KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৭, রমানাথ রোড, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher ন্যাশানাল নিউজ পেপার্স লিমিটেড
Title চিত্রবাণী	Size 7"x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number ১/২-৪ ১/৫-৮	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ - কার্তিক, ১৩৮২
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : সুব্রত রায়	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেড
সম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়

প্রথম বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৪২ | অষ্ট সংখ্যা

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অশান্ত,

প্রাক্-বৈপ্লবিক চীনদেশ—মাঞ্চু সম্রাট সগর্ব্বে সাম্রাজ্য শাসন করছেন। সেই সময় ধরো যদি কোনো চীনেম্যান হঠাৎ মনে করে যে, মাথায় "পিগ্-টেইল" রাখাটা একটা অত্যন্ত উচ্চ আত্মিক অবস্থা এবং তারপর সে যদি বোলপুরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এই ব'লে ধর্ণা দেয় যে যতদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ব-ভারতীর প্রতিটি শিক্ষক প্রতিটি ছাত্র মাথায় এক একটী ক'রে "পিগ-টেইল" না গজাচ্ছেন, ততদিন পর্য্যন্ত সে অর্থাৎ ঐ উপরিউক্ত মাঞ্চু সম্রাটের প্রজা চীনেম্যান অনশনব্রত অবলম্বন ক'রে থাকবে এবং এমন কি দরকার হ'লে উক্ত অবস্থায় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করবে—কিম্বা ধরো যদি আজ সুনীতি চ্যাটার্জ্জি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের লিখবার কক্ষের দ্বারের কাছে শুয়ে প'ড়ে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রোমান লিপিতে বাংলা ভাষা লেখা সুরু না করেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনি অর্থাৎ ঐ উপরিউক্ত রোমান-লিপি-প্রেম-বিকল সুনীতি চ্যাটার্জ্জি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করবেন না, তবে ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যথেষ্ট করুণ হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের পক্ষে ঐ করুণতার সাথে সাথে একটা অতি সূক্ষ্ম চাপা হাস্যরসেরও আবির্ভাব হয়।

তখন হয় রবীন্দ্রনাথকে মাথায় একটা "পিগ্-টেইল" নানাবিধ কেশতৈলসংযোগে যথাশীঘ্র সম্ভব গজাতে হয়, আর নয়ত তাঁকে উল্‌টে প্রায়োপবেশনে বসতে হয় এই ব'লে যে, যতদিন না চীনেম্যান তার অনশন ভঙ্গ করছে ততদিন তিনিও অন্নজল স্পর্শ করবেন না। বলা বাহুল্য যে, এর প্রথমটা হবে হাস্যজনক আর দ্বিতীয়টা হবে রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীর দিক থেকে প্রচণ্ড আপত্তিকর। আর একটা তৃতীয় পন্থাও অবশ্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ যদি চীনেম্যানের প্রায়োপবেশনটাকে তাঁর প্রতি জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের গুলি-চালানোর চাইতেও একটা বড় রকমের অন্যায় ব'লে মনে করতে

পারেন, তবে তাঁর ঠায় দাঁড়িয়ে চীনেম্যানের ঐ অনশনে আত্মহত্যা দেখা আর মনে মনে অবাচ্য করুণতার সঙ্গে ক্রাইষ্টের মতো প্রার্থনা করা Pardon him Father, he knows not what he is doing।

এ-ছাড়া চতুর্থ পন্থাও অবশ্য একটা আছে। কিন্তু সেটা আইনের কথা। সেটা হচ্ছে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আত্মহত্যার চেষ্টাপরাধে চীনেম্যানকে ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে হাজির করা।

আসলে সমাজে যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো বিষয়ে প্রায়োপবেশনের অধিকার principle হিসেবে, সমাজ সংস্থিতির একটা মূল সূত্র হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, সমাজে কেবলমাত্র এক আধ্যাত্মিক বা নৈতিক হিট্‌লারদেরই ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, আর কারো তা থাকবার দরকার নেই।

তা যদি হয়, তবে ব্যাপারটা কি রকম সঙিন্ হ'য়ে ওঠে মনে ক'রে দেখো। তবে পি, সি, রায় স্বচ্ছন্দে একদিন তোমার কাছে গিয়ে বল্‌তে পারেন যে তুমি চা পান ত্যাগ না করলে তিনি প্রায়োপবেশনে উপবেশন করবেন। কিম্বা কড়েয়া বাজারের ছটুলাল কি বছির মিয়াঁ তোমার ঘরে গিয়ে নির্ব্বিঘ্নে এই কথা বল্‌তে পারে যে তুমি যদি নস্যি ত্যাগ ক'রে বিড়ি না ধরো (যে হেতু নস্যি বিক্রি হয় বৌবাজারে আর বিড়ি তৈরি হয় কড়েয়া রোডে) তবে তারা অনশনে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত! তা হ'লে সমাজের প্রত্যেকটী নরনারীর সদা সশঙ্ক অবস্থায় অবস্থান করতে হবে এই ভেবে যে কার কখন martyr হবার সখ মনে চাড়া দিয়ে ওঠে। এমন কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আফগানরা কিম্বা উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত থেকে চীনারা যদি ভারত আক্রমণ করে তবে মহাত্মা গান্ধীর কোনো শিষ্যও এ-কথা বল্‌তে পারেন যে, ভারতবাসী যদি ঐ আফগানদের বা চীনাদের একমাত্র চরকা নিয়ে ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দেয় তবে তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবেন। কিন্তু অনুমান করছি যে, তাহলে সবার চাইতে মুস্কিল হয় কিশোরী তরুণীদের। কেননা, তবে প্রত্যেক হতাশ-প্রণয়ীই হয়ত তার দয়িতার কাছে এই ব'লে এক চিঠি লেখে যে, যতদিন না তিনি উক্ত পত্র-লেখককে বিয়ে করছেন ততদিন সে প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইল এবং এই মুস্কিল আরও সঙিন্ হয়ে উঠবে যদি কোনো বিশেষ সুন্দরী মেয়ের কাছে পাঁচ সাত দশ জন একই দিনে ঐ একই রকমের জবান্ দিয়ে পাঁচ সাত দশখানা চিঠি পাঠায়। বিশেষ ক'রে যখন একালে মহাভারতের দোহাই দেওয়া চলবে না।

সুতরাং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ যে সমাজে যে-কোনো ব্যক্তির যে-কোনো বিষয়ে প্রায়োপবেশনের অধিকার চোখ খুলে মান্‌তে পারা যায় না।

এখন তা যদি হয় তবে যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো প্রায়োপবেশনকারীকেই নির্ব্বিবাদে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করা চলে না। Martyr এবং murder এর বানান-জ্ঞান আমাদের স্পষ্ট থাকা দরকার। নিজেকে martyr করা, আর murder করা,—এক কথা নয়।

২

যাক্, এখন অ-বিশেষ থেকে সবিশেষে আসা যাক্—অর্থাৎ তোমরা ইংরাজীতে যাকে বলো from general to particular। ব্যাপারটা হচ্ছে পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার কালীঘাটের মন্দিরে ছাগবলি বন্ধ করবার জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন। বলা বাহুল্য, এই সঙ্গে সঙ্গে হয়ত পণ্ডিত রামচন্দ্রের ফুলচন্দন দিয়ে পূজোও আরম্ভ হ'য়ে গেছে। পণ্ডিতজীর পূজো আরম্ভ হ'য়ে গিয়ে থাকে তো থাক্, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমার আমার মতো লোক, যাদের এই একটা মস্ত বদ্ অভ্যাস আছে যে, তারা সব বিষয়ের ভিতরের ব্যাপারটা হৈ হৈ রৈ রৈ দিয়ে চাপা না দিয়ে ধীরচিত্তে শান্তমনে বুঝতে চায়, সেই তুমি আমি নিশ্চয়ই রামচন্দ্র শর্ম্মার এই প্রায়োপবেশনের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাষায় শুনতে চাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে চাই যে সেই উদ্দেশ্যটা কতটা বিচারসহ এবং ধ্যান ও জ্ঞানের অনুমোদিত। অর্থাৎ রামচন্দ্র শর্ম্মা সত্যি সত্যি দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন না একেবারেই চক্ষুহীন…অর্থাৎ তিনি ঋষিপদবাচ্য, না আর কিছু। মহাকবি লিখেছেন—Poets lovers and lunatics are all of imagination compact। সেকালে সম্ভবতঃ এই রকমের অনশন-দুষ্ট-ও-ক্লিষ্ট martyrএর উদ্ভব হয় নি। নইলে মহাকবি Poets lovers এবং lunaticsএর সঙ্গে martyr কথাটাও জুড়ে দিতেন নিশ্চয়।

সে যা হোক্ এখন বিচার করে দেখা যাক্।

প্রথমেই যে কথাটা আমার মনে উদয় হচ্ছে সেটা এই যে, যুগে যুগে ভগবান যেমন পরিত্রাণায় সাধুনাং এই ধরাধামে মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হন, পণ্ডিত রামচন্দ্রও কি আজ সেই রকমের ছাগ ও মেষকুলের রক্ষার জন্য কালীঘাটে অবতীর্ণ হয়েছেন? তা যদি হয়, তবে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটা খুব বিস্তৃত ব'লে মনে করা চলে না। কেননা আজ পৃথিবীতে প্রতি বৎসরে মানুষের হাতে যত ছাগ ও মেষকুলের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে তার সহস্র কি লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও জীবন-নাশ কালীঘাটে ঘটে না। সুতরাং কালীঘাটে বলি বন্ধ হলেই ছাগমেষকুল তাদের পার্থিব জীবনে যে একেবারে বিলকুল বিপদসঙ্কুলহীন হ'য়ে উঠবে তা নয়। এবং আজ রামচন্দ্র শর্ম্মা এই কলিকাতা মহানগরীর কর্ণওয়ালিস নামা ষ্ট্রীটে অনশনে প্রাণত্যাগ করলেই যে কাল স্পিট্‌স্‌বার্জেন থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope এর বাংলা—good hope কি না উত্তমাশা—মজাদার নয়?) পর্য্যন্ত বাফিন্ উপসাগর থেকে কেপ হর্ণ পর্য্যন্ত (কেপ্ হর্ণকে যে কেন আলস্যপরতন্ত্র হয়ে বাঙালী ভৌগোলিক শৃঙ্গ অন্তরীপ কিম্বা শিঙ্গা অন্তরীপ অথবা নেহাৎপক্ষে অন্ততঃ মোটর-বাঁশী অন্তরীপ করলে না তা বোঝা যাচ্ছে না) অন্যদিকে টোকিও থেকে পশ্চিমাভিমুখে স্যানফ্র্যান্সিস্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে সর্ব্বত্র ছাগ ও মেষকুল নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে বিচরণ ক'রে বেড়াবে বা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে বিচরণ করে বেড়াবার কোন সুদূর সম্ভাবনার সম্ভাবনাও গড়ে উঠবে, তা নয়। রামচন্দ্র শর্ম্মা অবশ্য বলতে পারেন টোকিও কিম্বা স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোতে ছাগমেষ বলি হয় হোক্ কিন্তু ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা ইত্যাদি। ছাগমেষকুল মনুষ্যভাষায় অভিজ্ঞ নয়। তা যদি হ'ত, তবে রামচন্দ্রের ঐ বক্তৃতা শুনে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে নিশ্চয়ই তারা প্রত্যুত্তর করত—"আমাদের মরতেই যদি হয়, তবে তা ধর্ম্মের নামেই হোক, বা ডিনার টেবিলের নামেই হোক অথবা শু ফ্যাক্টরির নামেই হোক, সব তাতেই আমাদের সমান কৈবল্য লাভ। ডিনার টেবিলের নামে আমাদের প্রাণত্যাগটা ধর্ম্মের নামে প্রাণত্যাগের চাইতে কিছুমাত্র কম আপত্তিকর নয়—কিম্বা ধর্ম্মের নামে প্রাণত্যাগটা যে শু ফ্যাক্টরির নামে প্রাণত্যাগের চাইতে বেশী আতঙ্কজনক, তাও নয়। আসলে হে মনুষ্যবৃন্দ, আপনাদের দিক থেকে যাই হোক্ না কেন, আমাদের দিক থেকে ও-সব সমান। কালী-মন্দির ও slaughter-house অর্থাৎ কসাইখানা, আমাদের অভিধানে এ-দুয়ের এক অর্থ! তবে হ্যাঁ—কালীমন্দিরের সাথে সাথে slaughter-house গুলিও যদি উঠে যায় তবে আমাদের কিছু সুরাহা হতে পারে বটে। কিন্তু তা কি যাবে?" সম্ভবতঃ ছাগ ও মেষকুলের নিজেদের মনেই সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমরা ভারত-বাসীরা অনেক সময় মাতৃভূমিকে সম্বোধন ক'রে এই রকমের গান গাই—হায় মা কেন তোকে বিধাতা এমন ঐশ্বর্য্যশালিনী করলেন—তা নইলে তো শক হূন পাঠান বার বার ইত্যাদি। ছাগ ও মেষকুলও নিশ্চয়ই সময়ে সময়ে তাদের সমাজে কণ্ঠ মিলিয়ে এই ধরণের গান ধরে—হায় বিধাতা কেন আমাদের দেহ এমন সুস্বাদু ক'রে গড়লেন—নইলে তো এশিয়া ইয়োরোপ আমেরিকার মনুষ্যনামধারী বর্ব্বরেরা ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা যদি দুনিয়ার ছাগমেষকুলকে রক্ষা করবার জন্যে কালীঘাটে অবতীর্ণ হ'য়ে প্রায়োপবেশনে ব'সে থাকেন, তবে তাঁকে সহৃদয়তার দিক থেকে যে-রকম প্রসংশাই করা যাক না কেন, তাঁর জ্ঞানের পরিধিটা লক্ষ্য ক'রে তাঁকে স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া যায় না।

কিন্তু দ্বিতীয়তঃ, এইখানে এই কথা উঠ্‌তে পারে যে, রামচন্দ্র শর্ম্মা প্রায়োপবেশনে বসেছেন সেটা দুনিয়ার ছাগ ও মেষকুলের পরিত্রাণায় নয়, সে হচ্ছে ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে প্রাণীহত্যা (animal sacrifice in the name of God) বন্ধ করা।

কথাটা শুন্‌লে হঠাৎ যেন মনে হয় ঈশ্বরের নামে পশুহত্যা হওয়াতে ঈশ্বরের একটা মহাকলঙ্ক বাজারে রটে গেছে এবং শীঘ্রই সমাজে উক্ত ভদ্রলোকের হুঁকো খোপা নাপিত ইত্যাদি বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই মহা অসুবিধাজনক অবস্থা থেকে ঈশ্বরকে বাঁচাবার জন্যেই রামচন্দ্রের এই প্রায়োপবেশন। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমন সাধু ঠিক তেম্‌নি জ্ঞান-দীপ্ত কিনা, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।

রামচন্দ্র শর্ম্মা ঈশ্বরকে তাঁর নামে পশু-হত্যা-হওয়া-রূপ কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে প্রাণপণ করছেন করুন, কিন্তু উক্ত ভদ্রলোকের পশুহত্যার জন্যে যে বিশেষ কোনো উদ্বেগ বা অনুশোচনা আছে তা বলে তো মনে হয় না। ঈশ্বর ব'লে যদি কেউ থাকেন এবং এই বিশ্বচরাচর যদি তাঁরই সৃষ্টি হয়, তিনিই যদি এর নানা মূল নীতির জন্যে দায়ী হন, তবে আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই যে, তাঁর পশুহত্যায় কিছুমাত্র লজ্জাবোধ বা পাপজ্ঞান নেই। প্রথমেই যা স্পষ্ট চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট বিরাট পশুজগতে এক প্রাণীকে আত্মসাৎ ক'রে আরেক প্রাণী বর্দ্ধিত হচ্ছে। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন তবে তিনি মার্জ্জার-গোষ্ঠীর (feline) ও শ্ব-গোষ্ঠীর (canine) সকল সভ্য-সভ্যকে এমন ক'রে তৈরি করতে পারতেন যে নখর-তন্ত্র মৃগ-শাবককে দেখ্‌লেই তাদের পাকস্থলীর নিম্নতম স্থান হতে একটা নিদারুণ বৈরাগ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাদের দেহের সমস্ত মাংসপেশীগুলিকে একেবারে উদাস্ত-স্বরে কা-তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ শুনিয়ে দেয়। তবে উক্ত দুই বনেদী গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সবাইকে এমন ক'রে তিনি গড়তে পারতেন যে, তারা নির্ব্বিবাদে সুশুভ্র বালি ও সুশুষ্ক উপলরাশি গলাধঃকরণ ক'রে দিব্যি জীবন-ধারণ করতে পারে। (তৃণ দুর্ব্বাদল গলাধঃকরণের কথা উল্লেখ করলেম না, কেন না বৈজ্ঞানিক অজ্ঞ এ-প্রমাণ করছেন যে পশু-জগতের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই—উদ্ভিদেরও সুখ-দুঃখ-বোধ আছে, আহার-নিদ্রা আছে, জন্ম-মৃত্যু আছে—এমন কি তারাও মদ খেলে মাতাল হয়, আঘাত পেলে ম্রিয়মান হয়—ইত্যাদি। সুতরাং আজ 'স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে' ব'লে সান্ত্বনা পাবার পথ বৈজ্ঞানিক মেরে দিয়েছেন)। কিন্তু তা যখন ঈশ্বর করেননি তখন হয় বলতে হয় যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান নন, নয় পশুহত্যা তাঁর নিজেরই অনুমোদিত। এখন ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান না হন তবে তাঁর আরও কত যে দোষ আছে তার ঠিক কি! কেননা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান যিনি, তাঁরই সর্ব্ব রকমের দোষ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। সুতরাং যাঁর আরও নানা রকমের দোষ থাকা সম্ভব, তাঁকে এক তাঁর নামে পশুহত্যারূপ কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কোনো রকমেই বুদ্ধিমানের বা দৃষ্টিবানের কার্য্য বলা চলে না। অপরপক্ষে ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন এবং সুতরাং পশুহত্যা তাঁর অনুমোদিত হয়, তবে তাঁর সেই পশুহত্যার কলঙ্ক নিবারণ করতে যাওয়ায় রামচন্দ্র শর্ম্মাকে ঠিক ঋষিপদবাচ্য করা যায় না। ঈশ্বর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৎসর ধ'রে এই পশুহত্যা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছেন। এখন এতকাল পরে হঠাৎ রামচন্দ্রের প্রায়োপবেশনে যে এই প্রাচীন বয়েসে তিনি সহসা নিজের চরিত্র সংশোধনে মনোনিবেশ করবেন, তা তো বোধ হয় না। বিশেষতঃ যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি লোকটীর এমনি একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা কারুণ্যরসধারা-বিগলিত সাধু সন্তদের দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে বিলকুল গরমিল।

কিন্তু তৃতীয়তঃ, এইখানে এই জবাব আসবে যে রাম-চন্দ্র যে প্রায়োপবেশনে বসেছেন সেটা দুনিয়ার ছাগ-মেষকুলের রক্ষার জন্যে নয় কিম্বা ঈশ্বরের কলঙ্ক-মোচনের জন্যও নয়, সেটা হচ্ছে বঙ্গবাসীর চরিত্র-সংশোধনের জন্যে, তাদের অন্তরে একটা নব দিব্যভাব জাগিয়ে তুল্‌বার জন্যে—অর্থাৎ অনশনটা ছাগমেষকুলকে বা ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য ক'রে নয়, বঙ্গবাসীকে লক্ষ্য ক'রে।

কিন্তু রামচন্দ্র প্রায়োবেশনে বস্‌লেই কি বাঙালীর চরিত্র ও মন বদ্‌লে যাবে? কিম্বা তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করলেই কি তাদের কচি পাঁঠা বা বৃদ্ধ মেষ দেখে বিরাট বৈরাগ্যভাবের উদয় হ'বে? পবিত্র গঙ্গা গর্ভের অমল ধবল ইলিশ মৎস্য দেখে কি তাদের গোঁড়ায় জিহ্বায় জল নিঃসরণ হবে না? মন ও চরিত্র বলে মানুষের যে বিষয় দুটী, সে দুটীকে কি আমরা এই রকম বলেই জানি? সে সব কি রাতারাতি কারো প্রাণ-রক্ষার খাতিরে হঠাৎ সত্যিকার ক'রে বদ্‌লে যেতে পারে? কোনো দৃষ্টিবান ব্যক্তিই কি এ-কথা বল্‌তে পারেন? বিশেষতঃ যারা কালী-ঘাটে পূজো দেয়, তারা কত শতাব্দী ধ'রে পুরুষানুক্রমে এ-কাজ ক'রে আস্‌ছে। আজও এদের মধ্যে অনেক লোক আছে যারা কালী-ঘাটের কালীকে জাগ্রত দেবতা ব'লে মনে করে এবং পশুবলি যে এ-দেবতার প্রিয় তাও বিশ্বাস করে। এখন রামচন্দ্র শর্ম্মাকে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে পশুবলি বন্ধ ক'রে তারা কি এই জাগ্রত দেবতার বিরাগ-ভাজন হ'তে সাহসী হবে? এই সাহস তাদের পেতে হ'লে হয় তাদের বিশ্বাস করাতে হবে যে, এ-দেবী দেবতা নন্ কিম্বা দেবতা হ'লেও জাগ্রত নন্ কিম্বা দেবতা ও জাগ্রত হলেও পশুবলি এঁর প্রিয় নয়। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রায়োপবেশনেই কি এ-কাজ করতে পারবে? রামচন্দ্র যদি মনে ক'রে থাকেন যে তা পারবে, তবে তাঁকে চক্ষুষ্মান ভাবতে পারা যায় না।

আসলে এই রকমের প্রায়োপবেশনের দ্বারা বহির্জগতের কোনো ব্যাপার বা বিষয় সাময়িকভাবে করিয়ে নেওয়া গেলেও যেতে পারে—অবশ্য যদি প্রায়োপবেশনকারী সর্ব্বসাধারণের অসাধারণ শ্রদ্ধার পাত্র হন—কিন্তু কোনো মানুষের বা জাতির অন্তর্জগতের পরিবর্ত্তন ঘটাতে গেলে যে-মন্ত্রের স্পর্শ দরকার, সে-মন্ত্র ঐ উপবাসের মধ্যে নেই। একটা জাতির ঐতিহ্য, সংস্কার, কাল্‌চার বা সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠে বহু শতাব্দী ধ'রে বহু মনের চিন্তা, বহু জনের সাধনা, বহু আত্মার শক্তি দিয়ে। একে পরিবর্ত্তিত করতে হ'লেও আবার চাই বহু মনের, বহু জনের, বহু আত্মার চিন্তা, সাধনা ও শক্তি। অথবা এমন এক ব্যক্তি যাঁর একার মধ্যেই বহু মনের চিন্তা, বহু জনের সাধনা, বহু আত্মার শক্তি সংহত হয়েছে—অর্থাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় যিনি ভগবানের চাপরাশ পেয়েছেন।

সুতরাং একটা সমগ্র জাতির বহু বহু শতাব্দীর অতীতকে পরিবর্ত্তিত করতে যে শক্তি সেটা প্রায়োপ-বেশনে মরবার শক্তি নয়, সেটা হচ্ছে আত্মার আলোকে, আত্মার ঐশ্বর্য্যে বাঁচবার শক্তি, বাঁচাবার শক্তি।

কিন্তু রামচন্দ্র শর্ম্মা যদি বাংলার আত্মার, বাঙালী জাতির কাল্‌চার বা সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন করতেই কালী-ঘাটে বা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তবে তিনি আত্মার কোন্ শক্তি, কোন্ ঐশ্বর্য্য নিয়ে এসেছেন? এমন কি সাধনা, কি চিন্তা, কি জ্ঞান লাভ করেছেন যে, তিনি এত প্রাচীন ও এমন মেধাবী বাঙ্গালী জাতির মতো একটা জাতির চরিত্র ও সংস্কৃতি বদ্‌লে দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন? এ পর্য্যন্ত এক অনশনে থাক্‌বার ঔদরিক শক্তি ছাড়া কি মানসলোক, কি চিন্তারাজ্য, কি আধ্যাত্ম-আলোক, কোনো বিষয়েরই কোনো অসাধারণ পরিচয় তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় নি। সুতরাং শুধু এক অনশনব্রত সম্বল ক'রে রামচন্দ্র শর্ম্মা যদি বাঙ্গালীর একটা মহা পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রয়াস করে থাকেন, তাহলেও তাঁকে খুব বেশী দৃষ্টিবান বলে মনে করা চলে না।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা পণ্ডিত হলেও হ'তে পারেন, কিন্তু ঋষিপদবাচ্য তাঁকে করা যায় না। তিনি যদি আজ অনশনে প্রাণত্যাগ করেন, তবে ঈশ্বরও তাঁর কার্য্যপ্রণালী বদলাবেন না, বাঙালীর চরিত্র ও মনও বদলে যাবে না এবং দুনিয়ার ছাগমেষকুলও রক্ষা পাবে না; বড় জোর কালীঘাটে যদি পাঁঠা বলি বন্ধ হয়ে যায়, তবে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে মাংসের দর বেড়ে যাবে। জগুবাবুর বাজারে গলদা চিংড়ির দামও

চড়ে যেতে পারে। কিন্তু কি কাণ্ড! মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে মাংসের দর বাড়াবার জন্যে এই যে বিরাট যজ্ঞ, এর কি কোনো অর্থই হয়? এর মধ্যে অনুপাত-জ্ঞানের কোনো হিসেবই কি পাওয়া যায়?

(৩)

আসলে রামচন্দ্র শর্ম্মার মতো সংকীর্ণ-জ্ঞান সংকীর্ণ-দৃষ্টি সৎ-মৎলবওয়ালা দরদী লোকেরা এমনি একটা স্বর্গ রচনা ক'রে বাস করেন, যেটাকে ঠিক বুদ্ধিমানের স্বর্গ নামে অভিহিত করা চলে না। তা যদি না হ'ত, এদের জ্ঞান-দৃষ্টি যদি এদের হৃদয়াবেগের সৃষ্টিগুলোকে একটু ছাড়িয়ে উঠতে পারত, এদের মানস যদি এদের জীবন-ব্যাপী ব্যক্তিগত সংস্কারগুলিকে কথঞ্চিৎও অতিক্রম ক'রে যেতে পারত, তবে এটা নিশ্চয়ই এদের চোখে পড়ত যে, কালীঘাটে পাঁঠা বলি বা শিকাগোতে শ্লটার হাউসে পশু হনন—এই যে নিষ্ঠুরতা, এটা অতি ছোট কথা। এর চাইতে আরও সাংঘাতিক কথা হচ্ছে এই যে, মহামান্য মানবের বহুমান্য সভ্যতার পিছনেই এমনি একটা নিষ্ঠুরতার ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। গোড়ার দিকে মানব-সমাজের সর্ব্বত্র যদি কেবল জৈন তীর্থঙ্করেরা জন্মগ্রহণ করতেন, তবে মানুষের সভ্যতা ব'লে কিছুই গজিয়ে উঠত না। এমন কি খুব সম্ভব নানা বিরুদ্ধ শক্তির কবলে পড়ে মনুষ্যনামধারী জীবটাই লুপ্ত হ'য়ে যেত। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতাকে গ্রহণ করতে সে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে নি বা ভয় পায় নি, তাই আজ-কার মানুষ যা, তাই। (শুনছি নাকি রামচন্দ্র শর্ম্মার কাছে শ্রীকৃষ্ণ পশুবলিতে কাতর হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। এই শ্রীকৃষ্ণই স্বজনবধে হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করবার জন্যে অর্জ্জুনের কাছে আঠারো অধ্যায়ব্যাপী বক্তৃতা দিয়ে গলা ভাঙ্‌ল)। এতে মানুষ বিশ্ব-বিধাতার আদেশ পালন করছে বলেই মনে করি। কেননা ডাইনোসরকে বাঁচিয়ে রাখাই বা পাঁঠাকে,—চতুষ্পদই হোক আর দ্বিপদই হোক,—মহিমান্বিত করাই তাঁর প্রধান মতলব নয়, স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাই আজকার সভ্য মানুষ তার মাথার টুপি থেকে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত সবেতে পশুজগতের আত্মত্যাগের চিহ্ন ধারণ ক'রে সগর্ব্বে বিচরণ করছে। এতে তার লজ্জা নেই, ব্যথা নেই—কেননা এইখানে সে নৈর্ব্যক্তিক।

কামকে আশ্রয় ক'রে যেমন মনুষ্যগোষ্ঠী বেড়ে উঠেছে, এই নিষ্ঠুরতাকে আশ্রয় ক'রে তেমনি মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বন্য মানুষ যেদিন তার চাইতেও বন্য ঘোড়াটাকে ধ'রে তার পিঠে সোয়ার হ'য়ে বসেছিল সেটা সেদিন তার উক্ত পশুর প্রতি সহৃদয়তার পরিচয় হয়নি। কিম্বা যেদিন সে অরণ্যের স্বচ্ছন্দবিহারী পশুকে ধ'রে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়ে নিয়েছিল, সেদিনও ঐ কার্য্য দেখে তাকে দয়ার অবতার ব'লে অভিহিত করা চল্‌ত না। মনে রেখো—কি মানুষ, কি পশু সবার জীবনেই মৃত্যুটাই চরম দুঃখজনক ব্যাপার নয়। আর মানুষ এই ঘোড়ার পিঠে চেপেছিল বলে, বনের পশু দিয়ে তার ক্ষেত চাষ করিয়ে নিয়েছিল ব'লে, তার সভ্যতাও সম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। কেননা সভ্যতার গোড়াকার অর্থ হচ্ছে এই যে, কে কতটা শরীরের মেহনত বাঁচিয়ে সেই শক্তি, সেই এনার্জি তার মস্তিষ্কের কোঠায় এনে কাজে লাগিয়েছে।

আর আজ যখন গিনিপিগ্‌ বা শশকের দেহে প্লেগ বা ক্যান্‌সারের বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক এক্স-পেরিমেণ্ট করেন তখনও সেটাকে ঐ পশুদ্বয়ের প্রতি একটা মহা কারুণিক ব্যবহার ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে না নিশ্চয়। তবু এই নিষ্ঠুরতাকে নির্ব্বিকারভাবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক গ্রহণ করেন। কেননা বৈজ্ঞানিকের অন্তরাত্মা জানে যে, একটা জরুরী পরোয়ানা তাঁর অন্তরে আছে। সেটা হচ্ছে ঐ বীজাণুদের ধ্বংস-গ্রাস হ'তে মানব-জাতিকে রক্ষা করা। সুতরাং গিনিপিগের উপর ঐ নিষ্ঠুরতা করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। যদিও এ-নিষ্ঠুরতা কালীমন্দিরের পাঁঠাবলির চাইতে বেশী নির্দ্দয়। এখন, একজন রাম-চন্দ্র শর্ম্মা কেন, পাঁচশত জন গৌতমবুদ্ধও যদি এসে বলেন মানুষ ক্যান্‌সারে মরে তো মরুক, কিন্তু গিনিপিগ্‌-দের বাঁচ্‌তে দাও, তবে তাঁদের সে-বলা বলাতেই থেকে যাবে, এমন কি সেই গৌতমবুদ্ধরা যদি প্রায়োপবেশনেও ব'সে যান। কেননা রামচন্দ্র শর্ম্মা বা গৌতমবুদ্ধের হৃদয়ের গঠন, আর বিশ্ব-বিধাতার মস্তিষ্কের গঠন এক-জাতীয় নয়। তাই বিশ্ব-বিধাতার বাণী হচ্ছে এই যে কেবল গিনিপিগ্‌ কেন, দুনিয়ায় যত পিগ্‌ আছে সব মরে তো মরুক, কিন্তু মানুষ যেন বাঁচে। মানুষ তার এই সভ্যতার জন্যে নিজের প্রাণও অকাতরে বিসর্জ্জন দেয়, যখন দরকার হয়—সে যে গিনিপিগের প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

(৪)

আমার উপরের ঐ বক্তৃতা প'ড়ে আমাকে একটা মহাহৃদয়হীন পাষণ্ড ব'লে মনে করবে নিশ্চয়। কিন্তু কি করা যাবে? এই সৃষ্টিটা বা মানুষের সভ্যতাটা কেবল একটা মানব নামক জীবের হৃদয় নামক জিনিষটার রস-রচনা নয়। এতে ঘাত প্রতিঘাত সংঘাত সব বর্ত্তমান। তাই থেকে যদি সৃষ্টিকে মুক্ত করতে পারো তবে দেখ্‌বে কালীমন্দিরের পাঁঠা-বলি তো পাঁঠাবলি, দুনিয়া থেকে মানুষবলি পর্য্যন্ত উঠে যাবে।

আর একটা শেষ কথা ব'লে এ-চিঠি শেষ করি। সার জগদীশের উদ্ভিদ্‌রাজ্যে গবেষণার কথা মনে ক'রে আমি কেবল এই কথা ভাব্‌তে চেষ্টা করি যে, যে—সূক্ষ্মবোধ আমাদের অন্তরে পশুহত্যার বেদনা জাগায়, সেই বোধ যদি আরও সূক্ষ্মতর হ'য়ে কুমড়ো-হত্যাতেও আমাদের অন্তরে ঠিক তেম্‌নি বেদনার জন্ম দেয় তবে আমাদের কি দশা হবে! তুমি অবশ্য এর উত্তরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌তে পারো যে, ইভলিউশানের দিক থেকে কুমড়োর মধ্যে প্রাণটা এমনি নীচু স্তরে রয়েছে যে, সেই কুমড়োকে বধ করলে বিশেষ কোনো দোষ নেই। কিন্তু সেটাও তো হবে হৃদয়হীনেরই কথা এবং সুবিধাবাদীরই যুক্তি। ইতি—

তোমার হসন্ত

—✻—

রূপসৃষ্টি

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

সারা জগতের যে গৌরবময় শিল্পসম্ভার উত্তরাধিকার-সূত্রে আজ আমাদের হাতে এসে পড়েছে তা নিয়ে আমাদের গর্ব্বের আর অন্ত নেই। এ যে আমাদের প্রাণের জিনিষ! এ নিয়ে গর্ব্ব তো আমাদের লজ্জার কারণ নয়!

একটা জাতির চিত্রশালায় যখন আমরা দেবদর্শন-পিপাসু ভক্তের প্রাণের আকুল আবেগ নিয়ে প্রবেশ করি, তখন সেই জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অপূর্ব্ব সৃষ্টি আমাদের মনে এমন একটা গভীর রেখাপাত করে,—যাতে আমরা সেই সৃষ্টিসম্ভারকে নিজেদের প্রাণের জিনিষ বলে মেনে না নিয়ে পারিনে! এমনি করে তারা হয়ে যায় যেন আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ! সর্ব্বধ্বংসী কাল কিম্বা জাতিবিশেষের প্রথার ব্যবধানমাত্র আমাদের মাঝে ভেদের প্রাচীর খাড়া করতে পারে না!

চিত্র কিম্বা অপরাপর শিল্প-সৃষ্টি-জগত মানুষের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে অমিতব্যয়ীর মত! কেবলমাত্র জাতীয় চিত্রশালায়, যাদুঘরে শিল্পীর বিরাট সৃষ্টির ভেতরই আমরা নয়নের তৃপ্তি খুঁজে পাই, তাই নয়! আমাদের চারিদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে এই শিল্প-জগত! পথ চলতে আমাদের নয়ন-পথে আসে যে কোন পুস্তকের আপণ, স্বর্ণকারের কর্ম্মশালা,—সবেরই ভেতর আমরা খুঁজে পাই অতীত শিল্পজগতের কোন না কোন নিদর্শন।

যে চিত্র হয়ত গতকল্য শিল্পীর দক্ষ তুলিকাসম্পাতে তার সব সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে উঠেছে, যে কর্দ্দমপিণ্ড

স্থপতির হাতের যাদুস্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই সৃষ্টি যদিও কল্যকার তবুও এর মূলে রয়েছে জগতের এক অতীত সভ্যতা।

কোন শিল্পরসিকের গৃহদ্বারে রয়েছে এই সৌন্দর্য্য-সম্ভারের কতক অংশ, কোন ভক্তের পূজাগৃহের বেদীমূলে জেগেছে নয়নানন্দকর অপূর্ব্ব কারুশিল্প! দ্বারপথ কিম্বা বেদীমূল সৃষ্ট হয়ত আমাদের জীবিতকালেই, তথাপি এইভাবে মানবমনের শিল্প-পিপাসা মেটাবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের ইতিহাস এমন কি স্মৃতির অতীত-কালের এক গৌরবময় সভ্যতার মাঝে! তাই বর্ত্তমান যুগের শিল্পের ভেতর অল্পবিস্তর পরিমাণে রয়েছে প্রাচীন শিল্পজগত হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানুষের জ্ঞান!

যুগ যুগ ধরে শিল্পীরা জগতের বুকে ছড়ানো রূপকে তুলিকাপাতে কাগজের বুকে ফুটিয়ে মানুষের আয়ত্ত করে দিয়েছে! আর আজও তা আমাদের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগাচ্ছে! বর্ত্তমান যুগের শিল্পীরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তা থেকে প্রেরণা লাভ ক'রে যে সৃষ্টি ক'রে চলেছে তার ফলে জগতের সেই অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভার দিন দিন বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে! ইতিহাসের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে শিল্পবিভাগ সম্বন্ধেই আমরা প্রাচীন যুগের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী!

শিল্পের এত নিদর্শন আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যে সব সময়ে ভালমন্দের পার্থক্য-বিচারে আমরা উদভ্রান্ত হয়ে পড়ি! তাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি! প্রাচীন যুগের শিল্পীদের আমরা মাপকাঠি হিসেবে মেনে নিতে পারি!

তবে এ কথাও সত্য—কোন চিত্র বা স্থাপত্য কেবলমাত্র প্রাচীন যুগের ছাপের জোরেই শ্রেষ্ঠত্বের কোঠায় উঠে যাবে এমনও কোন কথা নেই! প্রাচীন যুগের অনেক শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন আমরা সযত্নে রক্ষা করি কেবলমাত্র মৃত এক সভ্যজাতির অস্তিত্বের নিদর্শন হিসাবেই! মৃত জাতির ইতিহাস সঙ্কলনকালে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া সে সবের যে আর বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। কিন্তু শিল্পের জগতে এমন চিত্র, এমন স্থাপত্য-কলার নিদর্শনও আছে, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালীর সৃষ্টি বলে মানুষ শুধু মেনেই নেয়নি; বিচারকের কঠোর দৃষ্টির কাছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে!

অন্য মানুষের, অন্য যুগের মতে মত দেবার একটা অনিচ্ছা প্রথম সব মানুষের মনেই জাগে। হালকা মনে রেখাপাত করবার মত ছবিকেই হয়ত গোড়ায় আমরা প্রাচীন যুগের ভাবপূর্ণ চিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। শিল্পের সম্বন্ধে প্রকৃত বিচার করবার ক্ষমতার অভাবেই এমন ঘটে থাকে। কেবলমাত্র শিল্পীই সৃষ্টি করেন না, প্রকৃত দর্শকের দৃষ্টিও সে সৃষ্টির অনেকখানি সাহায্য করে থাকে। একখানি চিত্রে রয়েছে ঘটনা আর শিল্পীর অন্তর্নিহিত রহস্য। সেই রহস্যের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন শিল্পসৃষ্টিরই প্রকৃত বিচার আমরা করতে পারি না।

বিচারের সূক্ষ্ম তৌলে যে সকল শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে তাদের তিনটে বিভাগ আছে; অঙ্কন, তক্ষণ এবং স্থাপত্য। এর মধ্যে স্থাপত্যকেই আমরা অপর দুটির জনক হিসাবে মেনে নিতে পারি। কারণ অঙ্কন-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় গৃহের অলঙ্করণের মধ্যে। গৃহপ্রাচীর, গৃহের আসবাবের ভেতরই মিলতো অঙ্কন-শিল্পের নিদর্শন। ফ্রেমে বাঁধাই চিত্র প্রাচীর-শিল্পেরই পরবর্ত্তী সংস্করণ। তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শন মিলতো মন্দির বা রাজপ্রাসাদের খিলান কুলুঙ্গী কিম্বা প্রাচীর অলঙ্করণের ভেতর।

প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও এই সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানবমনের এক চিরন্তন প্রেরণা। আর এই প্রেরণার মূলে সকল যুগেই ছিল মানবমনের কতকগুলি চিরন্তন উচ্ছ্বাস। সেগুলি হচ্ছে প্রেম, দুঃখ, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। এই চারিটির সবগুলি ব্যতিরেকে কোন মহান্ শিল্পসৃষ্টির সম্ভব কোন যুগে হয়নি।

এর মধ্যে প্রেম দিয়েছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৃষ্টির প্রেরণা। তবে প্রেমের সংজ্ঞার একটা বিরাট বিস্তৃতি আছে। স্বামী, স্ত্রী, সন্তানের মধ্যে আছে প্রেমের এক

সম্বন্ধ। আবার মানুষের আছে সততা, সাহসের প্রতি প্রকারান্তরের প্রেম। আবার এই মানুষের আছে ঈশ্বরের প্রতি আধ্যাত্মিক প্রেম। আবার কারো বা আছে ঈশ্বরের সৃষ্ট মাটির ধরার উপর একটা আকর্ষণ। দুঃখের প্রেরণা হতে সৃষ্ট শিল্পের সংখ্যা যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প, তবুও তারা মানুষের মনকে নাড়া দেয় খুব বেশীই।

মানবমনের উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আর এই ভক্তির ভেতর দুঃখ, প্রেম, শ্রদ্ধা নিহিত রয়েছে। এই ভক্তির প্রেরণায় মানুষ এঁকেছে ছবি, গড়েছে মূর্ত্তি, মন্দির, ভজনালয়, আর প্রত্যেক মানুষের ভেতর ভগবানের প্রতি একটা উর্দ্ধমুখী চিন্তা আছে ব'লেই ভক্তির প্রেরণায় সৃষ্ট শিল্পকে মানুষ চিরদনই উচ্চাসন দিয়ে এসেছে। মানুষের খাঁটি বিচারে যুগে যুগে যে শিল্পসৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বলে পূজিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের ভেতরই মানুষের মনের চারিটি আবেগের যে কোন একটি বর্ত্তমান। আর এই ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত কোন সৃষ্টির ভেতর দক্ষতার ন্যূনতা বর্ত্তমান সত্ত্বেও তা মানুষের মনে চিরদিনই বেশী করে সাড়া দেয়। যে ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ মানুষ এমন সৃষ্টিকে একটা উচ্চাসন দেয় সেই ভাবটুকু হচ্ছে সৃষ্টির কাঠামো, সম্পূর্ণ মূর্ত্তি নয়। এর ভেতর অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু ছাড়া আর সবই ফুটে ওঠে। আর শিল্পীর প্রধান গৌরবই হচ্ছে নিজের বিশিষ্ট কল্পনাশক্তির বলে এই রহস্যটুকুর সন্ধান পাওয়া। যার কল্পনার জালে এই রহস্যটুকু যে পরিমাণে ধরা দেয়, তার সৃষ্টি হয় সেই পরিমাণে উদার, মহান্, গৌরবময়।

এখন আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, শিল্পসৃষ্টির মূলীভূত রূপই বা কি, কল্পনাই বা কি। এর কোন নির্দ্দিষ্ট উত্তর আজ পর্য্যন্ত মেলেনি। আমরা জানি খাদ্য যেমন দেয় দৈহিক তৃপ্তি, তেমনি এইরূপ কল্পনার সমন্বয়ে সৃষ্ট শিল্প আনে আমাদের মানসিক তৃপ্তি। এইরূপ কল্পনার আভাস জীবনের রহস্যের ভেতর লুক্কায়িত রয়েছে। রহস্যাবৃত হলেও মনের এই ইন্দ্রিয়গুলি চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি দৈহিক ইন্দ্রিয়ের মতই সত্য। কর্ণে যেমন সঙ্গীতের সুমিষ্ট লহরী দেয় একটা জাগ্রত প্রেরণা, দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া পাথরের মূর্ত্তি দেয় যেমন চোখকে তৃপ্তি, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মনের ইন্দ্রিয়গুলির কাছে ধরা পড়ে দৈহিক ইন্দ্রিয়ের অতীত ওদের একটা প্রচ্ছন্ন রূপ।

শিল্পী—র‍্যামব্রাণ্ট] বৃদ্ধার মুখচ্ছবি

রূপ, কল্পনা, বাস্তবের অতীত আদর্শের কাছেও একটা সাড়া এনে দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে অনেক শিল্পীর তুলির মুখেই বৃদ্ধা নারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু র‍্যামব্রাণ্টের তুলিকাসম্পাতে ফুটে উঠেছে যে বৃদ্ধার মুখচ্ছবি তা এই শ্রেণীভুক্ত চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম! শিল্পী তাঁর অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তির বলে রূপ-স্রষ্টার সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে, কল্পনাশক্তির বলে, সে মুখে আশ্চর্য্য এক রূপের রহস্যময় ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সে মুখ জরা, বার্দ্ধক্যজীর্ণা এক বৃদ্ধার নয়। সেখানে ফুটে উঠেছে স্নেহমমতা, মর্য্যাদাজ্ঞান, দুঃখ আর বয়সের সঙ্গে মানুষের ভেতর জমে ওঠা সকল রকম পার্থিব অভিজ্ঞতার ছবি।

প্রকৃতির বিস্তৃত রাজ্যে ছড়ানো অনন্ত রূপসম্ভার বহু শিল্পীই রূপে, রঙে, রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন! সূর্য্যের দীপ্তি, সাগরের বিশালতা, অনেকেই ক্যানভাসের বুকে বন্দী করেছেন! সেই একই দীপ্তি, বিশালতা ফোটালেন, টার্ণার। কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত রহস্যের, কল্পনার, দৃষ্টিশক্তির কাছে সেই দীপ্তি, বিশালতার এমন একটা স্বর্গীয় রূপ ধরা পড়লো, যার ফলে তাঁর সৃষ্টিগুলি হয়ে রইলো শিল্পীর অমর কীর্ত্তি। যার ভেতর এমন এক রূপের সন্ধান পাওয়া গেল যা বাস্তবে কোনদিন দেখা যায়নি। এ যেন কবির মানসচক্ষের সামনে ভেসে ওঠা প্রকৃতির এক অনবদ্য, অদৃষ্ট রূপ।

মানব মনের এইরূপ কল্পনাদৃষ্টি যে পরিপুষ্ট হয়েছে তা শুধু হাজার হাজার বছর ধরে নিজেকে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টার ফলে। সকল শিল্প, কাব্য, সঙ্গীতই মানুষের আত্ম-প্রকাশের বিভিন্ন রূপ। খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দৈহিক আবশ্যকের পরেই আত্ম-প্রকাশের প্রচেষ্টা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি!

যুগে যুগে জনকয়েক জড় প্রকৃতির মানুষ ছাড়া সকলেরই আগ্রহ থাকে এমন একটা কিছু গড়ে তুলতে, যার ভেতর তার বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ পড়ে। এই আগ্রহের ফলেই শিশু বহু চেষ্টা, যত্নের ফলে বালির উপর গড়ে তোলা সামান্য এক স্তূপকে দেখিয়ে সগর্ব্বে বলে আমি গড়েছি এই বাড়ী। এই আগ্রহের ফলে গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ফিডিয়াস এথেন্সে গড়ে ছিলেন পার্থিনন, এই আগ্রহের বশবর্ত্তী হয়েই মহাকবি সেক্স্‌পীয়ার লিখলেন তাঁর অমর গ্রন্থাবলী, বিটোফেন লিখলেন তাঁর করুণ, মহান সুরসৃষ্টির নিদর্শনগুলি। আমাদের শাস্ত্রের মতে সৃষ্টিরহস্যের মূলে রয়েছে স্রষ্টার এই আত্মপ্রকাশেচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার একটিমাত্র ইঙ্গিতে গড়ে উঠলো আমাদের এই সুবিশাল, বৈচিত্র্যময় জগৎ। তাঁরই সৃষ্ট জগতে বাস করে আমরা নিয়তই চেষ্টা করছি স্রষ্টার সেই রহস্যময় রূপের কণামাত্র ফুটিয়ে তুলতে।

আত্ম বিকাশের প্রথম প্রচেষ্টার মধ্যেই হোল শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। যে যুগে মানুষের লেখাপড়ার কোন নিদর্শনই মেলে না, যখন মানুষের অঙ্গের একমাত্র আবরণ ছিল পশুচর্ম্ম, তখনো মানুষের মাঝে জেগেছিল অঙ্কনের প্রেরণা। আজ শিশু যেমন তার প্রিয় বিড়ালের ছবি শ্লেটে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে, তেমনি সেই আদিম যুগে সহজ, সরল কতকগুলি রেখার সাহায্যে শিকারী ছুরির আঁচড়ে গুহার প্রস্তরগাত্রে ফুটিয়ে তুললে পলায়মান জন্তুর গতিভঙ্গির ছবি। আদিম যুগের সেই প্রথম প্রচেষ্টা আর বর্ত্তমান যুগের উন্নত, পরিপুষ্ট শিল্পসৃষ্টির মাঝের বিরাট ব্যবধান ভরিয়ে তুলতে মানুষের হাজার হাজার বছর লেগে গেল! এর মধ্যে কত সভ্যতা জগতের বুকে আত্ম-প্রকাশ করে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেল! কিন্তু বিগত যুগসমূহে মানুষের আত্ম-প্রকাশের প্রচেষ্টার ফল-প্রসূ বিরাট শিল্পজগৎ আজ বংশপরম্পরায় আমাদের হস্তগত হয়েছে।

অতীত জগতের পানে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের চোখে পড়ে আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের আত্ম-বিকাশের ব্যাথাভরা দ্বন্দ্বের নিদর্শন। বেদনার মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তার পাত্রটি যুগে যুগে সযত্নে রক্ষিত হয়ে আজও আমাদের ভেতর অমৃতের বীজ বপন করছে! বহুদিন ধরে মানুষের শিল্পসৃষ্টি ধর্ম্মকে ঘিরে আত্ম-বিকাশের প্রচেষ্টায় মগ্ন ছিল! ধর্ম্মের ভেতর বর্ত্তমান অন্ধ-বিশ্বাসের অন্ধকারে প্রকৃত রূপের আভাস মানুষের কল্পনাশক্তির কাছে যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়নি! মানুষের কল্পনা হয়ে গেল পঙ্গু, আর মানুষের বহু উচ্চে অবস্থিত দেবতার মূর্ত্তি গড়বার চেষ্টায় মানুষ গড়ে তুলেছিল সুসজ্জিত পুত্তলিকা! দেবত্বের চেয়ে তাতে ফুটেছিল বাহ্য চমকের বাহুল্য!

তবুও একথা বলা যেতে পারে এই ভুল-ভ্রান্তির আলো-আঁধারের মাঝেও মানুষ একটু একটু করে আদর্শের দিকেই এগিয়ে চলেছিল! যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিল্পসৃষ্টির উদারতা, বিশালতা ক্রমোন্নতির পথেই চলতে লাগলো! আতিশয্য পবিত্রতায় সরলতায় বিকশিত হোল! শিল্প অতি-মানবত্বের কোঠা থেকে নেমে এসে দাঁড়ালো জাতির দৈনন্দিন জীবনের মাঝে! ক্রমে শিল্প-জগতে এমন স্রষ্টারও আবির্ভাব হোল যাদের সকল স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তির উপরেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল রূপস্রষ্টার উর্দ্ধমুখী দৃষ্টি, কল্পনার বিরাট ক্ষেত্রে যা ছিল নিয়ত নিবদ্ধ! জগত নতমস্তকে এদেরই প্রতিভা মেনে নিলে। এঁদের অন্তর্নিহিত রহস্যের আত্ম-বিকাশের প্রচেষ্টার ফলে শিল্পজগতে এমন উদার, মহান সৃষ্টি সম্ভবপর হোল বা যুগযুগব্যাপী মানব-ইতিহাসের বুকে গভীর রেখাপাত ক'রে এগিয়েই চল্লো।

আহার, বিহার প্রভৃতি স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তির বহু উচ্চে ছিল এঁদের দৃষ্টি। অন্তর্ব্বর্ত্তী পবিত্রতার বিকাশের চেষ্টায় এঁদের সারা জীবন ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত কেটে গেল। এদের অন্তর্নিহিত রহস্য রূপে, রেখায় ফুটে উঠলো অঙ্কনে, তক্ষণে, স্থাপত্যে। তবে মানবমনের বৈচিত্র্যের ফলে যুগে যুগে, দেশে দেশে এই আত্ম-প্রকাশের প্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রাচীন গ্রীস, ভারত প্রভৃতি জাতির জীবনে এইরূপ কল্পনার বিকাশ হয়েছিল বহুল পরিমাণে। তাই আজও ভারতের অজন্তা, গ্রীসের অপূর্ব্ব তক্ষণ জগতের দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব বিস্ময় জাগায়।

জাতীয় জীবনে এইরূপ কল্পনা পূর্ণভাবে বিকশিত হয় একটা বিশিষ্ট যুগে।

যখন মানুষের প্রাণের উৎস যায় শুকিয়ে, তখন তার ভেতর হয় মিথ্যার প্রসার, তখন তার শিল্পসৃষ্টি নিম্নস্তরভুক্ত হয়ে যায়।

মানুষের স্বভাব তাকে শিল্পের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে নিয়ত সজাগ রাখে। শিল্পীদের প্রাণে সকল সময়ে প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলার যে স্বপ্ন জেগে থাকে তার ফলে তাদের প্রতিভার সঙ্গে একটা বেদনাময় মহান্ ভাবের ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। এই মহান্ বেদনা তাদের প্রাণে সব সময়েই অবর্ণনীয় অপ্রাপ্য একটা কিছু ফোটাবার প্রেরণা দিয়ে থাকে। যখন শিল্পীর প্রাণের আবেগ যায় ফুরিয়ে, যখন প্রেরণার অগ্রগতির অভাব সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, তখনই তার মুখে ফুটে ওঠে বেদনাময়, অশান্ত এক বাণী; "ওগো সকল রূপের স্রষ্টা, দৃষ্টি আমার আচ্ছন্ন, অন্ধ। তার সুমুখে জাগাও তোমার অনন্ত রূপের আলোর একটুখানি আভাস।"

রূপের এই সতৃপ্ত পিপাসা কেবল শিল্পীদেরই নিজস্ব নয়। সকল নর, নারী, শিশুর ভেতরে থাকে এই পিপাসা অল্পবিস্তর পরিমাণে। পিপাসু এই অন্তরের পরিচয় পাওয়া মাত্রই আমাদের প্রাণ অনাস্বাদিত এক তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। চিত্রে, ভাস্কর্য্যে রূপ ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা থাকে ভাগ্যবান কয়েকটি শিল্পীর। কিন্তু এই পিপাসু অন্তর আমাদের মাঝে একটা অশ্রান্ত অতৃপ্তির সুর তোলে বলেই শিল্পসৃষ্টির কোন সুন্দর জাগ্রত নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিপথে আসামাত্রই অন্তর সাড়া দিয়ে বলে "দেখা পেয়েছি।" রূপের সন্ধান পাওয়া মাত্রই আমাদের রূপপিপাসু অন্তর বিকশিত হয়ে ওঠে। এইভাবে ক্রমাগত দর্শনের ফলে আমাদের রূপদৃষ্টি, কল্পনাশক্তি পরিপুষ্ট হ'তে থাকে। জীবনের ক্ষণ যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই আমাদের জীবনে মানবতার পরিচয় ফুটে উঠতে থাকে। সঙ্গীতের সুর প্রায় সকলের মনেরই অন্তরতম প্রদেশে একটা সাড়া আনে। কিন্তু সেই সুরকে বাক্যে, বাদ্যে জাগাবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। সুন্দর মহান্ একটা রূপসৃষ্টি অনেকের মনকেই নাড়া দেয়। কিন্তু তুলিকাসম্পাতে তাকে ফোটাবার দক্ষতা থাকে জনকয়েক ভাগ্যবান শিল্পীর।

আমাদের প্রাণের অবর্ণনীয় বাণীকে মূর্ত্ত করেন কবি। আমাদের প্রাণের রূপসৃষ্টির অশান্ত, অনন্ত পিপাসাকে জাগ্রত করেন শিল্পী। প্রাণের মূক আবেগকে বাক্যে, বর্ণে, রেখায় মূর্ত্ত করাই শিল্পীর কাজ। সুখ ও দুঃখের অসহনীয় উচ্ছ্বসিত আবেগে যখন সাধারণ মানব মূক হয়ে যায়, শিল্পী হয়ে ওঠেন তখনই প্রাণচঞ্চল, মুখর।

রূপ, কল্পনা জীবনে জাগার শুভমুহূর্ত্ত হ'তে জীবনের প্রতিক্ষণ হয়ে ওঠে ক্ষুদ্র দেবদূতের ডানার শব্দে মুখর; সূর্য্যের দীপ্তি, বসন্তের কুসুম, ঘন বনানীর শ্যাম শোভায় সমুজ্জ্বল। তখন আমাদের পার্থিব জীবন হয়ে ওঠে স্বর্গীয় সুষমায় ভরপুর।

যে শিল্পীর সৃষ্টি রূপপিয়াসী অন্তরে সাড়া জাগায় না, তার মধ্যে প্রকৃতির বিশাল রাজ্যের বর্ণ-সমন্বয় হলেও সে সৃষ্টি হয়ে যায় ব্যর্থ! চিত্রিত বিষয়ের বহির্ভূত ভাবরাজ্যের দ্বার যদি সে আমাদের দৃষ্টিপথে উন্মুক্ত না করে তবে সেখানেই হোল তার মৃত্যু।

ইরাকে

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

(৫)

এই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাগদাদ—কল্পনার কল্পলোক, কবিত্বের কাম্যকানন, উপন্যাসের রাজ্য। কিন্তু ইহার ইতিহাস কেবল সাহিত্যের ইতিহাসই নহে—সে ইতিহাস কেবল কল্পনার নহে।

বাগদাদের বর্ণ—এক কথায় ময়ূর-কণ্ঠের নীল—আর তাহার মধ্যে মলিন স্বর্ণ। গাঢ় নীল বর্ণের চিক্কন টালিতে মসজেদের গম্বুজ প্রস্তুত—আর মিগরেটের স্তম্ভ স্বর্ণবর্ণ। ধূলিধূসর প্রাচীর আকাশে ইহার শোভা সহজেই অনুমান করা যায়। সহরের অব্যবহিত পরেই পরিখা—পরিখা ও প্রাচীর, আর তাহারই নিকটে সমাধিক্ষেত্র—সমাধি-মধ্যে মাক্কার দিকে মুখ রাখিয়া শব সমাহিত। চারিদিকে মৃত্যুর চিহ্ন। এই সব সমাধির মধ্যে প্রসিদ্ধ বাদসা হারুণঅল রসিদের প্রিয় পত্নী জোবেদার সমাধি বলিয়া যে স্তম্ভাকৃতি সমাধি দেখান হয়, তাহা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। জোবেদাকে অবলম্বন করিয়া কত গল্পই রচিত হইয়াছে! নদীর দুই কূলে সহর। পর-পারের বর্ণ এ পারের বর্ণের প্রতিফলিত শোভা—তাহাতে নানা বর্ণ—দাড়িম্ব কুসুমের রক্ত হইতে শিরিশের বর্ণ পর্য্যন্ত নানা বর্ণের সম্মিলন।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, বাগদাদ মুসলমান নগর—আল মনসুরের সময় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বকালে টাইগ্রীসের পশ্চিমকূলে পূর্ব্বে যে প্রাচীর রচিত ছিল, তাহার ইষ্টকে নেবুকাটনেজারের নাম অঙ্কিত। কিন্তু আরব ঐতিহাসিকরা বলেন, আল মনসুর যখন সহর প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তথায় কোন নগরের চিহ্নও ছিল না। হয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী নগর তখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রাকৃতিক উপদ্রবে, কি মানুষের কার্য্যফলে ইহা হইয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। হারুণ-অল-রসিদের সময় বাগদাদ বহু সুরম্য হর্ম্ম্যে শোভিত হয়। তিনিই নদীর পরপার পর্য্যন্ত সহরের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন এবং দুই অংশে গতায়াতের সুবিধার জন্য নৌসেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। হারুণ-অল-রসিদ ও তাঁহার পত্নী জোবেদার চেষ্টায় বাগদাদ সমৃদ্ধ এবং শিক্ষার এবং শিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হয়। জেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র হুলাকু ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ আক্রমণ করিয়া আব্বাসাইদ বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। তাহার পর বাগদাদের ইতিহাস জয়-পরাজয়ের ইতিহাস—এই সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—নাদির সাহ বাগদাদ আক্রমণ করিয়া তাহা জয় করিতে পারেন নাই। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা নামে কেবল তুর্কীর অধীন ছিল; কিন্তু আকমেভ পাশার সময় হইতে বাগদাদ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছিল।

এক পারে বহু মসজেদ ও সরাই, বাজার ও গৃহ—অপরপারে, কিছু দূরে কাজমেন। তথায় শিয়া সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান মসজেদ।

যাঁহারা বর্ত্তমান বাগদাদে আরব্য উপন্যাসের যুগের কোন চিহ্ন দেখিবার আশা করেন, তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ হইবে না।

তবে বাগদাদ এক সময় প্রাচীর ও প্রতীচীর বাণিজ্য-পথ ও কেন্দ্র ছিল। সকল দেশের পণ্য এই বাগদাদের বাজারে বিক্রয় হইত। হয়ত তখন—বাজারগুলি এখনকার মতই ছিল—বড় বড় খিলান করা গৃহ—মধ্যে পথ—দুই পার্শ্বে বিপণী; বিপণীতে বসিয়া চতুর দোকানীরা ক্রেতার সহিত পণ্যের মূল্য লইয়া দর কশাকশি করিতেছে। আর তখনও হয়ত সহরের পথের পার্শ্বে এমনই কফিখানা ছিল—বাগদাদবাসীরা তথায় বসিয়া কফি পান করিত, গার্হস্থ্য হইতে বাণিজ্য পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের আলোচনা করিত।

মধ্যে মধ্যে পারস্যের শাহার সহিত বাগদাদের শাসকের যুদ্ধ হইত। শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ রক্তপাতে পরিণতি লাভ করিত—গৃহদাহে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইত।

আমরা যখন বাগদাদে উপনীত হই, তখনও বাগদাদের পূর্ব্বরূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

জাহাজেই আমাদিগকে বলা হয়, হোটেল মডে আমাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে আমরা তথায় নীত হইলাম। বোম্বাই ত্যাগ করিবার পর আর এইরূপ আরামপ্রদ স্থানে বাস হয় নাই। বসোরায় বাস—স্বল্পাবারে, সৈনিকদিগের মধ্যে। আমার গৃহটি যেমনই কেন হউক না—সব ব্যবস্থা আপনাকে করিতে হইত। বাগদাদে এই হোটেলে সে সব উৎপাত নাই। হোটেলটির নামেই বুঝিতে পারা যায়—ইহা অল্পদিনের; কারণ—ইহা বাগদাদ-বিজয়ী জেনারল মডের নামানুসারে হোটেল মড নামে অভিহিত হইয়াছে।

হোটেলে বসিয়া মুক্ত বাতায়নপথে বাগদাদ সহর দেখিতে বসিলাম। মসজেদের উপর দলে দলে ধূসর-বর্ণ কপোত উড়িতেছে, বসিতেছে—আপনাদের মধ্যে কলহ করিতেছে, প্রেমালাপ করিতেছে। নিম্নে রাজপথে লোকের গতায়াত —উষ্ট্র যাইতেছে, বাহন হিসাবে শ্বেতবর্ণ গর্দ্দভই অধিক ব্যবহৃত।

বসিয়া বসিয়া সময় কাটিতে লাগিল—বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গী মৌলবী মাতুব আলমকে বলিলাম, "বাগদাদ সহরে আসিয়া সহর না দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না; চলুন বেড়াইয়া আসি।" তিনি বলিলেন, "যিনি আমাদিগকে দেখিবার ভার পাইয়াছেন, তাঁহার বিনানুমতিতে যাওয়া কি সঙ্গত হইবে?" আমি বলিলাম, "কোন দুষ্কর্ম্ম ত করিতেছি না—নিশ্চয়ই এ জন্য সামরিক ব্যবস্থায় কোতল করিবে না।"

দুই জনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

মৌলবী বলিলেন, "বাগদাদে আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদ বিশেষ প্রসিদ্ধ; যে কেহ তাহার সন্ধান দিতে পারিবে। চলুন, সেই মসজেদ দেখিতে যাওয়া যাউক।"

বাগদাদ সহরের দৃশ্য

আমি বলিলাম, "যেখানে ইচ্ছা চলুন—আমার উদ্দেশ্য সহর দেখা।"

রাস্তায় আসিয়া মৌলবী এক জন পথিককে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে সে পথ দেখাইয়া দিল। কিছু-দূর অগ্রসর হইয়া যে পথে আসিয়া পড়িলাম, তাহা পীচ দিয়া প্রস্তুত। তথা হইতে কোন্ দিকে যাইব, তাহাই জানিতে হইবে।

আমরা দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি বালক গর্দ্দভারোহণে তথায় আসিল। বালকটি গৌরবর্ণ—যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমা। তাহার সাজসজ্জা ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠাসন দেখিয়া মনে হইল, সে সম্ভ্রান্তবংশীয়। তাহার সঙ্গী ভৃত্যকে মৌলবী সাহেব আরবীতে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে বালকটি উর্দ্দুতে উত্তর করিল—সম্মুখেই মসজেদ! বাগদাদ সহরে এই বালকের মুখে উর্দ্দু কথা শুনিয়া বিশেষ বিস্ময়ানুভব করিলাম। বালক সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, সে সেই পথেই যাইবে।

আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া মসজেদের দ্বারে উপনীত হইলাম।

বালক সম্মুখের একটি বৃহৎ গৃহের দ্বারদেশে অবতরণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা দাঁড়াইয়া মসজেদটি দেখিতে লাগিলাম—আমি অমুসলমান, সুতরাং মসজেদে প্রবেশ করিতে

পারি কি না—জানি না; মৌলবী সাহেবও আমাকে ফেলিয়া একা মসজেদে প্রবেশ করিবেন না। এই সময় সম্মুখের সেই গৃহ হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বালকের সহযাত্রী সেই ভৃত্য আসিয়া আমাদিগকে চিনাইয়া দিল।

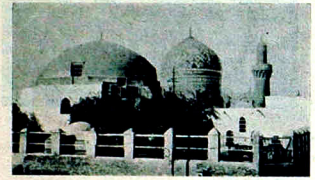

আবদুল কাদের জিলানীর মসজেদ

বৃদ্ধ উর্দ্দুতে আমাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া মসজেদে যাইতে বলিলেন। আমি যে মুসলমান নহি, তাহা বলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; আপনার আপত্তি না থাকিলেই হইল।"

তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের উর্দ্দুভাষা-জ্ঞানের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বোম্বাইয়ে ও ভারতের আরও কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের অনেক "শিষ্য" আছেন; সেই জন্য তাঁহাদিগের পরিবারে বালকরা উর্দ্দু শিক্ষা করে—তাঁহাদিগের পরিবারের এক জনকে প্রতিবৎসর শিষ্যদিগকে দর্শন দিতে ভারতে যাইতে হয়।

আমরা তাঁহার সহিত মসজেদে প্রবেশ করিয়া মসজেদ দেখিলাম। তিনি বলিলেন, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে মুসলমান তীর্থযাত্রীরা বাগদাদে আসিয়া থাকেন এবং এই মসজেদে আগমন করেন। সেই জন্য নানা দেশের লোক-প্রদর্শক (আমাদিগের "পাণ্ডা") হিসাবে বাগদাদে অবস্থান করেন—বাঙ্গালার একজন লোকও সেই মসজেদ-সংলগ্ন গৃহে আছেন। সে দিন তাঁহাকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু পরদিন ইমাম-পরিবারের এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের লোক;—নাম—মৌলবী মোহাসের আলী। তিনি হোটেলে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাক্ষাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। আমি তাঁহার নিকট বাগদাদবাসীদিগের অনেক কথা জানিবার সুযোগ লাভ করি। তিনিই বাগদাদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সেনাপতির প্রচারিত ইস্তাহার সংগ্রহ করিয়া আমাকে প্রদান করেন। সেখানি কূট রাজনীতির দান। তাহাতে বলা হইয়াছিল—বাগদাদ আরবদিগের দেশ—বিজেতা তুর্কীরা তথায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া বাগদাদ প্রদেশের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে; ইংরাজ বাগদাদের লোকের বন্ধু। "বাগদাদ প্রদেশের (ওয়ালীয়াতের) অধিবাসীদিগের প্রতি"—ইস্তাহারের আরম্ভ এইরূপ;—

"আমার রাজার ও যে সব জাতি তাঁহার শাসনাধীন তাঁহাদিগের নামে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি":—

"শত্রুকে পরাভূত ও এই রাজ্য হইতে বিতাড়িত করাই আমাদিগের সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমি এই অঞ্চলে বৃটিশ সেনাদলের পরিচালনের প্রধান ভার পাইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের সেনাবল তোমাদিগের নগরে বা প্রদেশে বিজেতা ও শত্রু হইয়া আসিতেছে না, পরন্তু মুক্তিদাতৃরূপে উপস্থিত হইতেছে।"

"হুলাগুর সময় হইতে তোমাদিগের নগর ও প্রদেশ বিদেশীর অত্যাচারাধীন হইয়া আছে—তোমাদিগের প্রাসাদসমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—তোমাদিগের উদ্যানগুলি জনহীন হইয়াছে—তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা ও তোমরা অধীনতায় আর্ত্তনাদ করিয়াছ। তোমরা যে সব যুদ্ধের জন্য দায়ী নহ, সেই সব যুদ্ধে তোমাদিগের পুত্ররা যাইতে বাধ্য হইয়াছে; অন্যায়াচারী লোকের দ্বারা তোমরা হৃতসম্পদ হইয়াছ এবং তোমাদিগের অর্থ দূর দেশে অপব্যয়িত হইয়াছে।"

"মিদহাতের সময় হইতে তুর্করা শাসন-সংস্কারের কথা বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে সব কথা যে আন্তরিক নহে, তাহা কি আজিকার এই হিংসালীলায় প্রকট হয় না?"

"অতীত কালে—যখন তোমাদিগের দেশ উর্ব্বর ছিল;—তখন তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা জগতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চারুশিল্প প্রদান করিয়াছিলেন। বাগদাদ নগর যখন পৃথিবীর বিস্ময়োৎপাদন করিত তখন তোমরা যেরূপ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিয়াছ—আবার সেইরূপ সমৃদ্ধি সম্ভোগ কর, ইহা কেবল আমার রাজার ও তাঁহার স্বজাতিরই অভিপ্রেত নহে, পরন্তু যে সকল জাতির সহিত তিনি মিত্রতায় বদ্ধ সে সকল জাতিরও অভিপ্রেত।"

"তোমাদিগের লোকের ও আমার রাজার রাজ্যের লোকের মধ্যে স্বার্থের দৃঢ় বন্ধন আছে। দুই শত বৎসরকাল বাগদাদের ও ইংলণ্ডের বণিকরা ব্যবসা করায় উভয় পক্ষই লাভবান হইয়াছে। আর যে জার্ম্মান ও তুর্করা তোমাদিগকে হৃতসম্পদ করিয়াছে, তাহারা গত ২০ বৎসরকাল বাগদাদকে কেন্দ্র করিয়া পারস্যে ও আরবেও মিত্র-শক্তিসমূহের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে।"

ইহার উপসংহারে আরবদিগের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্রাভাস দিয়া বলা হয়:—

"আমি আদিষ্ট হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমরা তোমাদিগের অভিজাতবংশীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা ইংরাজের সেনাবল-সহযাত্রী রাজনীতিক প্রতিনিধিদিগের সহিত একযোগে তোমাদিগের অসামরিক সব কায সম্পাদনে অংশ গ্রহণ কর তাহা হইলে উত্তরে ও পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে তোমাদিগের স্বজাতীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমরা তোমাদিগের জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিবে।"

আরবদিগকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালকদিগের পক্ষে রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচায়ক হইলেও তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায় না কি?

ইংরাজ লেখক ক্যাণ্ডলার বলেন, এই ইস্তাহারের কথায় ইংরাজ সৈনিকরাও হাস্যসম্বরণ করিতে পারে নাই। "The flowery periods of the proclamation amused the soldier……And as he read the proclamation he was conscious of appearing a little ridiculous, as if he had been going into the trenches spurred and plumed for a Crusade."

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইতে চাহিলে ভদ্রলোকটি আমাদিগকে তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে "কৃতার্থ" করিতে বলিলেন। সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইবে বলিয়া আমরা তাঁহার অনুগামী হইলাম।

আমরা সেই বৃহৎ গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপবিষ্ট হইলে ভৃত্য একখানি ট্রে-হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিল। মৌলবী সাহেব যেন চমকিয়া উঠিলেন—আমরা কি অন্যত্র কোন আহার্য্য বা পানীয় গ্রহণ করিতে পারি? তিনি আমাকে সে কথা বলিলে আমি বলিলাম, বাগদাদে আমরা আর সৈনিকনিবাসে নাই—হোটেলে রহিয়াছি; সুতরাং অত ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। আমাদিগের গৃহস্বামী আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "কেবল কফি—আর কিছুই নহে। পাছে আপনাদিগের কোন আপত্তি হয়, সেই জন্য আমি আর কোন আয়োজন করিতে পারি নাই।"

আমি ভাঙ্গা উর্দ্দুতে বলিলাম, "সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমরা আবার আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব।"

তিনি বলিলেন, "সে আল্লার ইচ্ছা।"

কফি পান করিয়া আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

সেই দিন রাত্রিকালেই জানা গেল, আমরা ইচ্ছা করিলে আরও অগ্রসর হইতে পারি—কিন্তু তাহা হইলে আপনাদিগকে তৃতীয় দিনই যাইতে হইবে এবং যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানও নাই। শুনিয়া আমি স্থির করিলাম, বাগদাদ হইতেই দেশে ফিরিব—অনির্দ্দিষ্ট

স্থানে যাইবার জন্য ইরাকের সেনাদলের অব্যবস্থার অসুবিধা ভোগ করিবার আগ্রহ আমার ছিল না। দলের আর সকলে অগ্রসর হইতে চাহিলেন। মৌলবী সাহেবও সেই দলে।

আমি ইরাকে আসিবার নিমন্ত্রণ পাইয়া ৩ দিনের মধ্যে যেভাবে আসিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অনুপস্থিতিকালে পত্রপরিচালন সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারি নাই—সে-ও আমার ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ।

যাওয়া বা থাকা—কিছুই আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে বলিয়া পরদিন হইতেই যত শীঘ্র সম্ভব বাগদাদের দ্রষ্টব্য স্থান দেখা শেষ করিব মনে করিয়া শয়ন করিলাম।

অপমৃত্যু

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নীলাম্বরী লুটিয়ে দিয়ে আকাশ-মেয়ে,
ধরার পানে আছে চেয়ে।
অঞ্চলে তার জড়িয়ে-পড়া হাজার তারা,
দৃষ্টি সবার নিমেষ-হারা।
রাত্রি-নদীর জমাটবাঁধা গভীরতায়,
চিরন্তনী বার্ত্তা পাঠায় নীরবতায়,
লিপ্সা ঝরে অঝোর ধারে চোখের কথায়
আকাশ মেয়ের আঁচল হ'তে চায় খসিতে
পাগলপারা!
হাজার তারা!

একটি তারা বাসনাকে আঁকড়ে ধ'রে,
অন্ধকারে গেল প'ড়ে।
দৃষ্টি তাহার পিপাসিত সৃষ্টিছাড়া,
ঐ যে পড়ে একটি তারা।
নীলাঞ্চলে জ্যোতির্ম্ময়ী রেখা টেনে,
তেপান্তরের প্রান্তে বারেক নয়ন হেনে,
যাবার বেলা যায় না কোন নিয়ম মেনে,
যায় সে যেন সর্ব্বনাশী ক্ষুধা নিয়ে,
সর্ব্বহারা!
একটি তারা!

আসে—আসে—নেমে আসে, ঐ যে আসে,
তারাগুলি কাঁপে ত্রাসে।
হাজার চোখে চেয়ে দেখে হাজার তারা,
কোথায় চলে সঙ্গীহারা?
ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসে তারার আশা,
কোথায় ধরা? বোঝেনা তা'র নীরব ভাষা,
মৃত্যু-আঁধার বক্ষে টানে বিশ্বগ্রাসী সর্ব্বনাশা।
নিত্য ঝরে আকাশ-মেয়ের আঁচল বেয়ে,
বিভোল তারা!
পাগল পারা!

দুঃখের বরষায়

উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৪

কাশীতে থাকিলে একাদশীর রাত্রে বিশ্বনাথের শৃঙ্গার-আরতি রাণীমার দেখা চাই। গত একাদশীতে শরীর-গতিকে যাইতে পারেন নাই। এবারে যাইবেন কিনা, তাহা লইয়া বহু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। অপরাহ্নে হরেন্দ্রনারায়ণের অবস্থার উন্নতি হওয়াতে তিনি যাওয়াই স্থির করিলেন। যাইবার আগে গিয়া একবার হরেন্দ্র-নারায়ণকে দেখিয়া আসা উচিত এবং যদি সম্ভব হয় ত' তাঁহাকে বলিবেনও; কারণ বৈকাল হইতে তিনি হাঁ, না, করিয়া কোন কোন কথার উত্তরও দিতেছিলেন।

রাণীমা কাছে গিয়া দাঁড়াইতে, দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ম্লান আলোতে চিনিয়া উঠা শক্ত। কণ্ঠের স্বর তখনও পরিষ্কার হয় নাই, গোল শব্দ বাহির হয় না, একটা গস্‌গসে গোছের শব্দে বলিলেন, কে? কে?

রাণীমা ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, হরু, আমি বাবা!

ওঃ—বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যাহারা কাছে ছিল তাহারা বুঝিল, রোগী ভয় পাইয়াছে।

হরিচরণ বলিল, রাণীমা ওঁর মাথা এখনো খুব ঠিক হয়নি; আর আপনি দাঁড়াবেন না।

রাণীমা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওকে বলে যেতে চাচ্ছিলুম যে বিশ্বনাথ দর্শনে যাচ্ছি।

তা আপনি যান না, হরিচরণ বলিল; এতে কি কেউ মানা করে? আপনি চরণামৃত নিয়ে এসে ওঁর মাথায় দিয়ে দেবেন, সব ভাল হয়ে যাবে।

হরিচরণের কথায় রাণীমা খুসী হইলেন। আনন্দের আধিক্যে শ্যামাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, বৌমা যাবে?

এই অত্যন্ত অসুবিধাকর প্রশ্নে শ্যামাঙ্গিনী বিপদে পড়িয়া বিছানা হইতে সরিয়া আসিয়া রাণীমাকে প্রণাম করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, যেদিন ওঁকে সঙ্গে ক'রে আপনি পুজো দিতে যাবেন মা, সেদিন আমাকে সঙ্গে নেবেন; আজ যে আমার মধ্যে-মধ্যে ডাক পড়ছে, এখেনে।

রাণীমা অপ্রস্তুতের হাসি চাপিতে চাপিতে বাহির হইয়া গিয়া পাল্‌কিতে চড়িলেন। সঙ্গে পিতল-বাঁধান লাঠি কাঁধে পীতাম্বর চলিল।

মোহিনী এই সুযোগের সন্ধানে ছিল; সে তাহার সকল কথা শ্যামাঙ্গিনীকে বলিতে পায় নাই; কিন্তু তাঁহার নিকট যে ভরসা পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহার অমতেই যদি তাহার সুধীর দাদাকে ডাকিয়া আনিয়া হাজির করে ত' নিশ্চয়ই শ্যামাঙ্গিনী অপ্রসন্ন হইবেন না।

সুধীর দাদার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস। সেই জোরেই সে বিশ্বনাথকেও উঁচু কথা শুনাইয়া দিতে পারিত। সুধীরদা প্রশ্ন গণনা করিয়া, মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলিতে পারে। কিসের তাগা-তাবিজ, কোথায় ধারণ করিলে রোগ-শান্তি এবং গ্রহ-শান্তি হইতে পারে, সেতো সুধীরের নখাগ্রে!

মোহিনী ঠিক করিল, যাহা থাকে কপালে, আজ কোন ক্রমে সুধীরদাদার সঙ্গে শ্যামাঙ্গিনীর দেখা করাইয়া দিবেই দিবে। কারণ গোড়ার কথা গ্রহ-শান্তি; তবে ত রোগ? কি হইল তাহার স্বামীর? বৃহস্পতি যার বৈরি, বজ্রী, তার ঔষধ-পত্রে কি হইবে—?

রাণীমা বাহির হইবার পর, সে আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। দ্রুত চলিল, তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাকে ফিরিতে হইবে। সুধীরদাও সেই সময় খাওয়া দাওয়া করিয়া ক্লাবে বাঁশী বাজাইতে যায়। তাহাকে ধরা চাই, নহিলে ফুরসৎ হওয়া কঠিন।

সুধীর খাইতে বসিয়া রাগা-রাগি করিতেছিল। সে এমন করে; মোহিনী তাহা জানিত। সমস্তদিন গণনার কূট অঙ্ক লইয়া যে মাথা ঘামায়, তাহার শরীরে রাগ অস্বাভাবিক নয়; বিশেষ করিয়া সে সেই জাতীয় মানুষ যাহারা অন্যের অপরাধ সকল সময়েই বড় করিয়া দেখিতে পায়। স্ত্রীটি ভালমানুষ গোছের লোক; সমস্ত দিন খাটিয়া খুটিয়া কিছুতেই স্বামীর মনের মত হইতে পারে না; তাহার প্রধান কারণ, স্বামীর অবস্থার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অভ্যাসটা সে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিল না। মাছ আসিলে সে সবটাই স্বামীর পাতে তুলিয়া দিয়া বাকি সকলকে শাক দিয়া অবস্থার মত করিয়া চলিতে পারে না। ছোট্ট সংসার, তাহার মধ্যে ভেদের ইতর-বিশেষ করিতে গেলে তাহার মন মানে না। এদিকে মনকে মানাইতে হইলে স্বামী-দেবতা বিদ্রোহ করেন। মনকে লইয়া অষ্টপ্রহর কাজ; কিন্তু স্বামীর আসা-যাওয়া ঝড়ের মত এখন-তখন। ঝড় উঠিলে পিছন ফিরিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিতে হয়; তেমনি স্বামীর ধমক সে নিঃশব্দে সহিয়া লইত। সুধীরের ঘরের প্রতি টান ছিল না তাই সে উদর পূর্ণ হইলেই সরিয়া পড়িত; তখন স্ত্রী নিজেকে অনেকটা ঝাড়া-হাত-পা মনে করিত।

সুধীরের মা বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি পুত্রের সম্মুখে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন; কিন্তু সুধীর বাহির হইলেই বধূকে বলিতেন, ওরা অমনিই; হাউ মাউ করে দশ-কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল; কিন্তু মনে কোন খল-কপট নেই! আর তুমিও বৌমা ধন্যি, ওর মানা কি কোনদিন শুনলে!

সে হাসিয়া বলিত, ও মানার মানে নেই, মা; শুনলে কি পাঁচটা নিয়ে ঘর করা চলে?

তাও ঠিক; বলিয়া তিনি বধূকে সমর্থন করিয়া আহারে বসিতেন। তাঁহার আহারের পর কি রহিল না রহিল, তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে তিনি ভাল বাসিতেন না। তাই বধূর ভাগ্যে শাকান্নের অধিক আর কোন দিন জুটিল না!

মোহিনী যে শিকার আনিয়াছে তাহা সুধীর বুঝিয়াছিল; কারণ রাশি-চক্রের বিশেষ সংস্থানে সে হয় একটা বড় গোছের লাভ, নয় মাঝারি গোছের ক্ষতি আশা করিতেছিল।

মোহিনীর দু-চার কথার মধ্যে দিয়া সুধীর এই বুঝিল যে শ্যামাঙ্গিনী অতিরিক্ত শঙ্কিত, তাই সে বলিল, ওরা কি এসব মানবে রে! একটা পণ্ডশ্রম হবে; তবুও, তুই যখন বল্‌ছিস্, তখন যাব।

যাবো নয়, সুধীরদাদা; এখ্‌খুনি চল।

হুঁ; কিন্তু ক্লাবের যে আজ একটা মিটিং আছে; আমি না থাকলে সব গুলিয়ে যাবে!

রেখে দাও, তোমার-ক্লাব মাব; তুমি চল আমার সঙ্গে।

আচ্ছা, তুই এগো তো; আমি চট্ ক'রে ক্লাব হ'য়ে, ধাঁ করে পৌছব। তা ছাড়া, তোর সঙ্গে গিয়ে হাজির হলে, টাকা পয়সা কম দেবে; মনে করবে; গরজ বেশী!

তোমার কি গরজ শুনি? মোহিনী প্রশ্ন করিল।

তুই ও-সব ঠিক বুঝবিনে; তুই তো এগো: তোর সঙ্গে যাওয়াটা কোন দিক দিয়েই ভাল হবে না।

মোহিনী আর কথা কহিল না। সে একবার নিজের বাড়ীতে যাইবে, তাহার পর ফিরিবে। পেট-কোঁচড়ে করিয়া কিছু ও-বেলার লুচি সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সেগুলির একটা ব্যবস্থা করাও চাই!

মোহিনী বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, রাণীমা ফেরেন নাই। কিন্তু শ্যামাঙ্গিনী তাহাকে বার-দুই খুঁজিয়া গিয়াছেন। খোঁজের কারণ বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র দেরী হইল না। সে দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিয়া

গেল; কেন না সুধীরের আসা সম্বন্ধে শ্যামাঙ্গিনী কিছুই জানেন না। আসিলে, পত্র-পাঠ বিদায় হইয়া গেলে তাহার লজ্জায় মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

শ্যামাঙ্গিনী কিন্তু অন্য কারণেই মোহিনীকে খুঁজিতে ছিলেন। একটা পাচন-অনুপানের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল; মোহিনী থাকিলে যত সহজে এবং শীঘ্র হইতে পারিত, তাহা না হইলেও হরিচরণের বুদ্ধিতে কার্য্যটা কোন রকমে সম্পন্ন হইয়াছিল।

সে আসিয়া বলিল, বৌদিদি, আমায় বুঝি খুজেছিলে?

তুমি কি আরতি দেখ্‌তে গিয়েছিলে? আমাকে একবার ব'লে গেলেই পারতে।

শ্যামাঙ্গিনীর কণ্ঠ-স্বরে মোহিনী বুঝিয়াছিল যে, না-বলিয়া যাওয়াতে স্রোত একেবারে উল্টা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে আর সুধীরের কথা পাড়িতে সাহস করিল না। সেখান হইতে চট্ করিয়া চলিয়া গেল।

মোহিনী খানিকটা এদিক-ওদিক করিয়া আসিয়া শ্যামাঙ্গিনীকে বলিল, ক'ব্‌রেজমশাই কি খাবেন, বৌদি?

শ্যামাঙ্গিনী উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, তিনি আসনে বসিয়া জপ করিতেছেন; চক্ষু মুদ্রিত। কথা কহিয়া তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না; বাহিরে আসিয়া বলিলেন, হরিচরণ খেতে গেছে, এখুনি আসবে। সে এলে আমি গিয়ে দু'জনে মিলে যা' হয় ক'রবো: দুধ আছে তো?

মোহিনী বলিল, আছে, বৌদি।

মোহিনী বুঝিল, শ্যামাঙ্গিনীর মনের সে উষ্ণতা অনেকটা কমিয়াছে, তাই সে চুপি চুপি বলিল, আরুতি দেখতে যাইনি, সুধীরদাকে ডাকতে গিয়েছিলুম, সে এলো বলে, বৌদি; তোমায় না ব'লে যাওয়া দোষ হয়েছে, সময় করতে পারিনি! দোষ নিও না।

শ্যামাঙ্গিনী মনে মনে দুঃখিত হইলেন; রাগ করিয়া তিনি মোহিনীর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন।

মোহিনীর একখানি হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, রাগ ক'রেছিলুম, তা জানতে পেরেছ? তোকেত' বলেছি, আমার মার পেটের বোন তোকে মনে করি, রাগ করিসনে ভাই, বলিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন; তোর দিদিটা ভারি বোকা, না বুঝে কথায় কথায় রেগে যায়।

মোহিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, বড় বোনেরা ত রাগ করবেই, নৈলে বড় হ'লো কিসের জন্যে?

এবার শ্যামাঙ্গিনীও হাসিলেন। বলিলেন, তোমার সুধীরদাকে ডেকে ভালই ক'রেছ; কিন্তু মনে নেই, আমি কি ওঁর কুষ্ঠিটা মনে ক'রে এনেছি? হরিচরণ আসুক, তারপর আমি গিয়ে খুঁজব। না হয়, একটা কাজ কর্ বোন্, একবার নায়েব মশাইকে ডেকে দিতে পারিস? তাঁকে আমি শুতে পাঠিয়েছি; দেখ্‌তো, যদি জেগে থাকেন।

মোহিনী ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রনারায়ণের উপসর্গগুলি কমিয়া গিয়া তন্দ্রার ঘোর বাড়িয়া চলিতেছিল। লক্ষণ ভাল কি মন্দ, শ্যামাঙ্গিনী স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁর মন জুড়িয়া একটা ভয় যেন চাপিয়া আসিতেছিল। একলা ঘরে রোগীর কাছে আর যেন থাকা যায় না। দ্বারের কাছে দাঁড়াইতে তবুও ভাল লাগে; বাহিরের বাতাসে মনটা হাল্কা করিয়া দেয়।

চাঁদ দেখা যায় না; কিন্তু স্বচ্ছ আকাশে ছেঁড়া মেঘে আলো পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে; কালপুরুষের কুকুর-তারাটি যেন পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি পাল্‌টাইয়া লইতে চাহে, এই নীল, আবার লাল, তারপর সবুজ!

উঁচু দেবদারু গাছের মাথার উপর একটা পেঁচা বসিয়া আলোর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যেন বলিতেছে, বেশতো, বেশতো, বেশতো! শ্যামাঙ্গিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! কিন্তু কোথা হইতে একটা অভয় আসিয়া তর্ক জোড়ে; ভগবান মঙ্গলময়; তাঁর ইচ্ছাতেই সব পূর্ণ হবে; তার সঙ্গে এই পেঁচার ডাকের কি সম্পর্ক?

ও ডাকচে, হয়ত ওর সঙ্গীকেই ডাকচে; তাতে ভয় পেলে চ'লবে কেন?

ভয় বলে ঠিক আজই ডাকে কেন? অন্যদিন তো ঠিক ওই জায়গায় ব'সে ডাকে না; এসবের একটা না একটা মানে আছেই আছে। শ্যামাঙ্গিনীর সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চের তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

অভয় বলিল, ও রোজই ডাকে গো: শোন না তোমরা, মন থাকে সুখের স্বপ্ন নিয়ে ভরপুর হয়ে। শোন্‌বার ফুরসৎ কোথায়?

শ্যামাঙ্গিনী হাসিলেন, মনে মনে বলিলেন, সত্যি কথা বলে কিন্তু মনই! কে যেন ত্রিকালজ্ঞ বুড়ো ব'সে ব'সে দিনরাত চিপটেন কাটচে! মানুষ সব জানে! জেনেও যে জানে না; শুনেও যে শোনে না; এই মায়া, এই সকল আশ্চর্য্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় আশ্চর্য্য!

মন যেন সাড়া দিয়া বলিতে চায়, ওই তো তোর দোষ, এক কথায়, মামলা ডিস্‌মিস্ ক'রে দিস্। পাঁচমুখো জানোয়ার; কিন্তু মনটাত একই। দেখতে গেলে শুনতে পাসনে, শুনতে বসলে ছুঁতে পাসনে। দিনরাত এই করছিস্, তবুও নিজেকে চিনিস্‌নে?……

শ্যামাঙ্গিনীর ভয়ে গা ছম ছম করিতে লাগিল। মানুষ যেমন দুর্ম্মুখের কাছে সহজে যাইতে চাহেনা; মুখের বাঁধন আলগা; কখন কি বলিয়া বসে! কিন্তু একলা ফেলিয়াও ত' যাওয়া যায় না। হরিচরণ আসিতে দেরী করিতেছে; ন'টা বলিয়া সাড়ে ন'টা করিল, এখনও দেখা নাই!

মনে হয় না—গেট দিয়া কে আসে? ঐ হরিচরণ! শ্যামাঙ্গিনী যেন বাঁচিলেন।

খানিক পরে বুঝিলেন, হরিচরণ নয়; চলিবার সময় হাত দুটি তাহার অত বেশী দোলে না; তবে কি ডাক্তার? তাই হবে, দেশী পোষাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। শ্যামাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে গিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। লোকটি বরাবর আসিয়া সিঁড়িতে না উঠিয়া ফিরিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। তখন বুঝিলেন ঐই লোকটিই মোহিনীর সুধীর দা'।

একটু পরেই শিকারী বিড়ালের মত মোহিনী আসিয়া সংবাদ দিল, সুধীর দা' এসেছে; এখানে ডাকবো, না, তুমি যাবে বৌদি?

এখনও তো হরিচরণ আসেন নি, এই খেনেই ডাক্; নায়েব মশাই বুঝি শুয়ে প'ড়েছেন?

মোহিনী ফিরিয়া গালে আঙ্গুল দিয়া বলিল, দেখ একবার আমার ভুল, কি হয়েছে যেন আজ; গিয়েই দেখি, নাক ডাক্‌চে তাঁর…কিন্তু মোহিনী কথা কহিতে কহিতে আগাইয়া গেল।

শ্যামাঙ্গিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া, সুধীরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুধীর আসিয়া দুইহাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল কিন্তু মোহিনীর ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে গড় হইয়া প্রণামই করে; কারণ বৌদিদিদের বয়স অল্প হইলেও দাদাদের বয়সের গুরুত্ব তাঁহাদের 'পরেও ত' সমান ভাবে বর্ত্তাইয়া থাকে!

মোহিনী বলিল, কিন্তু সুধীরদাদা, তোমাকে তো একটু ব'সতে হবে।

কেন? সুধীর প্রশ্ন করিল।

এইবার শ্যামাঙ্গিনী কথা কহিলেন, আমি সময় করে উঠ্‌তে পারিনি; ওঁর কুষ্ঠিটা মোটে এসেছে কিনা সঙ্গে, দেখবার সময় হয়নি। কিন্তু আজ তো রাত হয়ে গেছে।

মোহিনী বলিল, তাতে কি? সুধীর দাদার বাড়ী ফিরতে অমন কত রাত হয়। সুধীরদা', তোমাকে ব'সতেই হ'বে, সে আমি শুন্‌চিনে।

সুধীর মোহিনীকে লইয়া আরম্ভ হইতেই একটু বিব্রত বোধ করিতেছিল। তাহার বয়স, তাহার বৈধব্য, তাহার উপর, আবরণ-হীন খোলা কথা-বার্ত্তা; এবং বিশেষ করিয়া সুধীরের যে ব্যবসায় তাহাতে স্ত্রী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতায় ক্ষতি হইতে পারে, এই তাহার বিশ্বাস ছিল। স্থিত-ধী, চরিত্রবান্ ব্রহ্মচারী—এই গণনা কার্য্যের উপযুক্ত।

হরিচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, বাহিরের একটা

চেয়ারে সুধীরকে বসাইয়া শ্যামাঙ্গিনী ও মোহিনী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুধীর হরিচরণকে বলিল, কেমন বুঝচেন?

হরিচরণ বলিল, অবস্থা খুবই শোচনীয় ক'রে তবে ওঁরা ছেড়েচেন, এখন জেঠামশাইএর হাত-যশ আর আমাদের কপাল!

সুধীর হাসিল; বলিল, কপালং, কপালং, কপালং মূলম্! মনে পড়ে ব্রজরাজ পণ্ডিতমশাই-এর কথা? তিনি ব'লতেন, কপালে মুলো? তখন ভাবতুম্ পণ্ডিত-মশাই বুঝি রস ক'রে কথাগুলো বলেন; কিন্তু তা নয়, ভাগ্যই বড়। কর্ম্ম, পুরুষকার, এ সবই তার পরের কথা; ওগুলো আনুষঙ্গিক; মানুষের হাত-পা আছে, তাই সেগুলো নাড়ায়-চড়ায়; কিন্তু আসল কথা অদৃষ্ট। গ্রহের চক্রান্ত বড় কঠিন; তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বড় চারটি-খানি কথা নয়!

হরিচরণ বলিল, সে কথা একশোবার সত্যি; কিন্তু মানুষকেও ত' কিছু করতে হবে? চুপ ক'রে ব'সে থাকে, তাই বা তার সাধ্য কি?

মাথা নাড়িয়া সুধীর বলিল, পণ্ড-শ্রম! পথ না দেখলে, অন্ধকারে পা ফেলি কোথায়? আলো চাই! চোখ দেখতে পায়, খুব সত্যি কথা; কিন্তু আলো নৈলে সে চোখের দৃষ্টিশক্তিই থাকে না……

হরিচরণ আস্‌চি বলিয়া, ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

একটা বড় গোছের কাগজের বাণ্ডিল টেবিলের উপর রাখিয়া শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, এর মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হবে; কাল একবার সময় ক'রে আসতে পারতেন যদি…

সুধীর বাণ্ডিলের সুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, আমি শুধু লগ্নটা চাই, আজই খুঁজে নিচ্চি…কাগজ খুলিয়া বলিল, সর্ব্বনাশ, এযে মৈথিল পণ্ডিতের গণনা! এতে অনেক বাজে থাকে, বলিয়া পকেট হইতে কাগজ পেন্‌সিল বাহির করিয়া তাহাতে জন্মের তারিখ টুকিয়া লইয়া বলিল, আমি সব নতুন ক'রে তৈরি করতে চাই; পরের হিসেবে কাজ হয় না।…

কাগজ বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, আপনার কুষ্ঠীটা পেলে মিলিয়ে দেখার সুবিধা হ'তো…

ওতেই আছে, শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন।

বেশ, তাও তাহলে খুঁজে নিচ্চি—বলিয়া সুধীর আবার বাণ্ডিল খুলিয়া কাগজগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিল।

ততক্ষণে মোহিনী আসিল, আসিয়া বলিল, বৌদি ওকে সব কাগজ নিয়ে যেতে দাও; আমি ফিরিয়ে আনব'খন।

শ্যামাঙ্গিনী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুধীর বলিল, তোর যেমন বুদ্ধি, মোহিনী, এ কাগজ বেহাত ক'রতে নেই; থাকে তো এখুনি বেরুবে, যাবে কোথায়?

অবশেষে কাগজ বাহির হইল; সুধীর সেটিও নোট করিয়া লইতে লইতে বলিল, কাল সন্ধ্যের পর আস্‌বো; কিন্তু…বলিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সে দক্ষিণা অগ্রেই চাইতে ছিল; কিন্তু রাজদরবারে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে তাহার দ্বিধা হইতেছিল।

মোহিনী জানিত; কিন্তু তাহার ইচ্ছা নয় যে রাত্রে কোন টাকা সুধীরের হাতে পড়ে; সে টাকা বাড়ী যাইবে না, উপরন্তু পরের দিনে হয়ত সুধীরের দেখা পাওয়া ভার হইবে। তাই, সে বলিল, কাল সকালে, নাইতে যাবার সময় আমি গিয়ে তোমায় দিয়ে আস্‌বো।

সুধীর মনে মনে মোহিনীর উপর চটিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলে, খেলো হইতে হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা তাই হবে…

মোহিনী এই বুদ্ধি আঁটিয়া বলিল, নায়েব মশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা; টাকা-কড়ি তাঁর কাছেই থাকে…

শ্যামাঙ্গিনীর অঞ্চলে দুইখানি নোট বাঁধা ছিল; তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। মোহিনীর ভাব দেখিয়া তিনি টাকা বাহির করিলেন না। সুধীরের নড়া-চড়া দেখিয়া, তাঁহার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জমা হইয়াছিল।

চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া সুধীর উঠিয়া গেল।

শ্যামাঙ্গিনী মোহিনীকে বলিলেন, আঁমি জেঠামশাইকে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছি, তুমি এগোও মোহিনী।

মোহিনী চলিয়া গেল। শ্যামাঙ্গিনী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন হরিচরণ দোরের পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, ও আচ্ছা হুঁসিয়ার মেয়ে কিন্তু···সুধীরকে ও চেনে; টাকা পেয়েছে কি আর চুলের টিকি দেখা যাবে না।

অন্যের প্রসঙ্গে যোগ দিবার মত মনের অবস্থা শ্যামাঙ্গিনীর নহে; তাই কথাটাকে চাপা দিয়া হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাতে জেঠামশাই কি খান্?

আজ একাদশী, আর জলস্পর্শ করবেন না। বিছানা ও যাবেন না; শুধু জপে ব'সে রাত কাটিয়ে, একেবারে স্নান ক'রে পারণ করবেন।

শ্যামাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া সব কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন, কবিরাজ মহাশয় ধ্যানে বসিয়া আছেন।

১৫

রাত্রিটা কোন প্রকারে কাটিয়া গেল।

হরেন্দ্রনারায়ণের নিদ্রালুতা পূর্ণ অচৈতন্যে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক ডাক্তার সায়েব ডাক্তারের আহ্বান প্রতীক্ষায়, কাল আর নিজের কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সকালে, কি মনে করিয়া একবার আসিয়া মুখ বাঁকাইয়া দিলেন, কোমা সেট্ ইন্ ক'রে গেছে, মানুষের হাতের বাইরে।

প্রাণনাথ উত্তরে বলিলেন, আমরা কোন দিনই মানুষকে মানুষের হাতের মধ্যে মনে করিনে; সবই ভগবানের ইচ্ছা; আমাদের শুধু চেষ্টা বৈত নয়।

একটা অবহেলার হাসি হাসিয়া রমেশ বলিল, তাতো বটেই; তবে কিনা, চেষ্টার আবার উপায় ভেদ আছে···

প্রাণনাথ ইঙ্গিত বুঝিলেন; কিন্তু তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না! এক অন্ধ অন্ধকে বিদ্রূপ করিয়া বলে, শালা কাণা!

মোহিনী স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিয়া আসিতে নায়েব মশাই বলিলেন, চলুন আমিও যাব; টাকা-কড়ির ব্যাপার কিনা, মেয়েদের হাত দিয়ে হওয়াটা কিছু নয়!

মোহিনীর কাণে কথাগুলা ভাল শুনাইল না। জানে সে, সুধীর মস্ত-পায়ী, কিন্তু সে বিচার অন্যে কেন করিবে?

পথে যাইতে যাইতে মোহিনী নায়েব মশাইকে বলিল, তা ব'লে আমার সুধীরদা' জোচ্চর নয়।

আমি তো সে কথা বলিনি, সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন।

এই কথার কি উত্তর দেওয়া যায়, মোহিনী ভাবিতে ভাবিতে চলিল, অবশেষে একটা সহজ কথা মনে আসিল; সে বলিবে কিনা ঠিক না করিবার পূর্ব্বেই কথাটা যেন ফস্‌কাইয়া তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল; লোকজনের অভাব, আপনার ওখানে দরকার হ'তে পারে···

আমার চেয়ে দরকার তো মা তোমার বেশী; তা ছাড়া রাজাবাবু ভাল হ'লে পাই পয়সার হিসেব তো আমাকেই দিতে হবে···

উনি লোক বুঝি ভারি কড়া? মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল।

ওঁর চেয়ে আমাকে কড়া হ'তে হয়, বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে আছেন ওঁরা, যদি অন্যায় করি তো নরকেও যে জায়গা হবে না মা!

আশঙ্কায় মোহিনীর বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চলিয়া বলিল, আমাদের মেয়ে-বুদ্ধি, মনে হয় গঙ্গা-চান আর বিশ্বেশ্বরের মাথায় ফুল-বেলপাত দিলে, ইহকালের পরকালের দুই কাজই হয়।

নায়েব মহাশয় হাসিলেন, ও এক মত বটে; কিন্তু পাপ-পুণ্যের কাছে মেয়ে পুরুষ নেই; আমার বুদ্ধিতে যা অন্যায় মনে হয়, তা যদি করি তো তাই আমার পাপ। যদি অন্যায় মনে না হয়, তো তাতে আর পাপ নেই!

পাপ-পুণ্যের এত সহজ-নিরিখ মোহিনী আর ইহার আগে শুনে নাই; সে মনে মনে খুসী হইয়া উঠিল।

কিন্তু তখনি তাহার মনে একটা কথা সন্দেহের ছায়া ফেলিল। সে জানে বটে যে, চুরি করিতে নাই; করিলে পাপ; কিন্তু করিতে তাহার ভালও লাগে! এবং পুণ্যই যদি বড় ত' পাপকে হারাইয়া পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দেয় না কেন? সে এই কথা তোলাপাড়া করিয়া প্রশ্ন করিল; আচ্ছা নায়েব মশাই, পাপকে কেন ভগবান্ এখেনে থাকতে দেন?

সে বুঝি, আমাদেরই পরীক্ষার জন্যে···দেখ্‌চেন তিনি; যখন বুঝবেন সত্যিকার ভাল হয়েছি, তখন আর জন্ম হবে না; তাঁর পায়ের তলায় স্থান দেবেন।

মোহিনীর চোখে হঠাৎ অশ্রু দেখা দিল; সে গোপনে তাহা মুছিয়া বলিল, নায়েব মশাই, সত্যি আপনি বড় ভাল লোক, বৌদিদির সঙ্গে আপনাদের ওখানে যেতে আমার ভারি ইচ্ছে হয়।

নায়েব মশাই বলিলেন, মালিকের মর্জ্জি!

মোহিনী কথাটা ঠিক করিয়া না বুঝিয়া বলিল, দাদা-বাবুর মত, আপনি বল্লেই, হয়ে যাবে।

ঈষৎ হাস্যে নায়েবমশাইএর মুখ বিকট হইয়া উঠিল।

সুধীরের দোকান দেখাইয়া দিয়া মোহিনী আর দাঁড়াইল না। নায়েব মশাই সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলেন, কপাট খোলা, তাহার উপর বেগুনি রংএর একটা পর্দ্দা ঝুলিতেছে। পর্দ্দার গায়ে আঁটা একটা কাগজে লেখা;—বিনা প্রয়োজনে, এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

তিনি দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন, প্রয়োজন ত আমার আছে; কিন্তু অনুমতি কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে? একটু লক্ষ্য করিতেই দেখিলেন, অনুমতির পর একটি হাত আঁকা আছে; যাহা অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটি দড়ি দেখাইয়া দিতেছে; এবং সেইখানে ইংরাজিতে পুল; বাংলায় টানো; হিন্দিতে খিঁচো; লেখা আছে; ইহার বেশী নায়েব মশাইএর পড়িবার সময় নাই। তিনি আর দ্বিরা না করিয়া দড়িতে টান দিলেন। ভিতরের মানুষ কথা কহিল, আসুন।

ঘরে ঢুকিতেই দেখা গেল, একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি; তাহার নীচে ভারতবর্ষের প্রচলিত সকল জাতি ও ভাষার ক্যালেণ্ডার। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা যেমন করিয়া ঘিরিয়া থাকিত তেমনি করিয়া সার-বন্দিতে ঘেরিয়া আছে।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, কোত্থেকে আসুচেন?

কাল রাত্রে, বলিয়া নায়েব মশাই দুই খানি দশটাকার নোট অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এই আপনার প্রণামী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বসুন।—আপনি?

ওঁদের কর্ম্মচারী।

ও-অ অ, বলিয়া সুধীর টাকাটা লইয়া একটা তামার ট্রের উপর ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার গণনাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে···

আচ্ছা, বলিয়া তিনি চোখ বুজিয়া ঘড়ির শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

দেখুন, সুধীর ডাকিল, কর্ত্তার অবস্থা কেমন বুঝচেন?

বিশেষ ভাল মনে হয় না, ক্রমেই যেন সংজ্ঞা লোপ হয়ে আসুচে···

হুঁ বলিয়া সুধীর গণনায় মগ্ন হইয়া গেল।

এইবার কাগজপত্র সরাইয়া রাখিয়া সুধীর কথা কহিল, আর একবার আগা-গোড়া দেখতে হবে; দুজনের কুষ্ঠিতে মিল নেই। কর্ত্তার আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুযোগ আছে; কিন্তু ওঁর বৈধব্য নেই, আশ্চর্য্য নয়? যদি বাঁচেন তো স্ত্রীর ভাগ্যে; আর বেঁচে থাকলেও মৃতকল্প হয়ে থাকবেন। চোখ-কান কিছুই থাকবে না।

এখন কি উপায়? নায়েব জিজ্ঞাসা করিলেন।

একটা যজ্ঞ করতে হবে; কিন্তু তাতে বহু অর্থব্যয় হবে। তা কি ওঁরা করবেন? বিশ্বাস হবে কি?

খরচের কি আন্দাজ আপনি করেন?

কম হ'লেও তিন দিনে হাজার টাকা।

এ টাকা ওঁরা ব্যয় করতে পারেন, যদি···

সুধীর এবার হাসিল। যদি বাঁচার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ

না থাকে? কিন্তু এ কথা কেউ বলতে পারে না। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, এর বেশী আমি কিছুই বলতে পারিনে।

নায়েব বলিলেন, রাজাবাবুকে বাঁচাবার জন্যে দিনে হাজার টাকা ব্যয় করার অবস্থা ওঁদের আছে; কথা হচ্ছে টাকাটা শেষ পর্য্যন্ত জলে যাবে না তো?

সুধীর আবার কাগজ পত্র টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি গিয়ে বলুন একথা; আমিও আস্‌চি। আজ বারোটার আগেই স্থির করতে হয়; যদি কিছু করতে হয়ত' আজই সন্ধ্যা থেকে; কাল্‌কের দিনই ওঁর জীবনে সব চেয়ে মারাত্মক—আপনি এগোন, আমিও আস্‌চি...

নায়েব উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, এই টাকাটার রসিদ ...আমরা কর্ম্মচারী মাত্র...পাই পয়সার জবাবদিহি ..

তা ঠিক, বলিয়া সুধীর একটা রসিদ লিখিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামটি?

বগলাচরণ রায়...

নায়েব রসিদ লইয়া ঘড়িতে দেখিলেন, নটা বাজিতেছে।

১৬

শ্যামাঙ্গিনীর মনে আর আশা ছিল না। স্বামীর মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল। সাড়া নাই, শব্দ নাই; সংজ্ঞা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে! কবিরাজ অন্ধকারে পথ হাৎড়াইতেছেন; কিন্তু পথ যে আর আছে বলিয়া ত' মনে হয় না। ইহার পর কি আরোগ্য আর সম্ভব?

আপনি কি বলেন নায়েব মশাই? শ্যামাঙ্গিনী প্রশ্ন করিলেন।

বলার কিছুই নেই মা; কিন্তু দৈববলে বিশ্বাস করতে মন চায়। মানুষ কিই বা জানে, কতটুকুই বা করতে পারে? বলিয়া নায়েব মশাই চুপ করিলেন।

একবার মাকে জিজ্ঞাসা করি, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাঙ্গিনী ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

রাণীমা পাইতে বসিয়াছিলেন; মোহিনী নিকটে বসিয়া তদারক করিতেছিল। শ্যামাঙ্গিনী ঘরে ঢুকিলেন না, বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা, দৈব করলে কি হয়?

সুধীর বুঝি এসেছে? মোহিনীর দিকে চাহিয়া রাণীমা প্রশ্ন করিলেন।

মোহিনী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কৈ না:...

রাণীমা বলিলেন, ওর পাল্লায় পড়ো না বৌমা; ও জোচ্চোর, মানুষকে ধনে-প্রাণে নষ্ট ক'রে দেয়। করতে হয়, আরো লোক আছে।

মোহিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, রাণীমার এক কথা; আর সব হ'তে পারে সুধীরদা, কিন্তু জোচ্চোর নয়। এ যদি মিথ্যে হয় বৌদি, তুমি আমার নামে কুকুর পুষো—বলে দিচ্ছি ..

মোহিনীকে চোখের ইসারা করিয়া শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, কে আছে মা? তাকে ডাকাবেন?

সুধীর এসেছে?

না।

আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থা করছি, তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই, বৌমা, বলিয়া রাণীমা একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাইলেন। শ্যামাঙ্গিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাই ব'লে মা আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না, আজ ক'দিন পরে দু'মুঠো ভাতে ব'সেছেন।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, আর থাওয়া মা, ভাত কি পেটের মধ্যে যেতে চায়? হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবি, মরতে আমার ব্যামোর খবর দিয়েছিলুম। মনে করলুম আর হয়তো দেখতে পাব না—হে বিশ্বেশ্বর মুখ তুলে চাও; হরু আমার সেরে উঠলে হাজার টাকার পূজো দেব।...

মোহিনী আড়ালে গিয়া শুনিতেছিল। সে কতকটা মুস্কিলে পড়িয়াছিল; কারণ সুধীরকে যে সে আনিয়াছে, সকালে নায়েব মশাইকে তাহার দোকান চিনাইয়া দিয়া আসিয়াছে—একথা যে গোপন থাকিবার নহে তাহা সে জানিত; এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা বিপদে সে পড়িবে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, আচ্ছা মা, হরিচরণ, কবিরাজ

মশাই, সবাই ত সুধীরের সুখ্যাত কর্‌ছিলেন—ছোকরা গণনায় ভাল...

কি জানি বৌমা, আমার ওর ওপরে, কি জানি কেন একটুও ছেদ্ধা হয় না। মোহিনী কিঁচকে, আর ওকে বাড়িপাড় মনে হয়; শুনেছি কোথাও কোথাও টাকাকড়ি নিয়ে গোলও ক'রেছে, মোদো, মাতাল, কিনা!

এইবার মোহিনী রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, এই রইলো তোমার চাকরী—আমি চল্লুম—

শ্যামাঙ্গিনী আসিয়া মোহিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ছিঃ মোহিনী, মার কথায় কি রাগ করতে আছে; শোকাতাপা মানুষ, ওঁর কি আজ মাথার ঠিক আছে, না মনের ঠিক আছে? মানুষ কি নিজের ছেলেমেয়েকে বকে না, ধমকায় না? চাকরী, চাকরী, কিন্তু ভাই আমি তো দেখছি তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা, যা করছ তাই হচ্ছে...

মোহিনীর রাগ কান্নায় নামিয়া আসিল।

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, মা, মোহিনী আজ বড় দুঃখু পেয়েছে মনে—আচ্ছা মোহিনী, তোমার সুধীর দাদাকে মা নিশ্চয়ই ডাকাবেন শেষ পর্য্যন্ত—তখন তো আর কোন দুঃখুই তোমার...

রাণীমা বলিলেন, আচ্ছা ডাকবো, ডাকবো—দুজনকে একসঙ্গে ডাকবো—যে আগে আসবে সেই জিতবে।

মোহিনী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তাহলে আমিই গিয়ে ডেকে আনি।

মোহিনী আর দাঁড়াইল না—সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সুধীর পথে আসিতেছিল; মোহিনী তাহাকে বলিল দেরী ক'রোনা সুধীরদা, বুড়ীটা গোল বাধাবার মতলবে আছে; জানতো ওর শয়তানি...

সুধীর হাসিল, বলিল, শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করতে সুধীর অগস্তীও জানে, ছুই কোথায় চল্‌লি?

তুমি যাও, আমি জরদা কিনে আস্‌চি—বলিতে বলিতে মোহিনী চলিয়া গেল।

শ্যামাঙ্গিনী বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন, সুধীর আসিলে বলিলেন, মোহিনী এলো না?

না, সে তো চলে গেল...

ওই এক পাগলী...কি বল্লে, আস্‌বে তো? শ্যামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন।

আস্‌বে বৈকি, কিছু কিন্‌তে গেছে, বলিতে বলিতে সুধীর টেবিলের উপর কাগজ-পত্র খুলিয়া বসিল।

হরিচরণ বাহির হইয়া আসিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, কি, কোন আশা আছে?

সুধীর বলিল, আশার মধ্যে, এঁর বৈধব্য-যোগ নেই; ওঁর পূর্ণ শনির দৃষ্টি, তার ওপর বুধের অন্তর্দ্দশা, প্রাণ নিয়ে টানাটানি; ছুটো দিন যদি কাটে; কিন্তু কাটা শক্ত...

তারপর, উপায়? হরিচরণ প্রশ্ন করিল।

সুধীর বলিল, উপায় কিছু করতে হ'লে আজ থেকেই, গয়ং গচ্ছ করলে ফস্‌কে যাবে...

শ্যামাঙ্গিনী কথা কহিলেন, কিন্তু এই বৃহৎ কাজ আপনি একা পেরে উঠবেন কি?

সুধীর।—না, এর লোক আছে, তাদের ডাকাতে হবে...

তার আগে যে গণনা নির্ভুল হয়েছে, এওত ঠিক হওয়া চাই? হরিচরণ বলিল। ঈশ্বর পাঠককে ডাক্‌লে হয় না?

সুধীর বলিল সে এসে বথেড়া বাড়িয়ে তুলবে মাত্র।

বথেড়া তো আগা গোড়াই, ওতে ভয় পেলে চল্‌বে কেন?

পিতাম্বর সিং সংবাদ দিয়া গেল, পাঠকজীর আজ সুরসৎ নাই; যে দিন সময় হবে আস্‌বে।

সুধীর বলিল, আমি জানি, মহারাজার বাড়ী ছাড়া ও কোথাও যায় না, লাখপতি, টাকা-পয়সা গ্রাহ্য করে না...আমি জানি...

রাণীমা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া বলিলেন, আমি নিজে গিয়ে ওকে ধরে আন্‌চি; ওর বৌ যা বল্‌বে তা' ওকে শুন্‌তেই হবে, সে ছুঁড়ি বড় ভাল, আমার বাধ্য...

সুধীর বলিল, তাই ঠিক হবে, এঁর স্ত্রী-রাশিগুলো সবই প্রসন্ন; যদি কিছু সুফল হয়ত স্ত্রীলোকের দ্বারা।

হরিচরণ বলিল, কিন্তু স্ত্রী-লোক দিয়ে তো আর যজ্ঞ করা চ'লবেনা।

তাই কি হয়! বলিয়া সুধীর হাসিল, অনুষ্ঠানের উদ্যোগটা তো ওঁদের হাত দিয়ে হতে পারে।

রাণীমা বলিলেন, তা হ'লে আর দেরি ক'রে কাজ নেই, তোমরাও কেন এস না আমার সঙ্গে?

সুধীর বলিল, না, আপনি একা যান, এইতো পাঁচ মিনিটের পথ; আমরা আস্‌চি। তিন জনে যাত্রা-শুভ হবে না।

পিছন হইতে নায়েব মশাই কথা কহিলেন, চারজনে? রাণীমার সঙ্গে মাও যান্ না?

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, আমার গেলে চলবে? না হয়, মোহিনী যাক্।

না, না, বৌমা তুমিই চল, রাণীমা বলিলেন। ওরা আস্‌বে, পথ হাঁটতে ওদের দেরি হয় না। কতই বা দেরি হবে?—নায়েব মশাই থাকুন···

সুধীর একখানা কাগজে ঘর কাটিয়া কি একটা গণনা করিয়া বলিল, দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। ঠিক এই সময়টা যাত্রা করলে···

দশমিনিট পরে রাণীমা আর শ্যামাঙ্গিনী রওনা হইয়া গেলেন।

ঈশ্বর পাঠকের বাড়ী রথ-দোলের ভিড়। তাঁহারা বাহির বাড়ী উত্তীর্ণ হইয়া অন্দরের মধ্যে পা দিতেই, ঈশ্বরের স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া রাণীমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একি! আপনি নিজে এসেছেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই হ'তো রাণীজী!

রাণীমা বলিলেন, দেবী, তুমি ঈশ্বরকে ডাকাও···

কেন রাণীজী, কি হয়েছে?···দেবী বলিল, আপনারা এসে বসুন, আমি নিজে ডাক্‌চি—বলিয়া, সে দালানের উপর বিছানা ছিল, তাহাতে দুইজনকে বসাইয়া, দোরে একটা খট্ খট্ করিয়া শব্দ করিল।

ঈশ্বর ভিতরে আসিয়া রাণীমাকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইল, এত জরুরি, তা আমি বুঝতে পারিনি···

ওরা বাইরে এসেছে, বাবা, তোমাকে সব ব্যবস্থা এখুনি ক'রে দিতে হবে যে! হরুকে আমার বাঁচাতেই হবে, বৌমা নিজে এসেছেন···রাণীমা আর কথা কহিতে পারিলেন না।

সব হবে, আপনি ভাববেন না···

সুধীর বাহির হইতে গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিল, পাঠকজী, পাঠকজী···একদফে বাহার আইয়ে···

ঘরের দোর খুলিয়া পাঠক তাহাদের ঘরের মধ্যে বসাইল।

দেবী শ্যামাঙ্গিনীকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, কবে এসেছেন আপনি?

পরশু...বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন। গাড়িতে উঠিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অশ্রু বাঁধ মানিতেছিল না। পরের বাড়ী আসিয়া কান্নাকাটি করিবার মত দুর্ব্বল মন তাঁহার নহে; নিজেকে সংযত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও, চোখের জল কিছুতেই রোধ করিতে পারেন না।

দেবী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল, বাঁহাত খানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, সব বুঝতে পারি; কিন্তু ভাই, বিপদে মন স্থির করতে হবে, তোমাকে তো সব দিক সামলাতে হবে···

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, মা আছেন...

রাণীমা খুসী হইয়া বলিলেন, এমন বৌ আর হয় না..

দেবী বলিল, হবে না? কি রূপ! ভগবান্, বাবা বিশ্বেশ্বর, ভালই করবেন···

ভিতরে ঈশ্বর পাঠকের খড়মের শব্দ হইল, সে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বৌমার হাতখানা দেখতে চাই। দেবী তাহা বাহির করিয়া ধরিল। ঈশ্বর কাছে আসিয়া একখানা লেন্স দিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ভয় নেই মা; সুধীর বাবু ঠিক ব'লেছে—বৈধব্য-যোগ নেই। বাবু বেঁচে উঠ্‌বেনই!

ঈশ্বরকে কাছে পাইয়া রাণীমা চুপি চুপি বলিলেন কিন্তু বাবা, তোমাকে সব ভার গছে নিতে হবে, আমাকে কথা দাও···

চশমাটা চোখ হইতে খুলিয়া হাতে লইয়া সে বলিল কিন্তু আজই তো কিছু করা শক্ত মা!

কিসের শক্ত, কাশীতে মা অন্নপূর্ণার দৌলতে কিসের অভাব শুনি?

না, না, আর কিছু না, বাড়ীতে ব্যয়রাম, উদ্যোগের অভাব...বলিয়া ঈশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাণীমা বলিলেন, আমি দেবীকে নিয়ে যাচ্চি··· তোমরা ফর্দ্দ করে দাও বাবা ··

কুড়িজন লোক দরকার এ যজ্ঞে···

বেশ, আমি পাঁচটাকার জায়গায় দশটাকা দেব... কদিন হবে? আমি টাকা দিচ্চি আর কোন কথা শুনতে চাই না; মহারাজকে খবর দিতে বল, এখুনি পীতাম্বরকে পাঠিয়ে দেব···

না, তিনি এসে কি ক'রবেন?

দেবী, তুমি চলতো মা আমার সঙ্গে, দেখি কেমন না হয়।

ঘরের ভিতর হইতে সুধীর বলিল, আসল লোককে ধরেছেন রাণীমা; পাঠকজী এইবার কাবু।

পাঠকজী এইবার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, ঘরে অসুখ আছে...

দেবী বলিল অসুখ তো কি, চলুন রাণীজী, আমিও যাচ্চি···

পাঠক আসন্ন বিপদ এড়াইবার জন্য ফন্দি করিতে বসিয়া গেল।

রাণীমা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, দেবী আমরা আসি গিয়ে, তুই কখন যাবি বল্‌তো?

যত শীগগির পারি মা; ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই···

চল বৌমা, আর ভাবতে হবে না। বলিয়া রাণীমা নীচে নামিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন।

১৭

গভীর রাত্রে ভৃগু-যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

ঘরের মাঝখানে গঙ্গা-মৃত্তিকার ঈষদুচ্চ বেদীর উপর অগ্নির লেলিহান শিখা, তাহাতে হোতারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতাহুতি নিবেদন করিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বাকি কুড়িজন হোতা সেই মন্ত্রের অনুবৃত্তি করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিতে করিতে অনুষ্ঠানটি তাহার সুবিলম্বিত গতিতে প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করিয়া চলিল। প্রহরান্তে অধ্যক্ষ শঙ্খধ্বনি করিলেই হোতার দল দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে অগ্নিকে আরতি করেন; এইরূপে তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইলে চরু চড়িল।

সূর্য্যোদয়ের তিন দণ্ড পূর্ব্বে সাগ্নিকের দল প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং চরুস্থালী হইতে ভুক্তাবশেষের এক কণা হরেন্দ্রনারায়ণের মুখে দেওয়া হইল।

রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। কেবল আশার আর অন্ত নাই! সকলেই বলে, আর ভয় নাই!

কবিরাজ ঔষধের পর ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, কথা না কহিয়া কপালে হাত দেন!

সমস্ত দিন গণনা করিয়া সুধীর সন্ধ্যার সময় বলিল, আজ রাত বারোটার পর, মহা-সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে যাবে; তারপর, দেখবেন আপনারা, রুগী কথা কইবে; নৈলে শাস্ত্র মিথ্যে, আমার পাঁজি-পুঁথি গঙ্গার জলে ফেলে দেব।

সেই কথা শুনিয়া ঈশ্বর পাঠক হাসিল, বলিল ছেলে মানুষ!

হরিচরণ বলিল, তারপর কি করবেন সুধীরবাবু?

ছুঁচ বিক্রি ক'রে খাব, সোভি আচ্ছা; পরাশর ভুল হবে, ভৃগু ভুল হবে? তাহলে পশ্চিমে সূর্য্যি উঠ্‌তেও পারে!

শ্যামাঙ্গিনী রোগীর পাশে বসিয়া সব কথা শুনিতেছিলেন।

মোহিনী ঘরে আসিয়া বলিল, বৌদি তুমি সকাল সকাল খেয়ে আজ একটু ঘুমিয়ে নেবে চল, নৈলে তোমার একটা অসুখ হয়ে পড়বে।

শ্যামাঙ্গিনী হাসিলেন, বলিলেন, অসুখ আমার হবে না মোহিনী, আজ আর আমি খাবও না; আর এ বিছানা ছেড়ে কোথাও যাব না। এক রাত না খেলে

যদি শরীর ভেঙ্গে যায় ত' যাক্, কি হবে আমার এই দেহ নিয়ে ?

মোহিনী বলিল, জানি, তোমার কি হচ্ছে মনটার মধ্যে ; কিন্তু বৌদিদি···সে যাহা বলিতে যাইতেছিল, না বলিয়া চুপ হইয়া গেল। শ্যামাঙ্গিনী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কিন্তু মোহিনী ?

সে একটু এদিক-ওদিক করিয়া কহিল, আজকে আবার তুমি একবার জপে বসবে চল, বৌদিদি, আমি বুঝেচি, তোমার জপের সঙ্গে আর কারুর তুলনা হয় না ; সেদিন তো তুমি ফিরিয়ে এনেছ, নৈলে কি আশা ছিল ?

এ কথা শ্যামাঙ্গিনীর মনে অনেকবার আসিয়াছিল ; কিন্তু সাহস হয় না ; তাহার উপর, সময় কোথায় ? মনে হয় চক্ষের আড়াল হইলে, কি জানি, কি একটা হইয়া যায় !

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, জপ, যজ্ঞ, সবই তো হচ্চে, আমি ও সবের কিছুইতো জানিনে মোহিনী···

জেনে কাজও নেই, টাকার জন্যে করা, আর তোমার করা ? আমি জানি, বৌদি ; আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়···তুমি বস্‌বে চল, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্চি··· বলিয়া মোহিনী চলিয়া গেল।

শ্যামাঙ্গিনী বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মনের সে একাগ্রতা যেন দুশ্চিন্তায় হারাইয়া গেছে, সে জোর নাই ; ভয় হয়, কি করিতে কি হইয়া যাইবে ; আবার কোথা হইতে কে যেন ডাকে, আয়, আয়, ভালই হবে।

শ্যামাঙ্গিনী জপে বসিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া স্নান সারিতেছিলেন, মোহিনী দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর একটা কথা, বৌদিদি।

কি মোহিনী ?

এখেন থেকে কাল-ভৈরবের মন্দির তো কাছেই, একবার তাঁর দর্শন ক'রে এসে···চুপি চুপি যাব আমরা, কেউ জান্‌তেও পারবে না।

ঘরের ভিতর হইতে শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, কিন্তু মা' যদি জান্‌তে পারেন তো ভারি রাগ করবেন ; তাছাড়া অনেক দেরি হ'য়ে যাবে ভাই !

মোহিনী গদগদ কণ্ঠে বলিল, তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, আমার এ কথা রাখ ; তুমি জাননা, কি জাগ্রত দেবতা ঐ কাল-ভৈরব, উনিই তো আসল !

ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, কি যে বলিস্, তোর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে ভাই !— আচ্ছা, আজ তুই যা বল্‌লি তাই কর্‌বো ; কিন্তু যদি অসুখ করেতো সব সাম্‌লাতে হবে, একা তোমাকে, তা বলে দিচ্চি···কিন্তু তুমি আমার পর নয়, মায়ের পেটের বোন, সে কথা মনে আছে !

মোহিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ জীবনে ভুল্‌বো না ; বলতো তিন-সত্যি গালি !

শ্যামাঙ্গিনীর আনন্দে চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, তিনি মোহিনীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, তুই কোথেকে এসেছিস—আমার সকল বিপদের তারিনী মূর্ত্তি নিয়ে ?

আমায় ছুঁলে ? আবার নাইতে হবে।

তোকে ছুঁলে নাইতে হয় না, তুই গঙ্গার মতই···

বৌদি, তোমার ভুল হয়েছে—আমি যে বিধবা ! সেই সঙ্গে মোহিনীর বুকখানি দোলাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল !

তাতে কি ? বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া গভীর স্নেহভরে একটি চুম্বন দান করিলেন।

দুইজনে চুপি-চুপি পথে বাহির হইয়া পড়িয়া, শ্যামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, বেশী দূর নয় ত বোন্ ?

ঐ যে দেখা যাচ্ছে···বলিয়া মোহিনী হাত দিয়া দেখাইয়া দিতে গিয়া পথে হুঁচোট খাইয়া বসিয়া পড়িল।

আহা, লাগ্‌লো মোহিনী ?

না বেশী লাগেনি ; কিন্তু আমাদের একটু ব'সে যেতে হবে বৌদি !

পথে আবার ব'সবো কোথায় ? সে যায়গা কি আছে ?

আছে, বলিয়া মোহিনী উঠিয়া দাঁড়াইল বটে ; কিন্তু খোঁড়াইয়া চলিতে লাগিল। খানিকটা পথ উভয়ে নির্ব্বাক হইয়া অতিক্রম করার পর, মোহিনী বলিল, বোধহয় পৃথিবীতে, মেয়ে মানুষের বিধবা হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছুই নেই, ঠিক না বৌদি ?

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, বলা শক্ত ; তবে সেটা যে একটা খুব বড় দুঃখ, তাতে সন্দেহ নেই ; আর দুঃখ করেই বা লাভ কি, মোহিনী ? ভগবান যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবেন, তা' মাথা পেতে স্বীকার করতেই হবে। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন···

তিনি ভারি নিষ্ঠুর, এইটুকু আমি বুঝেছি···বলিয়া মোহিনী বসিয়া পড়িয়া বলিল, তোমার দেরি ক'রে দিচ্চি···

একখানা গাড়ী খালি চলিয়াছিল, শ্যামাঙ্গিনী সেটাকে ডাকিয়া মোহিনীর হাত ধরিয়া তাহাতে উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠিয়া বসিলেন। কোচম্যান জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন মা ?

কাল-ভৈরব, ভিতর হইতে মোহিনী বলিয়া দিল।

মন্দির হইতে ফিরিয়া গাড়িখানা গেটে ঢুকিল না, শ্যামাঙ্গিনী টাকা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দ্রুতপদে পা ধুইতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। মোহিনী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিল।

রাণীমা বারান্দার উপর ব্যাঘ্রিনীর মত অস্থির হইয়া পায়চারি করিতেছিলেন, শ্যামাঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন, কোথায় গিছ্‌লে বৌমা ? হরু তোমায় ডাক্‌ছিল···

ডাক্‌ছিলেন ! এ কথা শ্যামাঙ্গিনীর বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন, কাল-ভৈরবের মন্দিরে···

বেশ ! একটু ব'লে যেতে হয়, বলিয়া রাণীমা বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

শ্যামাঙ্গিনী যে কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া ছুটিলেন।

ঘরের মধ্যে কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ি ধরিয়া বসিয়া আছেন, হরিচরণ এবং নায়েব মশাই রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শুঁটের গুঁড়া ঘষিতেছেন।

শ্যামাঙ্গিনীকে দেখিয়া কবিরাজ বলিলেন, একটা টাল্···

নায়েব মশাই শ্যামাঙ্গিনীকে স্থান দিবার জন্য বিছানা হইতে নামিয়া আসিলেন। শ্যামাঙ্গিনী কিন্তু বিছানায় যাইতে চাহিতেছিলেন না ; একবার জপে বসিবার ইচ্ছা। একবার শেষ চেষ্টা ; হয়ত আর সে সুযোগ জীবনে আসিবে না। কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেও মন চাহে না ; তাই, শুধু বলিলেন, আপনি, তৈরী হয়ে আসুন, মোহিনীকে আজাড় করে দিতে হবে, তার পায়ে বড় লেগেছে।

হরিচরণ বলিল, সাম্‌লে গেছে, আমিও চট্ ক'রে খেয়ে আসিগে ?

কবিরাজ মশাই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন।

হাত ছাড়িয়া দিয়া শ্যামাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, আর বোধ হয় ভয় নেই···

কি হয়েছিল জ্যাঠামশাই ?

উঠে বসে—বিছানা থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন, তোমাকে বারম্বার ডাকছিলেন···

কেন এমন হলো ?

তা' কে বল্‌তে পারে, মা ? তবে এইটুকু পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমার পক্ষঘাতের অনুমানটা সর্ব্বৈব ভুল হয়েছে। রোগীর জীবনীশক্তি পূর্ণ বিদ্যমান আছে ; হয়ত' জ্ঞান ফিরে আসার এই সূত্র-পাত। নাড়ির অবস্থা ভালই···

তবে কেন শুঁট্ ঘষা হচ্ছিল ?

কবিরাজ হাসিলেন, হঠাৎ উঠে পড়াতে শক্তির অপচয়ে রক্ত চলাচলের অসমতা হ'য়ে হিমাঙ্গ দেখা দিয়েছিল ; ওটা সাময়িক ; তবে বার বার ঘটতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। আজকে হরিচরণ আর বগলা থাক্‌বেন···

আমি থাক্‌তে পাবো না ?

থাকবে বৈকি মা, তুমি জেগে থাক্‌বে, সতর্ক থাক্‌বে ; কিন্তু রোগী যদি আবার বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে জোর করে, তুমি তো তা নিবারণ করতে পারবে না।

এ লক্ষণ কি ভালো?

কবিরাজ মশাই, আবার মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, ভালো, মন্দ সবই পরমেশ্বরের হাতে, মা! আমার মনে হয়, এটি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে আসার লক্ষণ, তাই ভালো মনে করি! জীবন-মরণের মহাসন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছেন উনি; আজরাত্রে আমাকেও ব'সে কাটাতে হবে, নিরলস সতর্কতার সময় উপস্থিত; এটা সুযোগ, তাই ভালো; সুলক্ষণ নিশ্চয়!

হরেন্দ্রনারায়ণের মুখ হইতে শব্দ উঠিল, হুঁ।

শ্যামাঙ্গিনী সবিস্ময়ে কবিরাজ মশাইএর দিকে চাহিলেন, জেঠামশাই, জ্ঞান আছে? মাথা নাড়িয়া কবিরাজ ইঙ্গিত করিলেন, না।

তবে?

দেবতা কথা কইচেন; এমন হয়।

শ্যামাঙ্গিনীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

মোহিনী ঘোঁড়াইতে ঘোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল শ্যামাঙ্গিনীর উপরেই রোগীর ভার; অতএব হরিচরণ এবং নায়েব মশাইএর জন্য অপেক্ষা করিতেই হইবে, সে আসিয়া শ্যামাঙ্গিনীর কাছাকাছি দাঁড়াইল।

কবিরাজ মশাই বলিলেন, তোমরা দু'জনে আছ আমি চট্ করে ওষুধটা তৈরী ক'রে আনি; হরির জন্যে অপেক্ষা করলে, একটু দেরী হ'য়ে যাবে; কিন্তু খুব সাবধান, কিছুতেই উঠতে দিওনা তোমরা; পড়ে গেলে বড় কঠিন হবে···কি বল? আমি যাব? মোহিনী তুমি না হয়, এদিকে এসে ব'স, মা!

মোহিনী বসিলে তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, ব্যথা এখনও করছে?

বড় জ্বালা করছে, কেটে গেছে, দেখছি।

কি দিলে?

খানিকটে নুন টিপে দিয়েছি।

তাইতে জ্বালা, বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী হাসিলেন।

কাল থাকবে না।

হুঁ, বলিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিতে দুইদিক হইতে দুইজনে চাপিয়া ধরিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, আঃ ছেড়ে দাও, যাবো···আমায় ডাক্‌চে···

কেউ ডাকেনি, শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন।

রক্তবর্ণ চক্ষু চাহিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, ঐ ডাক্‌চে, কাল-ভৈরব, শুনতে পাচ্ছ না?

দুইজনের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

কথা কওয়ার শব্দে কবিরাজ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন, বাবা, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল দিকি।

হরেন্দ্রনারায়ণ কবিরাজ মশাইকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন,

মকরধ্বজ মস্ত মাতঙ্গ হরং, প্রণমামি শিবং শিব···

ঔষধ খাইয়া হরেন্দ্র নারায়ণ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কবিরাজ মশাই বলিলেন, জ্ঞান আসচে; কিন্তু এখনও বিকারের ঘোর কাটে নি।

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন; কিন্তু এসব কি ভাল লক্ষণ? বড় ভয় করে।

ভয় কি মা? মঙ্গলময় মঙ্গলই ক'রবেন। সাড়া শব্দহীন পাথরের মত প'ড়েছিলেন; এখন প্রতিক্রিয়া সুরু হ'য়েছে। আমার মনে হয়, এটি পরম শুভলক্ষণ, কাল সকালে হয়ত স্বচ্ছ জ্ঞানের উন্মেষ হবে·····

মোহিনী বলিল, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ক'রেজ মশাই!

মোহিনীর মুখরতায় কবিরাজ মশাইএর গম্ভীর মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। শ্যামাঙ্গিনী ঈষৎ লজ্জিত হইলেন।

নায়েব মশাই কখন আসিয়া বাহিরে বসিয়াছিলেন। হরিচরণ আসিতে দুইজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কবিরাজ মশাই বলিলেন, এইবার তোমরা যাও মা। আজকে এঁদের থাকতেই হবে। বড় সতর্কতার প্রয়োজন।

শ্যামাঙ্গিনী উঠিয়া মোহিনীকে ধরিয়া সইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

১৮

আসনে বসিয়া শ্যামাঙ্গিনী চিত্তকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা

করিলেন। মন যেন কে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে, তাহাকে এক করিয়া কুড়াইয়া তুলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল। চোখ বুজিতেই স্বামীর রোগ-ক্লিষ্ট মুখখানি নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে ভাসিয়া উঠে! বিশীর্ণ পদ্মফুল স্রোতের মুখে, ফেণায় বিবর্ণ হইয়া গেছে; চক্রাকার কুণ্ডলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে একবার কাছে, আবার দূরে চলিয়া যায়। জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া তলাইয়া যায়, আবার অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠে! সে দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা যায় না; কিন্তু সাধ্য কি, তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইবার! যেন জীবন-মরণের গ্রন্থি, জীবনের অন্ন পরিসর শেষ হইয়া মরণের অনন্ত বিস্তৃতি সুরু হইয়াছে, দূরে দূরে, বহুদূরে তাহার গতি, সেদিকে তাহার প্রবল আকর্ষণ, তাহারই মধ্যে, কুণ্ডলির কেন্দ্র ঘেঁষিয়া ঘুরিতেছে মাত্র, অপেক্ষা কেবল, সেই আকর্ষণের শিথিলতা; তাহা হইলে, তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না, অনন্তের পথে সেও পাড়ি দিবে!

কোশা হইতে জল লইয়া শ্যামাঙ্গিনী চোখে দিলেন, মাথায় দিলেন; অন্ধকার-প্রায় ঘরটির চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন; চোখ বুজিতে আর যেন সাহসে কুলায় না! জানিতেন, মোহিনী পাশের ঘরে দোরের কাছে বসিয়া আছে; মনে হইল, নিকটে থাকিয়াও সে নাই! এই নিঃসঙ্গ সংগ্রামের সে তো কেউ নয়; দুস্তর সমুদ্রে যে ডুবিতেছে, তীরের জন-কোলাহল তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া?

আহরণ-মগ্নই অসীম সমুদ্রের ভেলা, তাহাকে দৃঢ়-মুষ্টিতে না ধরিলে পার হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু জোর কোথায়? আঙ্গুলগুলি যে আড়ষ্ট হইয়া আলুগা হইয়া যায়!

তিনি হঠাৎ দেখিলেন, মোহিনী ভুল করিয়া আসন পাতিয়াছে দক্ষিণ মুখে! হয়তো, তাই মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, চক্ষের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে!

আসন উত্তর-মুখী করিয়া, শ্যামাঙ্গিনী আবার আচমন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এবারে জল নয়, খাড়া পাহাড়; মনে হইল একটি স্ত্রীলোক পথ হাৎড়াইতেছে, চতুর্দ্দিকে কুয়াশা; পথ বোধহয় দেখা যায় না। নাঃ, মেয়েটি বোধহয় অন্ধ, নহিলে অমন করিয়া হুঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইবে কেন? ও মোহিনী না? নাঃ, ওর যে লাল পেড়ে সাড়ী! তবে? শ্যামাঙ্গিনী নিজে? তাঁহার সমস্ত দেহটা দুলিয়া উঠিল!

সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া ঊর্দ্ধে চাহিলেন। ওটা কি? মন্দির? মন্দিরও হইতে পারে, না হয় বরফের চূড়া। লাল নিশান দুলিতেছে? না, সূর্য্যের কিরণ! সকাল না বিকাল? কুয়াশায় বোঝা শক্ত!

মন্দির কি পাহাড়ের চূড়া, যাহাই হউক না কেন, উপরে উঠিতেই হইবে; কঠিন, বন্ধুর পথ! তবুও···

মোহিনী ডাকিল, বৌদি, বৌদি, শীগ্‌গির উঠে এসো··

শ্যামাঙ্গিনী দ্রুতপদে বাহির হইতে, কোশাটা পায়ে ঠেকিয়া উল্‌টাইয়া গেল।

এই ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে শ্যামাঙ্গিনীর মনে হইল এক একটি মুহূর্ত্ত যেন অনন্ত কালের সমান, তাহার মধ্যে কত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া যাইতে পারে! পা যেন চলে না। ও-ঘরের চৌকাট ডিঙ্গাইবার আগে পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল; কিন্তু যেমন তিনি মাটির উপর হরেন্দ্রনারায়ণকে পতিত দেখিলেন, অমনি চৌকাটে পা বাধিয়া ঘরের মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ঘরের বিপদ এক হইতে নিমেষে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কবিরাজ মশাই হরেন্দ্রনারায়ণের নাড়ি পরীক্ষা করিতেছিলেন, ধিকি ধিকি চলিয়াছে—গতি হইতে স্থিতির মুখে যেমন করিয়া বিরাম আসে, হয়ত এখনি তাহা আসিবে; হয়ত' মানুষের সকল প্রচেষ্টার ঊর্দ্ধে এখনি আত্মা দেহখানিকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মৃত্যুর দুর্ভর প্রতীক্ষায় ভারাক্রান্ত বায়ুমণ্ডলে যেন আর নিশ্বাস পড়িতে চাহে না; যেন বুকের উপর দিয়া

কণ্ঠের নালি কে দুইহাতের বজ্রমুষ্টি দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে।

শ্যামাঙ্গিনীর পতনে ঘরের সেই জমাটভাব কাটিয়া গেল; একটা দমকা বাতাসে ওমটুটা যেন কোথায় উড়াইয়া দিয়া গেল।

হরিচরণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে দেখা গেল, কপাল কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

পিছন হইতে মোহিনী তাহা দেখিয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; ওগো কী সব্বোনাশ হলো গো!

১৯

দুঃখের রজনী অবসান হইল।

শ্যামাঙ্গিনীর সংজ্ঞা ফিরিলে তিনি মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি?

মোহিনী যেন শিখান বুলি বলিল, রাজাবাবু ভাল আছেন, বৌদি।

ভালো? শ্যামাঙ্গিনীর দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া গেল।

মোহিনী মিথ্যা কথা বলে নাই; সকলেই মনে করিয়াছিল, বিছানা হইতে সেই অবস্থায় পড়িয়া যাওয়ার পর, হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; তাঁহাকে রক্ষা করা শিবেরও অসাধ্য! মাটিতে বিছানা করিয়া দিয়া সকলেই সেই সুনিশ্চিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কবিরাজ নাড়ি ধরিয়া বসিয়া আছেন। সাড়া নাই শব্দ নাই, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমেই নিয়মিত হইয়া আসিল, নাড়ীর অবস্থা দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিকও আসিয়া দাঁড়াইল! কবিরাজমশাই অবশেষে নাড়ি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বোধকরি, এযাত্রায় রক্ষা হ'লো!

ঘরের লোক তাঁহার প্রতি সবিস্ময়ে চাহিল, মানুষের ভুল হয়, প্রবীন, অভিজ্ঞ হইলে কি হয়, তিনিও মানুষ; ভুল হইতে কতক্ষণ?

শ্যামাঙ্গিনী মোহিনীর দুইহাত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিলেন, মোহিনী, লক্ষী বোন্ আমার, একবার আমাকে ও-ঘরে নিয়ে চলো, আমার যে কিছুতেই মন মান্‌ছে না।

মোহিনী বলিল, আমি একবার জিজ্ঞেস করে আসি গিয়ে···

সে ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

শ্যামাঙ্গিনী ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিলেন, দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া যায়, বসিয়া বসিয়া দুইহাতে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কবিরাজ মশাই মোহিনীকে বলিতেছিলেন, বুদ্ধিমতী সে, বুঝিয়ে আটকে রাখ গে, এখন এখানে এসে কাজ নেই, আজ কোনো ভয় নেই; কিন্তু শ্যামাকে চব্বিশঘণ্টা বিছানা থেকে উঠতে দেওয়া হবে না; আচ্ছা চল, আমি বুঝিয়ে বলছি···

চৌকাঠের প্রান্ত হইতে শ্যামাঙ্গিনী কথা কহিলেন; কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মানে না, জেঠামশাই! বলিতে বলিতে শ্যামাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময়ের মধ্যে শ্যামাঙ্গিনী যে উঠিয়া আসিতে পারিবেন, তাহা মোহিনীও অনুমান করিতে পারে নাই, তাই সকলেই বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। শ্যামাঙ্গিনী অতিকষ্টে চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইয়া সোজাসুজি হরেন্দ্রনারায়ণের পায়ের তলায় শুইয়া পড়িয়া, তাঁহার চরণ দুইখানি বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। পর মুহূর্তে আবার তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া কেহই অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিল না। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। বাহিরে পাখীর কাকলি যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল; দূরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজিতেছে!

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে বৃদ্ধ প্রাণনাথ অশ্রু-সম্বরণ করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, সাধ্বী বটে! এরই মহিমা কীর্ত্তন করেছেন মুনি-ঋষিরা। সাবিত্রীর কাহিনী শোনা-কথা; আজ তা চোখে দেখে জন্ম সার্থক হলো আমাদের! লোকে বিশ্বাস করবে না; তেমন বহু সত্যেই তো মানুষের আস্থা হয় না! কিন্তু তাতে কি আসে যায়? যা' সত্য, তা' চিরদিনই সত্য!

দিন-রাত্রি এমনি করিয়াই কাটিল। আশা-নিরাশা, বিশ্বাস-সন্দেহের দোলায় সকলের মনই দুলিতে লাগিল।

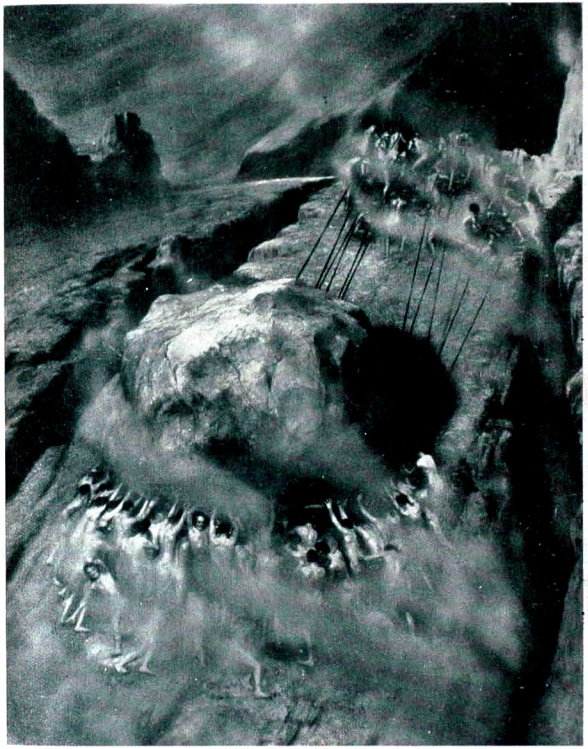

নরকের কাল্পনিক দৃশ্য

হরেন্দ্রনারায়ণ পাথরের মত নিস্পন্দ নিশ্চল; উপসর্গ নাই, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ; নাড়ির গতি স্বাভাবিক; গায়ে হাত দিলে মুখ খুলিয়া যায়; বোধ হয় আহারে অসম্ভব রুচি! কিন্তু শ্যামাঙ্গিনীর মুখ দিয়া এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গলিল না।

মোহিনী বার বার আসিয়া কাছে বসে, বলে; কবিরাজ মশাই, কি হবে?

কবিরাজ মশাই, কম্পিত হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া বলেন, ঈশ্বর ভরসা, এ বয়সে এমন কখনও দেখিনি মোহিনী!

শেষরাত্রে হরেন্দ্রনারায়ণের কথা ফুটিল, পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, শ্যামা, শ্যামা, শ্যামাঙ্গিনী। উত্তর দিলে শুনিতে পান না, গায়ে হাত দিলে চোখ চাহিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন; অবশেষে মুখ খুলিয়া যায়; দুগ্ধ পান করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া পড়েন।

একবার শ্যামাঙ্গিনী ডাক শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন, হাতে হাত দিয়া বলিলেন ডাকচো কেন? এইতো আমি।

উত্তরে হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, আমায় বাড়ী নিয়ে চল, আর এখেনে থাকবো না।

চতুর্দ্দিকে সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব আলাপ শুনিতেছিলেন।

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, ভালো হ'লে যাবো।

কিন্তু সে কথা তাঁহার নিকট পৌছিল না। তিনি আবার শ্যামাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন, শ্যামা বাড়ী চলো।

হরিচরণ বলিলেন, আচ্ছা, ওঁর হাতের চেটোর উপর ঐ কথাগুলো আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিন্ তো।

শ্যামাঙ্গিনী লিখিলেন, ভা

হরেন্দ্র পড়িলেন, ভা

শ্যামাঙ্গিনী লিখিলেন লো·

হরেন্দ্র বলিলেন, ভালো হ'লে যাবে? ভালো ত' হয়েছি।

শ্যামাঙ্গিনী লিখিলেন, জোর পেলে, সেরে গেলে···

দুই চোখ বহিয়া অশ্রু বালিশের উপর গড়াইয়া পড়িল। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল, হরেন্দ্র বলিলেন, এর চেয়ে আর কি ভালো? তুমি আমায় বাড়ী নিয়ে চলো, সেখেনে ভালো হব।

শ্যামাঙ্গিনীর মাথা তাঁহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার সজ্ঞা বিলোপ হইল। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যান্তরে লইয়া যাওয়া হইল।

কবিরাজ মশাই নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ভয় নেই, সাময়িক অবসাদমাত্র।

রাণীমা পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, এ সবই অদৃষ্টের খেলা; বিশ্বনাথ, কেবল আমাকেই ভুলে আছো?

মোহিনী সুর করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো আমাদের কি হ'লো গো!

হরিচরণ তাহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

ক্রমশঃ

বিপর্য্যয়

শ্রীগীষ্পতি ভট্টাচার্য্য

লক্ষ্মণ যখন নিনাদের বাড়ী পৌছিল তখন বাবুদের বাড়ীর ঘড়িতে আটটা বাজিতেছে। নিনাদের উঠানে জন পাঁচছয় লোক বসিয়া গল্প করিতেছে।

এ পাড়ার প্রায় সকলেই হাটুরে—নৌকায় করিয়া এ হাটের জিনিষ ও হাটে বেচিয়া জীবিকার সংস্থান করে। হাটের কথাবার্ত্তাই কহিতেছিল তাহারা। লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—এই যে লক্ষ্মণ—এ হাটে কেমন হ'ল রে। এ পাড়ার যত লোক হাটে যায় তাদের মধ্যে লক্ষ্মণই সব চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু ব্যবসাদার হিসাবে সে কারও খাটো নয়।

লক্ষ্মণ বলিল—মন্দ নয়, ত'বিল দেখিনি এখনো, তবে টাকা পঁচিশ হবেই হবে। তোমার কি রকম হ'ল?

—ঐ এক রকম, তাবলে কি আর আগের মত! তোরা তখনো জন্মাস নি লক্ষ্মণ—

নিনার বাবা হরিচরণ বলিয়া উঠিল—কাত্তিকে এয়েচে, জানিসরে লক্ষ্মণ!

—কাত্তিকে? কোন্ কাত্তিকে? লক্ষ্মণ ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিল না।

—কাত্তিকেরে, মধু বিশ্বেসের স্মুন্দি, সেই যে কোলকেতায় কাজ করে—।

—ওঃ, এইবার লক্ষ্মণ চিনিতে পারিল। মধু বিশ্বাসের মুখে কাত্তিকে'র নাম অনেকবার সে শুনিয়াছে।

—তা সে গেল কোথা? বলিয়া লক্ষ্মণ একবার চারিদিকে চাহিল।

—বাড়ীর ভেতর আছে সে, তোর খুড়ীর একরকম বোন পো হয় কিনা;—যা না তুই বাড়ীর ভেতরে।

যাই, বলিয়া লক্ষ্মণ উঠিয়া পড়িল। এখানে বসিয়া বেচাকেনার গল্প করিতে আসে নাই সে।

—খুড়ী, খুড়ী কোথায় গেলে? বলিতে বলিতে লক্ষ্মণ বাড়ীর ভিতর গিয়া দাঁড়াইল।

--কেরে লক্ষ্মণ, আয়, বলিয়া নিনার মা সাড়া দিলেন। অন্ধকার দাওয়ার উপর উঠিয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিল,—কে এয়েছে নাকি, খুড়ী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাত্তিকে এয়েচে, বলিয়া নিনার মা ঘরে বসিয়াই ডাকিতে লাগিল—কার্ত্তিক, ও কাত্তিক। ঐ দেখ, ওরা দুটো কোথায় বসে গল্পে মেতেছে, নিনা ও নিনা।

এই যে যাই, বলিয়া ছোটখুড়ীর ঘর হইতে নিনা সাড়া দিল, কিন্তু তাহাদের আসিতে দেরী হইতে লাগিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া লক্ষ্মণ বলিল—নিনার জন্যে এবার কটা জিনিষ এনেছিলাম খুড়ী, তা তোমার হাতেই দেওয়া ভাল, মেয়েত সেয়ানা হচ্চে।

—সেয়ানা হচ্চে ব'লে; বলি এত—তা, কি যে খেয়াল, কেবল বলে দেখি, দেখি। টাকার লোভ, মেয়ে যত সেয়ানা হবে টাকা তত বেশী পাবে; আমি বলি অত লোভে কাজ নেই, কথায় বলে লোভে পাপ পাপে মিত্যু। তা আমার কথা কে শোনে, কৈ কি জিনিষ দেখি,—নিনার মা আলো নিয়া বাহির হইয়া আসিল।

লক্ষ্মণ তাহার পুঁটুলিটা খুলিয়া জিনিষগুলি বাহির করিল। কার্ত্তিক ও নিনা ইহার মধ্যে সেখানে আসিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ এক এক করিয়া জিনিষগুলি দেখাইতে লাগিল—লাল ফিতে খানিকটা, রংবেরংয়ের কাঁটা কতকগুলো, মাঝারি রকমের আয়না একখানা, একশিশি

আলতা, সব শেষে নানারংয়ের ছাপ দেওয়া রুমাল একখানা।

নিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিনার মা বলিল—লক্ষ্মণ এনেছে এই সব তোর জন্মে।

নিনার কিছু বলিবার আগেই কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল,—ওঃ এই! আমাদের কোলকাতায়—,এবার যখন আসব বুঝলে নিনা, এক সেট এনে দেব তোমায়।

লক্ষ্মণ আড় চোখে একবার কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া দেখিল—'কোলকাতার' বাবু বটে! জোর করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলে বোধ হয় উড়িয়া যায়। চোখের কোন দুটো একেবারে বসা।

লক্ষ্মণের মন এক মুহূর্ত্তে কার্ত্তিকের উপর বিযাক্ত হইয়া উঠিল। সে নিনার মাকে বলিল—তাহলে আজ চল্লাম খুড়ী।

—কেন রে, এর মধ্যেই যাবি কেন? কর্ত্তিকের সঙ্গে কথা টথা ক'।

নিনার মুখের দিয়া চাহিয়া লক্ষ্মণ বলিল,—আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে লোক, কোলকেতার বাবুদের সঙ্গে কথা কইতে কি জানি আমরা, তা ছাড়া দুটো খেতেও ত হবে। নৌকো রেখে পর একটু জিরোই নি পর্য্যন্ত।

লক্ষ্মণ উঠিয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে লক্ষ্মণকে খুজিতে গিয়া নরহরি শুনিল ভোরে উঠিয়াই সে বাবুপাড়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে। নরহরি লক্ষ্মণের অংশীদার। প্রত্যেকবার হাট সারিয়া আসিয়া দুজনে বসিয়া ত'বিল মিলায়, লাভের কড়ি ভাগ করিয়া নেয়। ত'বিল না মিলাইয়া লক্ষ্মণ অন্য কোনও কাজে হাত দেয় না। তাই নরহরি একটু বিস্মিত হইল।

দুপুরের পর নরহরি আবার আসিল, সে সংসারী লোক, টাকার তাগাদা তাহারই বেশী। লক্ষ্মণ তখন ঘরেই ছিল। নরহরি ঘরে ঢুকিতেই লক্ষ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ঐ মধু বিশ্বেসের স্মুন্দিরে চেন হরি দা?

নরহরি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কেন?

—ও কি করে জান?

—শুনিত কোলকেতায় নাকি ভাল কাজ করে, টাকাও পায় নাকি অনেক!

—অনেক না ছাই; ঐ জন্মেই ত গিছলাম আজ বাবুপাড়া। বীরুবাবু বল্লেন ও নাকি কাজ করে কোন চায়ের দোকানে, খুব বেশী হয়ত মাইনে পায় দশটাকা।

—কি জানিরে ভাই! কিন্তু হরি সামন্ত ত ঐ ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বে' দেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।

লক্ষ্মণ চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তখন কোন কথা কহিল না।

ত'বিল মিলাইতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তারপর টাকাকড়ি তুলিয়া লক্ষ্মণ নরহরির সঙ্গেই পথে বাহির হইয়া পড়িল। ঘরে বসিয়া থাকিবার মত কোন দরকারই তাহার নাই। পথে নামিয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিল—কে বল্লে তোমারে যে নিনার বে' হবে ঐ কাত্তিকের সাথে।

নরহরি বলিল—মধু বিশ্বেস মামা হয় আমার। কাল সন্ধ্যেবেলায় গিছলাম তার বাড়ী, সেখানে মামী বল্লে ঐ কথা। তা ছাড়া আজ হরি খুড়োও বল্লে।

—বটে? সারা পথ লক্ষ্মণ আর কোন কথা কহিল না। নরহরি তাহার বাড়ী চলিয়া গেল। লক্ষ্মণ বড় পুকুরের পাড় ঘুরিয়া নিনাদের বাড়ী যাইবার পথে তেঁতুলগাছ তলায় দাড়াইল। পুকুর ঘাটে সে নিনাকে দেখিয়া আসিয়াছে।

ছোট্ট সরু পথ; এক পাশে একটা তেঁতুল গাছ তার বহু পুরাতন শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর এক পাশে ধানক্ষেত। হেমন্তের পরিপুষ্ট শস্যে ক্ষেত-গুলো একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে, যতদূর চোখ যায় ধানের সোনালী রং ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ক্ষেতগুলোর মধ্যে লক্ষ্মণের নিজহাতে চষা ক্ষেতও ছিল একখানা। অন্য সময় হইলে সে হয়ত দুদণ্ড দাঁড়াইয়া ক্ষেতখানার দিকে চাহিয়া দেখিত, কিন্তু আজ তাহার সে রুচি নাই।

তাহার মাথায় তখন ঝড় বহিতেছে, বুকে বেদনা ও বিদ্বেষের সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতেছে। নিনাকে সে আজ অনেক কথা বলিবে ভাবিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিনাকে লক্ষণ অনেক কথা বলিবে!—কিন্তু পথের মাথায় নিনাকে দেখিবামাত্র তাহার সমস্ত বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। লক্ষণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিনার মুখখানা রীতিমত কঠিন হইয়া উঠিল।

লক্ষণের কথাগুলো সব গোলমাল হইয়া গেল। সে বলিতে আরম্ভ করিল—কালকে জিনিষগুলো—;

কিন্তু নিনার ঝঙ্কারে তাহার কথা থামিয়া গেল।—ছাই জিনিষ, ও আবার জিনিষ নাকি?

নিনার মুখে এরকম ঝঙ্কার শোনা লক্ষণের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। অন্য সময়ে লক্ষণ ইহাতে কিছুই মনে করিত না, কিন্তু আজ নিনার এই অবজ্ঞা তাহাকে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়া রীতিমত রাগাইয়া তুলিল। সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—ও, কোলকেতার বাবু তোরে, কি, কি কথাটা কি—হাঁ। ছেট্ দেখিয়েছে, —না?

নিনা আরও রাগিয়া বলিল,—ছোট লোকের মত তুই তোকারি করিসনে বলছি।

—ওরে আমার ভদ্দর নোকরে, বাবুর ঘর কত্তে চলেচিস না, বটে? তা' বাবুর মুরদ কত জানিস!—মাইনে ত তার বড় জোর দশটাকা। যা, যা, বে'টা হয়ে যাক্ একবার, তারপর দেখিস্।

নিনা সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল—পথ ছাড়বি, না চেঁচিয়ে লোক জড় করব।

লক্ষণ একটু দমিয়া গেল, সে বলিল,—তা করনা, খারাপ কথাটা আমি কি কইচি, যে ভয় করব?

নিনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ লক্ষণের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল সে বলিল—সত্যিই কি তুই কার্ত্তিকেরে বে' করবি নিনা, আর আমি যে এ্যাদ্দিন ধরে তোর জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি সে কথাটা একবারও ভাবলি না তুই!

নিনা লক্ষণকে আর কথা কহিতে দিল না।

—সর, সর, সন্ধ্যে ঘুরে এল, দেরী হলে মা বকবে, বলিয়া নিনা এক হাতে লক্ষণকে ধানক্ষেতের দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া এক রকম লক্ষণের গায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল, নিনার ভিজা কাপড়ের ঘেঁসে লক্ষণের গায়ের খানিকটা ভিজিয়া গেল।

খানিক দূর গিয়া নিনা ফিরিয়া দেখিল লক্ষণ তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে। নিনা একটু থামিয়া বলিল—তোর সে জিনিষ সব আমি পুকুরে ফেলে দিইচি, শুনচিস্—এই? হাসিতে হাসিতে নিনা চলিয়া গেল। লক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া একটু একটু করিয়া সামলাইতে লাগিল।

বিকাল বেলার এই ব্যাপারের পরে লক্ষণ সেদিন নিনাদের বাড়ী না গেলেই ভাল করিত। কিন্তু নিনাদের বাড়ী না গিয়া লক্ষণের উপায় নাই।

নিনাদের বাড়ী গিয়া লক্ষণ দেখিল কার্ত্তিক সেখানে আগেই আসিয়া জুটিয়াছে। লক্ষণকে দেখিয়া নিনা কার্ত্তিকের মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া উঠিল। লক্ষণ বুঝিল নিনা এরই মধ্যেই বিকেল বেলার ঘটনা কার্ত্তিকের কাছে বলিয়াছে—ক্ষোভে দুঃখে লক্ষণের মন এতটুকু হইয়া গেল।

কার্ত্তিক লক্ষণকে ডাকিল—আসুন লক্ষণ বাবু।

লক্ষণ এ পর্য্যন্ত 'বাবু' হয় নাই কোনদিনও; তবু লোকটা যখন কথা কহিতেছে, কথার উত্তর দিতে হইবে বৈকি!

লক্ষণ বসিয়া একবার নিনার মুখের দিকে চাহিল, একবার কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিল, তারপর কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করিল—তা, কি করা হয় আপনার?

—করি! কার্ত্তিক যেন একটু অপ্রস্তুত হইল—হাঁ, কাজ অনেক রকম করি। লেখা পড়ার কাজ, আফিসে। নিনা, বলিনি তোমায় আমাদের আপিসের গল্প, সেইযে সাহেব আমায় বল্লেন থ্যাঙ্ক ইউ কারটিক। সাহেবরা বাঙালীর নাম বলতে পারে না মোটেই— হাঃ হাঃ হাঃ। লক্ষণ এতক্ষণ বেশ একটু কুটিল দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। কার্ত্তিকের হাসি থামিলে সে জিজ্ঞাসা করিল—তা মাইনে পাওয়া যায় কত?

—কত? কার্ত্তিক আবার হাসিয়া উঠিল—মাইনেইত 'চাল্লিশ'। তারপর উপরি আছে; কমিশন আছে,—একশ' একশ পঁচিশ, কোন মাসে দেড়শতও হয়। বিশ্বেস মশাই জানেন কোলকাতায় কার্ত্তিকের কি রকম খাতির, সাহেবরা তার সঙ্গে 'সেকেণ্ড' করে। বড় বড় লোক তার খোসামোদ করে।

লক্ষণের আর সহ্য হইল না। সে বলিয়া উঠিল—কিন্তু বাবুপাড়ার বীরুবাবু বল্লেন যে আপনি কাজ করেন চার দোকানে, সে কাজের মাইনে দশটাকার বেশী হয় না।

কার্ত্তিক একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল—কে বীরু বাবু? সে জানে কি কলকাতার—ড্যাম্, লায়ার।

কার্ত্তিকের শেষের কথায় লক্ষণও চটিয়া উঠিল—"ড্যাম্", "লায়ার" যে গালাগালি, সে কথা বুঝিবার মত জ্ঞান তাহার আছে।

রাগের মাথায় লক্ষণ হয়ত কার্ত্তিককে মারিয়া বসিত; কিন্তু নিনার জন্য ব্যাপার অতদূর গড়াইতে পারিল না।

ঠেলিতে ঠেলিতে লক্ষণকে উঠান পার করিয়া দিয়া নিনা বলিল বেরো তুই বাড়ী থেকে। আর যদি আসবি এখানে টের পাবি মজা। অসভ্য, চাষা কোথাকার।

অসভ্য! চাষা!! কার্ত্তিকের সামনে এ লাঞ্ছনা লক্ষণের আর সহ্য হইল না। সে কঠিন শপথ করিয়া বসিল যে মরিয়া গেলেও আর নিনাদের বাড়ীর দুয়ার মাড়াইবে না।

কিন্তু লক্ষণের অদৃষ্টে দুর্দ্দশার শেষ এইখানেই হইল না। দিন দুয়েক পরে নরহরি আসিয়া বলিল—মধু মামা ঘোঁট পাকিয়েছে খুব, আজ সন্ধ্যেবেলায় পঞ্চায়েত বসবে, হরি সামন্তের বাড়ী, তোর যেতে হবে সেখানে।

কার্ত্তিককে অপমান করিবার জন্য লক্ষণের বিচার হইবে। লক্ষণ একবার ভাবিল সে যাইবে না। সংসারে তাহার আপন বলিতে কেহই নাই, তবে কাহার জন্য সে পঞ্চায়েতের ভয় করিবে? লক্ষণ আবার ভাবিল—গেলেই বা ক্ষতি কি? অন্ততঃ কার্ত্তিক যে চায়ের দোকানের দশ টাকা মাইনের চাকর সে কথাটাও পাঁচ-জনের সামনে বলিয়া আসিতে পারিবে।

লক্ষণ যথা সময়ে পঞ্চায়েতের সামনে হাজির হইল। বিচার বেশ জমিয়া উঠিল; মধু বিশ্বাস একাই আসর মাত করিয়া তুলিল। মধু বিশ্বাসের জেরার উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া লক্ষণ বলিয়া ফেলিল—তুমি কথা কও কেন বিশ্বেস খুড়ো, পাঁচজনের পরে ভার দেছ, তারাই বিচার করুক।

বিশ্বাস একেবারে লাফাইয়া উঠিল—দেখলে, তোমরা দেখলে ত সবাই, সেদিনকার ছোঁড়া আমারে অপমান করে, ওরে হারামজাদা—,

লক্ষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—মুখ সামলে কথা কয়ো বিশ্বাসের পো, ও সব গালটাল দিও না, লক্ষণ দাস তোমার কার্ত্তিকে স্মুমুন্দি নয়।

কার্ত্তিক সামনের বারান্দায় বসিয়া সিগারেট টানিতে-ছিল। সে লাফাইয়া আসিয়া বলিল—কি বল্লি, থাবড়ে মুখ ভেঙে দেব জানিস্।

—মুখ ভাঙবি? ওরে আমার মুখভাঙা—লক্ষণ কার্ত্তিকের দিকে ছুটিয়া গেল,—দশ টাকা মাইনের চাকর বলে কিনা মুখ ভাঙবে লক্ষণ দাসের।

মাতব্বর কজন "থাম" "থাম" করিয়া যে যাহাকে পারিল ধরিয়া ফেলিল কিন্তু পাড়ার যত ছেলেছোকরা সেখানে জড় হইয়াছিল সকলেই লক্ষণের পক্ষ নিয়া রাগিয়া উঠিল,—বিশ্বেসের পো লক্ষণেরে গাল দেবে কেন? আর ঐ কার্ত্তিকে স্মুমুন্দি, এত বড় সাহস, বলে কিনা থাপ্পড় দিয়ে মুখ ভাঙবে!

ব্যাপার কতদূর গড়াইতে বলা কঠিন; কিন্তু হরিচরণের বারান্দার পাশে মণ কয়েক পাট ছিল গাদা করা; হঠাৎ সেগুলো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আর একটু আগে যদি লোকের চোখ পড়িত সেদিকে তাহা হইলে আগুন নিভাইতে বেশী কষ্ট হইত না, কিন্তু আগুন বড় বেশী জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোথায়, কলসী, কোথায় জল, করিয়া লোকজন এক বিষম হট্টগোল বাধাইয়া তুলিল।

লক্ষ্মণ প্রথমটা কেমন হতবুদ্ধি হইয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ একটা চীৎকার কাণে গিয়া তাহার সমস্ত জড়তা নিমেষে কাটাইয়া দিল। দুপাশে ঘরের মধ্যে সরু গলিপথ, সেই পথে নিনা ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

কে একজন চীৎকার করিয়া বলিল—কাপড়খানা খুলে ফেল। সে-কথা নিনার কাণে গেল না। মাথার উপরে ঘরের চাল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, নিনা কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া দৌড়াইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে আগুন আরও সমারোহে জ্বলিয়া উঠিল।

তোরা কি রে!—বলিয়া লক্ষ্মণ এক ছুটে নিনার কাছে গিয়া পৌঁছিল। সোজা পথ, কোন অসুবিধা নাই; তবু লোকগুলা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিনার জলন্ত আঁচলটা লক্ষ্মণ একনিঃশ্বাসে তাল পাকাইয়া দুহাতে চাপিয়া ধরিল—আগুন নিভিয়া গেল, তারপর নিনাকে টানিয়া খোলা উঠানে আনিয়া ফেলিতে এক মিনিটও লাগিল না। লক্ষ্মণ নিনাকে উঠানে আনিয়া ছাড়িয়া দিতেই সে প্রায় টলিয়া পড়িবার মত হইল। কোথায় ছিল কার্ত্তিক, সে ঠিক সময়মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল লক্ষ্মণের পাশে, চট্ করিয়া নিনাকে ধরিয়া সে মাটিতেই শোয়াইয়া দিল; তারপর—সরে যাও, সরে যাও, হাওয়া বন্ধ কর না, ভিড় কর না, বলিতে বলিতে ধাক্কা মারিয়া লক্ষ্মণকেই সে প্রথমে সরাইয়া দিল। লক্ষ্মণের হাতখানা খানিক উঠিয়া আবার নামিয়া আসিল। সে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিল।

হরিচরণ বাড়ীর পিছনদিকে গোলার ধান কটা বাঁচাইতে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল। মধু বিশ্বাস তাহাকে কথাটা কহিবার অবসর না দিয়া কহিল,—কাত্তিকে না থাকলে মেয়েটা তোমার গেছিল আর কি? ব্যাপার কি না বুঝিয়াই হরিচরণ কার্ত্তিককে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া বলিয়া উঠিল—ভাগ্যি তুমি ছিলে বাবা!

লক্ষ্মণ—নির্ব্বোধের মত খানিকক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর নিজের ঝলসান হাতদুখানার দিকে একবার চাহিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

মধু বিশ্বাসের মতে কার্ত্তিকের জন্যই নিনা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল; কিন্তু সেখানে মধু বিশ্বাসই একা ছিল না, আরও পাঁচজন লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া সবই দেখিয়াছে। তাহারা বলে লক্ষ্মণের জন্যই নিনা বাঁচিয়াছে। শুধু কি তাই! তারা আবার এও রটায়—যে, পাটের গাদায় কার্ত্তিকই নাকি আগুন ধরাইয়া দেয়; রাগের মাথায় জলন্ত সিগারেট সে নাকি ও দিকেই ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল।

মধু বিশ্বাস অবশ্য নরহরিকে এসব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে দিল না, কিন্তু এত সব কথার পরে কার্ত্তিক আর নিনাদের বাড়ী গিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। অগত্যা, কিছুদিনের মত সে সেখানে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ এ সংবাদ পাইয়া মনে মনে বেশ খানিকটা খুসী হইয়া উঠিল; কিন্তু খুসী হইয়াও তাহার কিছু লাভ নাই,—নিনাদের বাড়ী আর জীবনে যাইবে না সে। অথচ একপাড়ায় বাস করিয়া দিনান্তে একবারও নিনাকে দেখিবে না তাই বা লক্ষ্মণ কেমন করিয়া পারে! লক্ষ্মণ মহা বিপদে পড়িল।

হাটে বাহির হইতে পারিলে এত দুর্ভাবনা তাহার থাকিত না। কিন্তু হাতের ফোস্কাগুলা তাহার ভাল করিয়া শুকাইতে দুদিন দেরী হইবে, কাজেই নরহরি সেবারের মত অন্য লোকের নৌকায় হাটে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মণ ঘরে বসিয়া এক ঘেয়ে দিনগুলোর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যথার জাল বুনিয়া চলিল।

কিন্তু ব্যথার স্বপ্ন দেখিয়া মানুষের বেশী দিন চলে না, তাই।—হাত দুখানা একটু সারিয়া উঠিতেই লক্ষ্মণ কাজের অভাবে ছটফট্ করিতে লাগিল।

বাড়ী বসিয়া থাকিবার সময়ও লক্ষ্মণ কোনদিন বেকার বসিয়া থাকে না। নিজের নৌকা আছে তাহার; একটা বেলা একটু খাটিলেই আটগণ্ডা পয়সার আর ভুল থাকে না কোন দিনই। কিন্তু এবার লক্ষ্মণ দশবারো দিন নৌকাখানার খোঁজ পর্য্যন্ত নেয় নাই একবার। কিন্তু আর ভাল লাগে না তাহার। ডাঙ্গার চেয়ে নদীর বুকেই ভাল থাকে সে। তাই অনেকদিন পরে লক্ষ্মণ আবার তাহার নৌকা খুলিয়া নদীর বুকে পাড়ি জমাইল।

ওদিকে ঘর পুড়িয়া যাইবার পর হইতে হরিচরণের অবস্থাও বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। নূতন একখানা ঘর তুলিবার জন্য তাহার সব চেয়ে ভাল জমিখানাই দিতে হইয়াছে বন্ধক। ওপারের কুমোরদের কাছ হইতে হাঁড়ি কলসী আনিয়া হরিচরণ এপারে বেচিয়া এতদিন সংসার চালাইত কিন্তু এখন আর তাহাতে কুলায় না, তাই হাঁড়ি কলসী বেচিবার ভার নিনার উপর দিয়া এখন হরিচরণ যায় 'জন' খাটিতে, কাজেই বেসাতী আনিবার জন্য এখন নিনাকে প্রায়ই যাইতে হয় ওপারে কুমোরদের বাড়ী। অবশ্য ইহাতে ভয়ের কথা কিছু নাই; কুমোররা অনেক কালের চেনা শোনা, মাঝি মাল্লা সব আপনা আপনির ভিতর, এ গাঁয়ার মেয়েরা এমন হামেসাই যাতায়াত করে ওপারে।

পার হইতে গিয়া নিনা লক্ষ্মণের সামনেও পড়িয়া গিয়াছে কতদিন! নিনাকে দেখে আর লক্ষ্মণ ভাবে, একটা মুখের কথা বলিলে সে নিনাকে পারাপার করিয়া দিতে পারে। তাহাতে নিনার লাভ বড় কম হয় না, অত জিনিষ পত্র নিয়া পার হইয়া আসিতে কোন্ না আট দশটা পয়সা লাগে। শুধু কি তাই! নিনা যদি একটু আশা দেয়, তাহা হইলে তাহার বাবার জমিখানা ছাড়াইয়া দিতেই বা কতক্ষণ লাগে—এক আধশো টাকার জন্য লক্ষ্মণ দাস মারা যায় না। কিন্তু নিনা তাহা বলে না, কাজেই একটা উদ্ভত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চাপিয়া নদীর বুকে এখান ওখান ভাসিয়া বেড়ান ছাড়া লক্ষ্মণ আর কি করিতে পারে!

কার্ত্তিক মাসে ঝড় ঝাপ্টা বড় একটা ওঠে না; কিন্তু যদি কখনও ওঠে তবে তাহা নিতান্ত অল্পের উপর দিয়া যায় না; তাই সেদিন মোহনপুরের যাত্রী নিয়া যাইবার পথে লক্ষ্মণ যখন দেখিল যে আকাশের পুব কোণে মেঘ সাজিয়া উঠিতেছে, তখনই তাহার মনে হইল যে আজ বিকাল নাগাদ দেবতা একটা খেলা খেলিবে।

মোহনপুর লক্ষ্মণের গ্রাম হইতে ক্রোশ চারেকের পথ, জোয়ারে গিয়া ভাটায় ফিরিতে হয়। বেলা তিনটা নাগাদ জোয়ার আসিবার কথা;—লক্ষ্মণ হিসাব করিয়া দেখিল সময় মত সে ফিরিতে পারিবে। আর নিতান্তই যদি ঝড় উঠিয়া পড়ে, তবে পথে থাকিবার যায়গা মিলিবে।

ভাড়া চুকাইয়া লক্ষ্মণ একটু তাড়াতাড়ি করিয়াই ফিরিল।

লক্ষ্মণ যে সময় তাহাদের গ্রামের আড়পারে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ওদিকে মেঘও বেশ জমিয়া আসিয়াছে। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া পাড়ি জমাইবার জন্য লক্ষ্মণ নৌকা ঘুরাইয়া ধরিয়াছে এমন সময় তীর হইতে কে যেন তাহাকে ডাক দিল।

অত অল্প আলোয় দূরের লোক চেনা যায় না, কিন্তু মেয়ে লোকের গলা, তা ছাড়া আওয়াজ যেন চেনা বোধ হইল। আকাশের দিকে আর একবার চাহিয়া লক্ষ্মণ নৌকা ভিড়াইল। ভাটায় জল সরিয়া আসিয়াছে। প্রায় এক হাঁটু কাদা ভাঙিয়া তীরে উঠিতে লক্ষ্মণের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তীরে উঠিয়াই সে বিস্মিত হইয়া গেল—নিনা, হাঁ নিনাই তাহাকে ডাকিয়াছে।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিল—এসময় এখানে কি করছিস্ রে তুই?

নিনা কথা কয় না।

কথা কস্ না যে?—বাড়ী যাবি?

নিনা উত্তর করিল—বাড়ী যাব না কি থাকব এইখেনে?

—তবে আয় আমার নৌকায়।

নিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—যাব না তোর নৌকায়।

—তবে থাক, তোর কোলকেতার বাবু এসে পার করবেখন তোরে, বলিয়া লক্ষ্মণ ফিরিয়া চলিল। কিন্তু দু'চার পা গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল।

কণ্ঠস্বর যথা সম্ভব কোমল করিয়া লক্ষ্মণ বলিল—যাস্ ত আয় আমার সঙ্গে। এর পর কাক প্রাণীও তুই দেখতে পাবি না গাঙের পরে, নৌকো ত দূরের কথা। পাগলামী করিস নে আর, চল আমার সঙ্গে। আর না হয় ঐ কুমোর বাড়ীই ফিরে যা। এমন সময় কি মানুষ দাঁড়ায় এখানে?

নিনা তবু কোন কথা কয় না। এদিকে ক্রমশঃই দেরী হইয়া যাইতেছে। লক্ষ্মণ আবার বলিল,—তবে যা ভাল বুঝিস তাই কর তুই, আমি চল্লাম।

লক্ষ্মণ এবার সত্য সত্যই ফিরিয়া চলিল। নদীর বুকে যতদূর দৃষ্টি চলে তাহার মধ্যে নিনা একখানা নৌকাও দেখিতে পাইল না। অগত্যা নিনা লক্ষ্মণকে ডাকিয়া থামাইল।

—তোর নৌকাতেই যাই চল।

মাঝপথে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মণ ডাকিল—তবে আয়।

কিন্তু এক পা কাদায় নামাইয়াই নিনা বলিয়া উঠিল—এ আমি পারব নারে, তুই উঠে আয় একবার।

—আঃ আলাতন করে ছাড়লে, বলিয়া লক্ষ্মণ আবার তীরে ফিরিয়া আসিল।

নিনা ভাবিয়াছিল, সে লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া কাদাটুকু পার হইয়া নৌকায় গিয়া উঠিবে, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহাকে সে অবসর দিল না। হঠাৎ সে নিনাকে পাঁজাকোলা করিয়া একেবারে বুকের উপর তুলিয়া লইল। তারপর অতি সন্তর্পণে কাদাটুকু পার হইয়া নিনাকে নৌকার উপর বসাইয়া দিল। তারপর নৌকা ছাড়িয়া দিতে লক্ষ্মণের এক মুহূর্ত্তও দেরী হইল না।

নিনা চুপ করিয়া নৌকার উপর বসিয়া রহিল। লক্ষ্মণও প্রথমটা কোন কথা কহিল না; কিন্তু সে এক দৃষ্টিতে নিনার দিকে চাহিয়া প্রাণপণ জোরে নৌকা বাহিতে লাগিল। অন্ধকার বড় সহসা নামিয়া আসিল, গাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকার, কিন্তু ঐ অন্ধকারেও নিনার মনে হইল লক্ষ্মণের চোখ দুটো পৈশাচিক উল্লাসে অলিয়া অলিয়া উঠিতেছে।

খানিকক্ষণ পরে লক্ষ্মণ কথা কহিল, আমার নৌকোয় পার হচ্ছিস্, কোলকেতার বাবু তোরে কিছু বলবে না ত'? আরো যদি শোনে তোরে কোলে করে নৌকোয় তুলে দিছি আমি—আর একটু হলেই তোর মুখখানার পরে আমার মুখখানা ঠেকে গেছল আর কি? লক্ষ্মণ হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

নিনা লক্ষ্মণের কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিল, আজ আর পিছন ফিরে বসলে চলবে না। আজ আমার সব কথাই শুনতে হবে তোর। বড় বাগে পেয়েছি তোরে আজ, দেবতার কাছে কত মাথা খুঁড়েছি এর জন্যে তা জানিস্? আজ আমার সব কথাই শুনতে হবে তোরে।

ক্ষোভে নিনার কান্না আসিতেছিল, ঘাড়টা একটু ফিরাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি করেছি আমি তোর?

—কি করেছিস্? কি না করেছিস তুই আমার? ঝড়ের মুখে গাঙ্ পার হবার বেলায় তুই ডাক দিবি আমারে, আগুনে পুড়ে মরবার যো হবি তুই, তখন তোরে বাঁচাতে যাব আমি! মনে নেই তোর, ছেলেবেলায় যখন পাড়ার ছেলেগুলোর হাতে মার খেয়ে মরতিস্? তখন পড়ত—আমার ডাক; কিন্তু তারপর, তারপর আমি তোর কেউ না! আজ তার সব শোধ নেব।

নিনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—শোধ নিবি কিরে, মধ্যি গাঙে বুড়িয়ে মারবি নাকি?

দূর পাগল, মরলে ত শেষই হয়ে গ্যালো,—আর তোরে কি মারতে পারি আমি? সে সব কিছু নয়; তবে কাত্তিকে যে আমার পরে টেক্কা দেবে তা আমার সবে না কিছুতেই, তোর পরে আমার কত লোভ তা

জানিসনে তুই? এমন গাঙের বুকের পরে, কোনদিকে একটা কাকপ্রাণী নেই, এমন সুবিধে কি আর ছাড়ি আমি?

—হঠাৎ নৌকা খানা দুলিয়া উঠিল, একটা তীব্র পাক খাইয়া নৌকাখানা প্রায় উল্টাইয়া যাইবার মত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সবল কঠিন বাহুর বেষ্টনে নিনাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া লক্ষ্মণ পাগলের মত বলিতে লাগিল —আজ তুই আমার, আজ তুই আমার।

এক মুহূর্ত্ত—ঠিক একটা মুহূর্ত্ত নিনা অসহায়ভাবে লক্ষ্মণের বুকের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার পরে নৌকা-খানা আবার কাত হইয়া পড়িল, একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া লক্ষ্মণ নিনাকে ছাড়িয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে 'মাগো' বলিয়া নিনা নদীতে লাফাইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ অল্প বাধা পাইয়া নিনাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই সে নিমেষে উঠিয়া বসিল। যন্ত্রচালিতের মত বৈঠাখানা তুলিয়া নিয়া নৌকা সোজা করিতে করিতে লক্ষ্মণ নিনাকে ডাকিতে লাগিল।

একটু দূর হইতে নিনা উত্তর দিল—চলে যা তুই? পারি—সাঁতরে যাব।

সর্ব্বনাশ! নিনা বলে কি!

লক্ষ্মণ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—পাগল হয়েছিস তুই? হাঙ্গর কুমীরে গাঙ্ যে থিক্ থিক্ করছে এখন, উঠে আয় শিগ্‌গীর, উঠে আয়। এই গাঙ্ তুই সাঁতরে পার হবি?

নিনা বলিল—তোর নৌকোয় উঠবো মরতে! তার চেয়ে এই গাঙেই মরব। মানুষ না জন্তু তুই! যাব না তোর নৌকোয়।

লক্ষ্মণ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—মা কালীর দিব্যি ক'রে বলছি নিনা, আর একটা কথাও কবনা তোর সঙ্গে। না হয় আবার গাঙে ঝাঁপ দিস তুই।

জলের টানে ইহার মধ্যেই নিনার ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, একটু ভাবিয়া নিনা বলিল—বল্, আমার গায়ে হাত দিবি না তুই।

—না, না, না, এই তিন সত্যি করলাম, উঠে আয় এবার।

—তবে দাঁড়া একটু, নৌকাখানা আর একবার কাত হইয়া পড়িল, একটা ঝাঁকানি দিয়া নিনা নৌকায় উঠিয়া আসিল।

প্রাণপণে নৌকা বাহিয়া লক্ষ্মণ যখন তীরে আসিয়া পৌঁছিল ঝড় তখন কেবল উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে—নৌকাখানা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে!

অল্পদিন লক্ষ্মণ একাই তাহার নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখে, কিন্তু আজ গলুই ধরিয়া একটা টান দিতেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ আপনা আপনিই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

নিনা চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ও কিরে!

—কিছু না, একটু ধরতে পারবি তুই? একা আর পেরে উঠছিনে।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নৌকাখানা টানিয়া তুলিবার সময় নিনার হাতখানা একবার লক্ষ্মণের কাঁধে লাগিতেই সে আবার "উঃ" করিয়া উঠিল। নিনা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—অমন কাতরাচ্ছিস্ কেনরে বারবার? আকাশে সে সময় ঘন ঘন বিদ্যুৎও চম-কাইতেছিল; তাহারই আলোয় নিনা লক্ষ্মণের কাঁধের দিকে চাহিয়া দেখিল;—

—ইস্ রক্তে যে একেবারে ভেসে গেছে রে।

নৌকার উপরে লক্ষ্মণের হাত হইতে ছাড়াইয়া আসিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিনা লক্ষ্মণের বাঁ হাতের উপরে, কাঁধের কাছে প্রাণপণ জোরে দাঁত বসাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাত যে এমন ভয়ঙ্কর হইতে পারে নিনা এতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

নৌকাখানা ঠিক মত বাঁধা হইয়া গেলে নিনা লক্ষ্মণের কাঁধে হাত দিয়া দেখিল তখনও অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছে।

লক্ষ্মণ কোন আপত্তি করিবার আগেই নিনা তাহার শাড়ীর আঁচল হইতে একটা লম্বা ফালি ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া তারপর নদীর জলে সে ন্যাকড়াটুকু ভিজাইয়া

আন্দাজে আন্দাজে যতটা পারিল লক্ষ্মণের কাঁধে জড়াইয়া দিল।

লক্ষ্মণ বলিল—কেন মিথ্যে পাগলামী করছিস, তার চেয়ে চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

নিনা বলিল তার চেয়ে, তুই বরং শীগ্‌গীর বাড়ী যা, আমি একাই যেতে পারব এটুকু। নিনা একা চলিয়া গেল।

নদীতীর হইতে লক্ষ্মণের বাড়ী বেশী দূর নয়; কিন্তু এইটুকু পথই লক্ষ্মণ আজ যেন আর শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। অসহ্য যন্ত্রণায় হাতখানা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।

কোনমতে বাড়ীতে ঢুকিয়া ঘর খুলিবার দেরীটুকু লক্ষ্মণের সহিল না; বারান্দার উপরেই সে তাহার অবশ দেহ ঢালিয়া দিল। লক্ষ্মণ অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ পরে মানুষের হাতের স্পর্শে লক্ষ্মণ জাগিয়া উঠিল।—কে, কে—বলিয়া সে উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

—আর আমার পোড়া কপাল, দরজাটা খোলবারও তর সয়নি তোর!—নিনা কথা কহিতেছে। লক্ষ্মণ ডান হাতে চোখ মুছিয়া দেখিল, আলো নিয়া নিনাইত তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

বিস্ময়ে লক্ষ্মণের মুখে কথা সরিল না। নিনা জিজ্ঞাসা করিল—বলি চাবিটা দিবি, না সারাটা রাত এইখানেই কাটবে?

চাবি নিয়া নিনা ঘর খুলিয়া ফেলিল, তারপর মোটা-মুটা একটা বিছানা পাতিয়া লক্ষ্মণকে তুলিয়া আনিয়া সেখানে শোয়াইয়া দিল।

লক্ষ্মণ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। ঘরের ভিতর আসিয়া সে বুঝিল—নিনা আসিয়াছে এত রাত্রে!

লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিল – কার সঙ্গে এলিরে তুই?

নিনা বোধ হয় কাঁদিতেছিল, ধরা গলায় সে বলিল—কার সঙ্গে আবার আসব? শুয়ে শুয়ে খালি মনে পড়তে লাগল তোর কথা, তাই দেবতা ধরতেই চলে এলাম একা।

লক্ষ্মণের সঙ্গে নিনা কোনদিন এমন করিয়া কথা কহে নাই, লক্ষ্মণের প্রতিবাদ করিতে মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না। তবুও সে বলিল—ভাল করিস নি এসে।

নিনা ততক্ষণ লক্ষ্মণের কাঁধের পটীটা খুলিয়া ফেলিয়াছে; তারপর এদিক ওদিক হইতে কিছু কাট-কুটা আনিয়া খানিকটা জল গরম করিতে বেশী দেরী হইল না। আসিবার সময় নিনা কতকগুলা গাঁদা ফুলের পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল। গরম জলে ক্ষত স্থান ধুইয়া গাঁদা পাতা দিয়া নিনা আবার লক্ষ্মণের কাঁধটা বেশ ভাল করিয়া জড়াইয়া দিল।

লক্ষ্মণ বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিল। নিনা বলিল,—এইবার ঘুমো তুই।

—আচ্ছা, বলিয়া লক্ষ্মণ চোখ বুজিল। আবার চোখ মেলিয়া বলিল,—দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে যাস্।

—হবে'খন, তুই ঘুমো, বলিয়া নিনা লক্ষ্মণের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ছোট ছেলেটীর মত বিনা প্রতিবাদে লক্ষ্মণ আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া জাগিয়া উঠিল। নিনা তখনো তাহার শিয়রে বসিয়া ঝিমাইতেছে, তাহার হাতখানা বোধহয় অসাবধানে লক্ষ্মণের ব্যথার জায়গায় লাগিয়া গিয়াছিল।—নিনা ধড় মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

লক্ষ্মণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরে এখনো যাসনি তুই?

নিনা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না।

—না! কি মনে করেছিস্ তুই, কাল তুই মুখ দেখাতে পারবি পাড়ায়? আজ বাদে কাল পরের ঘর কত্তে যাবি তুই! কার্ত্তিকে শুনলে কি বলবে বলত?

নিনা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—পায়ে পড়ি তোর, ঐ কার্ত্তিকের নাম আর করিসনে তুই। একদিনও বলেচি যে ঐ কার্ত্তিকের ঘরে যাব আমি।

বিস্ময়ের পরে বিস্ময়! তবু লক্ষ্মণ বলিল, কিন্তু তোর বাপের ঘরও ত আছে, সেখানেই বা ফিরবি কি করে?

—নাই বা ফিরলাম সেখানে, তোর এই এত বড় ঘরখানা—দুষ্টু হাসিতে নিনার চোখ দুটী চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

নিনা বলে কি! ব্যথার কথা ভুলিয়া লক্ষ্মণ সটান তাহার বিছানায় উঠিয়া বসিল। চাপা উল্লাসে সে জিজ্ঞাসা করিল—কি বল্লি, আমার ঘরে—?

হাঁ, হাঁ তোর ঘরে, কিন্তু আজ যে কাণ্ড করেছি আমি, ভয় হয় যদি তাড়িয়ে দিস্।

—তাড়িয়ে দেবো আমি, নিনা, তোরে—উত্তেজনায় লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে নিনার দিকে হাত বাড়াইতে গেল কিন্তু দুরন্ত বেদনায় তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

নিনা দুহাত বাড়াইয়া লক্ষ্মণের পতনোন্মুখ দেহ নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল—তা জানি আমি তা জানি।

ভোরের আলো তখন কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে, বর্ষণ থামিয়া মেঘের চাপ আকাশ হইতে কখন সরিয়া গিয়াছে, পাখীর গানে তখন আকাশের এদিক হইতে ওদিক একেবারে ভরিয়া গিয়াছে।

ভুঁইচাঁপা

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

বনপথে কে দাঁড়ালো
রূপের ডালি এসে' ধীরি?
নগ্ন মেয়ে সীতার মতন
বসুন্ধরার বক্ষ চিরি'!
বিধির হাতের হয়তো এ ভুল,
নেইকো পাতা নাই দেখি মূল,
মাটির গায়ের ভুঁইচাঁপা ফুল
অঙ্গেতে ওর কতই ছিরি!
বর্ষাগমে ফুটে উঠি'
আনে স্নেহরসের বাণী,
আকাশকুসুম নয় রে কবি,
সত্যি ও ফুলের রাণী!
মেঘের কোলে তড়িৎমালা
করছে যখন বন উজালা,
দেখেই এলো ছুটে বালা
শ্যামলী মা'র অঙ্ক ঘিরি'

ছোট ঝরণা

পাষাণ-বুকের নির্ঝরিণী
কোন্ সে কথা বলে,—
আমারি কি মর্ম্মবাণী
ব্যথার নয়ন-জলে?
ঝর্ ঝর্ ঝর্ আকুল স্বরে!
কী বেদনা উপ্‌চে পড়ে!
বুঝতে যে তায় ইচ্ছা করে হায়,
পাইনে খুঁজে অর্থ যে তার
ঢুঁড়ি মনের তলে।
আমার মতো শোকের হাওয়ায়
ছাওয়া কি তার প্রাণ,—
তাই কি তাহার জলের গতি
এমন বেগবান?
কে জানে তায় কোন্ বেদনা
এমনতর পায় চেতনা!
কাঁদনে কী উন্মাদনা হায়,
পাইনে বুঝে সীমা যে তার
ব্যথাই বেড়ে চলে!

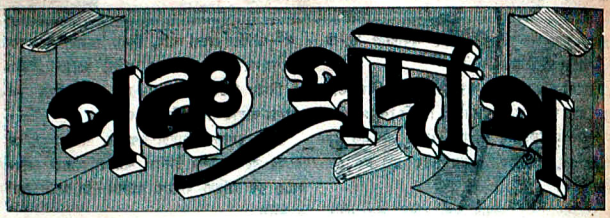

নারীর ছলনা

গী দ্য মোপাসাঁ

"মেয়েরা যেমন অনায়াসে আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারে, তেমন বুঝি আর কেউ পারে না। তাদের এই চাতুরীর মূলে সব সময় যে দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে তা' নয়, আমাদের ঠকাতে পারলেই তাদের আনন্দ! এমন সহজ স্বচ্ছন্দ ও দ্বিধাহীনভাবে তারা চাতুরী করে যে, তাদের আচরণে সন্দেহ করবার আমরা কিছুই পাই না। প্রতিদিনই আমরা ধরা দিচ্ছি তাদের চাতুরীতে, আর এ চাতুরী তাদের সবাই করে, যারা তাদের মধ্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মশীলা তারাও। তোমরা হয়ত বলবে, অনেক সময় তারা চাতুরী করতে বাধ্য হয়। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। পুরুষের কত রকমের অদ্ভুত খেয়াল আছে। স্বামী চান না বাড়ীতে তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন কাজ হয়, তা' সে হুকুম যতই অন্যায় হোক্ না কেন। স্ত্রী স্বামীর খেয়ালে বাধা না দিয়ে চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে; তা'তে কাজ তার সহজে সিদ্ধ হচ্ছে অথচ স্বামীর আত্মাভিমানে আঘাত করা হচ্ছে না। স্ত্রী স্বামীকে বোঝায়, এ জিনিস কিনতে মাত্র এত টাকা খরচ হয়েছে, কেন না তার চেয়ে বেশী খরচ হয়েচে জানলে স্বামীর মেজাজ হয়ত বিগড়ে যাবে। অবস্থা যতই সাংঘাতিক দাঁড়াক না কেন, মেয়েরা এমন কৌশলে তা' সামলে নিতে পারে যে আমরা কিছুই তার টের পাই না। দৈবাৎ যদি কোনদিন তাদের চাতুরী ধরা পড়ে যায় তখন বিস্ময়ে আমাদের চোখ কপালে ওঠে, হতবুদ্ধি হ'য়ে আমরা ভাবি, এটা লক্ষ্য করিনি এতদিন, আশ্চর্য্য!"

যিনি এ কথাগুলি বল্লেন তিনি রাজ্যের একজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কঁৎ দ্য ল—। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল বলে' তাঁর একটা দুর্ণাম ছিল সত্য, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। কয়েকটি যুবক তাঁর কথা বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনছিল।

কঁৎ বলতে লাগলেন—

"একবার এক সাধারণ, অশিক্ষিত মেয়ে আমাকে ভারী ঠকিয়েছিল। আমার মত একজন অভিজ্ঞ লোক কেমন ক'রে তার চাতুরীতে ভুলল সেই কথাই আজ তোমাদের বলব; তা'তে তোমাদের বিশেষ উপকার হ'বে বলে' মনে করি।

আমি তখন পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী। প্রতিদিন সকালে আমি শ্যাম্প্‌স্ ইলাইসীসে বেড়াতে যেতাম। তখন মে মাস, কচি পাতার মিষ্ট গন্ধে পথ ভরপুর হ'য়ে থাকত। বেড়াতে আমার যেন মোটেই শ্রান্তিবোধ হ'ত না।

দিন কয়েকের মধ্যেই আমি লক্ষ্য করলাম, পথে এক তরুণীর সঙ্গে আমার প্রত্যহ সাক্ষাৎ হচ্ছে। সে যে প্যারীর মেয়ে তা' বুঝতে একটুও দেরী হয় না। প্যারীর ছাপ তার চোখে মুখে সুস্পষ্ট। তা'কে সুন্দরী বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কারো মনে দ্বিধা আসতে পারে না। বাস্তবিক, অপরূপ সুন্দরী সে! তার গঠন? হ্যাঁ, এবিষয়ে মতভেদ হ'তে পারে। কোমর তার নিতান্ত ক্ষীণ, কাঁধ অত্যন্ত সরু, বুক যেন একটু বেশী স্ফীত। কিন্তু ভিনাস্ দ্য মিলোর মত প্রাণহীন মূর্ত্তির চেয়ে আমি পছন্দ করি ঐ সব হর্ষোৎফুল্ল জীবন্ত মূর্ত্তি।......

এই ধরণের মেয়েরা চলে এক অপরূপ ভঙ্গীতে। তা'দের পরিচ্ছদের মৃদু খস্ খস্ শব্দ অন্তরে এক উগ্র কামনার সৃষ্টি করে।......পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সে অপাঙ্গে আমার পানে একবার তাকালে। কিন্তু এই সব মেয়ের মনের তল পাওয়া কঠিন; চোখে মুখে তা'দের কত কি বিচিত্র ভাবের লীলা যে দেখি তা' আর কি বলবো!......

—একদিন সকালে দেখি পথের ধারে একখানি বেঞ্চের উপর সে ব'সে—কোলের উপর একখানা খোলা বই। আমি এসে ধীরে ধীরে তার পাশে বসলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জমে গেল। এরপর প্রতিদিন দেখা হ'লেই পরস্পরের সহাস্য অভিবাদন ও তারপর আলাপ। তরুণী আমায় বললে, তা'র স্বামী সরকারের অধীনে সামান্য একজন কেরাণী, জীবন তা'র নৈরাশ্যময়, উদ্বেগ অশান্তি অশেষ, এমনি আরো কত কি।

আমি তাকে আত্মপরিচয় দিলাম। আমার এ আত্মপরিচয় দেওয়ার হেতু শুধু যে আমার সাময়িক লঘুচিত্ততা তা' নয়, তার অন্তরালে গর্ব্বও প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার পরিচয় পেয়ে সে যেন রীতিমত বিস্মিত হয়েছে এমনিভাবে আমার পানে তাকালে।

পরের দিন সে আমার অফিসে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর সে এত ঘন ঘন আসা সুরু করল যে তাকে আসতে দেখলেই দ্বাররক্ষীরা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলাবলি করত, ঐ মাদাম লিউ, কারণ লিউ হচ্ছে আমার ক্রিশ্চান নাম।

তিন মাস ধরে' প্রত্যহ সকালে তা'র সঙ্গে আমার দেখা হ'তে লাগল কিন্তু তা'র প্রতি আমার আকর্ষণ একটুও কমল না। নিত্য সে তা'র সৌন্দর্য্যকে নূতন সজ্জায় সজ্জিত ক'রে আমার সামনে উপস্থিত করতে লাগল।......কিন্তু একদিন দেখি, মুখে তার দীপ্তি নেই, চোখদুটো ঈষৎ লাল ও ছলছল, যেন এক গোপন ব্যথায় তা'র অন্তর দীর্ণ হচ্ছে!

আমি তাকে অনুরোধ করলাম, মিনতি করলাম, তার এই মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ আমাকে বলবার জন্যে।

অনেক চেষ্টার পর সে ভয়জড়িত কণ্ঠে বললে যে তার সন্তান-সম্ভাবনা হ'য়েছে। আর, কথাটা বলে ফেলেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভয়ে আমি আঁৎকে উঠলাম। মুখখানা যে আমার নিমেষে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। এরকম অপ্রত্যাশিত পিতৃত্বের সংবাদ যে কী মর্ম্মন্তুদ তা' শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে! অথচ একে ঠেকিয়ে রাখাও যায় না, একদিন জানতেই হ'বে—দু'দিন আগে, নয় পরে।......

অতিকষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে বললাম, "তুমি—তুমি না বিবাহিতা?"

সে উত্তর দিলে, "হাঁ, কিন্তু আমার স্বামী মাস দুই এখানে নেই, তিনি আছেন ইতালীতে, আর......কিছুকাল তাঁর ফেরবারও কোন সম্ভাবনা নেই।"

উত্তর শুনে আমার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল। কিন্তু এ ভীষণ দায়িত্ব হ'তে যেমন করে হোক্ নিজেকে মুক্ত ক'রতে হবে! বললাম, "তুমি এখনই যাও তোমার স্বামীর কাছে......"

মুখ নীচু ক'রে লজ্জিতভাবে সে বললে, "হাঁ...কিন্তু..." কথাটা শেষ করলে না সে—সঙ্কোচে, না ইচ্ছা ক'রেই, তা' বলা শক্ত।

আমার বুঝতে দেরী হ'ল না—সেইদিনই তা'কে খামের মধ্যে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিলাম তা'র 'পথখরচ বলে'।

* * *

আটদিন পরে সে আমাকে একখানি চিঠি পাঠালে জেনোয়া থেকে। পরের সপ্তাহে চিঠি পেলাম ফ্লোরেন্স থেকে। তারপর চিঠি এল লেগহর্ণ, রোম ও নেপল্‌স থেকে।

সে আমায় লিখলে, "প্রিয়তম, আমি বেশ ভালই আছি। কিন্তু আমার চেহারা আজকাল কি কদর্য্যই না দেখাচ্ছে! এ চেহারা নিয়ে আমি কোন মতেই তোমার সামনে উপস্থিত হ'তে পারি না। আমাকে এখন দেখলে তোমার ভালবাসা হয়ত নিমেষে অদৃশ্য হ'বে!...তুমি শুনে সুখী হ'বে যে আমার স্বামীর মনে কোন রকম সন্দেহ জাগেনি। তাঁর এখানকার কাজ মিটতে আরো কিছুদিন লাগবে, তাই এখন আমার ফ্রান্সে ফেরা হ'বে না। ফিরব সেই প্রসবের পর।"

আট মাস পরে ভিনিস থেকে একটি ক্ষুদ্র লিপি এল, তাতে লেখা তুমি শুনে খুশী হ'বে যে আমার একটি পুত্রসন্তান হ'য়েছে।

কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন সকালে সে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে তা'র কোমল দুই বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

দেখলাম তার রূপলাবণ্য একটুও ম্লান হয়নি, বরং যেন আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল ও মনোরম! আমাদের পূর্ব্ব সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'তে দেরী হ'ল না।

মন্ত্রিত্বের কাজে শীঘ্রই আমি ইস্তফা দিলাম। রু দ্য গ্রেনেলে আমার বাড়ীতে সে এখন রোজই আসতে লাগল। ছেলেটির কথা সে প্রায়ই আমার কাছে বলত, কিন্তু সে কথায় আমি বড় একটা কর্ণপাত করতাম না। মাঝে মাঝে তা'র হাতে কিছু কিছু টাকা দিয়ে শুধু বলতাম, "এটা খোকার জন্য তুলে রেখো।"

আরো দু'বছর কেটে গেল। এখন সে লিউর কথা বেশী ক'রে বলতে সুরু করলে। আমার নাম অনুসারে সে খোকার নাম রেখেছিল লিউ।

মাঝে মাঝে সজল চোখে সে অনুযোগ করত, "তুমি খোকাকে মোটেই ভালবাস না। তা'কে একবার দেখবার ইচ্ছাও তোমার হয় না। তুমি যদি জানতে তোমার জন্যে আমি কত কষ্ট..."

অবশেষে তা'র পীড়াপীড়িতে আমি একদিন তাকে বললাম, কাল সকালে যখন সে খোকাকে শাঁ এলিজেতে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাবে তখন আমি বেড়াতে বেড়াতে ওদিকে যাবো।

কিন্তু বাড়ী থেকে বেরুবার সময় হঠাৎ আমার মনের মধ্যে একটা ভয় দেখা দিল। মানুষ দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধ। যদি সেই ক্ষুদ্র শিশুর উপর আমার মমতা পড়ে, তা'হলে? আর মমতা পড়াও আশ্চর্য্য নয়, আমি তা'র পিতা তো!

মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, না আমি যাব না—বিপদের কথা কে বলতে পারে!

হাতের দস্তানা জোড়া খুলে টেবিলের উপর রাখলাম, মাথার টুপীটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে দিলাম। যাব না এটা ঠিক।

পাশের দরজাটা খুলে গেল। আমার ছোট ভাই ঘরে ঢুকে আমার হাতে একখানি বেনামী চিঠি দিলে। চিঠিখানি সেইদিনই সকালে সে পেয়েছে। চিঠিতে লেখা—

"আপনার ভাই কঁৎ দ্য ল—কে সাবধান করে দেবেন। রু ক্যাসেতের সুন্দরী তরুণী তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তরুণীর সম্বন্ধে একবার সন্ধান করলেই সব তিনি জানতে পারবেন।"

আমার এ প্রণয় ব্যাপার কারো কাছে আমি প্রকাশ করিনি। এখন আমি আমার ভাইকে আদ্যন্ত সব কথা বললাম। তারপর তাকে বললাম, "এ বিষয় নিয়ে আমি নিজে আর কিছু করতে চাইনা। তবে তুমি যদি মেয়েটির সম্বন্ধে একটু সন্ধান নাও তো বড় ভাল হয়।"

আমার ভাই চলে গেলে আমি একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা, কিভাবে সে আমায় প্রতারিত ক'রে থাকতে পারে? তা'র অন্য প্রণয়ী আছে? তা থাকুক, আমার কি? তা'র রূপ যৌবন আছে, কেনই বা ভোগ করবে না সে? আমার আকাঙ্ক্ষা তো মিটে গেছে, তা'র কাছে আমি নতুন কিছু প্রত্যাশা করি না।...আমাকে হয়ত সে ভালবাসে...আর সত্য কথা বলতে কি, তা'র জন্যে আমার কতই বা খরচ হয়।...বাস্তবিক ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

আমার ভাই কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল। মেয়েটির স্বামীর সম্বন্ধে যা কিছু জানা যেতে পারে সবই সে পুলিসের কাছ থেকে জেনেছে। মেয়েটির স্বামী স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন কেরাণী, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্, কিন্তু সে বিবাহ করেছে একটি অতি সুন্দরী মেয়েকে, যার খরচ চালানো তা'র মত অল্প বেতনের কেরাণীর পক্ষে কষ্টকর।

মেয়েটির সঙ্গে দেখা করাও একবার দরকার। তাই আমার ভাই একটু পরে তার বাড়ীতে গেল। সেখানে শুনলে যে সে বাইরে গেছে, ফিরতে বিলম্ব হ'বে। দ্বাররক্ষীকে কিছু দিতেই সে খুশী হ'য়ে অনেক কথা বলতে সুরু করলে, "মাদাম দ" এর মত মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, ভারী সুন্দর তাঁর ব্যবহার। আর তাঁর স্বামীও চমৎকার লোক; অর্থবান্ না হ'লেও তাঁর মন অত্যন্ত উদার।"

কোনরকম ঔৎসুক্য না দেখিয়ে আমার ভাই জিজ্ঞাসা করলে, "মাদামের ছেলেটি এখন কত বড় হ'ল?"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না, মঁসিয়ে। মাদামের ছেলেতো কই নেই।"

"কেন? লিউ?"

"না মঁসিয়ে, আপনি ভুল করছেন।"

"ভুল? ইতালীতে তাঁর যে ছেলেটির জন্ম হয় দু'বছর আগে, তা'রই কথা বলচি।"

"না, মঁসিয়ে, তিনি কখনো ইতালীতে যাননি। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁকে এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দেখিনি।

রীতিমত বিস্মিত হ'য়ে আমার ভাই দ্বাররক্ষীকে ঐ বিষয়ে আরো অনেক প্রশ্ন করল। প্রশ্নের উত্তরে যা' জানা গেল তা' এই:—মাদামের অদ্যাপি কোনো সন্তান হয়নি, আর বিদেশযাত্রাও তিনি কখনও করেন নি।

* * * *

আমি যার পর নাই বিস্মিত হ'লাম, কিন্তু এ রহস্যের অর্থ পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমি আমার ভাইকে বললাম, "আমি এ ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝতে চাই। আমি মেয়েটিকে লিখে দিচ্ছি কাল এখানে আসতে। আমি তা'র সঙ্গে দেখা ক'রব না, দেখা ক'রবে তুমি। যদি সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করে থাকে তুমি এই দশ হাজার ফ্রাঁ তা'র হাতে দেবে আর সেই সঙ্গে একথাও তা'কে জানিয়ে দেবে যেন সে আমার কাছে আর না আসে। বাস্তবিক, তার সঙ্গে থাকা এখন নিতান্ত বিরক্তিকর ঠেকবে। তা'র কাছ থেকে আর আমি নতুন কি পেতে পারি?"......

তোমরা বিশ্বাস করবে কি? পূর্ব্বদিন রাত্রে আমার দুঃখই হয়েছিল এই নারীর গর্ভজাত সন্তান আমার পুত্র বলে, কিন্তু এখন লজ্জা, ক্ষোভ ও বিরক্তিতে মন আমার অশান্ত হ'য়ে উঠল তার সঙ্গে আমার চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হচ্ছে বলে'। সব রকম দায়িত্ব ও উদ্বেগ থেকে আমি এখন মুক্তি পেয়েছি, অথচ এ মুক্তির মধ্যে যেন আনন্দ নেই!......

পরের দিন সকালে আমার ভাই তা'র অপেক্ষায় বসে রইল আমার পড়বার ঘরে। প্রতিদিনের মত ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকে সে চেয়ারের দিকে এগিয়ে এল দুই বাহু প্রসারিত ক'রে। কিন্তু নিকটে এসে সে সঙ্কোচে সরে দাঁড়াল।

আমার ভাই উঠে দাঁড়িয়ে তা'কে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম, আমার অগ্রজের পরিবর্ত্তে আমি আজ এখানে আছি বলে'। আমার অগ্রজ আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চান, কিন্তু তিনি নিজে জিজ্ঞাসা ক'রতে বাধা পাবেন বলে' আমাকেই সেই অপ্রীতিকর কাজের ভার দিয়েছেন।"

তারপর তার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সে হঠাৎ একেবারে বলে বসল, "আমরা জানতে পেরেছি আমার ভ্রাতার ঔরসে আপনার কোন সন্তান নেই।"

এক মুহূর্ত্ত সে যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল। তারপর ধীরভাবে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সে তার বিচারকের মুখের পানে সহাস্যে চেয়ে রইল।

"না আমার কোন সন্তান নেই।" অতি সংক্ষেপেই সে উত্তর দিলে।

"আমরা আরও জানি যে আপনি কখনো ইটালী যান নি।"

এবার সে উচ্চ সিতভাবে হেসে উঠল। "সত্যি আমি কখনো ইতালী যাই নি।"

তরুণী যে এমন সরলভাবে উত্তর দেবে আমার ভাই তা' কল্পনাও ক'রতে পারে নি। উত্তর শুনে সে তো একেবারে স্তম্ভিত! খানিক চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "কঁৎ এই টাকা আপনাকে দিতে বলেছেন আর একথাও জানাতে বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে অতঃপর আপনার কোন সম্বন্ধ রইল না।"

এবার সে যেন একটু গম্ভীর হ'ল, ধীরভাবে টাকাটা পকেটে পুরে, নিতান্ত সহজ সুরে বললে, "তা'হলে কঁতের সঙ্গে আমার দেখা হ'বে না আর?"

"না, মাদাম।"

মনে হ'ল, সে যেন একথায় বিরক্ত হ'ল। কিন্তু বেশ শান্ত স্বরে বললে, "এটা নিতান্ত অন্যায়। তাঁকে খুব ভাল লাগত আমার।"

তরুণী এ বিষয় নিয়ে আর কোনো খেদ দেবে না বুঝতে পেরে আমার ভাই এবার ঈষৎ হেসে তাকে বললে, "আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আপনার এ রহস্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? আর কেনই বা আপনি ঐ কল্পিত ইতালী-যাত্রা ও শিশুর অবতারণা ক'রে রহস্যটিকে আরো জটিল করে তুললেন?"

সে আমার ভাইয়ের মুখের পানে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল যেন নিতান্ত নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন করেছে সে! তারপর সে বিরক্তির সুরে বলে উঠল, "অদ্ভুত লোক তো আপনি! আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আমার মত একজন সাধারণ মেয়ে এই তিন বছর কঁৎ দ্য ল—এর মত একজন রূপবান্, বিলাসী, ধনী, পদস্থ ব্যক্তিকে হাতে রাখতে পারতো—কোনরকম চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে?...যাক্, আজ এ অভিনয়ের শেষ হয়ে গেল। আমি জানতাম, এ চাতুরী বেশীদিন চলবে না। তবু যে তিন বছর চালাতে পেরেছি এই যথেষ্ট। আশা করি, আমার তরফ থেকে কঁৎকে দু'চার কথা আপনি বলবেন।"

এই বলে' সে উঠে পড়ল। আমার ভাই জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু—ঐ শিশু? আমার দাদাকে দেখাবার জন্যে আপনাকে বোধ করি একটি শিশু যোগাড় করতে হয়েছিল?"

"তা' হয়েছিল বৈকি। আমার দিদির খোকাকে একবার চেয়ে নিয়েছিলাম। দিদিই যে আপনাদের খবর দিয়েছে, একথা আমি বাজী রেখে বলতে পারি।"

"বেশ। আর ইতালী থেকে ঐ সব চিঠি?"

সে আবার বসে পড়ল—খানিকটা হেসে নেবার জন্য। "ওঃ, ঐ চিঠিগুলোর কথা বলছেন?...ওগুলো নিছক কাব্য। কঁৎ যে এ কৌশল ধরে ফেলেছেন এতে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হচ্ছি না। তিনি যে এক সময় পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রিত্ব করেছেন, এ কথা ভুললে চলবে কেন?"

"কিন্তু—আর একটা কথা?"

"বুঝেছি—ওটাই হচ্ছে আমার বৈশিষ্ট্য। প্রণয়ীকে আমি কখনো সঙ্কটে ফেলতে চাই না।"

তারপর মাথাটা একবার নত ক'রে, মৃদুহাস্যে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল। মনে হ'ল যেন এক নিপুণা অভিনেত্রী তার ভূমিকার আদ্যোপান্ত অভিনয় ক'রে বিদায় নিলে!"

এই পর্য্যন্ত বলে' কঁৎ দ্য ল উপদেশচ্ছলে বললেন, "অতএব আমি তোমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি যেন তোমরা ভুলেও কখনো ঐ সব মোহিনী নারীদের বিশ্বাস ক'রো না।" *

• অনুবাদক—শ্রীসুধাংশু কুমার গুপ্ত

বিরহ

শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অশ্রুমুখী—কে গো বিরহিনী,—
আষাঢ়ের কালো ঐ মেঘের মতন, স্বপনচারিণী,
গোপনে—গোপনে—
মিলনকাঙাল ওই মানবের মনে—
তোল নিত্য বিরহের ব্যথা-ভরা সুর!
বেদনা-রক্তিম ঐ ওষ্ঠাগ্রে বঁধুর,—
নারী তুলে দেয় মধু জোৎস্না-মাখা করে,
মিলনের পাত্রটিরে সুধা দিয়ে ভরে;
কানায় কানায় পূর্ণ সে পাত্রের বাণী ছলছল:
বিচ্ছেদের বেদনার উগ্র হলাহল—
তুমি সেথা ঢেলে দাও হে বিষাদময়ী।

মিলনের সাতরঙা ছবি,—
আঁকে যাহা মানব-মানবী,
দৈন্যে দুঃখে অশ্রুজলে
কত কুতূহলে;—
তাও তুমি ঢেকে দিতে চাও, বিরহের কালো
কালো মেঘপুঞ্জতলে,
অশ্রুসিক্ত বেদনা কজ্জলে।
অশ্রুভেজা আকাশের গায়
মিলনের আলোকপ্রভায়,
ফুটে ওঠে বর্ণে বর্ণে যে বর্ণের ছটা
পরিপূর্ণ মিলনের মহিমার ঘটা,
দেখা দেয় রামধনু:
হে অতনু,—
নিশ্চিহ্নে মুছিয়া দিয়া তারে,
নিখিলের চিত্রভূমিপরে
আঁক তুমি হে নিষ্ঠুর, হে করুণ কবি—
অমাঘেরা চিরন্তন বিরহের ছবি।
জানি ওগো জানি,
মিলন পিয়াসে কাঁদে নিখিলের হৃদয়-গেহিনী:
সে আত্মার বাণী
শাশ্বতকালের বিরহিনী—
আঁকে ছবি পরিপূর্ণ মিলনের রঙে
নিখিলের চিত্রপটভূমে।
স্বপন-কুহেলী-মাখা মিলনের গানে—
বিরহী প্রাণের ছন্দে, বিচ্ছেদের তানে,
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া ওঠে যেই সুর
হে ক্রন্দসী বেদনা-আতুর,
সে সুরে আকুল করো আকাশ ভুবন,
বেদনার বাণী স্বন স্বন—
অব্যক্ত ব্যথায়
কেঁদে ফেরে পশ্চিমা ঝঞ্ঝায়।

মিলনের রামধনু স্বপনে মিলায়,—
চিত্র হোতে মুছে যায় সে বর্ণ-বিলাস;
এতটুকু সে রঙের রক্তিম আভাস্—
তাও তারে মুছে দাও তুমি
চিরন্তনী অশ্রু দিয়ে ওগো বিরহিনী।
বিরহের বেদনার ছল-ছল কল-কল তান
ব্যথা অফুরাণ—
প্রেম-পূজা-প্রতীক্ষারে করেছে মহান,
করিয়াছে সর্ব্বজয়ী:
হে করুণাময়ী—
তোমার করুণ হস্তখানি,
বিরহের ব্যথাতাপ অশ্রুনির্ঝরিণী,—
মুছে নেয় মিলনের দৈন্য আর গ্লানি।
হে অন্তর্য্যামী,—
পৃথিবীর এ বিরহ সু-দুঃসহ:
(বুঝি) তাই অহরহ—
মিলনের বন্ধে বন্ধে—ফুৎকারিয়া বেদনার বাঁশী
আজও কাঁদে অমর ক্রন্দসী
তাই বুঝি এ বিরহ দুঃসহ সুন্দর
মিলনেরে করিয়াছে উজ্জ্বল প্রখর।

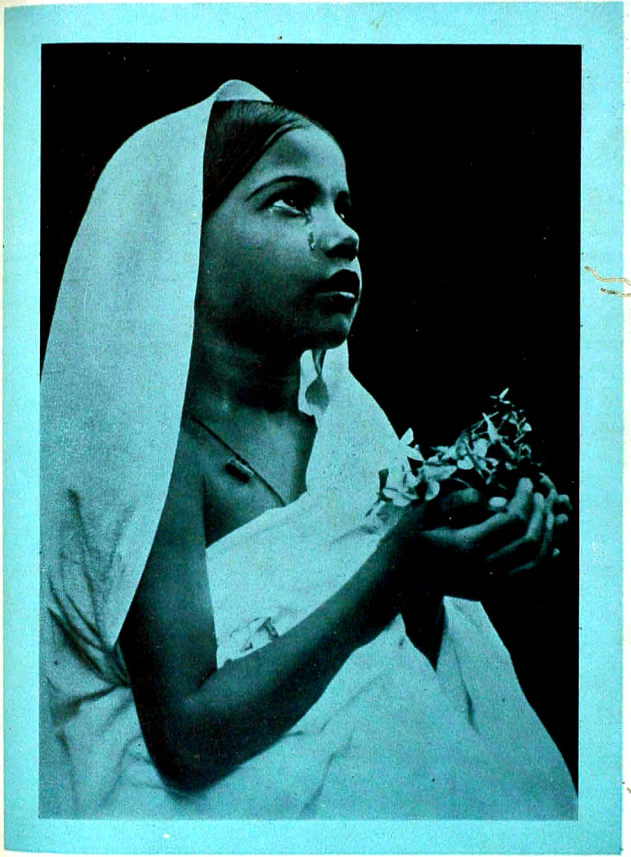

অশ্রুর অর্ঘ্য

শিল্পী: চিনু মজুমদার

মুদ্রণ: দেয়ালী প্রেস

পুরাতনের পুনরাগমন

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আকাশে মেঘ

"দেখলেত, ছোড় দি, আমি বলেছিলাম, এ পাড়াগাঁর চালচলন, আমাদের ধাতে সবে না—যেন তেলে জলে মিশে না।"

লজ্জাবতীর কথার পর মালতী মাধুরীকে বলিল, "আমরাও তাই বলাবলি করি—কি রকম যে হবে; না যেন জিদ করেই তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে ফেললেন।"

মাধুরী কলিকাতায় আসিয়াছে; দেবদত্তই তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। সে আসিবে জানিয়া মালতী সেই দিন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। এখন সকলে এক সঙ্গে হইয়াছিল—আলোচনা চলিতেছিল। লজ্জাবতীর কথায় সায় দিয়া মালতী যাহা বলিতেছিল, তাহার মধ্যে যেন একটু তৃপ্তির আভাস ছিল। মালতীরও অজ্ঞাতে তাহার মনে মাধুরীর সম্বন্ধে একটু হিংসা স্থান পাইয়াছিল। রবীন্দ্র বেশ একটু "চালিয়াৎ" ছিল। সে বিষয়ে মনোজের প্রকৃতি আর তাহার প্রকৃতি যেন বিপরীত। মনোজ যেমন স্বল্পভাষী ও মিষ্টভাষী তেমনই বিনয়বশে আপনাকে সর্ব্বদাই "গেরস্থ" বলিয়া মনে করিত ও পরিচয় দিত। আর রবীন্দ্র অকারণে আপনার ও আপনার দাদাদের চাকরীর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসটা কথায় গর্ব্বের ভাবে ফুটাইয়া তুলিত। এই গর্ব্বভাবের কথায় মনোজ এক দিন মাধবীকে বলিয়াছিল, "আমরা 'গেরস্থ'—কোন রকমে দিন চলে গেলেই মনে করি—এই যথেষ্ট। চাকরীও ত পদ্মপত্রে জল। আমাদের দেশে চাকরীকে লোক কখন বড় বলে মনে করে নি। রাজসরকারে চাকরীইত সব চেয়ে বড় চাকরী—তার সম্বন্ধে কথা—

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ,
রাজসেবা কত খটমট।'

গল্প আছে—বর্ষার রাত্রি—মেঘে অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে; সেই সময় রাজকাজে জরুরী তলবে গৌড়ের রাজমন্ত্রীকে প্রাসাদে যেতে হ'ল। তখন মেথর ও তার স্ত্রী কুঁড়ে ঘরে ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়েছে। পথে জলে পায়ের শব্দ শুনে মেথর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'বল, দেখি—কে যায়?' মেথরাণী উত্তর দিল, 'কুকুর'। মেথর হেসে বললে 'দূর! কুকুর কি কখন এই দুর্য্যোগে বেরোয়? ও চাকর।"

রবীন্দ্রনাথ যে শুনিত, দেবদত্ত বড় জমিদার, ধনী, সত্য সত্যই তাহার হস্তিশালায় হাতী আছে—ইহাতে তাহার সঙ্কীর্ণ চিত্তে হিংসার উদয় হইত। তাহারই অভিব্যক্তি তাহার স্ত্রীর হৃদয়েও সংক্রমিত হইয়াছিল। মালতীর কথায় সেই ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মাধবী লজ্জাবতীর ও মালতীর কথা শুনিল—বুঝিল, এ আলোচনা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া ভাল নহে; কারণ, মাধুরীর মনে যদি শ্বশুরবাড়ীর উপর বিরুদ্ধভাব স্থান পায়, তবে ভবিষ্যতে কেবল যে তাহার সংসারে অশান্তির উদ্ভব হইবে, তাহাই নহে; পরন্তু সে আপনিও অসুখী হইবে। তাই মাধবী বলিল, "কেন, মালতী, মা ত খুব ভাল বিবেচনার কাযই করেছেন! ধনে, মানে, রূপে, বিদ্যায়—কিসে দেবদত্ত মন্দ?

মালতী বলিল, "সে কি, দিদি—আমি কি দেবদত্তের নিন্দা করছি? পাড়াগাঁর কথা হচ্ছে—আমরা সহরে হয়েছি ও রয়েছি, আমাদের চালচলন একটু আলাদা রকম হয়ে গিয়েছে। তাই পাড়াগাঁর লোকের সঙ্গে

একটু তফাৎ হয়। সেখানে এখনও তেলের বাতি,—এখানে ইলেকট্রিক লাইট; সেখানে বাঁশবাগানে—পানাপুকুরে সেকাল এখনও দাঁড়াবার স্থান পেয়েছে।"

লিজী হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ সেখানে আজও 'পতি পরম গুরু' পাঠ মুখস্থ করতে হয়।"

মাধবী বলিল, "কিন্তু কোন্‌টা ভাল, তা' ঠিক বলা যায় না, মালতী। তা'র পর দেখ, এই সহর কলকাতা-তেই তুমিও যে-বাড়ীর মেয়ে, আমিও সেই বাড়ীর—আমি বড়; আমাদের দু' বোনেরই শ্বশুরবাড়ী এখানে—অর্থাৎ আমার দাদাশ্বশুর পাড়াগাঁ থেকে এসে এখানে বাড়ী করেছিলেন, তোমার শ্বশুর চাকরী শেষ ক'রে এখানে এসে বাস করেছিলেন। অথচ তোমার মনে হয়, আমার বাড়ীর চাল চলন সেকেলে; আমি ভাবি, তোমরা খুব একেলে। কাজেই ও কথা কিছু নয়। দেখলে ত, আমাদের মা সে-কালের লোকের মত বাণপ্রস্থে গেলেন?"

"না, দিদি। দেখলেত, এই কি কাণ্ডটা হ'ল?"

"কেন—কলকাতায়ই কি কোন বাড়ীতে পূজায় বলি হয় না? কালীঘাটে কি হয়? আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা নাই—আমাদের বাপের বাড়ীতে বৈষ্ণবমন্ত্র. কাযেই পূজা থাকলেও বলি হ'ত না। আমরা বলি দেখি নি, তাই মাধুরী সহ্য করতে পারে নি।"

"কিন্তু কি বীভৎস ব্যাপার—পাঁঠাকাটা!"—বলিয়া লিজী মুখের ও চক্ষুর এমন ভাব করিল যে, সে যেন কোন বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

মাধবী স্বভাবতঃ ধীর—কাহাকেও ব্যথা দিয়া কোন কথা বলিতে চাহে না। সেই ভাব অনুশীলনে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে এতক্ষণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিতেছিল—যে তরবারের খেলায় পটু, সে যেমন যতক্ষণ পারে প্রতিপক্ষকে আঘাত না করিয়া অস্ত্রখানি ঘুরাইয়া খেলা করে, তেমনই ভাবে আলোচনা করিতে-ছিল। এইবার সে বলিল, "কিন্তু যা'রা মাছ মাংস খায়, তা'দের কি ওকথা বলা চলে?"

"কেন?"

"পাঁঠাকাটা দেখলে যদি মনে করি—কি নিষ্ঠুরতা, কি বর্ব্বরতা, তবে সেই কাটা জীবের মাংস পরম পরিতোষ সহকারে পেটে পুরি কেমন ক'রে? আবার যা'রা মুসলমান বাবুর্চ্চীর রান্নাই ভালবাসে তা'দেরত আরও চমৎকার। সে আবার এক কোপে কাটা নয়—আড়াই পোঁচে জবাই করা।"

লিজী বলিল, "সে ত আর কেউ দেখতে যায় না।"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখতে যায় না বটে, কিন্তু ভাবতে কি পারে না? আর মাছ? সে ত বাড়ীতে চোখের সামনেই দেখা যায়, কেমন ক'রে জিয়ন্ত জীবকে মারা হয়! কৈ মাছের সম্বন্ধে ত কথাই আছে—যে ধরে, যে বেচে, যে কুটে, যে রাঁধে—মাছ সকলকে চিনতে পারে—পারে না কেবল, যে খায় তাকে। সকলে সব দেখতে পারে না। সইতে পারে না।"

লিজী দেখিল, যুক্তিতে সে মাধবীর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না; সে বলিল, "কিন্তু আপনি যাই বলুন না কেন, পাড়াগাঁয় আর সহরে অনেক তফাৎ।"

"সে ত বটেই; মানুষে মানুষে, তোমাতে আমাতে প্রভেদ। কিন্তু পাড়াগাঁর অপরাধ কি? আমাদের দেশে সহর অল্পদিনের ও অল্প। কাজের জন্য লোককে সহরে থাকতে হয়; কিন্তু যা'দের সে দরকার নেই বা যা'দের কাজই পাড়াগাঁয়—প্রজাদের মধ্যে, তা'রা যদি পাড়াগাঁ ছেড়ে অকারণে সহরে আসে, তবে সে ত তা'দের কর্ত্তব্য ছেড়ে পালিয়ে আসা। যা'র যেটা কর্ম্মক্ষেত্র।"

মালতী ও লজ্জাবতী বুঝিল, মাধবীর মত তাহাদিগের মতের অনুকূল হইবে না।

মাধবী বলিল, "আমাদের যে সব প্রথা আছে, সে সব বিশেষ কারণেই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। সে দিন আমি তোমাদের জামাইবাবুর কাছে বলির নিন্দা করেছিলাম। তা'তে তিনি বল্লেন, বলি যে নিষ্ঠুর, তা'তে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে যখন পশুবলির চলন হয়েছিল, তখন সংগ্রামের কাল—মানুষকে

রক্তপাতে অভ্যস্ত করাই তখন মানুষের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল। এখনও যে পৃথিবীতে যুদ্ধ হয় না, এমন নয়। মানুষ যদি রক্ত দেখলে মূর্চ্ছা যায়, তবে তা'র পক্ষে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা দুঃসাধ্য হয়। জিনিষটা যে খুব মনোরম, তা' নয়; কিন্তু বলিদান যা'রা বর্ব্বরতার নিদর্শন ব'লে নিন্দা করে, সেই য়ুরোপীয়রা পাখী থেকে হাতী পর্য্যন্ত শিকার ক'রে পরম আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করে কেমন ক'রে?"

মাধবী এই কথা বলিতে আরম্ভ করিবার সময় প্রমথ-নাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সে, সব শুনিয়া, বলিল, "কথাটা ঠিক। মনোজের যুক্তি এমন তীক্ষ্ণ যে, তা'র সঙ্গে কোন কথার আলোচনা করলে অনেক শিক্ষা হয়।"

স্বামীর সম্বন্ধে ভ্রাতার এই উক্তিতে মাধবী যে আনন্দানুভব করিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ করিল না; বলিল, "উনি কোন প্রথার বা কোন মানুষের নিন্দা চট্ করে' করতে চা'ন না; বলেন, অনেক জিনিষ আমরা তলিয়ে বুঝতে পারি না ব'লে ভুল বুঝি।"

মালতী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লজ্জাবতীর দিকে চাহিয়া একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "কেবল এ কালের চাল-চলন তিনি ভাল দেখেন না।"

"তাই কি? একালে জন্মে কে এ কালকে মন্দ দেখতে পারে? মা'র কোলে শুয়ে ছেলে কি মা'কে মন্দ ভাবতে পারে? তা' নয়। উনি বলেন, প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য আছে—সে তার প্রাকৃতিক অবস্থার, শিক্ষার, সভ্যতার ফল—তা' তা'র প্রকৃতিগত হয়ে আছে; সেটাকে আবর্জ্জনা মনে ক'রে ত্যাগ করে', অন্য কারণে অন্য জাতির যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হয়েছে তা'র অনুকরণ করতে যাওয়া মস্ত ভুল—তা'তে ভালত হয়ই না, বরং পদে পদে মন্দ হ'বার সম্ভাবনা থাকে।"

প্রমথনাথ বলিল, "একালের লোক সেকালকে যে ভাল মনে করে, তা'র কারণ, সেকাল দূরত্বের রঙ্গিণ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখ্‌তে হয়। মনোজ এ কালকে অস্বীকার করে না—সে সে-কালকে তা'র প্রাপ্য দেয়।"

তাহার পর প্রমথনাথ বলিল, "এতদিন পরে সব এক সঙ্গে হয়েছিস, আজ সব এখানে থাক্ না কেন?"

মাধবী বলিল, "আমি ত কিছু বলে আসি নি।"

মালতী বলিল, "আমারও তা'ই।"

প্রমথনাথ বলিল, "চল, সব গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি; আসবার সময় মাধবীর বাড়ীতে নেমে মা'কে ব'লে আসব; মালতীর বাড়ীতে আমি ফোন করে দিচ্ছি। দেবদত্তকে এখানেই থাকতে বল্লুম, সে রাজি হ'ল না।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"বল্লে, কাল আসবে। মনে করছি, কাল সকলকে খেতে বলব।"

প্রমথনাথ ফোন করিতে গেল; ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মালতী, তোমার ছুটী রাত্তির দশটা অবধি। রবিন কোথায় বাগান পার্টিতে যা'বে—ফেরবার পথে তোমায় তুলে নিয়ে যা'বে; কাল তোমাকে নিয়ে সন্ধ্যার পর আসবে।"

অপরাহ্ণে প্রমথনাথ সকলকে তাগাদা দিল—"শীগগির ঠিক হয়ে নাও—বেড়াতে যেতে হ'বে।"

সে তিন ভগিনীকে, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগকে ও স্ত্রীকে লইয়া মোটর হাঁকাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল—সোজাপথে সহর ছাড়াইয়া গড়ের মাঠের মধ্যদিয়া গঙ্গার ধারের রাস্তায় পড়িল। তখন সূর্য্যাস্ত হয়-হয়। সে পথে তখন যানের শ্রেণী চলিয়াছে। পথের এক দিকে মাঠের সবুজ বিস্তার; আর এক দিকে গঙ্গা—তাহার জল মলিন, সেই জলে তরণীর পর তরণী—চিমনি হইতে ধূম বাহির হইয়া আকাশ ও বাতাস মলিন করিতেছে—পরপারে মলিন আকাশের পটে বর্ণরঞ্জনের চেষ্টা করিয়া সূর্য্য ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। প্রমথনাথ বলিল, "সূর্য্যাস্ত দেখতে হয় ত মাধুরীর শ্বশুর বাড়ীর দেশে যেতে হয়।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"খোলা মাঠের উপর নীল আকাশ—তা'তে না আছে ধূলা, না আছে ধোঁয়া—সেই মাঠের পরে—নদীর পরপারে সূর্য্যাস্ত; আকাশে রঙ্গের কি খেলা! সমুদ্রে

সূর্য্যাস্ত একরকম—বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে মাঠের পারে সূর্য্যাস্ত আর এক রকম। সে না দেখলে কল্পনা করাও যায় না। আমি সে যা দেখেছি, তা' কখন ভুলতে পারব না।"

মালতী হাসিয়া বলিল, "দাদা একেবারে কবি হয়ে উঠেছে।"

"যা' বলেছিস। সে কবির দেশই বটে।"

ফিরিবার পথে গাড়ী মাধবীর বাড়ীতে গেল। সে বাড়ীতে প্রমথনাথের গতায়াত বাড়ীর ছেলের মতই ছিল; মাধবী যেমন তাহাকে "দাদা" বলিত, মাধবীর মা'ও তাহাকে তেমনই "দাদা" বলিতেন। প্রমথনাথ "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। মাধবীর শাশুড়ী তখন "সন্ধ্যা" করিতে যাইতেছিলেন, প্রমথনাথের গলা শুনিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমথনাথ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, মাধবীকে এনেছি কিন্তু আবার নিয়ে যা'ব।"

মা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল?"

"কিছু না—মাধুরী এতদিন পরে এসেছে, তাই ওদের আজ থাকতে বলছি।"

ততক্ষণে মালতী, মাধুরী ও লজ্জাবতীও আসিয়া পৌছিয়াছে। সকলে মা'কে প্রণাম করিল; মা আশীর্ব্বাদ করিয়া মাধবীকে বলিলেন, "বৌমা, কিছু খাবার দাও।"

মালতী বলিল, "সে হ'বে না—আমরা একদিন এসে ভাল ক'রে খেয়ে যা'ব।"

"সে ত যেদিন ইচ্ছা, এলেই হয়; বোনের বাড়ী—পরের ত নয়। কিন্তু তাই বলে' মনে করো না, আজ 'মিষ্টিমুখ' না করে' যেতে পারবে।"

বাড়ীতে কেহ আসিলে তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া মা যে যাইতে দেন না, তাহা সকলের জানা ছিল; তাই কেহ আর কোন আপত্তি করিল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া সকলে বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। দুই দিন পরে প্রমথনাথ মাধুরীকে লইয়া মা'র কাছে পুরীতে যাইবে। সে মাধবীকে ও মালতীকেও যাইতে বলিয়াছিল; তাহা হইলে লজ্জাবতীও যাইবে এবং সে-ও কয় দিন থাকিয়া আসিবে। মাধবী যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে দোটানায় পড়িয়াছিল; একদিকে মাকে দেখিবার বলবতী বাসনা, আর এক দিকে সংসার। সে জানিত, সে যাইলে শাশুড়ীরই কাজ বাড়িয়া যায়। যদিও শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, "যদি ইচ্ছা হয় দিন কয়েক মা'কে দেখে এস। এর পর, আমি অথর্ব্ব হয়ে পড়লে, আর নড়তেই পারবে না"—তবুও শাশুড়ীকে কোনরূপ অসুবিধায় ফেলিতে তাহার বড় অনিচ্ছা ছিল। মালতী বলিয়াছিল, সে যাইবে। সে যাইবে জানিয়া লজ্জাবতীও যাইতে চাহিয়াছিল—নহিলে সে কি করিত বলা যায় না। মাধবী সেদিনও বলিল, "আমি যেতে পারব কি না, কাল ঠিক করে জানাব।"

লজ্জাবতী বলিল, "আজই ঠিক করে' ফেলুন।"

মাধবী একটু মৃদু হাসিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া মালতী নির্ব্বাক হইয়া গেল—দিদির মুখের সঙ্গে মা'র মুখের এত সাদৃশ্য সে আর কখন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই আহার শেষ হইয়া গেল। মা'র সময় হইতে এ বাড়ীর নিয়ম, মেয়েদের লইতে লোক বা গাড়ী আসিলে তাহাকে যেন অকারণে অপেক্ষা করিতে না হয়। মা বলিতেন, "সকলেরই কায আছে; এক জনের জন্য পাঁচ জনের কাযের অসুবিধা হ'লে পাঁচজন বিরক্ত হয়।" দশটার সময় পার্টীর ফেরৎ রবীন্দ্রনাথ আসিয়া মালতীকে লইয়া যাইবে, কথা ছিল; তদনুসারে মালতী প্রস্তুত হইয়াছিল। আর সকলেও রবীন্দ্রনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দশটা বাজিয়া গেল—ক্রমে এগারটা বাজিল; রবীন্দ্রনাথ আসিল না। প্রমথনাথ বলিল, "এযে বড্ড দেরী হচ্ছে! ফোন ক'রে দেখবি?"

মালতী ফোন করিয়া ফিরিয়া আসিল; তাহার মুখ বড় গম্ভীর। মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর মালতী?"

মালতী উত্তর দিল, "আসতে পারে নি; নিতে ঝি আসছে।"

প্রমথনাথ বলিল, "সে কি? আমায় ফোন করলেই আমি দিয়ে আসতাম; না হয়, আজ থাকতিস। রাত দুপুরে ঝি আসছে! ব্যাপারটা কি?"

মালতী কিছু বলিল না।

প্রমথনাথ বলিল, "না হয়, চল; আমি পৌছে দিয়ে আসি।"

মালতী বলিল, "ঝি আসছে, আসুক।"

একটা কেমন অপ্রসন্ন ভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—যেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশে সহসা অকাল জলদোদয় হইল।

ঝি আসিয়া পৌছিল; বলিল "চল, বৌদিদি।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবি এল না কেন?"

ঝি সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মালতী বলিল, "গাড়ী এসেছে ত?"

ঝি বলিল, "না।"

গাড়ীর প্রাচুর্য্য যাহাদিগের থাকে না, তাহারা "ঘরের গাড়ীর" অধিকারটা জানাইতে ব্যস্ত হয়। মালতী বলিল, "কেন?"

ঝি তাহাকে বলিল, "বৌদিদি, এদিকে এস।"

মালতী বিরক্তভাবে বলিল, "তোমার সঙ্গে কি পরামর্শ করতে হ'বে?" বলিতে বলিতে সে বারান্দায় গেল; তথায় ঝি বলিল, "দাদাবাবুরা ফিরেছে—টল্‌তে টল্‌তে,—বমী করে পোষাক, গাড়ী সব ভাসিয়ে দিয়েছে।"

ঝির কথা মাধবী শুনিতে পাইল।

মালতী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রমথনাথ সঙ্গে যাইবে বলিলে সে আপত্তি করিল। কিন্তু প্রমথনাথ তাহার কথা শুনিল না।

মালতীকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া প্রমথনাথ দেখিল, মাধুরী ঘুমাইয়াছে, মাধবী বসিয়া আছে। সে মাধবীকে কোন কথা বলিল না; মাধবীও কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না।

ক্রমশঃ

প্রশ্ন

শ্রীবাণী গুপ্ত

জীবনের পথখানি সবটুকু দুর্গম কঠিন?
সত্য, তাই পথ জীবনের।
সমস্ত জীবন ধরি চলিতে হইবে কিগো?
তাই কাজ সারা জনমের।

আছে কি সন্ধ্যার ছায়ে এতটুকু বিশ্রামের ঠাঁই?
আছে বন্ধু, জীবন-সন্ধ্যায়।
আঁধারের মায়া যদি ভুলাইয়া দেয় সেই স্থান?
ভুলিবার স্থান তাহা নয়।

হেরিব কি তথা আমি আরো পথশ্রান্ত কেহ?
বন্ধু! যারা গেছে পূর্ব্ব সাঁঝে।
দাঁড়াতে কি হবে দ্বারে, বলিতে কি হবে খোল দ্বার?
তারা ডেকে লবে তোমা কাছে।

লভিব কি শান্তি সেথা, ক্লান্ত এই জীবনের পরে?
তৃপ্তি পাবে সবখানি দুখ।
আছে কি সবার তরে এই বিশ্রামের স্থান?
আছে সখা! পরমেশ-বুক।

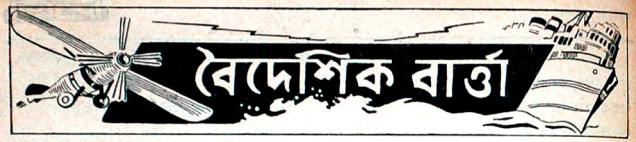

শ্রীপ্রমোদ সেন

যুদ্ধ বাধ্‌ল

ইটালী ও আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ বেধেছে। এটা এক রকম জানাশোনা যুদ্ধ, গত জানুয়ারী মাস থেকেই এক রকম বোঝা গিয়েছিল যুদ্ধ বাধবেই, কারণ যুদ্ধ না করলে মুসোলিনির ফাসিস্ত বাহিনীর বীরত্ব পরীক্ষা হবে কি করে'? মুসোলিনি যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের বিজয়-অভিযানের পর সারা জাতিটার কানে যুদ্ধের মন্ত্র দিচ্ছিলেন, আর ইটালীকে রোমক গৌরবের স্বপ্ন দেখিয়ে বোঝাচ্ছিলেন যে, সর্ব্বস্ব পণ না করলে বৃহত্তর ইটালী গড়ে উঠবে না। ১৯২৪ কি ২৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই মুসোলিনী সুর তুলেছিলেন সূর্য্যের নীচে ইটালীর স্থান চাই। ইয়োরোপের পাণ্ডা শক্তিগুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য আছে—ইটালীর কেন থাকবে না! রোমক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ভূমধ্য সাগরের তিন কূল দিয়ে, মুসোলিনি ঠিক কর্‌লেন আবার ঐ অঞ্চলে গিয়ে ইটালীর লীলাখেলা দেখাতে হবে।

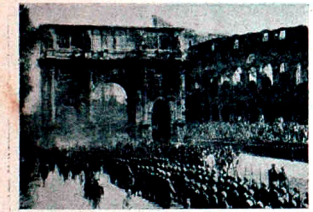

প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের স্মৃতি কনষ্ট্যানটাইন তোরণে—মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট বাহিনী। মুসোলিনি রোমক-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর।

মুসোলিনির আগেই ইটালী অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দুর্ব্বল তুরস্কের কাছ থেকে এক থাবা মেরে উত্তর আফ্রিকার ত্রিপোলি দেশ ইটালী ছিনিয়ে নিয়েছিল। বিগত মহাযুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ইটালীর বেশ ভাল রকমই লাভ হ'ল। ইটালী পেলে অষ্ট্রিয়ার বেশ খানিক অংশ। ভিনিসের কাছাকাছি অষ্ট্রিয়ার ট্রিষ্টে বন্দর এলো ইটালীর হাতে। তা'রপর ইটালী ওৎ পাতল যুগোশ্লাভিয়ার নব বিজিত খানিকটা অংশের ওপর। বীর কবি ডানানৎসিও ছোঁ মারলেন ফিউমে বন্দরের ওপর। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স রা রা ক'রে উঠল, কাজেই সেবার গেল মস্ত একটা দাঁও ফস্কে।

তারপর ইটালী, মুসোলিনীর জয়যাত্রার পরেই, গ্রীসের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধালে। মনে হ'ল যুদ্ধ বাধল বুঝি। কিন্তু আবার বৃটেন ও ফ্রান্স বাদ সাধ্‌ল। ইটালী গুমরিয়ে মরতে লাগল। এরপর ইটালী তুরস্কের ওপর নজর দিয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নয়, কারণ সেখানে কামাল পাশা 'দিচ্ছে হানা'—আর গ্রীকদের এশিয়া মাইনর থেকে পাততাড়ি গোটানর ব্যাপার ইটালীর চোখের সামনেই হয়েছিল। কাজেই ইটালী পূবদেশে 'কালচার' বিস্তার করতে আরম্ভ করলে এবং এই 'কালচারের' ঢেউ মিশর পর্য্যন্ত এসে পৌছেছিল। ওখানে স্কুল কলেজ খুলে ইটালী নয়া রোমক সভ্যতা প্রচারের চেষ্টায় ছিল। একবার এই 'কালচার' নিয়ে মাল্টাদ্বীপে ইটালির বৃটেনের সঙ্গে এক দফা হ'য়ে গেছে। এবার তাই ইটালীর বেচাল ভাব দেখেই বৃটেন আগে ভাগেই যুদ্ধ জাহাজগুলো মোতায়েন করেছে।

এরপর ইটালীর লীলাখেলা আরম্ভ হ'ল ইয়ুরোপে। প্রথম রেশারেশি চল্‌ছিল যুগোশ্লাভিয়া ও তার মুরুব্বি ফ্রান্সের সঙ্গে। তারপর হ'ল জার্ম্মানীতে নাৎসি-অভ্যুদয় এবং নাৎসিরা অষ্ট্রিয়া গ্রাস করবে বলে বড়ই নাচানাচি

আরম্ভ করল। ইটালী সেই সুযোগে অষ্ট্রিয়ার মুরুব্বি সেজে বস্‌ল। এদিকে আবার নাৎসিদের দাপটে জার্ম্মানী যেই চাঙ্গা হ'য়ে উঠল, অম্‌নি ফ্রান্সের হ'ল বড্ড ভয়। ফ্রান্স ভাবলে ইটালী ও জার্ম্মানী দুটোকে ঠেকান যাবে না। কাজেই ফ্রান্স অষ্ট্রিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মোড়লী দিলে ইটালীর হাতে সঁপে। যুগোশ্লাভিয়া দেখলে মুরুব্বি যখন বিগড়েছে তখন আর শক্তিমান্ প্রতিবেশীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে লাভ কি। সেও ইটালীর সঙ্গে কোলাকুলি করলে। গত বছর অক্টোবর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেক্‌জাণ্ডারের হত্যার পর জাতি-সঙ্ঘে একদিকে ইটালী ও হাঙ্গেরী ও আর একদিকে ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়ায় বেশ ঠোকাঠুকি চলেছিল। তা'রপরেই ফ্রান্স হ'ল ইটালীর এমন বন্ধু যে, আজও জাতিসঙ্ঘে নিন্দিত হ'লেও ফ্রান্সের প্রাণটা আন্‌চান্ করছে। জাতিসঙ্ঘ ইটালীকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু ফ্রান্স বল্‌ছে যে ইটালীর প্রাণে বেশী দাগা দিও না।

কাহিনীটা একটু বড়ই হচ্ছে, কাজেই আবিসিনিয়া-পর্ব্বে আসা যাক্। মুসোলিনি মেরে গুঁতিয়ে জাতটা চাঙ্গা ক'রেই দেখলেন কবে কোথায় ইটালীর কি অপমান হয়েছে। দেখা গেল যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার আডোয়া নামক যুদ্ধে ধলা আদ্‌মিদের মেরে কালা হাবসীরা ভূত ভাগিয়েছিল। রণক্ষেত্রে ইটালীর দলকে হাজার মৃত সৈন্য রেখে আস্‌তে হয়েছিল। মুসোলিনি বল্‌লেন আডোয়ার প্রতিশোধ চাই—। অবশ্য মুসোলিনির এই অপমানজ্ঞানটা হালেই হয়েছে, কারণ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়া যখন জাতিসঙ্ঘে আসন পেতে চায় তখন মুসোলিনির চেলা আবিসিনিয়ার সব দোষ ঢেকে তা'কে সানন্দে আবাহন করেছিল। তখন বরং বৃটেনের তরফ থেকে কিছু আপত্তি হয়েছিল, কারণ বৃটেন ত' এর আগে আবিসিনিয়ার সঙ্গে বুঝেছে। বৃটেন অনুযোগ করেছিল আবিসিনিয়ায় দাসত্বপ্রথা আছে, ইত্যাদি। তখন ইটালীর প্রতিনিধি অতীব মহানুভবতা দেখিয়ে বলেছিল ও বেশী কিছু দোষ নয়, ও সেরে যাবে। কিন্তু আজ মুসোলিনি ও জেনেভায় তার চর ব্যারণ আলোয়াজি কেবলই চেঁচাচ্ছে যে, আবিসিনিয়া সঙ্ঘে থাকার যোগ্য নয়, কাজেই সঙ্ঘ আবিসিনিয়া সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করবে ইটালী তা মান্‌বে না। আবিসিনিয়া যেন এখন হয়েছে ইটালীর খাস-মহলের প্রজা, কাজেই তা'কে মেরে গুঁতিয়ে যা কিছু করার অধিকারের দাবী মুসোলিনি কর্‌ছে।

সেদিন জাতিসঙ্ঘ বল্‌লে (সকলেই একমত হয়ে বল্‌লে) যে ইটালীই আগে আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। কিন্তু তা'র ক'দিন পরেই রোম থেকে জাহির করা হ'ল যুদ্ধ আরম্ভ করেছে কে? যুদ্ধ ত' ঘোষণাই করা হয় নি। ও-দিকে কিন্তু ইটালীর সেনাপতি এরিত্রিয়া উপনিবেশের রাজধানীতে ৪ঠা অক্টোবর ঘোষণা করেছিলেন যে পামর আবিসিনীয়দের সাজা দেবার জন্যেই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছে। রোম এখন বেগতিক দেখে সুর ধরেছে যুদ্ধ- ত' আরম্ভ করা হয় নি, বেয়াড়া আবিসিনীয় জাতিদের গোলাগুলি মেরে, বিষবাষ্পে শ্বাস রোধ করে সাজা দেওয়া হচ্ছে। এর পরে আবিসিনিয়া দখল হ'লে রোম থেকে বোধহয় বলা হবে, আবিসিনিয়া আবার কবে স্বাধীন ছিল, চিরকালই ত' এ ইটালীর উপনিবেশ! যুদ্ধের চমৎকার কাহিনীও রোম থেকে পাওয়া যাচ্ছে। আবিসিনীয়রা নাকি যুদ্ধ কর্‌ছে না, তা'রা দলে দলে ইটালীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে, আর তাদের প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে! কারণ চল্লিশ বছর আগে তা'রা ইটালীর সুশাসনের যে মহিমা দেখেছিল তা এখনও ভুলতে পারেনি।

আবার যখন আডোয়া বিজয় হয়েছিল তখন (৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায়) রোমে আনন্দের লহরী খেলেছিল; ইটালীর কাগজগুলোয় মোটা মোটা হরফে বেরিয়েছিল "আডোয়ার প্রতিশোধ"। এখন আবার শুন্‌ছি যে আবিসিনিয়া বিনাযুদ্ধেই আডোয়া দিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আবিসিনীয় সম্রাটের জামাতা হাজার হাজার অনুচর নিয়ে ইটালীর দলে ভিড়ে

পড়েছে। মুসোলিনির জামাতা বহুদিন আফ্রিকায় বিচরণ করছেন। যুদ্ধের ঠিক আগেই একবার তিনি ইটালীতে ফিরে বেতারযোগে আমেরিকায় আবিসিনিয়ার দারুণ বর্ব্বরতা সম্বন্ধে মুখরোচক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেই তাঁর জোর বরাতের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নাকি এরোপ্লেনে উড়্‌ছিলেন এবং সেই সময় শত্রুপক্ষ বিমানপোত লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে—কিন্তু জামাতা বাবাজীর কেশও কম্পিত হয়নি। আশা করা যায় এবার এই বলবান জামাতার সঙ্গে আবিসিনীয় সম্রাটের বিশ্বস্ত জামাতার কোলাকুলি হবে।

পর্ব্বতের মুষিক প্রসব

যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ থেকে বেশ আজ্‌গুবি খবর আস্‌ছে। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, ইটালী যত সহজে কেল্লামাৎ করবে মনে করেছিল তা' হবে না। শুনে আস্‌ছি জানুয়ারী মাস থেকে এপর্য্যন্ত দু লাখের উপর ইটালীয় সৈন্য এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে গেছে এবং তাদের সঙ্গে আছে অসংখ্য কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আর আজকালকার ফ্যাসন-দুরস্ত বিমানপোত প্রভৃতি সরঞ্জাম। মনে হয়েছিল দু'দিনের মধ্যে ইটালী তোপের মুখে আবিসিনিয়াকে উড়িয়ে দেবে। এখন দেখ্‌ছি একদিকে আবিসিনীয়রা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছে এবং জায়গায় জায়গায় ইটালীয়দের নাজেহাল করছে, এমন কি তাদের উপনিবেশে ঢুকে পড়ছে, আর একদিকে ইটালীয়রা ত' ভাল করে অগ্রসর হ'তে পারছে না, পরন্তু যেন খানিকটা ঘাব্‌ড়ে গেছে। অবশ্য হয়ত খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলছে, কারণ আবিসিনিয়া দেশটা ত' সুবিধের নয়, মরু, পাহাড়, পর্ব্বত, জঙ্গল প্রভৃতিতে সমাচ্ছন্ন—আধুনিক যুদ্ধ চালানও শক্ত। কাজেই ইটালী আকাশ থেকে বোমা ফেলে অসহায় লোকগুলিকে কোতল করছে।

জাতিসঙ্ঘ ইটালীর নিন্দা করেছে, কিছু মৃদু সাজা দেবারও ব্যবস্থা করেছে, এবং শস্ত্ররপ্তানীর অনুমতি দিয়ে আবিসিনিয়ার কিছু সুবিধে করেছে। আবিসিনিয়দের সৈন্যসংখ্যা মন্দ নয়, কিন্তু আধুনিক শস্ত্রাদি খুব কম। এবার যদি অবাধে শস্ত্র পায় তা হ'লে আবিসিনিয়া লড়াইয়ের মত লড়াই করবে মনে হয়। জাতিসঙ্ঘের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। সকলে ভেবেছিল ইটালীকে আরও নানাভাবে জব্দ করার চেষ্টা হবে,

আবিসিনীয় বাহিনীর সৈন্যরা কলের কামান নিয়ে কুচকাওয়াজ করছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আবিসিনিয়ার খুব কম আছে, কিন্তু এখন জাতিসঙ্ঘের বিধানে শস্ত্র পাবার সুযোগ হয়েছে।

যেমন তার বন্দরগুলো অবরোধ করা হবে, সুয়েজ খাল দিয়ে তার জাহাজগুলোর যাতায়াত বন্ধ করা হবে, ইত্যাদি। ভূমধ্যসাগরে ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজগুলোর মহলা এবং জিব্রাল্টার, মাল্টা, আলেকজাণ্ড্রিয়া ও এডেন বন্দরে তোড়যোড় দেখে মনে হয়েছিল যে, বেশ ভাল রকম একটা কিছু পাকবে। মুসোলিনিও হাঁক দিয়ে বলেছিলেন যে, ইটালীও তার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সঙ্ঘের কার্য্যকরী ব্যবস্থা 'হোমিওপ্যাথিক ডোজেই' হবে। তাকে ইটালী থোড়াই কেয়ার করে—সে কথা ইটালীর কাগজগুলো জোর গলায় বলেছে।

কিন্তু সঙ্ঘের যে দু নৌকোয় পা—এক নৌকো বৃটেনের আর এক নৌকো ফ্রান্সের। ফ্রান্স ও বৃটেন এ পর্য্যন্ত একমত হয়েছে বলেই সঙ্ঘ এতদূর এগুতে পেরেছে, নয়ত এতদিনে সঙ্ঘের আদ্যশ্রাদ্ধ হ'ত। ফ্রান্সের ইটালীর ওপর দরদের কথা আগেই বলেছি। ফ্রান্স সোজাসুজি ইটালীর বিরুদ্ধে যেতে চায় না, কারণ

ফ্রান্স বোঝে একা জার্ম্মানী-রামে রক্ষা নেই, ও-দিকে ইটালী-সুগ্রীব দোসর। জার্ম্মানী আবিসিনিয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাক্‌বে বলেছে, কিন্তু এই সুযোগে ইটালীর সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ পাকাবে ভাল ক'রে। কারণ জার্ম্মানী ত আর জাতিসঙ্ঘের তোয়াক্কা রাখে না যে তার নির্দ্দেশ মান্‌বে। ও-দিকে আজকাল আবার বৃটেন একটু জার্ম্মানীকে তোয়াজ ক'রেই চলেছে, কি কারণে

মাল্টা দ্বীপের বন্দরে বৃটিশ রণতরী। বৃটেন মাল্টায় বেশ বড় রকমের নৌবহরের ঘাটি তৈরী করেছে, কারণ বৃটেনের বেশ আশঙ্কা আছে যে ইটালী সুবিধা পেলেই মাল্টার ওপর ছোঁ মারবে।

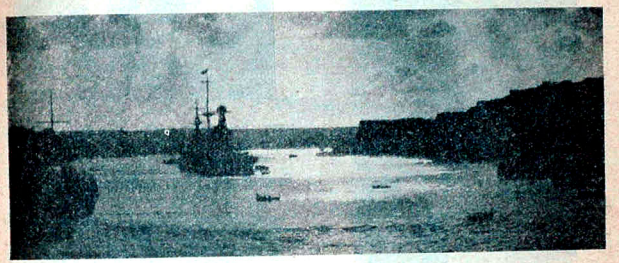

কে জানে। কাজেই বৃটেন ফ্রান্সকে কিছুতেই খোলাখুলি কথা দিচ্ছে না যে জার্ম্মানী যদি তাকে আক্রমণ করে তা হলে সে বিগত যুদ্ধের মত তাকে সাহায্য করবে। কাজেই ইয়ুরোপীয় শক্তিদের মধ্যে বেশ রাজনীতির মারপ্যাচ চলেছে, যদিও এ জিনিষটা নতুন নয়। ও-দিকে বৃটেন দেশরক্ষার জন্যে প্রাণপণে নানারকম ব্যবস্থা করছে, কার ভয়ে কে জানে।

কাজেই মাঝ থেকে আবিসিনিয়া বেচারী নাজেহাল হবে। পৃথিবীর বার জাত তাকে অস্ত্রশস্ত্র বেচ্‌বে, আর সে যুদ্ধ চালাবে। তারপর ইটালীর কতদূর দৌড় হবে তাই দেখে রক্ষার জন্যে কোন কোন কালনেমি ওৎপেতে বসে আছে—বুঝ সাধু যে জান সন্ধান। কিন্তু মোদ্দাৎ জাতিসঙ্ঘ ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে, অনেকটা শ্যামও রেখেছে কুলও বটে!

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

কালো-আলো দিয়ে অদৃশ্য লেখা পড়া হচ্ছে

বড় বড় ডাকাতের দল মানুষ চুরি ক'রে নিয়ে যায়, আর তার আত্মীয়দের কাছ থেকে বহু টাকা দাবী ক'রে গুপ্তলিপি পাঠায়। এ রকম খবর প্রায়ই কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ডাকাত ধরবার জন্যে আল্ট্রা ভায়োলেট্ রশ্মির সাহায্যে ডাকাতদের প্রেরিত চিঠি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই কালো আলো দ্বারা অদৃশ্য লেখা পরিষ্কার দেখা যায়। সেই অদৃশ্য লেখাদ্বারা ডাকাতদের সন্ধান পাওয়া আগের চেয়ে ঢের সহজ হয়েছে।

বঁড়শীতে বিজলী-বাতি

ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, ঝরণা-কলমের খোলের মত একটি খুব পাতলা কাঠের খোলের মধ্যে ব্যাটারি দিয়ে খুব ছোট ল্যাম্পে আলো জ্বেলে দেওয়া হচ্ছে। এই কাঠের খোলের সঙ্গে বঁড়শী লাগানো থাকে। এই আলোতে টোপটি বেশ

চকচক্ করে ব'লে রাত্রেও মাছ ধরতে নাকি ভারি সুবিধা হয়েছে।

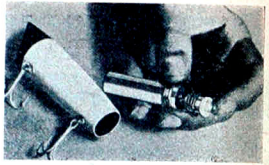

বিপরীত দিক থেকে দুটি ইঞ্জিনের সংঘর্ষ

আমেরিকা এক আজব দেশ। যত রাজ্যের আজগুবি খেয়াল এই দেশের লোকের মাথায় আসে। ছুটো ইঞ্জিনে ঠোকাঠুকি লাগলে দেখতে কি রকম হয়, তার ব্যবস্থা সম্প্রতি হয়েছিল ইলিনয়িসে। দেখবার জন্যে হাজার হাজার লোক টিকিট কিনলে। যথাসময়ে দুই বিপরীত দিক থেকে দুটি খুব পুরাণো ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়েই চালকরা লাফিয়ে পড়লেন। পূর্ণবেগে এসে ভীষণ জোরে একটা আর একটার সঙ্গে লাগালে বিষম ঠোকাঠুকি। তখন যে কি ভীষণ দৃশ্য হ'ল তা' ছবি দেখেই বুঝতে পারবেন।

রোবো উড়ো জাহাজ

উড়ো জাহাজ বা গাড়ী চালাতে চালকের দরকার হয়, এতকাল লোকে তা-ই জান্‌ত; কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে উড়ো জাহাজ চালক না হ'লেও উড়তে পারে। এই চালকহীন উড়ো জাহাজের নামই রোবো। রোবো

ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ মাইল অবধি গিয়েও আবার ফিরে আসতে পারে। যুদ্ধের সময় এই উড়ো জাহাজ বড্ড বেশী কাজ দেবে বলে আশা করা যায়।

রোবো উড়ছে আর চালকরা নীচে দাঁড়িয়ে আছেন

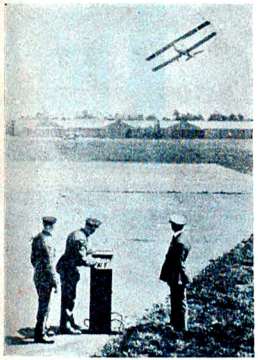

রোবো উড়ো জাহাজ পরিচালিত হচ্ছে রেডিও দ্বারা। এই ছবিখানাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রোবো উড়েছে, আর চালক নীচে থেকে চালাচ্ছে। আর ওপরের ডানদিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে চালক বোতাম টিপে রোবোর গতি নির্দ্দেশ করছেন।

মাদ্রিদের পার্কে পুস্তকাগার

স্পেন্ দেশের রাজধানী মাদ্রিদ সহরে খোলা পার্কেও পুস্তকাগার, পুস্তক রাখবার তাক ও কন্‌ক্রিটের তৈরি আলমারি আছে। তাকে তাকে নানারকমের বই সাজানো থাকে। পথচারীরা পার্কে গিয়ে, বিশ্রাম করতে করতে মনের মত বই প'ড়ে বেশ আনন্দলাভ করে। আমাদের দেশে এ রকম ব্যবস্থা কবে হবে?

বিশালকায় বৃক্ষখণ্ড

২০০ থেকে ৩০০ ফুট অবধি উঁচু এক একটা গাছ করাত দিয়ে কাটা হয়। করাত অবিশ্যি কলেই চলে। গাছের এই অত্যন্ত লম্বা এবং মোটা গুঁড়ি গুলোকে টুকরো টুকরো করা হয়। ছবি

দেখলেই বুঝতে পারা যায় এক একটা টুকরো কি রকম বিরাটকায়। ক্রেনে ক'রে এই টুকরোগুলি গাড়ীতে তোলা হয়। ছবিতে যে টুকরোগুলি দেখা যাচ্ছে তা অরেগণের ভীষণ বনের মাত্র দুটি গাছের সুদীর্ঘ দেহ কেটে পাওয়া গেছে।

শুষ্ক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে অগ্নি-নির্ব্বাণ

সাধারণতঃ জল দিয়েই লোকে আগুন নেবায়; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ শুকনো বস্তু দিয়েও আগুন নেবাবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। ছবিতে যে পিচকারীর মত যন্ত্রটি দেখা যাচ্ছে, তা থেকে এক রকমের শুষ্ক রাসায়নিক দ্রব্য বেরোয়, তাতেই আগুন নিভে যায়। এই রাসায়নিক বস্তু লাগলে অন্য বস্তুতে কোনও রকমের দাগ পড়ে না, কোনও জিনিসেরই কিছুমাত্র ক্ষতি করে না।

উজ্জ্বল জীবাণু দ্বারা আলো জ্বালা

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা সহরে বৈজ্ঞানিকগণ ফস্ফরাস যুক্ত জীবন্ত জীবাণু দিয়ে যে উজ্জ্বল বাতি সৃষ্টি করেছেন, তাকে জীবন্ত বাতি বলা যায়। পচা মাছে যে পোকা জন্মায়, তারই নানা প্রক্রিয়ার পর কাচের নলে পুরে এই উজ্জ্বল বাতির সৃষ্টি হয়েছে। বারুদের কারখানায় আগুনের শিখা বা বিদ্যুৎ অনেক সময়ে বিষম বিপদের কারণ হ'য়ে ওঠে। নূতন আবিষ্কৃত এই জীবন্ত উজ্জ্বল বাতিতে কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না।

বৈদ্যুতিক দস্তানা প'রে পুলিশ দাঙ্গা দমন কচ্ছে

নিউ ইয়র্কের পুলিশ বৈদ্যুতিক দস্তানা হাতে প'রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাবার ব্যবস্থা কচ্ছে। কোমরের সঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ব্যাটারী বাঁধা আছে, আর সেই ব্যাটারি থেকে একটি তার দস্তানার ভেতরে এমন ভাবে চ'লে গেছে যে, দাঙ্গার সময় পুলিশ দাঙ্গাকারীর দেহে যেমনি দস্তানাটি ঠেকায়, অমনি তার দেহে লাগে বিদ্যুতের জোর ধাক্কা, আর তার দেহও হ'য়ে পড়ে

একেবারে অবশ। এই অবশভাব অল্প সময়ই থাকে, তাই এতে শরীরের কোনও অনিষ্ট হয় না। এই দস্তানা দ্বারা দাঙ্গা থামানো খুব সহজ হ'য়েছে।

দিনের বেলায় আলোকোজ্জ্বল সহর

বরফের ঢাকা ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশের আধুনিক ধরণে নির্ম্মিত কিরুণা নগরের শীতকালের দুপুর বেলার দৃশ্য। শীতকালে সব সময়েই সেখানে অন্ধকার থাকে। তাই দিনের বেলাতেও সেখানে আলোকমালার একান্ত প্রয়োজন।

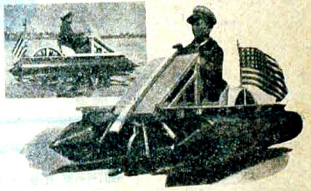

তারে নির্ম্মিত মানুষ ও পশুর প্রতিমূর্ত্তি

ভিয়েনা নগরে বার্টহোল্ড অর্ড্‌নার্ নামে এক অন্ধ ভাস্কর আছেন। অন্ধ হ'য়েও মূর্ত্তি গড়বার ঝোঁক তাঁর মোটেই কমে নি।

লোহা, পিতল ও তামার তার দিয়ে মানুষ ও পশুর নানান অবস্থার মূর্ত্তি তৈরি ক'রে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

শিশুদের তিনচাকার উভচর সাইকেল

এই অদ্ভুত তিন চাকার সাইকেল জলেও যেমন সহজে চলে, ডাঙ্গায়ও তেমনিই চলে। ছেলে মেয়েরা এই সাইকেল জলে ভাসিয়ে সাধারণ সাইকেলের মত প্যাডেল্ চালিয়ে অনায়াসে জলবিহার করতে পারে; আবার ডাঙ্গায় তুলে তিনটি রবারের টায়ারযুক্ত চাকা লাগিয়ে চার দিকে দিব্যি ঘুরে বেড়াতে পারে।

গাড়ীর ছাদে ঘুমাবার কামরা

ক্যালিফোর্নিয়ার এক ডাক্তার তাঁর গাড়ীর ছাদে ঘুমাবার এক কামরা তৈরি করেছেন। গাড়ীর সঙ্গে খুব হাল্কা অথচ খুব শক্ত এক ফ্রেমের ওপর এই দোতলার ঘরটি তৈরি। এতে ধুলা ঢুকতে পারে না। প্রয়োজন অনুসারে

এই কামরাটি খোলাও রাখা যায়, আবার চারিদিক বন্ধ ক'রেও রাখা চলে। মজা এই যে, গ্যারেজে ঢোকাবার সময় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দোতলার ঘর খুলে ফেলতে পারা যায়। ডাক্তার যখন খুব দূরে বেড়াতে যান তখন গাড়ীর ছাদের দোতলা ঘরে বেশ আরামে ঘুমান।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য

শ্রীবিনয় দত্ত ও শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ

গ্রন্থাগার যে সহরের এক কোণে মস্ত বাড়ীতে সচরাচর প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, তার কারণ—আগে যাঁরা বই পড়তেন, তাঁরা ছিলেন পণ্ডিত, বিদ্বান্ লোক। নির্জ্জনতাই তাঁরা ভালোবাসতেন। এই অধিকারী-ভেদ অনেক দিনই ছিল, এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটু একটু তার প্রভাব কমছে। প্রজাতন্ত্রের যুগে বিদ্যার বহুল প্রচার আর বিদ্বানের কানে সাধারণের হস্তক্ষেপ করার অধিকার বেড়ে যাচ্ছে। এই নির্জ্জনতা বিদ্যা-চর্চ্চার পক্ষে দরকার হ'লেও পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, আগে ছিল সব পুস্তক একস্থানে জড়ো করার রীতি—সে জন্যে মস্ত বাড়ীর দরকার হত। আজকাল ছাপা পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল ভাষার সকল পুস্তক সংগ্রহ করা সরকারের সাহায্য পেলেও অসম্ভব। বাছাই ক'রে এক একটি বিষয়ে প্রায় সব বই রাখা হয়ত সম্ভব।

আমাদের মতে বর্ত্তমান আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যে-সব বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য জীবন-যুদ্ধে রত, তাঁদের মনের খোরাক জোগানো। বিদ্যালয় বর্জ্জন ক'রে শিক্ষা শেষ হয় না—এই কথাটাই সার্থক করা তার প্রধান উদ্দেশ্য। মনের খোরাক জোগানো বড় কথা। সাদা কথা হচ্ছে—মন যাতে লেখাপড়ার চর্চ্চা রেখে আনন্দ পায়, যাতে দরকার হলে স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও ব্যবসায়সংক্রান্ত সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। আনন্দ দেওয়ার দিকটা এখনকার লাইব্রেরীগুলি গ্রহণ করেছে সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বইএর সংগ্রহ ক'রে কলিকাতার সাধারণ পাঠাগারগুলি পল্লীর পাঠকদের মন আকর্ষণ করতে কিছু পরিমাণে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা আজও পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারের কোনও সাহায্য পান নি ও এ বিষয়ে গ্রন্থাগার কি ভাবে তাঁহাদের সাহায্য করতে পারে তার আলোচনাও হয় নি।

কথা হচ্ছে যদি আমরা জনসাধারণকে লাইব্রেরী সম্বন্ধে সচেতন করতে চাই,—যদি আমরা পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পাঠ্যবিষয়ে উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য বলে মনে করি, তবে পুস্তকের বেসাতি খুলে বসে থাকলে কোনো ফল হবে না। মহম্মদের মত পর্ব্বতের কাছে যেতে হবে। বর্ত্তমানে একটা প্রচারকার্য্য চালাতে হবে যাতে লোকে পাড়ার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সুদৃষ্টি দেয়, তার উন্নতিকল্পে সময় ও অর্থব্যয় করে। অর্থ ও অবৈতনিক পরিশ্রমের কিরূপ প্রয়োজন তা প্রত্যেক পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষেরাই জানেন। তাঁরা পরিচিত ও উৎসাহী কর্ম্মী সুবিধা পেলেই জোগাড় করে নেন ও যাঁরা পারেন না, তাঁদের পাঠাগারের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন হচ্ছে পাঠক তৈরী করা যায় কি ভাবে? যদি কোনও রকমে সাধারণের মনে পাঠস্পৃহা জাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে আজই হোক্ কালই হোক্ পাঠাগারের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—এ নিশ্চিত। আমাদের মনে হয়, পাঠস্পৃহা বাড়াবার উপায় বইগুলি সম্বন্ধে তাদের ধারণা পরিস্ফুট করে তোলা। বাড়ীতে যাঁরা বই রাখতে সুরু করবেন, ছোট ঘর ভরবার আগে ও পয়সায় টান ধরতে দেখে, ক্রমে বাদ-বিচার করতে বাধ্য হবেন। অনেক ভেবে চিন্তে তবে তাঁরা বই ঘরে ঢোকান। এই বাদ-বিচার করা হবে গ্রন্থাগার হতে দরকার মত বই নিয়ে এসে পাঠ করে'—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কাজেই কি ভাবে নিজের লাইব্রেরী গড়তে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। নিজে যখন দরকার মত বই গুছিয়ে রাখতে শিখবো, তখনই লাইব্রেরীতে গিয়ে দরকার মত বই আনতে পারবো। প্রতিদিন দেখি লাইব্রেরীতে দলে দলে লোক গিয়ে তালিকা নিয়ে নানান্ ধরণের বই চাইছে, কি পড়বে ঠিক নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলে—একটা ভালো বই বেছে দিন। একদিকে যেমন ভালো বইয়ের অন্ত নেই, তেমনি আবার ভালো বই মাপকাঠি নিয়ে বিচার করলে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যা ভালো লাগে, যা পড়ে মন তৃপ্তি পায়—যা তার অশান্ত কামনার অগ্নিশিখাকে স্তিমিত করে রাখে—তাতে ইন্ধন জোগায় না—তাই তার পক্ষে ভালো বই। তার যদি কোনো বই পড়ে ভালো না লাগে, তাই তার পক্ষে চরম সত্য। কোথায় কোন্ সমালোচক কি বলেছেন, তাতে কান দেওয়ার যেমন দরকার নেই, তেমনি জানাশুনো বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কে কি মত দিল, সেই মত শিরোধার্য্য ক'রে বই পড়ার সার্থকতাও কম। মনে রাখা দরকার, সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য যাঁরা বই পড়েন, সাধারণ পাঠক সে দলভুক্ত নয়। তার উদ্দেশ্য আনন্দ পাওয়া, তৃপ্তি পাওয়া, ক্লান্ত মনকে সজীব করে তোলা। কেউ যদি হালকা নভেল নাটক পড়ে সময় কাটাতে চায়, কারুর উচিত নয় তাতে বাধা দেওয়া। তাতে ভয়ের কারণও কিছু নেই। এ রকম নিরুদ্ধ কামনার কাল্পনিক নিবৃত্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। ভয় একটু হয় যখন কামনার দীপ-শিখা এই সব স্বপ্নবিলাসের আবহাওয়ায় দপ্ করে জ্বলে ওঠে। অসামাজিক প্রবৃত্তি যখন বৃদ্ধি পেতে পারে, সমাজের অহিতের আশঙ্কা তখনই হতে পারে। কিন্তু এমনি সম্ভাবনা ত চারিধারেই রয়েছে। ভয় কোথায় নেই? সহরের জতুগৃহে বাস করে অভ্যাস হয়ে গেছে আগুন নিয়ে নাড়া চাড়া করা। ভয়টা বাড়িয়ে দেখার দরকার নেই। যে যা ইচ্ছে বই পড়ুক,—যা তার ভালো লাগে। আমরা শুধু দেখবো—সে যেন পড়তে শেখে, বইকে ভালোবাসতে শেখে, তার জীবনের একটা ভাগ যেন তার বাছা বাছা কয়েকখানা বইএর সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

এইটুকু করতে পারলেই আমাদের কাজ সফল হবে।

কাম্বোজ

[১১]

ফুণম্ পেন

কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী এঙ্করের মহাধ্বংসাবশেষ হ'তে বিদায় নিলাম। সিয়াম-রাপের আনামি হোটেলটিতে এ অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন ভারতীয় গাইড্ বাস করেন। তিনি একখানা মোটর ভ্যানে আসন ঠিক ক'রে দিয়ে জিনিষপত্র উঠিয়ে দেওয়ালেন। সিয়াম-রাপ থেকে প্রাতে আবার রওনা হলাম, কাম্বোজের বর্ত্তমান রাজধানী Phnom Penh অভিমুখে। যে শিল্পসম্ভার ও ঐশ্বর্য্য এঙ্করের মাঝে স্তূপীকৃত হয়েছিল, সুদীর্ঘ এ পথে রিক্ততা ও দৈন্যের সঙ্গে তার যেন কোন যোগসূত্র ছিল না মনে হয়। হয়ত বা অন্য কত স্থানের ইতিহাসের মত, এঙ্করও ছিল জাতির ও দেশের অবসার মাঝে একটা বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি। মিশরের ফ্যারাওদের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাদের প্রজাসাধারণের ও দাসেদের অবস্থা যেমন ছিল কতই না পৃথক!

প্রায় দুপুরে একটা নদীপুল পার হ'য়ে Kompong Thom এ গাড়ীখানি খানিকক্ষণ থামল যাত্রীদের আহারের জন্য। কমপং থমে কিছু ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ আছে। এখানকার প্রধান হোটেলটিতে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। বিকালের আগে মোটরভ্যানখানা একটা

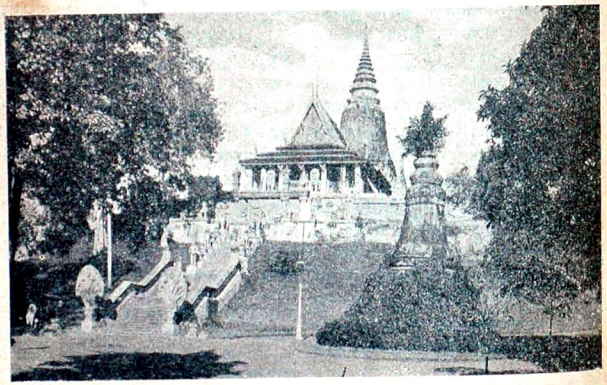

ফুণমের উপর প্যাগোডা

ঘরস্রোতা নদী পার হল, মোটর-লঞ্চ-চালিত একটি গাধাবোটের উপরে। আরও অনেকখানি পথ শেষ করে' চোকে পড়ল ফুণমপেন সহরের সুনির্ম্মিত বাড়ী ঘর, পথ। সহরের ষ্ট্রীটগুলি সমস্তই 'টার ম্যাকাডাম' এবং ফরাসী নামযুক্ত—Rue Armond Rousseau, Avenue Joffre, Quai Verneville প্রভৃতি; কোথায় কাম্বোজের রাজপথ, আর পৃথিবীর কতদূর প্রান্তে ফ্রান্স্।

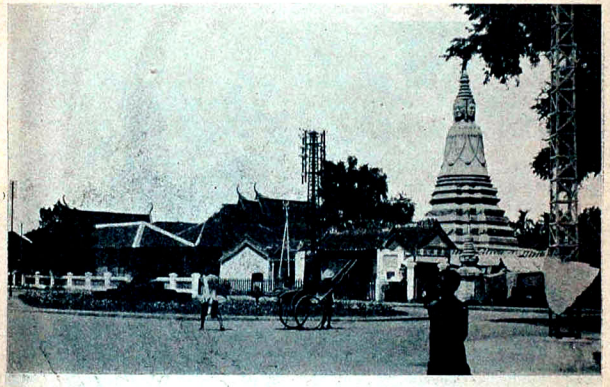

তিনদিকে মুখ: কাম্বোজ প্যাগোডার একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য

বাজারে গিয়ে ভানখানি থামল। এখানে কিছু ভারতীয়ের দোকান আছে, বিশেষ করে' বম্বে প্রদেশের ব্যবসায়ীদের। সিঙ্গাপুর থেকে ভারতীয় একটি ব্যবসায়ীর নামে একখানা চিঠি ছিল। কিন্তু কি করেই বা কাম্বোজের মুটেদের বোঝাই। ভারতীয় বোধে একখানা বোম্বাইওয়ালার দোকানে মুটেরা নিয়ে গেল। চিঠিতে লিখিত দোকানদারের কাছে যেতে চাওয়ায় তারা লোক দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিলে। মুসাভাই লোকটি বড়ই ভদ্র, যথাসাধ্য খাতির করলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সকলই করতে থাকলেন। একটা চীনা-পরিচালিত হোটেলে, ঘর ঠিক করিয়ে নিলাম। হোটেলটি আকারে যত বড়, পরিচ্ছন্ন তত নয়, এবং পরে জানলাম গোলমালও আমাদের দেশের অনেক ধর্ম্মশালারই মত।

মেকং নদীতীরে অবস্থিত খমের-খণ্ডজার শেষ রাজধানী এবং বর্ত্তমান কাম্বোজেরও রাজধানী এই ফুণমপেন সহরটিতে প্রায় একলক্ষ বসতি। কিন্তু তিন ভাগের একভাগ চীনা, অপর একভাগ আনামি, হাজার খানেক ফ্রেঞ্চ এবং বাকী কাম্বোজ। অধিকাংশ বড় কাজ-কারবার কাম্বোজদের হাতে নাই। যেমন প্রায় আমাদের কলকাতা এবং বাংলাদেশের অবস্থা। অবাঙ্গালীর ব্যবসার প্রাধান্য শুধু কলকাতায়ই নয়, খড়গপুর, টাটানগর, চাইবাসা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ধানবাদ, রাণীগঞ্জ সকল স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুদূর

গৌহাটি ও আসামের প্রান্তবর্ত্তী ডিব্রুগড়, শিবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অর্থ-সম্পদের পথগুলি আয়ত্ত হ'লে, সেখানকার জমি, বাড়ী, ও জমিদারিও সকলই হাতে আসে। লক্ষ্মী চঞ্চলা অথচ অবিনাশী, কেবল ঘোরে ও হাত ফেরে। যার হাতে যায় তাকে দোষ দেওয়া চলে না ত, যার রাখবার ক্ষমতা হ'ল না, তাকে নিজবাসে পরবাসী হয়ে থাকতেই হয়। কাম্বোজের অবস্থাও তাই।

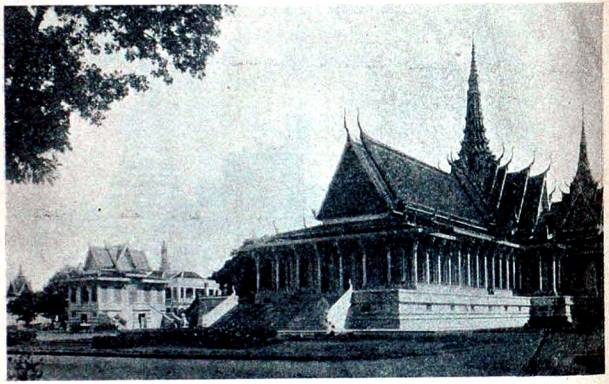

গুলো সিঁড়ি উঠে যেয়ে প্যাগোডা। ভিতরে বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বস্তুবহুল সজ্জা।

রাজবাড়ীর প্রাচীরের মাঝে ঘেরা স্থানটুকু এ রাজধানীরও একটি বিশিষ্ট চিত্তাকর্ষক কেন্দ্র। কাম্বোজের রাজা আজ কাম্বোজের রাজা নয়। বৃটিশ ভারতের কত শত রাজা, মহারাজাদের মত একটা উপাধি মাত্র। যে সকল ব্যক্তির রাজা বা মহারাজা উপাধি থাকে, অথচ তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা

কাম্বোজ রাজপ্রাসাদ—ফ্নমপেন

কাম্বোজ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এখানকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তা জাতির জীবনে কি প্রভাব ও পরিণতি এনেছে তা জানবার কোন সুযোগ ঘটল না। Phnom Penh সহরের মাঝে ক্ষুদ্র (Phnom) পাহাড়টির উপর একটি বৌদ্ধ প্যাগোডা। চারিদিকে ঘাসের লন্ এবং ফুলের কেয়ারি আছে ঘিরে এই স্তূপটিকে। প্রশস্ত সিঁড়ির সম্মুখেই দু দিকে উদ্যতফণা নাগিণী। অনেক-

কোন দিক দিয়ে কিছু নেই, এবং যাঁরা এ উপাধি পোষাকের সহিত অলঙ্কারের মতই ব্যবহার ক'রে পুলকিত হ'ন, তাঁরা নিজেদের মাঝে ছাড়া জগতে আর সকলের মাঝেই হাস্যোদ্দীপনা ক'রে থাকেন। ২৩টি রাজবাড়ী, দরবারমঞ্চ, একখানি রাজোচিত সিংহাসন অর্থাৎ জমকালো চেয়ার, একটি উষ্ণীষসহ রাজ-পোষাক, গুটী কয়েক জমিদারি কাছারি এবং জনকতক তরোয়াল,

সড়কি ও গাদা বন্দুকের মত কার্য্যকরী অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত বরকন্দাজ পাইক ও সেপাই। এগুলো থাকলেই এহেন রাজা মহারাজা ও নবাবের আসবাব উপকরণ সম্পূর্ণ। মহারাজা হয়েও যদি অন্যের অনুগ্রহ দৃষ্টির কাঙ্গাল হ'তে হয়, যাদের একখান পত্র লিখেই রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসন

সুসজ্জিত দরবার গৃহে কাম্বোজ রাজসিংহাসন

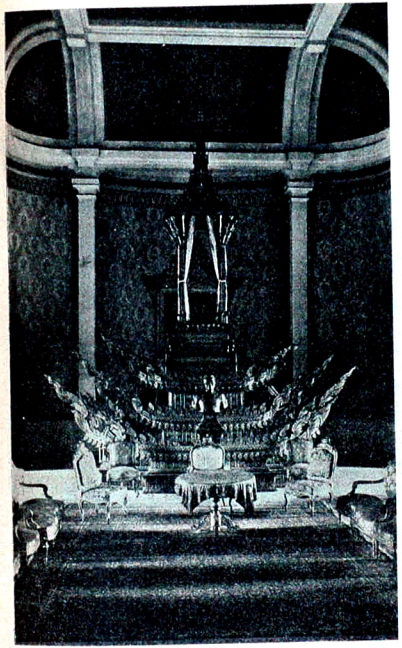

করে' দেওয়া চলে, তবে সে কেমন মহারাজা? যদি ষ্টেট্ রিসিভারের হাতে যেয়েও রাজা বা মহারাজা থাকা যেখানে চলে, যথার্থ রাজ্য পরিচালনা না ক'রেও এবং রাজ্য না থেকেও রাজা বা মহারাজা হওয়া যেখানে চলে, সেখানে বলতে হয় 'মহা' এবং 'রাজা' এবং রাজকুমার শব্দ কয়টির অর্থ হয়ে গেছে পরিবর্ত্তিত।

কম্বোজের বৃত্তিভোগী রাজা এমনই উপাধিধারি মাত্র। কাম্বোজ হচ্ছে French Protectorate অর্থাৎ বাংলা কথায় সম্পূর্ণরূপে ফরাসীর অধীন। হিজ্ ম্যাজেষ্টির মাস মাইনে একটা কিছু বরাদ্দ আছে। রাজ্য-পরিচালনার সকল রশ্মিগুলিই পরহস্তে। আইন আদালত, বিচার, শৃঙ্খলা, মুদ্রাদির প্রচলন, ট্যাক্স, শিক্ষা স্বাস্থ্য, দেশরক্ষা ও রাজনীতি—মোট কথা রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কোন কিছুই তার আর দুশ্চিন্তার বিষয় নেই। বর্ত্তমানকালে রাজা, মহারাজা, নবাব ও সুলতানদের মর্ম্মকথা যাই হোক্, এ রাজবাড়ীর প্রাচীরের মাঝে আছে, কাম্বোজ-শিল্পের কতকগুলি সুন্দর নিদর্শন।

রাজবাড়ীর সুবিস্তৃত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা স্থানটির মাঝে যে সৌধগুলি আছে, তা দেখলে আনন্দ হয়। এদিক দিয়ে কাম্বোজ-শিল্প সুদর্শন। কাম্বোজ সৌধ ও মন্দিরের রেখাগুলির নবত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে। রাজবাড়ীর সিঁড়ির সামনেই আছে সপ্তনাগ-ফণা। এটা হয়ে গেছে কাম্বোজ শিল্পের একটা motif, ছাদের কার্ণিসের

উপরে রয়েছে অগ্নিশিখার সাজ। এঙ্ কয়েও এরও নিদর্শন ছিল নানাস্থানে। ছাদের চূড়া ও লাইনগুলি ভারি মনোজ্ঞ। রাজদরবারের হলটিরও ভিতর বাহির চমৎকার। পূর্ব্বতন রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অনেক কিছু নিদর্শন ও সজ্জা গোটা দুই প্রকোষ্ঠে আছে। হলের মেঝে থেকে আরম্ভ করে, থাম শেষ করে ছাদ পর্য্যন্ত কোনখানেই শিল্পীর অবহেলা হয়নি। রাজ-সিংহাসনটি ত এক অপূর্ব্ব পরিকল্পনা। এটিতেও দেওয়া হয়েছে অগ্নিশিখার সাজ।

অমাত্য ও পরিজন নিয়ে, ইয়ুরোপীরাও সেখানে অবশ্য নিমন্ত্রিত হ'ন।

কাম্বোজিয়ান প্যাভিলনটিও অতি সুপরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত। এখানে সযত্নে রাখা আছে প্রা-খা অর্থাৎ সেই দেবরাজ হতে লব্ধ অসি যা এঙ্কর থেকে এ রাজ-ধানীতে পূর্ব্বে এসেছিল। একদিকে ঝলমল সজ্জা ও স্বর্ণনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি।

এখানেও আছে ব্যাঙ্ককের মত এক রাজার মন্দির—"ওঅট্ ক্র কাও"। পূর্ব্বতন রাজা নরোদম-নির্ম্মিত এই

রাজবাড়ীর একটী মন্দির—ফ্‌ণম্ পেন

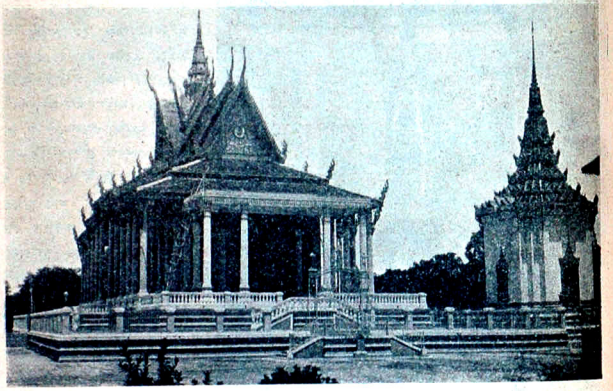

নবনির্ম্মিত নাচ-গৃহটিও মনোহর কাম্বোজ-আদর্শের নিদর্শন। কাম্বোজের নৃত্যকলা সুপ্রসিদ্ধ। শ্যামের নৃত্য অন্য আরও অনেক জিনিষের মত খ্মূজার কাছেই লওয়া। রাজা বৎসরে কয়েকটি উপলক্ষে মাত্র এখানে কাম্বোজের প্রাচীন নৃত্য-উৎসবের আয়োজন করান। দ্বিতলে চিত্রিত খোলা হলটিতে তখন তিনি বসেন তাঁর

মন্দিরের মেঝেটি রূপার চাদরে আচ্ছাদিত। বুদ্ধের জীবন কথা দেওয়ালে অঙ্কিত। একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত উচ্চাসনে মরকত-মণির বুদ্ধমূর্ত্তি!

রাজবাড়ীর একটা শ্বেতহস্তীও আছে, তবে সেটা ধবধবে সাদা কিছু নয়। সহরের প্যাগোডা আনালোম, Batum Watdeyর প্যাগোডা এবং বিশেষ করে দ্রষ্টব্য

কাম্বোজ মিউজিয়ামটি। Phnom Penhএর রেল ষ্টেশনটির বাহির থেকে আকৃতিতে একটু নবত্ব আছে।

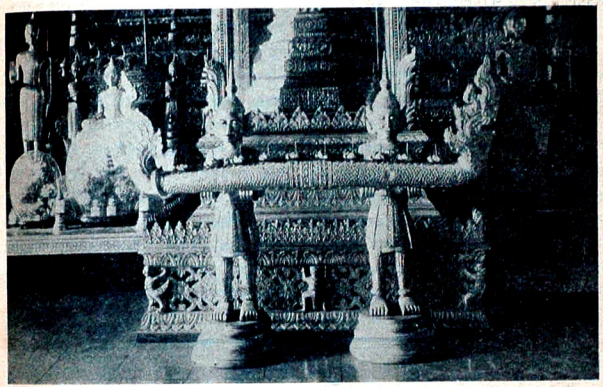

ফ্‌ণম পেনের গায়ে মেকং নদীটি হ'ল কাম্বোজের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান পথ। কাম্বোজবাসীর জীবন-ধারা এই মেকংএর ধারার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত

অনেক দিক থেকে ঐশ্বর্য্যান্বিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে সে নৃত্যকলা কাম্বোজের রাজধানীতে দেখতে পাওয়া দুর্লভ। গোটা দুই দেশী অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ আছে এখানে। একরাত্রে অভিনয়ে গেলাম। কাম্বোজের নৃত্য-কলার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখা সহজে ঘটবে, ধারণা ছিল।

রাজবাড়ীর মন্দিরাভ্যন্তর

শতাব্দী হ'তে। কিন্তু এ জাতির জীবন ধারাটি যেন ক্ষীণ দেখায়, জাতীয় জীবনের বিকাশটি যেন হয়ে, পড়েছে নিতান্ত সঙ্কুচিত। শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধনে, সম্পদে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পকলায়, সম্মানে শৌর্য্যে—প্রাণের সকল রকম প্রকাশে, এ জাতির জীবন-সূর্য্য যেন হয়ে পড়েছে কোন্ দিন নিষ্প্রভ। কালের প্রবাহে যে জাতিকে আজিকার স্তরে এনে ফেলেছে, ভাবীকালে পুনরায় তা ভাস্বররূপে জগতে প্রতিভাত হবে কি না কে বলতে পারে!

শিল্পকার্য্যে যেমন, কাম্বোজের নৃত্যকলাও ছিল একদা প্রসিদ্ধ, শ্যাম যার কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে'

কিন্তু কাম্বোজ-নৃত্য আজকাল বড় একটা হয় না, সে প্রাচীন নৃত্যকলার কদর দর্শকদের মধ্যে তেমন নেই বলেই বোধ হয়। তার বদলে অভিনয়ের মাঝে রয়েছে দেখলাম ফ্রেঞ্চ নৃত্যের একটু করে' অনুষ্ঠান! অভিনয়টিতে শৌর্য্য-বীর্য্যের বা জাতির চরিত্রের মাঝে শক্ত সবল কিছু আছে মনে হ'ল না। মেয়েলীভাবে অনু-প্রাণিত পুরুষেরও অভিনয়। নরনারীর সনাতন আকুতি নিয়ে করুণ রসসৃষ্টির ক্ষমতা রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়াকে সিক্ত করে' ফেলতে পারে এবং হৃদয়কে স্পর্শ করে। গানগুলিতে চীনাসুরের ছাঁদ আছে কিছু। মুসাভাইর ভ্রাতষ্পুত্র, ভারত হতে আগত কেহ কাম্বোজ-নৃত্যের

নমুনা দর্শনে বিশেষ আগ্রহান্বিত, এ কথা রঙ্গালয়ের ম্যানেজারের নিকট জানিয়ে এবং কিঞ্চিৎ জাতীয় নৃত্যের নমুনা দেখানর জন্য অনুরোধ করায়, ম্যানেজার মহাশয় সে নৃত্যের বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন। কাম্বোজ-নৃত্যের সঙ্গে শ্যাম নৃত্যের প্রকৃতিগত মিল আছে যথেষ্ট, দেখলাম। সত্যি, এ জিনিষটাকে এরা উত্তরোত্তর উন্নতি না করে' কেন পরিত্যাগ করতে চলেছে দেখে দুঃখ হয়।

ফুণম্ পেনে ফল পাওয়া গেল অনেক রকমের। এখানকার রূপার অলঙ্কারাদি বিশেষত্বপূর্ণ ও অতি চিত্তাকর্ষক। ইয়ুরোপীয়ান মহিলারা ত এগুলো দেখে না কিনে পারে না। রূপার পাতে ঢাকা বৌদ্ধমূর্ত্তি, বাসনাদিও নূতন রকমের। ভারতীয় সংস্কৃতির নমুনা-স্বরূপ কিছু সুগঠিত ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিও বিক্রয় হয়, পুরাতন 'কিউরিও' হিসাবে। এখানকার সিল্কের 'সারোং' এবং সুদৃশ্যভাবে বুনা লুঙ্গি প্রভৃতিরও নাম করা যেতে পারে। তবে এ সকল জিনিষের দাম সস্তা নয়। এখানকার 'পিয়াস্তার' আমাদের প্রায় দুটাকা। এ সকল দোকানে দেখি কাম্বোজ মহিলারা স্বচ্ছন্দে দোকানের বিক্রয় চালাচ্ছে। কাম্বোজ-নারীর মাঝে এমন একটু নরম ও কোমলভাব আছে যা শ্যাম নারীর মাঝে সচরাচর চোকে পড়ে না।

ভারতবাসী এখানে শ' খানেকের উপর—ব্যবসা সম্পর্কে। কাম্বোজ-ভাষা এখানকার সকল ভারতবাসীই বলতে শিখেছে। ভারতবাসী এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই, তবে বোম্বাই প্রদেশের বেশী। কেউ কেউ এখানে কাম্বোজ-নারী বিবাহও করেছেন। এমন একটি পরিবারে দিন দুই নিমন্ত্রণ হ'ল। ভদ্রলোকটি অতি সজ্জন, এখানে সকলের কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম আছে। একটি সিল্কের কারখানা ও কারবার চালান। এই হিন্দুর কাম্বোজ-স্ত্রী, খাওয়ার সময় উপস্থিত হ'লেন। অতি সাদাসিধা ও নম্র। হাতে কি একটা সেলাই চলছিল। ভাষার অন্তরায়ে কথা কিছুই বলতে পারলেন না। এখানকার বিবাহিত পত্নী স্বদেশে নিয়ে যাওয়া অচল। হয় দীর্ঘকাল পরে দেশে ফেরার সময় পত্নীকে ও পুত্রাদি ছেড়ে যেতে হয়, আর নয় দেশ থেকেও সকল ভারতবাসী হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন।

—*—

পূর্ণপাত্র

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

তুমি জীবনের পূর্ণ-আধার, নিত্য নব
উৎসের ধারে উৎসারি' ওঠো উচ্ছলিয়া,
আমি পলে পলে চুম্বন করি অধরে তব—
নব-চেতনার নব নব রসে সঞ্চরিয়া!

অধীর ওষ্ঠ পাতিয়া রেখেছি সকল বেলা,
আকুল তৃষ্ণা প্রতিটি বিন্দু গ্রহণ করে;
অন্তরে দোলে রস-সিন্ধুর গভীর খেলা,
অনাস্বাদিত সুধার নির্ঝর অঝোরে ঝরে;

রঞ্জিয়া ওঠে মোর প্রতিবেলা; প্রতিটি দিন,
সে-রস ধারায় আলোক-আঁধার পড়ে ঝরিয়া,
মলিন মর্ত্ত্য সে-মধু-প্রপাতে মাধুরীলীন,
লাখো—লাখো যুগ—জনম—জনম গেল তরিয়া!—

তবু অপূর্ণ-পিয়াসা আমার; নিত্য—নব—
বিত্ত সাধিছে চুম্বন রচি' অধরে তব।

মাটির প্রদীপ

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

—নাঃ, উনোনটা আজ আর কিছুতেই ধরবে না—পোড়া উনোনের যে আজ আবার কি হোল!—পাখার হাওয়া করিতে করিতে তৃপ্তির হাতের কব্জিগুলিতে খিল ধরিয়া আসিবার উপক্রম। হাত পালটাইয়া লইয়াও কিছু হইতেছে না—ধোঁয়ার আধিক্যে চোখ দুটী জবা ফুলের মতো টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছে—অশ্রুধারা অবিরাম গণ্ড বহিয়া নামিয়া চলিয়াছে—ছোট টিনের ঘরখানি ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ—তবুও উনান ধরে না।

ওঘর হইতে বড় মেয়েটি চীৎকার সুরু করিয়াছে—মা—ওমা—ওগো মাগো—পল্টুকে আর রাখ্‌তে পারছি না—কাঁদছে আর কেমন করছে যে—তুমি এসো না।

মেজ মেয়েটিও রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া পাল্লা দিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে—মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—আর থাক্‌তে পারছি না—মারে।

তৃপ্তি ঝঙ্কার দিয়া ওঠে—থাক্‌তে পারছো না তোমার পিণ্ডি গেলো—কেবল খাই খাই—সংসারটাকে না গিলে আর থেকো না।

অবোধ বালিকার বুঝিবার ক্ষমতা নাই—মার তিরস্কারে ঠোঁট ফোলাইয়া অভিমানভরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যায়। আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

—তৃপ্তির যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে—কর্ম্মক্লান্ত স্বামী এখুনি আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে—বাড়ী আসিয়াই কিছু জলযোগের পরই আবার বাহির হইবে টিউশানি বজায় রাখিতে—একটুও দেরী হইলে চলিবে না। অভুক্ত ছেলেমেয়ের দল কান্না সুরু করিয়াছে—রুগ্ন শিশুটিকে একটু সাবু রাঁধিয়া দিতে হইবে—জ্বরটা আজ বড়ই বাড়িয়াছে—একটু বসা দরকার—তারপর আবার ভাত চাপানো—অন্ততঃ তাহার সহিত একটা ডাল কিংবা তরকারীরও প্রয়োজন। তৃপ্তি কি করবে!—উনান আজ আর কিছুতেই ধরে না।

কয়লাওয়ালা ব্যাটা নিশ্চয়ই আজ ঠকাইয়াছে—নিশ্চয়ই কাঁচা কয়লা দিয়াছে। তারই বা অপরাধ কি? পাঁচ আনা দরে সস্তা কয়লা লইয়াই আজ এ বিপত্তি!

তৃপ্তি আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে পাখা চালাইল। হাত থামাইয়া বার কয়েক উনানের তলায় ফুঁ দিল—কিন্তু একরাশ চোখের জল বাহির হইয়া আসা ছাড়া আর কোন ফলই হইল না।

* * * *

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল।

তৃপ্তি বুঝিল স্বামী আসিয়াছে। মুস্কিল হইল—আজ অভুক্তই পড়াইতে যাইতে হইবে। পোড়ার উনান এখনো ধরিল না।

তৃপ্তি দরজা খুলিয়া দিল।

ক্লান্ত অজিত অফিস হইতে আসিয়াই তক্তাপোষের বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। আজ মেল ডে; অফিসে গুরুতর খাটুনি হইয়াছে—পরিশ্রান্ত দেহমন যেন আর পরিশ্রম করিতে পারে না—কর্ম্মভারে দেহটি যেন নুইয়া পড়িতেছে—কিন্তু এখুনি আবার টিউশানি। সে টাইম্‌-পিস্‌টির দিকে তাকাইয়া দেখিল—ছয়টা বাজিয়া গেছে—সাতটায় আবার পড়াইবার পালা!

নাঃ অজিত আর পারে না—কাজ—কাজ—কোন রকমে দুবেলা দুটি খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার জন্য—কষ্টেসৃষ্টে চোখের জলে সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য তাহার জীবনের কর্ম্মচক্র অবিরাম ঘুরিয়াই চলিয়াছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, আশা নাই, সুখ

নাই, কাব্য নাই—কঠিন কর্ম্মচক্রের নিষ্পেষণে তাহার তরুণ মনপ্রাণ দলিয়া পিষিয়া যাইতেছে। ইহারই নাম জীবন—ইহারই নাম বাঁচিয়া থাকা!

রুগ্ন ছোট ছেলেটি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া চলিয়াছে—অজিত একবার দেখিয়া লইল—তাহারি শয্যাপার্শ্বে—তাহারি কুল-প্রদীপ ভবিষ্যৎ বংশধর—তাহারি আশা ভরসা!—পাশে আট বছরের বড় মেয়ে আশা তাহার শুশ্রূষায় রত! ছোট ভাইটিকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইবার ভার তাহার উপরই ন্যস্ত। তৃপ্তির অবকাশ কই! ঝি নাই—ঠাকুর নাই—সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্মের সম্পাদনে দিন গড়াইয়া সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রির গভীরতা নামিয়া আসে।

ছোট ছেলেটির দিকে দৃষ্টি পড়িতে অজিত জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে আশা—পণ্টু আজ কেমন আছে—অত কাঁদ্‌ছে কেনরে?

আশা শুষ্কমুখে উত্তর দেয়—দুপুরে আজ পণ্টু কেমন করছিল বাবা—মা বল্‌লে বড্ড বেড়েছে—আজকে তোর বাবা এলে ডাক্তার আনতে বল্‌তে হবে।

হাঁ ডাক্তার—তেমনি কপাল কিনা! আজ আবার সাহেব জানাইয়াছে কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই—বড় 'ডল্-মারকেট্'—পরের মাস হইতে রিট্রেঞ্চমেণ্ট-এ পাঁচ টাকা করিয়া মাহিনা কাটা যাইবে।

পণ্টু জোরে ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! চিলের মত চীৎকার—কোন ভার নাই! অন্তরের তন্ত্রীগুলি যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—অতি কুস্বর!

অজিতের আর মায়া লাগে না, বিরক্তি বোধ হয়। নাঃ, একটু যে শুয়ে বিশ্রাম করবো তার উপায় নেই—ছেলেটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে—মরণও নেই! জন্মাবধি এক কাল-ব্যাধি লইয়া আসিয়াছে—নিজেও মরিবে—তাহাকেও মারিয়া যাইবে।

বিরক্তিভরে অজিত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল।

ভীতা ত্রস্তা আশা তখন ভাইটিকে সামলাইবার চেষ্টায় ভুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে—চুপ করো পণ্টু—লক্ষ্মিটি—কি হয়েচে—মা?—মা আস্‌ছে!—ওই—ওই চাঁদ দেখ্—আয় চাঁদ আয়—পণ্টুর কপালে টী দিয়ে যা।

ছেলের চীৎকার শুনিয়া রান্নাঘর হইতেই তৃপ্তি ঝঙ্কার দিয়া ওঠে—ওরে ও পোড়ারমুখী—ও আশা—ছোঁড়াটাকে একটু ঠাণ্ডা করে ভুলিয়ে রাখতে পারছো না। মানুষটা সারাদিন খেটে খুটে এলো—একটু জিরুতে দাও—তা না হলে পিণ্ডি জোগাড় হবে কোত্থেকে?

মেজ মেয়েটি ইতিমধ্যে ভয়ে রান্নাঘরের দরজা হইতে কখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

অজিত রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলে—জিরুবো মলে; তার আগে নয়!—দাও দুখানা রুটী দাও—এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হবে। উঃ কত কয়লা দিয়েছো—ধোঁয়ার গুঁতোয়তো রান্নাঘরে ঢোকবার উপায় নেই।

তৃপ্তির মাথার উপর যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বহুচেষ্টা, কষ্ট এবং কসরৎ করিয়া তবে উনানটাকে একটু বশে আনিয়াছে—একটু একটু আগুন দেখা দিয়াছে—এইবার ধরিল বলিয়া!

মিনতিমাখা কণ্ঠে স্বামীকে বলিল—তুমি ঘরে গিয়ে একটুখানি বসো গে—কাঁচা কয়লা দিয়েছে এবার কয়লাওয়ালা—দুঘণ্টা ধরে উনোন আর ধরে না—এই আমার হয়ে গেল বলে—লক্ষ্মিটি, আর একটু সবুর করো।

মিনতি বাধা মানিল না।—ক্ষুধায়, বিরক্তিতে, ক্লান্ত অবসাদে অজিতের সমস্ত শরীর আন্‌চান্ করিতেছে। জীবনের উপর—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার—সংসারের উপর প্রবল বিতৃষ্ণা! অফিসের রিট্রেঞ্চমেণ্ট—পণ্টুর অসুখ—খাটুনির গুরুত্ব—প্রাইভেট্ টিউশানি—আজ সমস্ত মনকে তাহার বিষাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিন হইলে অজিতকে কিছুই বলিতে হইত না। এতক্ষণ পণ্টুকে কোলে বসাইয়া আদর করিত, টাইম্‌পিস্‌টার উপর লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে তৃপ্তির সহিত হাসিয়া দুএকটা

কথাও যে বলিত না এমন নয়। আজ কিন্তু সংসার-সংগ্রামে সে ক্লান্ত—অধীর!

তৃপ্তির কথাগুলি তাহার মাথায় আগুন ধরাইয়া দিল।—এখনও খাবার হয় নি? চাই নে। সমস্ত দিন কি কর?—ঠ্যাঙ্ ছড়িয়ে কেবল গল্প আর শুয়ে থাকা বইত ত নয়—খাবারটা পর্য্যন্ত সময়ে ক'রে উঠ্‌তে পারো না!

রাগে গর গর করিতে করিতে অজিত বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

* * * *

তৃপ্তি চুপ করিয়া গিয়া রান্নাঘরে বসিয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যেই তাহার সমস্ত কর্ম্মতৎপরতা উবিয়া গেল। উনানের উদ্গত ধোঁয়ার মূলে অল্প অল্প অগ্নি-শিখা দেখা যাইতেছে—আর একটু জোর করিয়া হাওয়া করিলেই এখুনি ধরিয়া যাইবে। কিন্তু না, থাক্—যখন খুসি ধরুক; ব্যস্ততার আধিক্য তাহার কমিয়া গেছে—কর্ম্ম-ঔৎসুক্যও আর নাই। কেন?—কিসের জন্য?—সংসার—ছেলেমেয়ে—সে কি কেবল একলা তাহারি?—সংসারের দুপয়সা সাশ্রয়ের জন্যই না আজ সে দরজায় অল্প দামের কয়লা কিনিয়াছে! উনান ধরিতে দেরী হইল—ইহা কি তাহার ইচ্ছাকৃত? অপরাধ তাহার কোথায়? স্বামী অভুক্ত—হইলেই বা—সে তো চেষ্টার কোন কসুর করে নাই? আর তৃপ্তি—সে নিজেই বা কি খাইয়াছে! সংসারের ভাবনা—কষ্ট—সে কি অজিতের কেবল একলার? তাহার অধিকাংশ ঝক্কি তো তৃপ্তিকেই বহন করিতে হয়। তৃপ্তি গল্প করে—বসিয়া থাকে! উদয়াস্ত খাটুনি—ইহা কি অজিতের অজ্ঞাত! কি সুখে—কি আনন্দে সে আছে? অভাব-অভিযোগ—দৈনন্দিন হাহাকার—তাহার শরীরের রক্তকে—তাহার তরুণ মনকে তিলে তিলে শুষিয়া হত্যা করিতেছে—তবুও তাহার জন্য স্বামীর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নাই! চোখ ফাটিয়া তৃপ্তির অশ্রুরাশি বাহির হইয়া আসে অভিমানে অন্তর ভরিয়া যায়।

পণ্টু আবার কাঁদিতে সুরু করিয়াছে।—আশা চীৎকার করিতেছে—মা—ওমা—এসোনা—পণ্টুকে আর যে রাখতে পারছি না।

তৃপ্তি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া আজ তাহার পিছনে লাগিয়াছে। রুক্ষ মেজাজে রান্নাঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া আশার পিঠে ঘা কতক চড় বসাইয়া দিল। হারামজাদা মেয়ে—ছেলেটাকে পর্য্যন্ত একটু ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারো না—দুবেলা দুকাঁড়ি গেলা!

আশা প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু উদ্দাম ক্রন্দনের বেগ আসিয়া তাহা রুদ্ধ করিয়া দিল।

তৃপ্তির তখন সেদিকে হুঁস নাই। রুগ্ন ছেলেটির পাশে শুইয়া অবহেলাভরে স্তন-দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে সে বলিল—কি, কি, হয়েছে কি? নাও গেলো—চীৎকার করে মরছো কেন? মরণও নেই তোমার—আর যে জ্বালাতন সহ্য হয় না! তুমি গেলেও তবু হাড় কখানা একটু জুড়ায়!

বালকের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই—সে তখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মায়ের মুখের দিকে নিবিষ্টচিত্তে তাকাইয়া আছে।—

পণ্টুর গায়ের উপর হাত পড়িতেই তৃপ্তির চমক্ ভাঙ্গিল—গাটা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে যে—জ্বর ভয়ানক বাড়িয়াছে। তেমনি ছাই সংসারে কিছু কি আছে; একটা থার্ম্মোমিটার পর্য্যন্ত জোটে না! কয়দিন ধরিয়া স্বামীকে বলিয়া বলিয়া হয়রান হইতেছে। কপালে, গায়ে, পিঠে, দেহের চারিদিকে হাত দিয়া ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া তৃপ্তি বুঝিল জ্বরের প্রকোপ খুবই বেশী—ক্রমশঃই জ্বর যেন বাড়িয়া চলিয়াছে।

ছেলে মেয়ের উপর বিতৃষ্ণা, রাগ, অভিমান নিমেষের মধ্যেই তাহার মনের পাতা হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৃপ্তির অন্তর ভরিয়া উঠিল আশঙ্কা এবং উদ্বেগের কালো ছায়ায়।

নাঃ, আর উপেক্ষা করা চলে না। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; আজ স্বামীকে বলিতেই হইবে।

পন্টু যদি না বাঁচে? তৃপ্তি শিহরিয়া উঠিল। আজ আর অন্য কাজ নয়। জ্বর যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে পন্টুর কাছে আজ বসা দরকার—তৃপ্তি স্থির করিল।

পন্টু চুপ করিয়াছে—তন্দ্রাভরে চোখদুটি মুদিয়া আছে। এই বেলা যাহোক্ করিয়া দুটি ডাল ভাত রাঁধিয়া আসা যাক্! আজ আর কিছুই হইবে না।

তৃপ্তি উঠিয়া পড়িল। যাইবার কালে আশাকে আদর করিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া গেল—লক্ষ্মী মা আমার—কাঁদতে আছে! কত বিরক্ত করিস্ বল্‌তো—পন্টুকে দেখ্—আমি ভাত আর ডালটা তাড়াতাড়ি তৈরী করেই আস্‌ছি। উনি এ মাসের মাইনে পেলেই তোর কাণের দুটি দুল গড়িয়ে দেবো।

ক্ষুব্ধ অভিমানে বালিকার তখন ঠোঁট দুটি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—হাঁ ছাই দেবে—কতদিন তো বলেছো—

তৃপ্তি আশ্বাস দিল—এবার আর মিথ্যে কথা নয়—এবার ঠিক দেবো।

*   *   *

পড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে অজিতের মনের গ্লানি এবং রুক্ষতা কাটিয়া গেছে।

আজকের ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। দোষ সমস্ত তাহার একেলার। তৃপ্তি, পন্টু, ছেলে মেয়ে—কাহারও অপরাধ নাই। তাহার হতভাগ্যের জন্য কি দায়ী তাহারা? অবিরাম দারিদ্র্য-রাক্ষসীর সহিত তাহারা সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে—মুখ বুজিয়া সানন্দে তাহারা অভাব, অশান্তি, দুঃখ, কষ্টকে বরণ করিয়া লইতেছে—তাহার জন্য এতটুকু অভিযোগ নাই—বিদ্রোহ নাই! ভাগ্য-বিধাতার ক্রূর অট্টহাসি—অপরাধ তাহাদের কোথায়!

তৃপ্তি—মূর্ত্তিমতী সেবাপরায়ণা তৃপ্তি—দরদী তৃপ্তি—সর্ব্বক্ষণই তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—দুঃখ কষ্টের এতটুকু আঁচ তাহার গায়ে লাগিতে না দিবার চেষ্টায় সর্ব্বক্ষণই ব্যস্ত—সংসারের ঝড় ঝাপটার আঘাতও নীরবে নিজের মাথার উপর পাতিয়া লইয়া দিনান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছে; উপরন্তু তাহার বাক্যবাণ! জীবনে ভোগ নাই—বিলাস নাই—গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন ছাড়া অপর কোন ঐশ্বর্য্য নাই—মমতাময়ী তৃপ্তি! তাহার মতো হতভাগ্য স্বামীরত্নলাভ করিয়া জীবনের কতটুকু স্বাদ সে উপভোগ করিয়াছে! অজিতের মন করুণায় ভরিয়া উঠিল।

আজিকার কৃতকর্ম্মের জন্য সে স্ত্রীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে!

রাস্তায় চলিতে চলিতে অনেক কথাই অজিতের মনে পড়িতেছে। একটা বৈঠকখানার ঘড়িতে সে দেখিল সাড়ে আট্‌টা বাজিয়া গেছে। অজিত একটু জোরে পা চালাইল। তৃপ্তি এতক্ষণ রান্নাঘরে তাহার জন্য ভাত লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে বাড়ী ফিরিলে যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া তবে সে খাইতে বসিবে। তারপর এঁটো পরিষ্কার করা—রাত্রেই বাসন মাজা—রান্নাঘর ধোওয়া—সমস্ত কাজ সারিতে এগারোটা বাজিয়া যাইবে—তারপর শোওয়া! আবার প্রভাত না হইতেই উঠিয়া আফিসের ভাত তৈয়ারী—কাজ, কাজ—শুধু কাজ!—নিজের উপর তাহার লক্ষ্য নাই—অকৃত্রিম সেবা আর যত্ন—জীবনে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকেই সে দেখিয়াছে বড় বলিয়া! তৃপ্তি—তাহার সহধর্ম্মিনী তৃপ্তি—মহীয়সী তৃপ্তি—তাহার উপর সে করে রাগ এবং অভিমান! অনুশোচনায় অজিতের অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল!

মাথার উপর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তারায় ভরা বর্ণোজ্জ্বল আকাশ—সহরের রাজপথের আলোকে চাঁদের আলো মিলাইয়া গেছে—মিষ্টি ঝির ঝিরে উদাসী বাতাস অজিতের কাছে বড় চমৎকার লাগিল! বহুদিন যেন সে এমন অম্লান আকাশ দেখে নাই। কলেজের যুগ পার হইয়া জীবনের বাসন্তী সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া আসিয়া কল্পনার রঙীন স্মৃতিরাশি পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিয়া আজ রূঢ় বাস্তবের আঙিনায় অজিত পদার্পণ করিয়াছে। সংসার—অভাব-অভিযোগ—হাহাকার—মনকে তাহার বিষাইয়া তুলিয়াছে! জীবন হইয়াছে দিনগত পাপক্ষয়,

কিন্তু তাহার মধ্যে আজিকার রাত্রি—এ যেন তাহার জীবনের একটি বড় রোমান্স।

অজিতের মন খুসিতে ভরিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ অজিতের মনে হইল আজকে তাহার বিবাহ-তিথি! হ্যাঁ এইরূপ আর এক ফাল্গুনী রাত্রেই তৃপ্তির সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল বটে! সে আজ বছর দশেক পূর্ব্বের কথা—কতদূরে তাহা চলিয়া গেছে!

এমনি দিনেই সে শুনিয়াছিল শানাইয়ের মধুর ইমনের আলাপ—কল্যাণময় একটি মধু উৎসবের মঙ্গল আনন্দ-গুঞ্জন-ধ্বনি। এমনি দিনেই সে দেখিয়াছিল চন্দন-চর্চ্চিত-ললাট এলায়িতচূর্ণকুন্তলরাশি সালঙ্করা ভীতা, আনন্দবিহ্বলচিত্তা কোমল কিশোরী বধূর তরুণী তন্বী মূর্ত্তি; চোখের কোনে প্রেমের মধুর স্বপ্ন বিলাস! এমনি দিনেই সে অনুভব করিয়াছিল তৃপ্তির পুলকিত অন্তরের সপ্রেম দিঠি!—সেদিন সে বর্ণোজ্জ্বল রাত্রি কোথায় মিলাইয়া গেছে! স্বপ্ন—আজ শুধু তাহা স্বপ্ন মাত্র!

দিনের পর দিন তাহারা চলিয়াছিল একটি স্বপ্নময় রঙীন কল্পনার রাজত্বের মধ্য দিয়া। কত অসংখ্য আশা ভরসাই না তাহাদের মনের মধ্যে নীড় বাঁধিয়াছিল—আজ সে জীবন কোথায়!—

অজিতের তন্ময়তা ভাঙিয়া যায়। রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল একটি ফুলওয়ালা।

অজিত তাহার কাছ হইতে একটি বেল ফুলের গোড়ের মালা কিনিয়া লইল।

আজকের দিনে কোন অশান্তি কোন দুঃখ কষ্টই তাহাদের মনে আর স্থান পাইবে না। তৃপ্তি আর সে—আজ আবার নবজীবন লাভ করিবে। ফুলের মালাটি আজ অজিত নিজেই তৃপ্তির খোঁপায় জড়াইয়া দিবে। আজ আবার তাহারা পিছনের দিনে ফিরিয়া যাইবে। বিবাহের জড়োয়া বেনারসীখানি তৃপ্তির বাক্সে এখনও সযত্নে তোলা আছে—আজ সে কোন বাধাই মানিবে না। বর্ত্তমান!—বর্ত্তমান আজ অজিতের মন হইতে ডুবিয়া গেছে। দুঃখ নাই—দারিদ্য নাই—সে আর তৃপ্তি—অতীত দিনের সুখময়ী রাত্রি—বর্ত্তমানের স্বপ্ন!

সংসার—মনের বার্দ্ধক্য—জীবনের সংগ্রাম—পন্টুর অসুখ—অফিসের রিট্রেঞ্চমেণ্টের ভাবনা—গুরুতর খাটুনি—অজিতের মনের পাতা হইতে সব কিছু বিলীন হইয়া গেছে আজ! কল্পনার মোহজাল তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। দীর্ঘপথ কোথা দিয়া অতিক্রান্ত হইয়া যায় অজিত তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

পন্টুর শিয়রে তৃপ্তি বসিয়া আছে—চোখে মুখে তাহার উদ্বেগ এবং আশঙ্কার গভীর ছাপ!—ইহারই মধ্যে ছেলের তিনবার তড়কার মতো হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া কিরূপ এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। হাত মুখ খিঁচাইয়া চোখ কপালে তুলিয়া ছট্‌পট্ করিতে করিতে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেছে। কি হইবে!—তৃপ্তি আর যেন সাহস পাইতেছে না!

পন্টু—ও পন্টু—বার বার হাত দিয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করিতেছে।—ভগবান—হে ভগবান! ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বিরক্তিবশে যে সন্তানের মৃত্যু কামনা করিয়াছে—বার বার তাহারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

নয়টা বাজিয়া গেছে—স্বামী এখনও আসিল না। অন্যদিন সে এতক্ষণ ফিরিয়া আসে। এখনও একজন ডাক্তার আনিলে হয়—ইহার পর হয়ত আর পন্টুকে বাঁচানো যাইবে না। না, তৃপ্তি আর এ অমঙ্গলের কথা ভাবিতে পারে না। গরিবের, কাঙালের ভগবান সহায়। এমন কিছু অপরাধ তাহারা করে নাই যাহার জন্য—

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তৃপ্তি বুঝিল স্বামী আসিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া দৌড়াইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই প্রসন্নচিত্তে অজিত গৃহে ঢুকিল। মুখে চোখে তাহার আনন্দ-বিহ্বলতা—হাতে গোড়ের মালা!—সাগ্রহে কি যেন সে বলিতে গেল; কিন্তু অকস্মাৎ তৃপ্তির বেদনা-উচ্ছল কণ্ঠস্বরে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। ওগো পন্টুর জ্বর আজ বড্ড বেড়েছে—তুমি চলে যাবার পর খাবি খাবার মত তিনবার—কি হবে গো—একজন ভালো ডাক্তার—

আর কিছুই বলিতে হইল না—অজিত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিল ডাক্তার ডাকিতে।

পন্টু—তাহার ভবিষ্যৎ বংশধর পন্টু—তাহার একমাত্র কুলপ্রদীপ পন্টু—বিনা চিকিৎসায় মরিবে!—হাত হইতে ফুলের মালাটি কখন্ যে পথধূলির সঙ্গলাভ করিয়াছে অজিতের সেদিকে লক্ষ্য নাই!

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান কালকে আমরা 'রেকর্ড' ভঙ্গের যুগ বলতে পারি। সকল ক্ষেত্রে—খেলা-ধূলা, শরীরচর্চ্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে ও ব্যাপারে অহরহ চল্‌ছে এক প্রবল প্রতিযোগিতা। হয়তো এটা নতুন জীবনের প্রবল স্পন্দন, কারণ বিজ্ঞানেরা বলেন প্রতিযোগিতাই উৎকর্ষের মূল। বীমার ব্যবসায়ে এই প্রতিযোগিতা কতখানি কল্যাণ সাধন করে সেইটিই বিবেচ্য।

প্রতিযোগিতা দ্বারা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের দোষ-ত্রুটি দূর হয়, সত্যিকার উন্নতি যা, যদি সকল প্রকারে ক্রমে ক্রমে তা-ই সাধিত হয়, তা হ'লে প্রতিযোগিতার সার্থকতা থাকে। আর যদি জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিশেষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন ক'রে বীমা-পত্র সংগ্রহের চেষ্টা হয়, অথচ সত্যিকার উন্নতির মাপকাঠি যা, সেদিকে আন্তরিক চেষ্টা না থাকে, তবে প্রতি-যোগিতায় ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টের সম্ভাবনাই থাকে বেশী।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা ক'রে দেখি। মনে করুন একটা কোম্পানীর নাম 'ক'। 'ক' বছরে ১ কোটি টাকার নতুন বীমা-পত্র পায়, বোনাস্ গড়পড়তা হাজার করা বছরে ২০ টাকা ক'রে দেয়, দাবীর টাকাও যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করে। সুতরাং দেশের মধ্যে 'ক' সুপ্রতিষ্ঠ, 'খ' অপেক্ষা-কৃত নতুন কোম্পানী। 'খ' কোথা থেকে বীমাপত্র সংগ্রহ করবে? লোকের কাছে তো 'ক'ই পরিচিত। কাজেই 'খ'এর কর্ম্মকর্ত্তাদের সব চেয়ে বড় কাজই হ'ল বিজ্ঞাপন ও বীমাকর্ম্মীদের মারফৎ চারদিকে প্রচার করা। প্রচারের মূল কথা হ'ল এই যে, 'খ'এর মত বীমা-প্রতিষ্ঠান আর নেই, 'খ'এ বীমা করলে যত সুবিধা এবং আর্থিক লাভ যত বেশী, এত সুবিধা ও লাভ 'ক' এর কাছে পাওয়া যায় না। 'খ' বীমাকর্ম্মীদের কমিশন দিলে 'ক' এর চেয়ে অনেক বেশী। কর্ম্মীরা সাধারণতঃ যেখানে বেশী পয়সা পায়, সেই দিকেই টলে। কর্ম্মীদের অবিশ্যি এতে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, পয়সার লোভে টলে না, এমন লোকতো চোখে বড় একটা পড়ে না। যাঁর চোখে পড়ে তিনি ভাগ্যবান নিশ্চই। কংগ্রেসেরই কত বড় বড় কেষ্ট বিষ্টুকে দেখা গেল গেল যাঁরা মাত্র কয়েক বছর আগে কত জন-সভাই না স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, এমন কি মাঝে মাঝে প্রাণত্যাগ ক'রে ফেলতেন! তাঁরাইতো আজ স্বার্থের লোভে, ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে করেন না, বা করতে পারেন না, এমন কোন কাজই নেই। দরিদ্র বীম-কর্ম্মীর আর দোষটাই বা কি?

এত ক'রেও যদি 'ক'এর সঙ্গে সমানে সমান পাল্লা দিতে 'খ' না পারে, বীমাপত্রের প্রস্তাবকরা যদি তুলন ক'রে বোনাসের কথা তোলে, এই জন্যেই কর্ম্মকর্ত্তারা খরচের হার কমাবার দিকে নজর না দিয়েও 'বোনাস্' ঘোষণা করেন। বোনাসের বর্ত্তমান হার এবং তিনি কি পাঁচ বছর পর সেই হারের ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়ে বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 'খ'এর মত কোম্পানীগুলি বর্ত্তমানে এই পন্থাই অব-লম্বন কচ্ছে।

বেশীর ভাগ লোকই বীমাকর্ম্মী যে লোভ দেখায় তা-ই বিশ্বাস করে। তাদের এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার আছে অনেক কিছু। প্রথমতো চাই কোম্পানীর নিরাপত্তা। বীমাপত্রের টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে কিনা এবং পরের টাকা পেয়ে কর্ম্মকর্ত্তারা যা কম খরচ করে কিনা, এইটিই দেখা চাই বিশেষ ক'রে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যোগ্যতা অনুসারে যিনি যে বেতন পাওয়ার যোগ্য, তার চেয়ে বেশী বেতন তিনি পান। একজন প্রকৃত যোগ্য লোক যদি ১০০৲ কি ২০০৲ টাকায় পাওয়া যায়, সেখানে কুলনায় ঢের অযোগ্য লোককে ৫০০৲ টাকা দেওয়ার অর্থই পরের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে এটা শুধু অন্যায় নয়, ভীষণ অপরাধ। একজন ম্যানেজারকে, যে-যোগ্যতার ওপর নির্ভর ক'রে বছরে একলক্ষ টাকা অথবা মাসে দশ হাজার টাকা, শুধু বেতন বাবদই দেওয়া হয়, সেরকম যোগ্য লোক মাসে ১০০০৲ টাকায় পাওয়া বিশেষ আয়াস-সাধ্য নয়। এতে খরচ ঢের বাঁচে, আর অংশীদার ও বীমাপত্রের গ্রাহকদের কিছু কিছু লাভও দেওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ এই কথাটি মনে রাখা খুবই সমীচীন যে, বোনাসের নিশ্চয়তা কিছু নেই। ভারতীয় কোম্পানী অবিশ্যি যে বোনাস একবার ঘোষণা করেন সেটা কমাতে পারেন না নানান কারণে। বিদেশী কোম্পানী পারেন এবং কোরেছেনও অনেকবার। এ অব-স্থায় কেবল বোনাসের পরিমাণই হিসাব ক'রে বীমা করতে যাওয়া ভাল নয়! বোনাস ও নিরাপত্তা দুইই থাকলে তো সোনায় সোহাগা। নতুন কোম্পানীর পক্ষে বীমাপত্র সংগ্রহের জন্য বোনাস ঘোষণা করা বড়ই মারাত্মক। এতে দেনার পরিমাণ (Liabilities) অত্যন্ত বেড়ে যায়। যে পরিমাণ বীমা একটা কোম্পানীতে হয়, কোম্পানীকে অন্ততঃ সেই পরিমাণ টাকা বীমাকারীকে দিতেই হবে। এই টাকা থেকেই কোম্পানীর খরচ হয় সব রকমের। এই খরচ বাদ দিয়ে বীমার পরিমাণ পোষাণো অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। মনে করুন ১০০৲ টাকা থেকে ৬০৲ কি ৭০৲ টাকা খরচ ক'রে ১০০৲ টাকা পূর্ণ করা কি সহজ ব্যাপার? এর ওপর বোনাস দিতে পারা যায় কি হ'লে? যদি এই কথা কেউ বলেন যে, কোম্পানী নানান ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে যথেষ্ট লাভ করে, তাই দিয়েই শুধু বাকী টাকা পূরণ করাই হয় না, তার ওপরেও বেশ কিছু হয়। কিন্তু ভেবে দেখা উচিত যে, ব্যবসায়ে টাকা খাটালে লাভের আশা যা থাকে, লোকসানের আশঙ্কা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশী লাভের আশায় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কোন বীমা কোম্পানী খুব বেশী পরিমাণ টাকা দিয়ে চিনির কারখানা চালাতে গিয়েছিলেন। ফলে লাভ হওয়া দূরে থাক্, মূলধন অবধি নিঃশেষ হয়ে গেছল। এই টাকা গেল কার? কর্ম্মকর্ত্তাদের নিশ্চয়ই নয়, গেছে বীমাকারীদের। এই জাতীয় ব্যবসায়ে বীমা প্রতিষ্ঠানের টাকা লগ্নী করে বোনাসের লোভ দেখানো কোন রকমেই সমীচীন মনে হয় না। এতে কোম্পানীর তহবিলে ঘাটতি পড়ে। কাজেই বীমাকারীর উচিত কোম্পানীর Full balance sheetটি আগে দেখা।

তৃতীয়তঃ, যে কোম্পানী রাতারাতি মোটা লাভ করবার দুঃস্বপ্ন না দেখে' বেশীর ভাগ টাকাই Government Security, Municipal debentures ইত্যাদি নানা রকমের নিরাপদ লগ্নী করেন, তাঁর বোনাস্ কম বা মোটে না হ'লেও তাঁকেই বিশ্বাস করতে হবে বেশী। কোম্পানীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিরাপত্তার মাপকাঠি প্রতিবছরের বীমাপত্রের সংখ্যাধিক্য ও বোনাসের মোটা হারই শুধু নয়! জনসাধারণ এই দুইটি বস্তুতে যত আকৃষ্ট হয়, কোম্পানীর অন্য গুণে তত আকৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের অবস্থা তিন চার বছর ধ'রে অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় ব্যাঙ্কের সুদের হারও কমে গেছে খুব বেশী। কাজেই নিতান্ত পুরাতন কোম্পানী ছাড়া এ বাজারে তিন চার বছরের নতুন কোম্পানীর বোনাস্ ঘোষণা দ্বারা কোম্পানীর Liabilitiesই বাড়ে। যদি এতে বীমাপত্রের সংখ্যা লাখে লাখে বেড়ে যায়, তাতে কোম্পানীর Liabilities বৃদ্ধি না হ'য়ে কমে না। তার চেয়ে বীমাপত্রের সংখ্যা তুলনায় ঢের কমই হোক না, বোনাস তাড়াতাড়ি ক'রে ঘোষণা নাই করা হোক্, ক্ষতি নেই, কোম্পানীর ভিত্তি সুদৃঢ় করা চাই, খরচের হার কমানো চাই, নিরাপদ লগ্নী হওয়া চাই; তারপর বোনাস্। বিশেষজ্ঞরাই বলেন, "Volume of business is not the criterion of soundness."

সাহিত্যায়ন

(সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক প্রেরিতব্য)

পথ ও ছায়া—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রসচক্র সাহিত্যসংসদ, ১৫, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বার তের বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন তখনই তাঁহার কবিতার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী ও অকৃত্রিম মাধুর্য্য পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে। এই বহুমুদ্রনের যুগে যখন সরস্বতীর মন্দির-প্রাঙ্গন কবিযশঃ-প্রার্থীদের ভিড়ে ও হুড়াহুড়িতে ধূলিকীর্ণ হাটের পথে পরিণত হইয়াছে, তখন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের মত একজন সহজ-শক্তিসম্পন্ন কবিকে এত দীর্ঘদিন পরে প্রথম কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিস্ময় লাগে। ইহার কারণ তিনি পুস্তকের মুখবন্ধে যে কয়েক ছত্র "নিবেদন" লিখিয়াছেন তাহার ভিতর হইতেই পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—"যশের জন্য কবিতা লিখি নাই, লিখিয়াছি আত্মপ্রসাদের জন্য।" এই কবি এবং ইহাঁর কবিতার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে তিনিই বলিবেন যে, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ছাব্বিশটী কবিতাপূর্ণ এই পুস্তকখানি শুধু যে কবির আত্মপ্রসাদের কারণ হইয়াছে তাহা নহে, পাঠকও তাহার অংশ পাইবেন। অধিকাংশই প্রেমের কবিতা—Love Lyrics—ফুটনোন্মুখ হৃদয়ের অনুরাগরঞ্জিত সহজ সুন্দর অভিব্যক্তি।

দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। রাখাল মাঠে গরু চরাইতেছে। স্নানার্থিনী বালিকার দল সেই পথে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে এক কিশোরী বালিকাকে দেখিয়া রাখালের মন উদাস হইল কিন্তু বালিকা কিছু না জানিয়া স্নানশেষে ফিরিয়া গেল। তখন রাখালের মনোভাব বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন :—

জগতের নির্ম্মম নয়ন 'পারে
ধরা যেথা নাহি দেয় কেহ কাহারে,—
সুনীল সাগর এক সৃজন করি'
রাখাল আঁখির জলে দিল যে ভরি',
অজানা কাহারা সেথা বাহিছে তরী,
উতরিতে আসে হায় কোন্ কিনারে!
জগতের দৃষ্টি 'পারে।

(বালিকা ও রাখাল)

আর একটা কবিতা "রাজা"। এই কবিতাটীতে কবি তাঁহার হৃদয় রাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, একটা 'জনম' বোধ হয় তাঁহাকে তাঁহার রাণীর নিকট হইতে দূরে থাকিতেই হইবে। কারণ 'এই জনমে' মানুষের দুঃখ, দৈন্য, ব্যথা ও কর্ম্ম তাঁহাকে ডাক দিয়াছে। একটী পদে কবি ইহার সুন্দর ছবি ফুটাইয়াছেন :—

হাতছানিতে ডাক দিয়ে যায়
ঐ যে কারা পথের ধূলায়,
হুহু স্বরে গুমরে ওঠে
শ্মশানজোড়া বহ্নি-চূলায়।
শুষ্ক নদীর কূলে কূলে
ঐ যে কারা কাঁদন তুলে
ঝঞ্ঝাহত তালের বনে
ব্যস্ত ব্যাকুল হস্ত বুলায়,
তপ্ত বালুর মরীচিকায়
সকল গানের ছন্দ ভুলায়।"

উপসংহারে কবি-অঙ্কিত কোজাগরী পূর্ণিমার আর একটী সুন্দর ছবি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আজি কোজাগরী কুহকিনী রাতি
পেতেছে ইন্দ্রজাল—
স্তম্ভিত দেশকাল।
জরা-যৌবন থমকি দাঁড়ায় মধুর মূর্চ্ছনায়,
জীবনে সহসা পরিপূর্ণতা রূপ-লাবণ্যে ভায়।
প্রাণে প্রাণে রস-সৌরভ উঠে ভরি'—
স্মৃতি-বিস্মৃতি-বেদনা-কমলে জাগে কোন্ সুন্দরী।

ছেলে ধরা—দাম আট আনা
রাক্ষসের দেশে—দাম আট আনা
চালিয়াৎ ছেলে—দাম ছ' আনা
} শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত—৭৮নং কাশীপুর রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

"ছেলেধরা" বড় গল্পের বই, "রাক্ষসের দেশে কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি এবং "চালিয়াৎ ছেলে" একটি নাটিকা। সবগুলিই একাধিক চিত্র-শোভিত।

প্রথম পুস্তক খানির গল্পের অবয়ব, ঘটনা সংস্থান, নানাস্থান ও বিপদ্ সঙ্কুল অবস্থার বর্ণনা পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। এই পুস্তকখানি ছেলেদের মধ্যে একটা দুঃসাহস, বাহিরের বিপদ্ ও ভয় জয় করিবার একটা আকাঙ্খা জাগাইবে। এইরূপ পুস্তকের এখন বিশেষ প্রয়োজন।

শেষোক্ত দুইখানি পুস্তক সুখপাঠ্য হইলেও বহুস্থলে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কল্পনাজগতেও সম্ভাব্যতার মাপকাঠি আছে; গল্প লিখিতে বসিয়া তাহা ভুলিলে চলিবে না।

ছাপার ভুল সম্বন্ধে আর একটু সাবধান হইলে ভাল হয়। দুই পুস্তকে এক ব্লক ব্যবহার করা সমীচীন নহে। "ছেলেধরা" পুস্তকের একটী ব্লক "রাক্ষসের দেশে"তে ব্যবহৃত হওয়ায় মারাত্মক ভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে।

যাহা হউক, লেখকের শিশুসাহিত্যের রচনায় হাত আছে। ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরও সুন্দর রচনা আশা করি।

শ্রীসুবোধ রায়

আর্টের আটচালা

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

অপ্রকাশ, না সপ্রকাশ?

মাতা বসুমতী সর্ব্বংসহা—এইরূপ একটা কথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা যাঁহারা "শারদীয়া বসুমতী" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। কে এক শ্রীযুক্ত অপ্রকাশ গুপ্ত "শারদীয়া বসুমতী"র বুকে যেরূপ অবাধে লেখনী-খনিত্র দিয়া নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া সপ্রকাশ হইয়াছেন, তাহা দেখিলে "বসুমতী"র জন্য বাস্তবিকই দুঃখ হয়। গল্প, কবিতা, নক্সা, নাটিকা সকল ক্ষেত্রেই এই দুর্দ্ধর্ষ লেখক আপনার বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে, এই মহা-লেখক "আধুনিক উপন্যাস" নামক এক নক্সা রচনা করিয়াছেন। জনৈক ওয়াকিব-হাল পাঠক বলিতেছিলেন যে ইহা Stephen Leacock-এর "Winsome Winnie" পুস্তকের Split in the Cabinet অবলম্বনে রচিত। অথচ লেখক তাহা কোথাও স্বীকার করেন নাই। লেখক যেরূপ অধ্যবসায়ী তাহাতে তাঁহার এইরূপ হজমশক্তি থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

এই রচনার মুখবন্ধে লেখক মহাশয় অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন :—"সবজান্তার আদর্শে আমরা বাদামের খোলায়

(in a nut-shell) একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদরা ভরিয়া দিতেছি। ইচ্ছা আছে, পূজার গোলমাল কাটিলে এ বহি পূর্ণাকারে ছাপাইব।"

ঐ ইচ্ছা পর্য্যন্তই ভাল। কারণ, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে John Lane Company-র নিকট হইতে উকীলের চিঠি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

এই লেখক-ধুরন্ধর নিজেকে অপ্রকাশ বা গুপ্ত রাখিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গলার একজন নামজাদা লেখক, যাঁহার এইরূপ বিনা মাশুলে বিদেশী লেখার ভেলায় বাঙ্গলা সাহিত্যের মরাগাঙ্গে পাড়ি দেওয়ার অভ্যাস আছে, তাঁহারই ছায়া যেন এই নামের অন্তরালে দেখিতে পাইতেছি!

উপদেশের বহর

এই সংখ্যাতেই গুপ্ত মহাশয় "নারী" শীর্ষক এক কবিতা লিখিয়াছেন বা কিঞ্চিৎ ছড়া কাটিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কবিতায় তিনি যে সকল নারী পুরুষের সহিত সাম্য চাহিতেছে, তাহাদিগকে উক্ত কু-কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশের একটু নমুনা :—

"সুখে আছ। মিছে সাম্য-ভূতেরে
ডেকে কেন কিল খাবে?
টাকার বাজার সে যে কি ভীষণ
হাড়ে ঘুণ ধ'রে যাবে!
সোণার বরণ হ'বে কালিঝুল
কুঞ্চিত কালো কেশে
চাঁদে বাঁধা হায় কবরী কোমল
ঘুচে যাবে অবশেষে।
যে চারু নয়নে খেলে কটাক্ষ
চাহনির নাহি তুলা—
সে নয়নতলে জাগিবে কালিমা
আঁখি হ'বে যেন চুলা!"

এই সবজান্তা লেখক জানেন কি যে, বাঙ্গলার শত সহস্র নারী যাহারা সাম্যের গান কখনও শুনে নাই এবং শুনিলেও সে গান নিজেরা গাহিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের "সোণার বরণ" আজ রোগে "কালিঝুল" হইয়াছে। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গলার শত শত গৃহকর্ম্মনিরতা কল্যাণী নারীর "নয়নতলে কালিমা" জাগিয়া "আঁখি চুলায়" পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রতীকার কি কবি-রাজ মহাশয় বলিতে পারেন?

ভবিষ্যতের এই ভীতিপ্রদ ছবিতেও নারী ভয় না পাইয়া যদি পথে বাহির হইয়া পড়ে, তাই তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তিনি লিখিতেছেন :—

"ঘরে বাসা আছ, আরামে মজায়
বোঝো'না পথের কষ্ট,
আছে গো-মহিষ, ছুটন্ত বাস
বলি শোনো কথা স্পষ্ট—
হাঁটুভোর জল আষাঢ়ে-শ্রাবণে
চাঁদি-ফাটা রোদ গ্রীষ্মে,
ইন্‌কামট্যাক্স, পাহার-ওয়ালা
মাতাল—ভীষণ দৃশ্যে!"

বাস্তবিক্—লেখকের নারীজাতির প্রতি কি অসীম দরদ!! যে সকল নারী সাম্য চাহিতেছেন, তাঁহারা তো এতদিন জানিতেন না যে, পথে এই সকল ভয়ঙ্কর জিনিষ আছে! তাই এই সংবাদ দিয়া তিনি অবলা-সুহৃদেরই কাজ করিয়াছেন। প্রকাশ, লেখকের এই বিভীষিকা-মন্ত্র আওড়ানোর পর হইতে বাঙ্গলায় নারী-আন্দোলন একরূপ বন্ধ! ইহার ফলে নাকি বাঙ্গলার বহু অবিবাহিতা নারী নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের সকলকে যদি গৃহধর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে এখন হইতে কিছুদিন বাঙ্গলার প্রত্যেক যুবকের তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ঢাকের বাদ্য

কার্ত্তিকের "ভারতবর্ষে" শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার একটা গল্প লিখিয়াছেন—পল্লীচিত্র। পল্লীসমাজের যে দোষ শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহু শক্তিশালী লেখক দেখাইয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি কিন্তু অতিভাষণে ভরা। এক সখের ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার আছে—সে বিশেষ কিছু জানে না কিন্তু ডাক্তারের নিকট বড় বড় রোগের নাম করিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করে। যথা—"Hyperbonadium Carborised রোগ"। "চিকিৎসা সঙ্কটে"র মত নক্সাচিত্রে ইহা চলিতে পারে। কিন্তু গম্ভীর গল্পের মধ্যে এরূপ অতিভাষণ অত্যন্ত বিসদৃশ।

লেখকের ভাষার দুই একটা নমুনা :—

"ডেরার পাশে ডেরা কুঁজো হ'য়ে জড়, স্থবির, বার্দ্ধক্যের পাঁচালী গায়, মাঠে জলের ঢেউ বয়।"

(বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভেদে পাঁচালী কয় প্রকার?)

"তুলসী-বেদীতে বাতি দে'য়া হয় না, দেখানো হয় ওপর থেকে। প্রদীপের ক্ষীণ শিখায় ধূপের গন্ধ না থাকলেও সংস্কার বশতঃ ধোঁয়া সোঁকানো হয়।" (প্রদীপের শিখা হইতে ধূপের গন্ধ বাহির হয়—এ কথা কেহ জানেন কি?)

"রোগী আসে, গলা কাসি দেয়," ইত্যাদি। লেখক গল্পটির নাম দিয়াছেন "হট্টগোলের বাইরে।" তিনি নিজে যদি এইরূপ সাহিত্যিক হট্টগোলের বাইরে থাকেন, তাহা হইলেই ভাল।

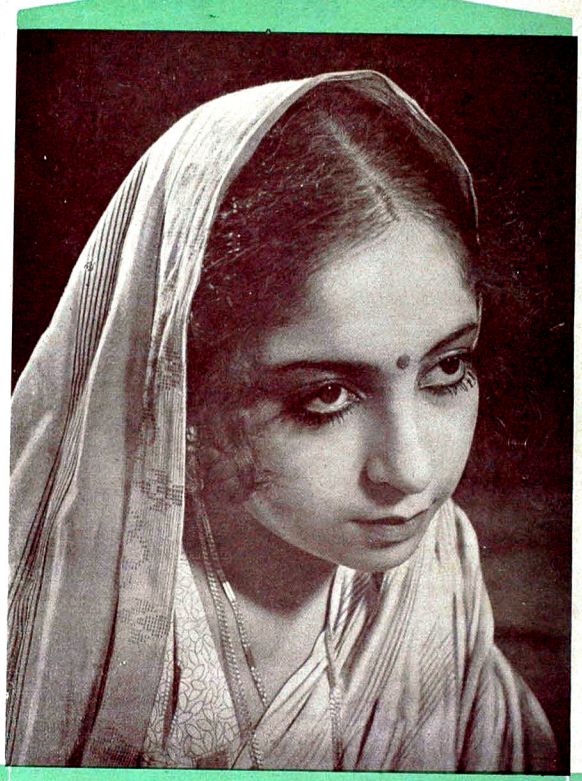

জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না। রূপোলী পর্দ্দা জ্যোৎস্নালোকে ঝলসে তুলবে "তরুবালা" ছবিতে।

দুর্গাদাস কী মায়া জানে!—নইলে আজ পনের বছর ধরে শত-সহস্র নর-নারীর হৃদয়-আসনে বিরাজ কোর্‌ছেন কিরূপে? "ভাগ্যচক্রে" তাঁর প্রতিভার কিরণ উদ্ভাসিত হ'য়েছে—পরিপূর্ণরূপে।

রূপ ছায়া

শ্রীমিলন মিত্র

হিসেব নিয়ে দেখা গেলো, হলিউডে এ বছর বিখ্যাত
[...]ন বিবাহিত জীবনের ওপর হঠাৎ-যবনিকা পড়েছে
[...]ন্য বছরের চেয়ে বেশী। এতে প্রমাণ হ'লো
[...]দেশে বিয়ের রঙীন্ সুতো যত শক্তই হোক না কেন,
[...]লিউডের হাওয়া তা ছিঁড়্‌বেই ছিড়্‌বে। যে স্ত্রী আজকে
[...]নে পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী বলে' পরিচয় দিচ্ছে,
[...]লই দেখি তার চোখে দুঃখের একটা কালো আবরণ;
[...]ং সেই সঙ্গে এটাও আমরা জানি, যে সে আবরণ
[...]ণিক। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে কালোর সোনালী
[...]রিণতি হ'তে কতক্ষণ!

মেট্রোর উঠ্‌তি তারকা লেটি ফার্‌নেসকে এখানে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। টেনিস খেল্‌তে এ ভারী ভালোবাসে।

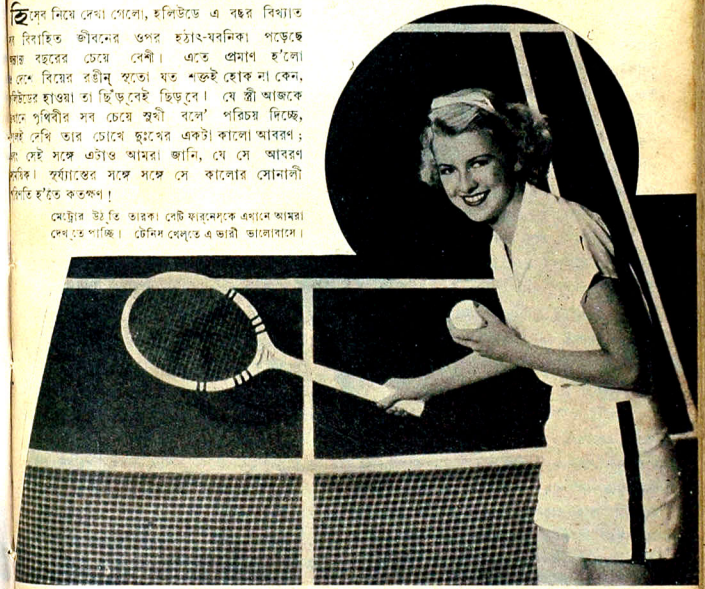

এই বিচ্ছেদের কারণ অনেক সময় আমাদের কাছে হাস্যাস্পদ। জিন্ হার্লো ক্যামেরা-ম্যানস্বামী হল্ রসনকে ছাড়্লে কেন জানেন? তার স্বামী লোকটা ভারী বইয়ের ভক্ত ছিলো। রাত জেগে বিছানায় সে প্রায় রোজই পড়্তো। জিন-এর চোখে লাগ্তো আলো। অতএব, কোর্টের আশ্রয়। শুনি হার্লোর—হাতে আবার নাকি এক হীরে জ্বলে' উঠেছে। তবে সে আংটি উইলিয়ম পাওয়েল্এর দেওয়া কিনা কেউ বল্তে পারে না।

ডগ্লাস-মেরির বিখ্যাত বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক এ বছরই চুক্লো। এ খবরটি এতো বিখ্যাত যে, এর বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

শনিবার সন্ধ্যেবেলা বিদেশী ডাক যেমন আসে, এবারও এসেছে ঠিক তেমনি। বারবাক্স থেকে বাদামী দু'খানা খাম। একটিতে এক প্রবন্ধের নাম- ব্লনডেল্ আর বারন্স্। জোন ব্লনডেল আর জর্জ্জ বারন্স্এর বিবাহিত জীবন ক-ত-দূ-র যে সুখী—তারই অতি বিস্তৃত এক আলোচনা। দ্বিতীয় খামেই আরেক খবর—ব্লনডেল্ আর বারন্স্এর স্ত্রী নয়!

চিত্রশিল্পী আর চিত্র-অভিনেত্রীতে বিয়ের জাল বোনা বাস্তবিকই হলিউডে ভারী অসম্ভব। প্রথম প্রমাণ—হার্লো-রসন। দ্বিতীয়—বারন্স্-ব্লনডেল।

বুড়ো বয়েসে জন ব্যারীমুর সেদিন ডেলোরেস্ কষ্টেলোকে তার স্ত্রীপদ থেকে প্রত্যাখ্যান করলে। সুনামের উচ্চ শিখরে কষ্টেলো যখন, তখন জন একদিন বলেছিলো তুমি আমায় বিয়ে করবে? কষ্টেলো সানন্দে সেদিন সম্মতি দিয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে ছায়াছবিকে বলেছিলো—হে বন্ধু, বিদায়। কিন্তু, হায়, তারই নিমন্ত্রণ-লিপি আজ সে সলজ্জে অথচ সাগ্রহে অপেক্ষা করে।

এর ফলে তিনজন কিন্তু তাকে ফিরে পেয়েছে। এক হচ্ছে তার বাবা মউরিশ কষ্টেলো, দুই—তার বোন হেলেন, আর তিন—আমি, আপনি, হ্যারি, ডিক, হরি। মউরিশ চিরকাল মেয়েকে এ বিয়ে করতে বারণ করেছিলো। আর বিয়ের কিছুদিন পর হেলেন-ডোলোরেস্এ মুখ দেখাদেখি হ'তো না। কেন? —তাই এখন বল্ছি।

কলম্বিয়ার অ্যান্ সাদার্ণ—দিনে দিনে রূপ তার বাড়ছে। রোজার প্রায়ার-এর সঙ্গে এর আধুনিক ছবি।

হেলেন্এর স্বামী ছিলো লোওয়েল্ সারমান। পরিচয়—পরিচালক, অকাল মৃত্যুর আগে তার শেষ ছবি 'নাইট লাইক্ অফ্ গড্স্'। এই লোওয়েল্

এক কালে অভিনয় করতো চমৎকার। 'জেনারাল ক্র্যাক্' বলে' এক ছবিতে জন আর লোওয়েল একসঙ্গে নেবেছিলো। এতে লোওয়েল এতো ভালো অভিনয় করলে যে জনএর মুখে তো একবারে চুণ-কালি! জনএর কিন্তু এক নিয়ম আছে! এ নিয়ম হচ্ছে—যে ছবিতে সে অভিনয় করবে—সে ছবির একমাত্র কর্ত্তা হবে জন নিজে। এরই ফলে লোওয়েল-এর অতো চমৎকার অভিনয় সম্পাদকের পায়ের তলাতেই পড়েছিলো, সাধারণ দেখতে পায়নি। এ ঘটনার পর থেকে ডোলোরেস্ আর হেলেন্এ মুখ দেখাদেখি হয়নি।

হলিউড হঠাৎ এ বছর খুব সেক্স্পীয়র নিয়ে মেতে পড়েছে। ওয়ার্ণারএর হয়ে মাক্স্ রিনহার্ট্-এর 'মিড্সামার নাইট্স্ ড্রিম' তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। তারপর—নরমা শিয়ারারের পরের ছবি হচ্ছে—'রোমিয়ো এণ্ড্ জুলিয়েট্'। শোনা যাচ্ছে এর পর 'হ্যামলেট্'ও নাকি হবে। ছবি তৈরী তো হচ্ছে, তবে আমেরিকানদের তা রুচিসঙ্গত হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহই আমার আছে। এ সন্দেহ আমার কেন—নীচের ঘটনাটি পড়লেই আপনারা বুঝ্তে পারবেন। এটিকে অনেকে করে বিশ্বাস, অনেকে বলে মিথ্যে। অনেকদিনের আগের কথা অবিশ্যি। আমেরিকার বিখ্যাত এক রঙ্গমঞ্চে 'হ্যামলেট্'-এর অভিনয় হচ্ছিলো। যবনিকা পড়্বার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের প্রবল চীৎকার উঠ্লো—'নাটকের লেখক কোথায়? লেখক?'

ম্যানেজারের তো মুস্কিল। সেক্স্পীয়ার যে সত্যিই এ মর্ত্তলোকে আর নেই—এ কথা জনতাকে সে বোঝায় কী করে! আবার কিছু না বলে'ও উপায় নেই—তাদের চঞ্চলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, অভিনন্দন গ্রহণ করতে সে নিজেকেই নাটকের রচয়িতা বলে' পরিচয় দিলে।

ফলে, দর্শকদের গুলিতে তার সেদিন প্রাণনাশ।

মউরিন ও'সুলাভান আইরিশ মেয়ে। আমেরিকা তাকে পেয়ে কতো বড়োই না ক'রে তুললো।

চিত্র-সংস্করণে নরমা শিয়ারার যে জুলিয়েট্—এ কথা না বল্লেও চলে। তবে 'রোমিয়ো' এখনও ঠিক হয়নি। আমার মনে হয় এ অংশটি খুব সম্ভব নেল্সন এডি পাবে। এর পরিচালক—জর্জ্জ কুকর, পৃথিবীতে এ শাখায় সব চেয়ে মাইনে যে পায় বেশী। সম্প্রতি ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট্এর ডেভিড্ ও' সেল্জ্নিক একে বছরে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে তিন বছরের জন্য

চুক্তিতে আবদ্ধ ক'রেছেন। এর আগে সবচেয়ে মোটা টাকা পকেটস্থ করতো আর্ণ্শ্ লুবিশ। প্রতি চিত্রে তার পারিশ্রমিক ছিলো পঁচিশ হাজার পাউণ্ড। জর্জ্জ এককালে মঞ্চ-পরিচালক ছিলো, চিত্ররাজ্যে প্রবেশের পর এর প্রথম কাজ—'অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ্ ফ্রণ্ট্'এর 'ডায়ালগ্' লেখা। ক্যাথরিন হেপবার্ণ্কে আবিষ্কার করে জর্জ্জই প্রথম। হেপ্বার্ণের ছবিই এখন পরিচালনা সে কর্ছে—'সিল্ভিয়া স্কারলেট্।'

বিলেতের বেনিটা হিউম হলিউডে এখন মউরিন ও' সুলিভান্এর প্রধান শত্রু। জনি ওয়াইস্ মূলারের আধুনিক ছবি 'টার্জন রিটার্ণস্'এ বেনিটাই হবে নায়িকা; মউরিন নয়।

পাঁচ বছরের আগেকার কথা। হলিউডে জোর এক গুজব উঠেছিলো—গ্রেটা গার্বোর পরের ছবি নাকি—'ক্যামিলি'। কিন্তু, সে গুজব আজ পর্য্যন্ত সত্যে পরিণত হয়নি। তবে এবার সত্যে পরিণত হবার খুবই সম্ভাবনা আছে। মেট্রোর লিয়ো সিংহ হাঁক ছেড়েছে—গার্বো এবার নাব্তে পারে 'ক্যামিলি'তে। সেদিন হলিউডের বিখ্যাত দুই পরিচালককে অবিবাহিত জীবনকে বল্তে হয়েছে—বিদায়। নায়ক দু'জন হচ্ছে আর্ণ্শ্ লুবিশ আর লুইস্ মাইলষ্টোন। লুবিশকে পরিচালক বলা এখন অন্যায় হবে—কারণ সে প্যারামাউন্টের এখন প্রযোজক। যাকগে, লুবিশ যেদিন ভিভিয়ান গে'কে বল্লে—তুমিই আমার স্ত্রী, সেদিনই মাইলষ্টোন কেন্ডাল লি মেন্জারকে কনে' সাজিয়ে চার্চ্চে নিয়ে গিয়েছিলো।

মে ওয়েষ্টের মনটি যে খুব উদার এর প্রমাণ আমরা অনেক দিনই পেয়েছি। আবার পাচ্ছি—নতুন আরেক ঘটনা থেকে। রোজ সন্ধ্যায় সে যেমন চুল ঠিক করতে হলিউডের বিখ্যাত এক দোকানে যায়, সেদিনও তেমনি গেছে। চুল নিয়ে নাড়াচাড়া কর্ছিলো যে পরিচারিকা তার মুখ দেখে মে'র হঠাৎ মনে হ'লো—যেন গভীর একটা দুঃখের ছায়া তার চোখে। তিন-চার বার তার কারণ জিজ্ঞেস কর্বার পর ওয়েষ্ট জান্তে পার্লে—মেয়েটির মার অত্যন্ত অসুখ। দেখ্তে যাবার তার ভারী ইচ্ছে, কিন্তু পথ অনেকটা দূর। ট্রেণে যেতে পয়সা লাগে অনেক। অতো পয়সা তার নেই।

তখন সে কী কর্লে—এ ভাবা খুব কঠিন কাজ নয়। হাত-ব্যাগ্ থেকে টেনে সে বার করলে চেক-বই। বড়ো রকম এক টাকার অঙ্ক লিখে মেয়েটিকে সে তখুনি তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

প্যারামাউন্টের হ'য়ে হারল্ড লয়েড-এর নতুন ছবি 'মিলকি ওয়ে'। চিত্র গ্রহণের পর ষ্টুডিয়োর ডাক্তার যে রিপোর্ট্ দাখিল করেছিলো—তা হচ্ছে এই—

১। হারল্ড লয়েড্। থুত্নীর ওপর প্রবল আঘাত। কারণ—প্রথম দিকের এক দৃশ্যে, লিওনেল ষ্ট্যাণ্ডার্এর মুষ্টি হঠাৎ এসে লাগে। (ষ্ট্যাণ্ডার্ ক্যালিফোর্ণিয়ার এক মুষ্টি-যোদ্ধা)।

২। উইলিয়াম গার্গান। থুত্নীর ওপর অল্প আঘাত। কারণ লিওনেল ষ্ট্যাণ্ডার্কে এক দৃশ্যে সে আলিঙ্গন করেছিলো।

৩। অ্যাডলফ্ মেন্জু। থুত্নীর ওপর অপ্রবল আঘাত। কারণ—লিওনেল ষ্ট্যাণ্ডার্এর সঙ্গে এক দৃশ্যে একবার অভিনয়।

৪। হেলেন ম্যাক্। হাতের আঙুলে আঘাত। কারণ—লিওনেল ষ্ট্যাণ্ডার এক দৃশ্যে তাকে হাত ঝাঁকুনি দিয়েছিলো।

মিঃ ষ্ট্যাণ্ডার আজকাল মারামারির দৃশ্যে প্রায়ই নাব্ছেন।

জিন্ হার্লো আর ডিক পাও-য়েল রেডিয়োতে গান গাইছিলো—এমন সময়ে এই ছবি।

ম্যাজে সিওয়েল এর নাম। মেট্রোর ছবির এ মেয়ে-সম্পাদক।

জোন্ ক্রাওফোর্ড্ আর ব্রায়ন্ আরন্ একসঙ্গে নেবেছে ক্রাওফোর্ড্এর আধুনিক ছবিতে। আরন্‌কে ওপরে জোন্ নিজের হাতের তৈরি খাবার খাওয়াচ্ছে।

আমাদের দেশ

কল্‌কাতার সব ষ্টুডিয়োর কী খবর নতুন করে' আপনাদের দেবো—তা বাস্তবিকই ভাবনার বিষয়। নতুনত্বের দিক থেকে গাঙ্গুলী মশাইএর কালী ফিল্মস্—আমার কাছে মন্দ লাগ্‌ছে না।

"যা বো যা, মা ঠায়ে ছুধ পিবো যা"। উড়িয়া ভাষায় প্রাজ্ঞ আমি নই, এবং এও বল্‌তে চাইনে যে-কথাটি এই মাত্র আমি লিখেছি তা খাঁটি উৎকল। উৎকট উৎকলও হতে পারে। মোট কথা, এই রকম একটা কিছু আমরা সেদিন শুনে এসেছি। এ কথাটির ভাবার্থ হচ্ছে—"যা পালা এখান থেকে। মার কাছে গিয়ে ছুদু-ভাতু খা'গে যা।" বল্‌ছে—খুব সম্ভব—মারীচ্, রাম আর লক্ষ্মণকে।

রাম ও লক্ষ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে বনে এসেছে রাক্ষসের হাত থেকে ব্রাহ্মণদের বাঁচাতে। পথের মাঝে এদের ওদের দেখা। তাই এই ঝগড়া।

সর্ব্বপ্রথম উৎকল ভাষায় এই প্রথম সবাক-চিত্র গাঙ্গুলী মশাই ক্যামেরাম্যান ননী সান্যালকে দিয়ে তোলালেন। নাম—'সীতার বিবাহ'।

চিত্রখানি প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। অতএব, কিছুদিন পর, আমার কিম্বা আপনার বাড়ীর উড়িয়া ঠাকুর চাকর যদি এক আধ বেলা নাই আসে—ভেবে নেবেন—নিশ্চয়ই তারা এ 'নতুন্অ বাইস্কপ্অ' দেখ্‌তে গেছে।

এ ষ্টুডিয়োর অন্যান্য খবর আপনাদের জানা আছে।

বোম্বাই-ফেরৎ দেবকী বাবু কী যে তুল্‌বেন এখনও ভেবেই পাচ্ছেন না। তবে—শুনলুম—সেদিন তিনি নাকি শান্তিনিকেতনে গিছ্‌লেন। রবীন্দ্রনাথের মনোরম নিকেতনের প্রাকৃতিক শোভা তিনি যে দেখ্‌তে যান নি এ আমরা জানি। দেবকীবাবু বাস্তবিকই কী শেষকালটা রবীন্দ্র-নাথের গুরুতর উপন্যাস নিয়ে পড়লেন? আবার শুনি—তিনি নাকি এক কমিক-ছবি তুল্‌বেন। কী যে হবে শেষ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারা মুস্কিল।

'প্রফুল্ল' প্রায় শেষ-পথে। 'মণি-কাঞ্চণ' (দ্বিতীয় পর্ব্ব) আর 'বিদ্যাসুন্দর' সুন্দরী 'উত্তরা'য় ২রা নভেম্বর পেয়েছে প্রথম প্রকাশ।

নদীয়ার নিমাই এবার নিয়ে ক'বার এলেন কল্‌কাতায়! খোল্-করতাল, সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সর্ব্বপ্রথম তিনি দেখা করলেন দেবকীবাবুর সঙ্গে। দেবকী বোস তখন সবে মাত্র বম্বে মেল্ থেকে নেবে—অনেক ঘোরাফেরা করে'—গাঙ্গুলী মশায়ের আস্তানায় গিয়ে বিশ্রাম কর্‌ছেন বল্‌লেন—'আচ্ছা, আপনাকেই নিয়ে' তুল্‌বো ছবি

মার্‌লে ওবারন্ ও স্যামুয়েল্ গোল্ড্‌উইন। 'ডার্ক্ এন্‌জেল্'এর মার্‌লে হচ্ছে নায়িকা আর স্যাম্ প্রযোজক। মার্‌লে নাকি শিগ্‌গীরই আসবে কল্‌কাতায়।

ফলে, পাতায় পাতায় পড়্‌লো বিজ্ঞাপন। সন্ধ্যে বেলাতেই বোস্ বাবু সিনারিয়ো লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এলো 'ভাগ্যচক্র'। নিমাইকে নিয়ে দেবকী বাবু আমার পাশে বসেই দেখে

এলেন। শেষ হ'লো ছবি। ছাত্ থেকে ইউসুফ্ মুল্জি ছবি তুল্লো। নিমাই বাবু জিজ্ঞেস্ করলেন 'কেমন লাগ্লো, ডাইরেক্টর?' ডাইরেক্টর তখন স্বপ্ন দেখছেন। বল্লেন—'জানেন? এই খানেই আমার 'চণ্ডীদাস' ভারতে সব চেয়ে বড়ো রেকর্ড ভেঙ্গেছিলো।'

রেকর্ড্ ভাঙ্গাভাঙ্গির ব্যাপার নিমাইএর মাথায় ঢুক্লো না। শিশু-বিনিন্দিত সরল প্রাণ। বল্লেন—'চণ্ডীদাসটা এমন ছেলেমানুষ আমি জানি।'

দেবকী বাবু বল্লেন তাই, আর চণ্ডীদাস-ফণ্ডীদাস নয়। খোল্-করতাল আমি আর চাইনে। এবার... সামাজিক সবাক-চিত্র'—ব'লেই ট্যাক্সীতে উঠে' বল্লেন, 'চালাও'। নিমাই চীৎকার করে' উঠ্লেন—'আমাকে নিয়ে যাবেন না, ডাইরেকটর?'

ট্যাক্সীর ভেতর থেকে জবাবের বদলে এলো এক রাশ ধোঁয়া।

ছোটার অভ্যেস নিমাইএর ছোটোকাল থেকেই আছে। তিনি পেছন পেছন ছুটলেন। বল্তে

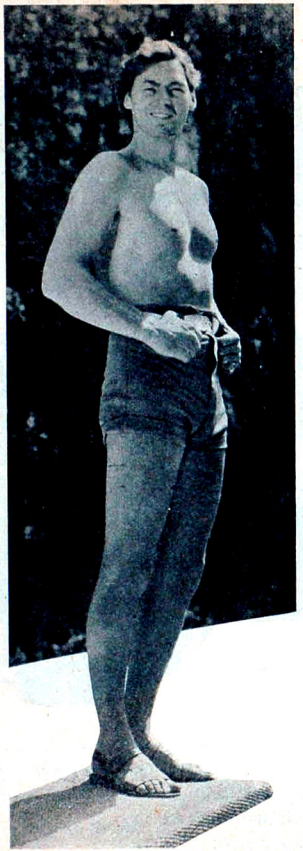

জনি ওয়াইস্‌মুলার। 'টারজন্' বল্লেই একে চিনি আমরা বেশি। নতুন এক 'টারজন' ছবিতে শিগ্‌গীরই এ নাব্‌বে।

লাগ্লেন—'নিঠুর তুমি—আমা ত্যজি কোথা যাও?' জবাব এইবার এলো—'শান্তি নিকেতন।'

নিমাই থুত্নীর ওপর বুড়ো আঙুল ঘষে' বল্লেন 'আড়ি।' কিছুক্ষণ পর গুণ গুণ গান শোনা গেলো—'কোথা যাই, কোথা যাই।' তারপরই 'চলে যাই,' কার কাছে? না, বঙ্গ-সবাকে আজি স্বরগ আনিল যে'—

যার কাছে নিমাই এবার গেলেন তিনিও বোস্। নীতীন বোস। নীতীন বাবুর সঙ্গে সেদিন তাঁর না দেখা হ'লেও পরদিন হয়েছিলো।

পরের দৃশ্য—হাওড়া ষ্টেশন। হাজারিবাগএর ট্রেন্ দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীদের কোলাহল, পান-বিড়ি, চা-গরম ইত্যাদি নানাপ্রকার শব্দ। একটি উচ্চ-শ্রেণীর কাম্‌রা থেকে নীতীন বাবু নাব্‌লেন। কপালে তিলক-চন্দন কাছেই নিমাই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নীতীন বাবু—আমি হাজারিবাগ থেকে 'হেল্‌থ্'টা ভালো করে' আসি বুঝেছেন?—তারপর আপনাকেই নিয়ে তুল্‌বো ছবি।

নিউ থিয়েটার্স্‌এ নীতীনবাবু নাকি ঠিক করেছেন 'নিমাই সন্ন্যাস' তুলবেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সামাজিক উপন্যাস নিয়ে থাকাই উচিত। কারণ, এই দিকেই তাঁর সুনামের আশা বেশী।

প্রমথেশবাবু শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-কাজে হাত দিয়েছেন। শুভ-সংবাদ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চিত্র-রূপ দিতে আমার মতে প্রমথেশবাবুই সব চেয়ে উপযুক্ত। আমাদের যদি একটা ষ্টুডিয়ো থাক্‌তো—শরৎবাবুর সব বইগুলো কিনে দিয়ে দিতুম প্রমথেশ বাবুর হাতে। অবিশ্যি, একটা নিয়ম আমাদের থাক্‌তো; সেটি হচ্ছে—তাঁকে ক্যামেরার পেছনেই সব সময় থাক্‌তে হবে—সাম্‌নে নয়।

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দার্জ্জিলিঙ্ না হাজারিবাগ গিছ্‌লেন। যেখানেই গিয়ে থাকুন না কেন—তিনি যে "বিজয়া"র উপযোগী নিজের চেহারায় জৌলস লাগিয়ে এসেছেন—এ আমরা জানি। কী করে?—সেদিন, স্বদেশী প্রদর্শনী।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী সেদিন শ্রীমতী শান্তি গুপ্তাকে নিজেদের শ্রেণীভুক্ত ক'রে নিয়েছেন। "কৃষ্ণ-সুদামা"য় ইনি একটি উন্নত অংশে অভিনয় কর্‌বেন। শান্তির মুখে ছায়াছবির উপযোগী মিষ্টত্ব আছে প্রচুর, এবং আমরা খুবই আশা করি যে রাধার আর্ক্ ল্যাম্পের আলো এঁকে এ রাজ্যে আরো বিখ্যাত হ'বার সুযোগ দেবে। "কৃষ্ণ-সুদামা"য় উজ্জ্বল সোনালী আভা ফোটাতে কর্ত্তৃপক্ষ রূপোর কার্পণ্য কর্‌ছেন কম। বিরাট্ সেটএর নীচে, হাজার আলোর তলায়, হাজার ফুট্ ফিল্ম্‌এ প্রায় রোজই আলো লাগানো হচ্ছে। পরিচালক হরিপদ বাবুর পরিশ্রমের অন্ত নেই। আমরা নিঃসন্দেহ—তাঁর পরিশ্রম হবে সার্থক।

ও দিকে জ্যোতিষ বাবুর 'কণ্ঠহার' হু হু করে' ছুটে চলেছে রণলালের বাইক্‌এর চাকার মত। ছবিটির মুক্তি আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা কর্‌ছি।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ায় 'পথের শেষে'র মহলা আরম্ভ হয়েছে। বাংলা ভাষার পরিচালনা কর্‌বেন শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় আর হিন্দী—স্বয়ং বি, এল্, খেম্‌কা। মিঃ খেম্‌কা আরেকখানা ছবির পরিচালনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছেন, সেটি হচ্ছে "৩৬ সনের কনে"।

এ ষ্টুডিয়োর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, এই ষ্টুডিয়োরই প্রধান ক্যামেরাম্যান শ্রীযতীন দাস 'ষ্টার ফিল্মস্' বলে' এক কোম্পানী গঠন করে' স্বাধীনভাবে "পরপারে" তুল্‌বেন। প্রধান ভূমিকায় খুব সম্ভব বাংলার বিখ্যাত নট শ্রীদুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। তা ছাড়া যাঁরা নাব্‌বেন ঠিক হয়েছে—তাঁদের নাম যথাক্রমে—শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীযোগেশ চৌধুরী ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা। দাস মহাশয়ের এ উদ্যমের প্রশংসা করে' আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি।

সেদিন আমাদেরই প্রেসের সাম্‌নে হঠাৎ দেখি এক ছবি তোলার দল এসে মহা তোড়জোড় করে' খানিক ছবি তুলে' নিয়ে গেলো। সবার মুখে একই প্রশ্ন—কোন্ কোম্পানী, কী ছবি, বল্‌তে পারেন মশাই?

বল্লুম—পারি। কোম্পানীর নাম—এভারগ্রীণ পিকচার্স্। ছবির নাম—'স্বয়ম্বরা'।

'স্বয়ম্বরা'র কাজ তা হ'লে খুব জোর চল্‌ছে?

বল্লুম—তা তো দেখাই যাচ্ছে।

কবে পর্দ্দার ওপর দেখা যাবে; জানেন?

ঠিক তারিখ বল্‌তে পারিনে, তবে খুবই শিগ্‌গীর।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বগ্রাসী কালের ধীর ও ধ্রুব স্রোতের মাঝে ধীরে ধীরে অতীত নিশ্চিহ্ন হয়, বর্ত্তমান জেগে ওঠে, ক্রমে তাও অতীতে লীন হয়। জগতের এই শাশ্বত নিয়ম, কালের এই নিত্যলীলা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু এর মাঝেও মুষ্টিমেয় মনীষীরা তাঁদের অমানুষিক প্রতিভার প্রাখর্য্যে অতীতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত জ্বল জ্বল করেন; ভবিষ্যতের বংশধরেরা অতীতের অন্ধকারের মাঝে সব ভুলে গেলেও এই সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারে না; এদের ভাস্বর প্রাখর্য্য কালের স্রোতধারায় কখনও মুছে যায় না, যাবে না। এমনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে অতীত গ্রীসের দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল অন্যতম। বহু শতাব্দী আগে এই দুই মনীষী গ্রীসের মাটীতে জন্ম নিয়েছিলেন (জন্ম:—প্লেটো, ৪২৭ খৃঃ পূর্ব্ব; অ্যারিষ্টটল, ৩৮৪ খৃঃ পূর্ব্ব), তাঁদের নশ্বর দেহ মরলোকের মাটীতে বহুদিন মিশিয়ে গ্যাছে কিন্তু তাঁদের মনীষা অমরত্ব লাভ কোরেছে। এঁরা সম্রাট নন, বিরাট ব্যয়ে কোনো সুবিশাল কীর্ত্তিসৌধ রেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের অভিনব চিন্তাধারা ভাবরাজ্যে যে যুগান্তর এনেছিলো এবং আজও যা মানবের চিত্তে আলোড়নের সাড়া জাগিয়েছে সেই বিশিষ্ট চিন্তাশক্তিই তাঁহাদিগকে মরলোকের পরপারে অমরত্বে পৌঁছে দিয়েছে।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল ছিলেন গুরু ও শিষ্য; অথচ দুজনের মধ্যে ছিল প্রবল মতানৈক্য; দুজনেরই মতবাদ আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের মধ্যে তেমনি শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য জাগায় যেমন প্রাচীন গ্রীসে একদিন জাগিয়েছিল। উভয়েই ছিলেন দার্শনিক কিন্তু প্লেটো অপেক্ষাকৃত কল্পনাপ্রিয়, কবি ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন; অ্যারিষ্টটল ছিলেন কঠিন প্রকৃতির বস্তুতান্ত্রিক ও শরীরতত্ত্ববিদ। এঁদের বহুমুখী চিন্তাধারা থেকে এখানে তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদটুকু আলোচনা কোরব।

প্লেটো বর্ত্তমান কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মত ছিল—কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন থাকবে না, কোনো পুরুষের ব্যক্তিগত পত্নী থাকবে না; রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি সকলে মিলে একসঙ্গে ভোগ কোরবে। রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যে এমন কোনো স্বার্থ থাকবে না যা তাদের মধ্যে শ্রেণী-সংঘাতের সৃষ্টি কোরবে। রাষ্ট্রের মধ্যে একশ্রেণীর অধিকতর সুবিধালাভ, বা অন্য শ্রেণীকে বঞ্চনা থাকবে না; যে জিনিষ রাষ্ট্রের একজনকে আঘাত কোরবে তা যেন রাষ্ট্রের সকলকে আঘাত করে। প্লেটোর মতে যদি কেউ বলে আমার আঙ্গুল বেদনা হোয়েছে তা হোলে আমরা যেমন বুঝি যে সে বেদনা তার সর্ব্বশরীর ভোগ কোরছে, রাষ্ট্রও ঠিক তেমনি সমগ্র একটী সমষ্টি হবে যার মধ্যে একের আঘাতে সকলেই আহত হবে। ছেলেরা রাষ্ট্র-পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হবে, দেশে উকীল থাকবে না; চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিকেরা রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ-মত শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি কোরবে।

রাষ্ট্রপরিচালনের জন্য প্লেটো কিন্তু সমাজকে তিনটী শ্রেণীতে ভাগ কোরেছিলেন; প্রথম, শ্রমিক—যারা জমি চাষ কোরবে, শিল্পকাজে ব্যাপৃত থাকবে, যারা সমাজ জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবে। দ্বিতীয়, সেনা—যারা রাষ্ট্রকে বিদেশীয় আক্রমণ থেকে রক্ষা কোরবে ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা কোরবে। তৃতীয়, শাসক-সম্প্রদায়—যারা রাষ্ট্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে দেশ

শাসন কোরবে; এদের তিনি বোলতেন "গার্জ্জিয়ান" (guardian)। এই সব কাজের বিভাগগুলি খুব স্পষ্ট-ভাবে করা ছিলো, যাতে কেউ কারু কাজে অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে। প্লেটো চাইতেন না যে, মুচি আইন-সভায় বক্তৃতা করুক, অথবা সৈন্যরা যুদ্ধ থেকে এসে কৃষিকাজে মন দিক্। তাঁর মতে রাজকার্য্য পরিচালনা যারা কোরবে তাদের অন্য কাজ দেওয়া অনুচিত, কারণ এতে তাদের সমস্ত সময় ও একাগ্রচিত্ত দেওয়া প্রয়োজন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হোলেও বোলে রাখা ভাল যে, হিন্দুর গীতায় যে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হোয়েছে বা খৃষ্টীয় বাইবেলে উল্লিখিত ঈশ্বরের তিন পুত্রকে তিনি তিনটী বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত কোরেছিলেন বোলে যে উল্লিখিত হোয়েছে, প্লেটো তাকেই স্বীকার কোরে নিতে বাধ্য হোয়েছেন, কারণ এর বেশীদূর আজও কোনো মানবের মনীষা অগ্রসর হয়নি। বর্ত্তমান রাশিয়াও পূর্ব্ব শ্রেণী ভেঙ্গে দিয়ে যে শ্রেণীশূন্য সমাজ গঠনের চেষ্টা কোরছে তার মধ্যেও এরি মধ্যে কর্ম্মী, কুশলী কর্ম্মী (বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাহিত্যিক ইত্যাদি) ও রাষ্ট্রপরিচালক এই তিনটী শ্রেণী সুপরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে এবং হোতে বাধ্য। এমন শ্রেণী-বিভাগ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হবে, সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

প্লেটো শাসকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কথা বোলেছেন। তাঁর মতে শাসকেরা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হবে (মনস্তাত্ত্বিক), তারা সমস্ত মত-বাদকে পরীক্ষা কোরে গ্রহণ কোরবে, এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেককে পরিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের সুবিধা দেবে। প্লেটো চেয়েছিলেন শাসকদিগকে যেন শাসনময় করায়ত্ত কোরবার জন্য ঝগড়া মারামারি না কোরতে হয়; শৈশব থেকেই তারা যেন শাসনের খুঁটীনাটী শিখতে পায়, সেইভাবে তাহাদিগকে শৈশব থেকে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত করা হবে। প্লেটোর মতে যদি শাসক হবার জন্যেই মানুষ ঝগড়া মারামারি কোরে তার সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ অপব্যয় করে তবে শাসন কোরবার সময় তার শক্তি ও উৎসাহের অভাব ঘটতে পারে, তাছাড়া এতে অনভিজ্ঞ লোকের হাতে শাসনময় যেতে পারে। তাই তিনি একটী শাসক-সম্প্রদায় গোড়তে চেয়ে ছিলেন, যাদের হাতে শাসন-বিভাগের সমস্ত কাজ ন্যস্ত করা হবে।

অ্যারিষ্টটল প্লেটোর শিষ্য, কিন্তু তিনি অনেক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ কোরতেন। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিকের' মত অ্যারিষ্টটলের 'পলিটিকস'ও রাজ-নীতি বিজ্ঞানের একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। অ্যারিষ্টটল ছিলেন চমৎকার তার্কিক, তাঁর ভাষার যোজনা ও বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণের কৃতিত্বের জন্যই তিনি বিশেষ-ভাবে খ্যাতিলাভ কোরেছেন। চিন্তারাজ্যে তাঁর দান প্লেটোর অনেক নীচে। অনেক বিষয়ে তিনি তৎকালীন সমাজের অনেক কুপ্রথাকে 'স্বাভাবিক' বোলে ধোরে নিয়ে তার ওপর ভিত্তি কোরে তাঁর মতবাদ প্রচার কোরেছেন। তিনি তৎকালীন দাসত্ব প্রথাকে 'স্বাভাবিক' বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছেন; সামাজিক শ্রেণী-বিভাগকেও তিনি 'স্বাভাবিক' মনে করেন। অবশ্য দাসত্ব-প্রথাকে তিনি সমর্থন কোরলেও দাস ক্রয়-বিক্রয় তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন ওপরের শ্রেণীদিগকে কাজ কোরবার অবসর দেবার জন্যে এই সব দাসদের প্রয়োজন, যারা ওপরের শ্রেণীর সব কাজ কোরে দেবে। অ্যারিষ্টটল বাণিজ্য পছন্দ কোরতেন না, বেশী ধনসম্পদ তাঁর মত-বিরুদ্ধ ছিলো কারণ সমাজের পক্ষে তা অকল্যাণকর বোলে তিনি মনে কোরতেন। সমাজ-জীবনে কোনো কিছুরই মাত্রাধিক্য তিনি পছন্দ কোরতেন না। অথচ তিনি কেবলমাত্র ওপরের শ্রেণীদের জন্যই (free citizens) তাঁর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সকল সুখসুবিধা ভোগের ব্যবস্থা কোরেছেন। তিনি প্লেটোর বিবাহিত স্ত্রী না রাখার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; তাঁর যুক্তি ছিলো এতে আত্মীয়তা নিজেদের সম্বন্ধ না জানার ফলে পরস্পর মারামারি কোরবে এবং আত্মীয়বধের জন্য যে সামাজিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তা পালন কোরবে না। কারণ কে যে কার

আত্মীয় তা জানবার উপায় থাকবে না। এখানে আমরা অ্যারিষ্টটলের সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারার পরিচয় পাই; তিনি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনার মধ্যে তখনকার সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার কথা ভুলতে পারেন নাই। এবং আত্মীয়বধের চিন্তায় তিনি ব্যাকুল। এ বিষয়ে প্লেটো স্থান ও কালের বহু উর্দ্ধে তাঁর চিন্তারাজ্য বিস্তৃত কোরেছিলেন।

অ্যারিষ্টটল মুদ্রা-বিনিময়ের বিরোধী ছিলেন, কারণ অর্থকেই তিনি সকল সামাজিক অনিষ্টের মূল বোলে মনে কোরতেন, এজন্য মুদ্রাকে তিনি 'অস্বাভাবিক' বোলে ঘোষণা করেন এবং তার পরিবর্ত্তে 'বিনিময় প্রথা' (Barter System) সমর্থন করেন। অর্থের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ এই যে অজ্ঞাতকুলশীল নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও অর্থের সাহায্যে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করে, এবং অর্থশালী লোকেরা অর্থহীনদিগকে খাদ্য ও বস্ত্র দান কোরে, বিনামূল্যে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কোরে, ভোজ দিয়ে ও উৎসব আমোদ কোরে তাহাদিগকে অলস, কর্ম্মবিমুখ করে, ফলে সাধারণ সমাজ অবনত ও কলুষিত হয়। এ যুক্তি চিন্তার বিষয় কিন্তু অ্যারিষ্টটল নিজেই আবার এ-নিয়মের ব্যতিক্রম কোরে পাঠকের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলেন। তিনি ওপরের শ্রেণীদের জন্য কোনো শারীরিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা করেন নাই, ফলে তাহাদিগকে শ্রমবিমুখ হবার সুযোগ দিয়েছিলেন উপরন্তু তিনি এদের 'কমিউনিটীর' ব্যয়ে সাধারণ ভোজনালয়ে খেতে দেবার প্রস্তাব কোরেছেন।

প্লেটোর পরিকল্পিত রাষ্ট্রের সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের অল্পাংশে মিল আছে। কিন্তু অ্যারিষ্টটলের শাসক সম্প্রদায় অর্থাৎ 'অভিজাত'দের বদলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা শাসন অনুমোদন করেন। অবশ্য কি ভাবে যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গোড়ে উঠবে তা বোঝা শক্ত, কারণ তাঁর মতে রাষ্ট্রে অধিকবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত কেউ থাকবে না; কাজেই সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের প্রশ্ন আলাদা কোরে কেন তাঁর মনে এল? অ্যারিষ্টটল বিলাসিতার ওপর বেজায় চটা ছিলেন; স্পার্টার কড়া শিক্ষাপ্রণালী তিনি পছন্দ কোরতেন। দুর্ব্বল ও বিকৃতাঙ্গ শিশু পালন করা তাঁর মতে অপরাধ বোলে গণ্য। তাঁর মতে শিশুদিগকে তাদের খুসীমত কাঁদতে দেওয়া উচিত। পারিবারিক জীবনে স্বামীর অধিকার তখনকার সামাজিক ব্যবস্থামত অপ্রতিহত হওয়া তিনি পছন্দ কোরতেন, তবে স্বামী বা বাড়ীর কর্ত্তাকে হৃদয়বান হবার উপদেশ আছে। অ্যারিষ্টটলের মতে পুরুষেরা বিয়ে কোরবে ৩৭ বৎসর বয়সে ও মেয়েরা বিবাহিত হবে ১৮ বৎসর বয়সে। এমনি আরো অনেক সমাজজীবনের খুঁটিনাটী বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা কোরেছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল খুব বেশী কিছু বলেন নাই। তাঁর মতে পুরুষেরা যখন সব কাজের অযোগ্য হবার মত বুড়ো হবে শুধু তখনই পুরোহিত হোতে পাবে।

প্লেটোর শাসক সম্প্রদায়ের বদলে তিনি ধনী দরিদ্র সকলকেই শাসন বিভাগে কাজ কোরবার অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, তবে ছ'মাসের বেশী এক পদে কেউ থাকবে না। সাধারণের মধ্য থেকে শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী বেছে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না কিন্তু যুদ্ধের সময় এ ব্যবস্থা ভাল চোলবে না বোলে তিনি মনে কোরতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার চরম ক্ষমতা প্লেটোর কল্পিত 'গার্জ্জিয়ানদের' বদলে তিনি সৈনিকদের হাতে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে কোরতেন "মানুষ যখন মনে করে তাদের যেমন ব্যবহার পাওয়া উচিত তেমন ব্যবহার পাচ্ছে না তখনই ঈর্ষার বশে তারা বিদ্রোহ করে," কাজেই তিনি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কোরবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে আইন "স্বার্থশূন্য যুক্তি" (Reason unaffected by desire)। এই আইনের ওপরেই অ্যারিষ্টটলের সকল কল্পনা প্রতিষ্ঠিত।

অ্যারিষ্টটলের পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটী এই যে তিনি বৃহত্তর সাম্রাজ্যের কল্পনা কোরতে পারেন নাই; তাঁর সকল মত তখনকার দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'নগর রাজ্য' (City States) গুলিকে কেন্দ্র কোরে গোড়ে উঠেছে। তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রের সমস্ত সৈনিকবাহিনী এক নায়কের অধীনে পরিচালিত, রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলেই পরস্পরের পরিচিত; একজন ঘোষক সকল রাজাদেশ প্রচার করে। তাঁর মত গ্রীসের কোনো রাজ্য গ্রহণ করে নাই; তাঁর পরিকল্পনা মূর্ত্ত হোয়েছিল রোমান রিপাব্লিকে।

—

সম্পাদকীয়

"আমার যাত্রা এখন হ'ল সুরু
ওগো কর্ণধার,
এখন, বাতাস ছুটুক্, তুফান উঠুক,
ফিরব নাকো আর।"—

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যিনি নেতা হইবেন, কবির এই মন্ত্রই তাঁহার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে

স্বার্থ নেতৃত্ব

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এরূপ একজন নেতারও সাক্ষাৎ পাই না। ওয়ার্দ্ধা হইতে মাদ্রাজ অধিবেশন সময়ের দিক হইতে অনেকটা পথ বটে কিন্তু মতামতের দিক হইতে নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ এক পদও অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কাহারও মনে নির্দ্দিষ্ট পথের ধারণা নাই, ধারণা থাকিলেও কেহ আবার নানা কারণে সে পথে চলিতে দ্বিধা করেন। তাই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মাদ্রাজ অধিবেশনেও মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ-সমস্যার সমাধান স্থগিত রহিয়া গেল। তাই দেখিতে পাই যে, আচার্য্য কৃপালানীর প্রস্তাবের সংশোধন প্রস্তাব হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রকাশম্ যে প্রস্তাব করেন—"নূতন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্বগ্রহণসম্পর্কে আলোচনা হউক এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করা হউক"—তাহাও অগ্রাহ্য হয়।

যেখানে নেতারা নিজেরাই পথের নির্দ্দেশ দিতে অক্ষম, সেখানে জনসাধারণ কি করিবে? এ যেন "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা:।"

যাহা হউক—এসম্বন্ধে আলোচনার বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া রাষ্ট্রীয় সমিতি কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আন্দোলন করিয়া একটি বিরুদ্ধবাদী জনমত গড়িয়া তোলা। কারণ, কংগ্রেস-সদস্যগণ ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ না পাইলে খোলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবেন।

মাদ্রাজ অধিবেশন হইতে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে দেশে বিশেষ কোন সাড়া দেখা যাইতেছে না। এই নিশ্চিন্ত নিরপেক্ষতা সত্যই নিন্দনীয়।

—

বর্ত্তমানে কংগ্রেস হইতে আদর্শবাদ ও জন-সাধারণের কল্যাণ-কামনা কিরূপ তিরোহিত হইয়াছে তাহা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত অধিবেশনে

দেশীয় প্রজা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব

দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সম্পর্কে আলোচনা ও গৃহীত প্রস্তাব হইতে বুঝা যায়। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি-পরিবর্ত্তনের বিরোধী এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। ইহার উত্তরে মিঃ মেহেরআলী এক সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের এই আশ্বাস দেওয়া হউক যে, যখন গণ-পরিষদ গঠিত হইবে, তখন দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও বৃটিশ ভারতের সহিত সমান ভিত্তিতে প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইবেন এবং

গণ-পরিষদ না হইলে কোনো যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাদের সমান অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত না হইলে বৃটিশ ভারত উহা গ্রহণ করিবে না।

এই প্রস্তাবের মধ্যে দেশীয় নৃপতিদের বা তাঁহাদের রাজ্যের ক্ষতিকারক কিছুই ছিল না কিন্তু তবু ৩১-১০ ভোটে মিঃ মেহেরালীর এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, গণতান্ত্রিক কৃষকবন্ধু বলিয়া যিনি নিজেকে পরিচয় দেন সেই সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশীয় নরপতিদের সম্বন্ধে গভীর হৃদয়াবেগের সহিত বক্তৃতা দেন। করাচী কংগ্রেসের এই সভাপতি মহাশয় কি জানেন না যে, অন্যায় খামখেয়ালীর জন্য একাধিক দেশীয় নরপতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গদীচ্যুত হইয়াছেন? বিলাসব্যসনে যাঁহাদের অনেকেই আকণ্ঠ নিমগ্ন তাঁহাদের জন্য কৃষকবন্ধুর চোখে এইরূপ সাঁতারপানি বাস্তবিকই উপভোগ্য!

কিন্তু এইরূপ নীতিই যদি বজায় রাখা হয় তাহা হইলে ইহার পর কংগ্রেসকে কি আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলা চলিবে? ভারতের এক তৃতীয়াংশ লোককে বাদ দিয়া যদি কোনো পরিষদ্ হয়, তাহাকে কি গণ-পরিষদ্ আখ্যা দেওয়া চলিবে?

——

বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখ হয় বটে কিন্তু সেরূপ বিস্ময় বোধ হয় না যেরূপ হইয়াছে আসামে বাঙ্গালী-বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া। এতদিনে আসাম যদি নিজেদের রাজনৈতিক দাবী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া থাকেন, তাহা আনন্দের কথা কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার দাবী এক কলস দুগ্ধে এক ফোঁটা গোমূত্রের ন্যায়ই অচল—এ বিষয়ে অনেকের ন্যায় তাঁহাদেরও ধারণা নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

আসামে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ

সম্প্রতি আসামে যে দুইটী উল্লেখযোগ্য সভা হয়—একটী গৌহাটীতে আসাম এসোসিয়েশনের সভা এবং অপরটী শিবসাগরে সর্ব্বদল-সম্মেলন—সে দুইটীতেই আসাম হইতে শ্রীহট্টকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এমনকি প্রথমোক্ত সভায় আসামের বিদ্যালয়গুলি হইতে বঙ্গভাষার উচ্ছেদও প্রস্তাবিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টবাসীরা অবশ্য আচার-ব্যবহার, ভাষা ও সংস্কৃতি সকল দিক দিয়াই বাঙ্গালী! ইহাই কি তাহাদের অপরাধ? আর ভাষা সম্বন্ধে? সরকারী রিপোর্ট হইতেই জানা যায় যে, "আসাম প্রদেশে বাঙ্গলা-ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা শতকরা ৪৬ জন আর অসমীয়া ভাষায় কথা বলে এইরূপ লোকের সংখ্যা শতকরা ২৭ জনের অধিক নহে?" এরূপ ক্ষেত্রে আসামের বিদ্যালয়গুলি বাঙ্গলাভাষাকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র অসমীয়ার প্রচলন করিলে আসামবাসীরাই অধিকতর ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিবেন না কি?

শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালীদের বাদ দিয়াও তো আসামে অনেক ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী ও অন্যান্য দেশের লোক আছেন। তাঁহাদের সহিত বনিবনাও করিয়া রাজনৈতিক অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা চলিতে পারে, কেবল বাঙ্গালী সম্বন্ধেই তাহা চলিবে না! এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিকে কি আখ্যায় ভূষিত করিব?

পরিশেষে বক্তব্য, শ্রীহট্ট যদি বাঙ্গলার এলাকাভুক্ত হয় তো শ্রীহট্টের এমন কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু আসামেরই সমূহ ক্ষতি—এই সহজ কথাটী কি অসমীয়া নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের প্রদেশবাসিগণকে বুঝাইতে পারেন না?

——

বহুদিন হইতে আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, সৈনিক ও পুলিশবিভাগের তুলনায় দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট অতি অল্পই খরচ করেন। অথচ,

ভারতবাসীর স্বাস্থ্য

দেশকে বড় করিতে হইলে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। আমাদের এই উক্তি ভারতগভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য কমিশনারের ন্যায় একজন পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছি, সেইরূপ আবার তাঁহার রিপোর্টে স্বাস্থ্যের

যে ভয়াবহ অবস্থা সূচিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হতাশায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। ভারতে শিশুমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া কর্ণেল রাসেল বলিয়াছেন যে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। "১৯৩৪ সালে সমগ্র ভারতে এক বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছিল ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার অথবা সমগ্র মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ২৭টী অর্থাৎ হাজার করা শিশুমৃত্যুর হার হইয়াছিল ১৭০·৫। রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে, শিশু মৃত্যুর হার ভারতের মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৪৫টী ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের মধ্যে এবং শতকরা পঞ্চাশটী ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের মধ্যে। শুধু তাহাই নহে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের সহিত তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ১৯৩৩ সালে ঐ দুই দেশে এক বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল মোট মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা ৭·৪টী, ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৩·১টী এবং দশ বৎসরে নিম্নবয়স্ক শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ১·৪টী মাত্র।

কর্ণেল রাসেল বলিয়াছেন যে দূষিত আবহাওয়া ও অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এ দেশে শিশুদের জন্ম হয়, তাহাতে শিশুমৃত্যুর হার এরূপ ভয়াবহরূপে অধিক না হইয়াই পারে না। এবং তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে শিশুমঙ্গল প্রসূতিমঙ্গল ইত্যাদি যাহা হইতেছে, সমস্যার তুলনায় তাহা সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘবৎ। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আরও কিছু করা দরকার!

ভারতে বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে একমাত্র কুইনাইন বিতরিত হয় কিন্তু কর্ণেল রাসেল বলিয়াছেন যে, বিতরিত কুইনাইনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অবশেষে তিনি বলেন—"বর্ত্তমানে ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়। যদি এই অবস্থার উন্নতি করিতে হয়, তবে স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য আরও ব্যয় করিতে হইবে।"

ভারত সরকার তাঁহাদের নিয়োজিত স্বাস্থ্য কমিশনারের এই সুপারিশ গ্রহণ করিবেন কি, না, জগন্নাথের রথ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে?

——

সামরিক ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ প্রভৃতি চলে নক্ষত্র-বেগে, আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ নড়ে শম্বুকের গতিতে। তাই বহু গবেষণার পর ইতালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার

ইতালী-আবিসিনীয়া

আরম্ভের দিন ধার্য্য হইল ১৮ই নভেম্বর। ইতিমধ্যে আদোয়ার পতন হইয়াছে, মাকালে অধিকৃত এবং ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত আবিসিনীয়ার অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে তাহা আবিসিনীয়ার ভাগ্যবিধাতাই জানেন। ইতিমধ্যে কখনও ফ্রান্স কখনও বা বৃটেনের মারফত ভিতরে ভিতরে ইটালীর সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তাও চলিতেছে। ইহাই হইল ইউরোপীয় রাজনীতি। এই কূটনীতির স্বরূপমূর্ত্তি কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কালা হাব্‌সীদের কি হইতেছে সে সম্বন্ধে কাহারও চিত্তচাঞ্চল্য আছে বা হইবে—এমন কোনো লক্ষণ দেখিতেছি না। কখনও নরম এবং কখনও গরম হইয়া সকলেই স্ব স্ব অবস্থা সামলাইতে তৎপর। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জলে না নামিয়া মাছ ধরার এই কৌশল ইউরোপে বজায় থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

——

কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা অধিকারই যথেষ্ট নহে, তাহার সম্যক ও যথোচিত ব্যবহারের উপরই মানব সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে।—অন্যান্য সকল

বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশান

বিষয়ের ন্যায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এই কথা খাটে। প্রথমতঃ বাঙ্গলাদেশে শিক্ষিত জনগণের অনুপাতে যতগুলি গ্রন্থাগার থাকা উচিত, তাহা তো নাই-ই, যেগুলি আছে তাহাও সুপরিচালিত নয়। বৈজ্ঞানিক রীতিতে গ্রন্থাগার

পরিচালনা একটা শিক্ষার বিষয়। তদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া কিরূপে সংশিক্ষা ও সাহিত্যের প্রচার হয়, পরস্পর সহযোগিতা দ্বারা গ্রন্থাগারের শক্তি বৃদ্ধি হয়—সে কথাও এখনও অধিকাংশ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের অজ্ঞাত। এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা। সভাসমিতি ও নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিয়া তাঁহারা এবিষয়ে প্রচারকার্য্যও করিতেছেন। বিশেষতঃ মিউনিসিপ্যালিটী, জিলাবোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড ও গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে অর্থ সাহায্য পায়, সে বিষয়ে তাঁহাদের প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম, এল, সি এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্তের উদ্যোগ ও পরিশ্রম সবিশেষ প্রশংসনীয়। বাঙ্গলার গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষার প্রসারকামী ব্যক্তিগণের এই সমিতিতে অবিলম্বে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

——

গত এক মাসকালের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লোকান্তর ঘটিয়াছে—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু, ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ঈশান পরলোকে চন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশ একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ হারাইল। সেনগুপ্ত দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মীরূপে তিনি বহুদিন করপোরেশানের সদস্য ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু ছিলেন একজন নিরলস ও অনাড়ম্বর সাহিত্যসেবক ও সাংবাদিক। গত ২৩ বৎসরকাল দক্ষিণ কলিকাতা হইতে তিনি পাক্ষিক-পত্রিকা 'সম্মিলনী' সম্পাদন করিতেছিলেন। উক্ত পত্রিকাখানিই এই দুঃস্থ পরিবারের একমাত্র জীবনোপায়। অতএব ইহার রক্ষার জন্য সকলের সহৃদয় সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

বাঙ্গলার চারিদিকে আজ যে শরীর-চর্চ্চা ও ব্যয়ামের উৎসাহ দেখা যাইতেছে ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথকে তাহার অগ্রদূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার এমন কোন ক্লাব ছিল না যাহার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন না। ব্যায়ামের উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় দেড়লক্ষ টাকা দানও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে বাঙ্গলা একজন অকৃত্রিম ব্যয়াম-বন্ধু হারাইল।

একসময়ে প্রধান শিক্ষক ও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণেতা হিসাবে ঈশান বাবুর খ্যাতি ছিল। কিন্তু কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি পালি জাতকমালার যে বঙ্গানুবাদ করিয়া স্বীয় অর্থে তাহা প্রকাশিত করেন, তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী পণ্ডিত ও ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তিশালী ভারততত্ত্ববিদ্ আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভির মৃত্যুতে শুধুই ফ্রান্স নহে, ভারতেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। অধ্যাপক লেভি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে জ্ঞানের সেতু বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্ম্মকথা ইউরোপে প্রচারিত হইতেছিল। তিনি ভারতে আসিয়া বিশ্বভারতীতে কিছুকাল বাস ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকটী বক্তৃতা দান করেন।

——

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপট—"পৌরুষ"—এই চিত্রখানিতে তীরন্দাজের শরীরের প্রতি অংশ হইতে পৌরুষের শক্তি প্রতিফলিত হইতেছে। শিল্পীর এইখানেই কৃতিত্ব।

পি. ১৮বি, হাজরা রোডস্থ "খেয়ালী প্রেসে" শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
৯, রামময় রোড হইতে প্রকাশিত।

চিত্রা

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেড
সম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়

প্রথম বর্ষ	অগ্রহায়ণ—১৩৪২	৭ম সংখ্যা

কলিকাতা লিট... ও ... কেন্দ্র ... টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রাচ্য নৃত্যের ঐশ্বর্য্য

শ্রীযামিনী কান্ত সেন

ইদানীং প্রতীচ্য নৃত্য বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। সব জায়গায় সে নৃত্যের বৈচিত্র্য ও গমক বিস্ময় উৎপন্ন করছে। এদেশেও পরোক্ষভাবে সে নৃত্যের ঝড় মাঝে মাঝে বইতে সুরু করেছে।

এদেশে নৃত্য-কল্পনা এসেছে তুরীয় লোক হ'তে। শিবনৃত্য একটা অলৌকিক উৎস—সে উৎস হ'তে সর্ব্বত্র নৃত্যের বহুমুখী ছন্দ ক্ষরিত হয়েছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে মহাদেবের অষ্টোত্তরশত নৃত্যের ছন্দের উল্লেখ আছে। লৌকিক নৃত্যও তাই অষ্টোত্তরশত বলে' কল্পিত হয়েছে।

ভারতীয় কল্পনায় নৃত্য একটি অঙ্গবিলাস মাত্র নয়। নৃত্যের দ্বারা যে মুক্তিলাভ করা যায় এ কথা ভাগবতে আছে :—

"যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বাহ সুভক্তিতঃ
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তর শতেষ্বপি"

বস্তুতঃ ভারতে কোন সাধনাই একান্তভাবে ঐহিক দিক্ হ'তে সমর্থিত হয় নি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে সমগ্র রূপশিল্পের উৎস হচ্ছে নৃত্যকলা! চিত্র, ভাস্কর্য্য,

নটরাজ (মাদ্রাজ)

সঙ্গীতাদি নৃত্যকলাদ্বারা পুষ্ট ও প্রবর্ত্তিত হয়ে থাকে। অপর দিকে নৃত্যের দ্বারা পূজার বিধিও আছে :—

"নৃত্যং দত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্
স্বয়ং নৃত্যেন সম্পূজ্য তদৈবানুচরো ভবেৎ।"

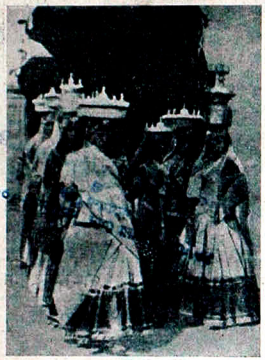

দৌখ-নৃত্য (ভারত বর্ষ)

বস্তুতঃ সমগ্র কলাবিদ্যাই অসীমের নিকট সীমার আত্মসমর্পণ !

অথচ একথা বলতে হয়, এদেশ একটা বিরাট সম্পর্ককে শিরোধার্য্য করেছে বলে' ইহলোকের ছন্দ-সম্পদ তা'তে শীর্ণ হয় নি, উপচিতই হয়েছে। প্রতীচ্য নৃত্য ইটালীর সার্কাস খেলোয়াড়ের কালোয়াতীতে পরিণত হয়েছে। মাংসপেশীর বিস্ময়জনক আবর্ত্তন ছাড়া নৃত্যের আরও উচ্চতর লক্ষ্য আছে। সে সব ইউরোপীয় চিন্তায় ধরা পড়েছে অতি যৎসামান্য।

ইউরোপের নৃত্যের আশ্রয় হচ্ছে স্থান (space)—প্রাচ্য নৃত্যের কাল। spaceএর বহুমুখী ফলক (aspects) দেখান হচ্ছে ওদের মূল ব্যাপার—এজন্য মানুষের দেহের নানা অবস্থা, ভঙ্গী, লীলা ও বিন্যাস দেখে প্রতীচ্য পুলকিত হয়। নানা দৃষ্টিপ্রান্ত হ'তে (angle of vision) মানব শরীরকে দেখান ও দেশের ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার লক্ষ্য। অপরদিকে গতিভঙ্গের লীলা দেখানই হচ্ছে প্রাচ্যের কামনীয়; গতিবেগের আশ্রয় হচ্ছে কাল—স্থান নয়। এজন্য নৃত্যের ভিতর ক্রমকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে অনেক সময় উদ্দাম অঙ্গদর্শনকে বর্জ্জন করতে হয়। ভারতীয় রূপশিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে রসকে প্রতিপাদন। নানা রস বা একই রসের বহু বৈচিত্র্য—এজন্য প্রত্যেক অঙ্গই ব্যবহৃত হয়। চোখের চাহনি, অঙ্গুলির ইঙ্গিত, বাহুর লীলা, বক্ষাদির স্পন্দন, পদের বিক্ষেপ—এ সমস্তই সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়। দেহের নানা ভঙ্গী দেখান হয়—মনের নানা অবস্থাকে প্রতিপাদন করাই লক্ষ্য হয়ে পড়ে। নর্ত্তননির্ণয়ে আছে :—

"অঙ্গেনালং নয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ
চক্ষুভ্যাম্ ভাবয়েৎভাবং পাদ্ভ্যাং তালমাদিশেৎ"।

কাজেই ব্যাপার অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ছে। প্রতীচ্য নৃত্য হিটলারের ঝটিকা-বাহিনীর (storm troops) মত একটা উদ্দাম অট্টকোলাহল সৃষ্টি করে—তা'তে দেহের ব্যঞ্জনা প্রচুর হয়ে থাকে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা'তে মনের খোরাক কমই থাকে। প্রাচ্য নৃত্যের ধীর ও বিচিত্র পদক্ষেপ আনুষঙ্গিক

নটী (ভারতবর্ষ)

নানা উপাদানকে গ্রহণ ক'রে চলে। তা'তে ভাববার ও আনন্দ পাওয়ার অনেক বিষয় থাকে। রসজ্ঞগণ স্থিরচিত্তে সে সব অনুভব করে। একটি রসের—যেমন শৃঙ্গার রস—বহুমুখী লীলা—মিলন, বিরহ, প্রভৃতি—ধীরে ধীরে প্রকটিত হয় চোখের মুখের, হাতের বিচিত্র সঞ্চালনে! সে সব সঞ্চালনের প্রেরণা দৈহিক বৈচিত্র্য-সম্পাদন নয়—মানসিক ঐশ্বর্য্য-উদ্ঘাটন। এখানেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নৃত্যের মৌলিক বিভেদ।

এই রসের অসংখ্য রূপ উদ্ঘাটিত হয়—প্রতি মূর্চ্ছনায় এক একটা রূপভঙ্গ উৎফুল্ল হয়ে উঠে। 'রস' ব্যাপারটি রূপের বৈপরীত্যমূলক ব্যাপার নয়। যাকে দেখা যায় না তাকে দেখানই বাস্তবিক রূপের সৃষ্টি; যা' দেখা যাচ্ছে সে বহিরঙ্গ ব্যাপার প্রদর্শনে রূপের সৃষ্টি হয় না। বহিরঙ্গ দেহের নানা ফলক দেখান অতি তরল ব্যাপার—তাকে এক শ্রেণীর ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত বস্তু মনে করা যেতে পারে। মানুষ বলতে মানুষের শরীর মাত্র বোঝায় না; মানুষের মনের লীলা মুছে ফেল্‌লে শরীরে কি থাকে নির্ণয় করা কঠিন হয়

জাপানী-নৃত্য

পড়ে। অন্ততঃ মনকে অদৃশ্য করে মাংসজ বৈচিত্র্য উপস্থাপিত করার ভিতর ঐশ্বর্য্য বা কৃতিত্ব বিশেষ আছে মনে হয় না।

ভরত নাট্য শাস্ত্রে আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিন্তু ভারতীয় অঙ্গকল্পনা অঙ্গীর সহিত অসহযোগের উপর আশ্রিত নয়। অঙ্গ হিল্লোলিত হবে মানস-হিল্লোলের তালে তালে, মনকে অস্বীকার ক'রে নয়, কিম্বা মনের কোন অকিঞ্চিৎকর অবস্থা নিয়ে নয়।

মুখোস-নৃত্য (ইন্দো-চীন)

বস্তুতঃ মনের অসীম ঐশ্বর্য্য উদ্ঘাটন করতে উৎসাহিত হ'বে এমন সমস্ত নৃত্যচেষ্টা এদেশে সৃষ্ট হয়েছে, যার তুলনা পাওয়া কঠিন। আমার মনে হয় ইউরোপের অনেক নৃত্যের আদর্শ ভারতবর্ষ হ'তে গৃহীত হয়েছে। বহুকাল হ'তেই ভারতবর্ষ হ'তে অনেক মূর্ত্তি সংগৃহীত হয়ে ইউরোপের বহু যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রতীচ্যে অসংখ্য দর্শকের চক্ষুগোচর হয়েছে। ইউরোপের নব্য স্থাপত্যের অনেক কিছু এই সমস্ত মূর্ত্তির আদর্শ হ'তে গৃহীত, এ বিষয় ইদানীং অনেকটা স্বীকৃত হয়েছে। ইউরোপের উৎক্ষিপ্ত-চরণ নৃত্য-লীলা এদেশের নটরাজের নৃত্যের আদর্শ হ'তে গৃহীত মনে হয়, কারণ এ শ্রেণীর বহুমূর্ত্তি ইউরোপের যাদুঘরে বহুকাল হ'তে স্থান পেয়েছে। এরকমের নৃত্যকে "ভুজঙ্গত্রাস" বলে। ইউরোপে ভুজঙ্গললিত নৃত্যেরও বিশেষ প্রচলন আছে।

সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্যকে প্রকট করা হয় নটরাজের নৃত্যে। একদিকে তুর্য্যীয় নৃত্যের এই বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত হয়েছে—অন্যদিকে

খেচর, ভূচর ও জলচরের লীলাভঙ্গও নৃত্যের ছন্দতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মায়ূরী নৃত্য, মৃগীনৃত্য প্রভৃতি অসংখ্য নৃত্যের বিচিত্র বিন্যাস এদেশে প্রচলিত ছিল।

চৈনিক-নৃত্য

এদেশে বহুপূর্ব্বে যুগ্ম নৃত্যও প্রচলিত ছিল। সে নৃত্যের নাম ছিল যৌবত নৃত্য। এ নৃত্যে স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। বস্তুতঃ নৃত্যকলায়ও পশ্চিমকে প্রাচ্যাঞ্চলের নিকট প্রতিপদে ঋণ স্বীকার করতে হবে।

প্রাচ্যাঞ্চলে জাপান, চীন, দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া ও ভারতে নৃত্যকলার একটা সজীব চর্চ্চা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় নৃত্যের বৈচিত্র্য অসীম এবং সর্ব্বত্রই একটা মহত্তর নির্দ্দেশ আছে। অঙ্গ সঞ্চালনের বৈচিত্র্যেও এক্ষেত্রে প্রতীচ্যকে অধোমুখ হ'তে হবে। নানারকমের 'শিরোভেদ', 'দৃষ্টিভেদ' 'গ্রীবাভেদ', 'মুদ্রাভেদ', 'কটী-ভেদ, 'পাদভেদ' প্রভৃতির বিচার নর্ত্তননির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এ সমস্তই রসোদ্‌ঘাটনের সহায়তা করে।

ইদানীং ভারতীয় নৃত্যে স্থল-বিশেষে অবসাদ এসেছে। অঙ্গাদি দেশে প্রচলিত নৃত্য একটা অলীক আচারে পরিণত হয়েছে—সঙ্গীতও এসেছে একটা গণিতগত পরিমাপের বজ্রমুষ্টির ভিতর। নাগ প্রদেশের লোকনৃত্য ও গ্রাম্য-নৃত্যে এখনও প্রাচীন ছন্দের ভাব বজায় আছে। গ্রামনৃত্যের যৌথপ্রথায় এখনও অনবদ্য সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে উঠে। অন্যত্র ইতরতা ও ক্লেদে মজ্জিত হয়ে স্বস্থ নৃত্যকলা মলিন হয়ে পড়েছে।

চীনদেশের নৃত্যকলায়ও প্রাচ্যের সংযম ও শোভন ঋজুতা প্রকট হয়। ঘূর্ণীবাত্যার ন্যায় একটা অশান্ত মত্ততা সৃষ্টি করা নয়—সহজ সৌন্দর্য্যের ললিত শাসনে অনুবৃত্ত চৈনিক নৃত্যের ছন্দে পঙ্কিল উন্মাদনা নেই—আছে শান্তিগ্রীব বিকশিত শুভ্র দীপ্তি। প্রচুর বসনাবৃত হয়েও এই রূপকৃতির অবগুণ্ঠিত হয় না। চৈনিক নর্ত্তকীর প্রশান্ত ব্যঞ্জনা যেন প্রাচ্য শীলতার মর্ম্মকথা উদ্ঘাটিত করে। রঙ্গমঞ্চেও চৈনিক অভিনেত্রী চাপল্যের ভিতরও একটা অসীম সংযম রক্ষা করে' দর্শকগণকে পুলকিত করে।

যৌথ-নৃত্য (যবদ্বীপ)

সবসময় বিশুদ্ধ নৃত্যকলা যে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তা' নয়। ভোগের দাবাগ্নি

সমগ্র শীলতাগত-সংহতিকে বিসর্জ্জন দিতেও যে কোথাও উৎসারিত হয়নি তা নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কেউ কলাকৌলীন্য প্রত্যাশা করে না। ভারতের অবনত যুগে যেমন তেমনি চীন-দেশেও এ সমস্ত সাধনায় বহুবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চও প্রাচ্যাঞ্চলে প্রতীচ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

জাপানের নৃত্যকলাও অন্ততঃ প্রাচ্যশ্রী বহন করে' এখনও জগৎকে পুলকিত করছে। নব্য সভ্যতার সম্পর্কে বার বার তাহাতে পটক্ষেপ হচ্ছে। বস্তুতঃ যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনেই প্রাচ্য নৃত্যের প্রাচীন গৌরব এখনও লক্ষিত হয়। এ সমস্ত নৃত্যের বিচিত্র সম্পদ অতুলনীয়। ইন্দোচীনের যুগ্ম ও যৌথ নৃত্য, যবদ্বীপের রসনৃত্য সংযমে অপরাজেয় এবং সৌন্দর্য্যেও তুলনা-হীন। ভারতীয় আদর্শ এ সমস্ত অঞ্চলে এখনও প্রাণবান্ হয়ে আছে। ইন্দোচীনের প্রাচীন মন্দিরে খচিত নৃত্যচঞ্চল নারীমূর্ত্তি প্রাচীন কলার অতি মনোহর রীতির নমুনা। যবদ্বীপের মুখোস-নৃত্য নৃত্যকলার আর একটি নূতন অধ্যায় সূচনা করছে।

বস্তুতঃ অন্তর-লোকের বিচিত্র বার্ত্তা উদ্ঘাটনে অনেক সময় মানুষের স্বাভাবিক মুখশ্রী পর্য্যাপ্ত হয় না। মানুষের অন্তর অসংখ্য অজানা ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ—অনেক মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রনা, অতুলনীয় হাহাকার চিত্তের কন্দরে চলাফেরা করছে। বাইরে সে সবকে রৌদ্র, করুণ বা বীভৎস রসে রূপান্তরিত করতে স্বাভাবিক চেহারার সাহায্যে সম্ভব হয় না। একটা কিছু বিরাট অত্যুক্তি বা মহত্তর অনুভূতি হ'লে তা'কে মুখোসের সাহায্যে উপস্থাপন করা সহজ হয়ে পড়ে। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় মুখোসের প্রচলন আছে।

তিব্বতে এখনও মুখোসনৃত্য জীবন্ত। বস্তুতঃ মুখোসের সাহায্যে সেখানে নির্ব্বাক অভিনয় হয়ে থাকে। সেখানকার দেববাদ, স্বর্গ, নরক ও প্রেত-লোক, জীবনের নানা অনুভূতির সহিত যুক্ত। এ সমস্ত আশ্চর্য্যভাবে মুখোসের সাহায্যে অভিনীত হয়। বিরাট প্রাঙ্গনে দলে দলে লামাগণ অতিবিচিত্র মুখোস পরে' উপস্থিত হয়। শুধু গতি ও নৃত্যের সাহায্যে এ সমস্ত নাটককে সুসম্পন্ন করা হয়। অনেক মুখোস কঙ্কালের প্রতিরূপ, কোনটি রাক্ষস বা কোন বীভৎস জানোয়ারের চেহারা। যমের দূতেরা মহিষ বা হরিণের মুখোস পরে' আসে। নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র একটা তুমুল বাদ্যবাহুল্য ঝঙ্কৃত করে তোলে—এরই ভিতর অতি বিচিত্র বহুবর্ণের পরিচ্ছদ পরে' অভিনেতারা অগ্রসর হয়। তিব্বতের "কালোটুপীর নাচ" অতি বিখ্যাত। বস্তুতঃ এ সমস্ত নৃত্য ক্ষিপ্রতা ও গতিবেগের জন্য বিখ্যাত।

বস্তুতঃ প্রাচ্য নৃত্যের সর্ব্বত্র আখ্যানমূলক দৃষ্টিতেও রসবিশ্লেষণ ও প্রতিফলনের চেষ্টা আছে। বাহিরকে মুখ্য করে' এসব সৃষ্টি হয় নি। আধুনিক নব্য নৃত্যের প্রচলনে একপাটী প্রায় সকলে 'ভুলে' গেছে। ইউরোপের নৃত্যের অনুকরণে এদেশী নৃত্য ইদানীং রচিত হচ্ছে। তা'তে সাময়িক উচ্ছ্বাস জাগ্রত হয় কিন্তু স্থায়ী রস হ'তে সে সব বঞ্চিত। জাপানের Geisha নৃত্য, চীনের রূপক নৃত্য, ব্রহ্মদেশ যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনের নৃত্য যে ধারার নমুনা—সে ধারার ইতিহাস ইউরোপে নেই। আধুনিক নৃত্যকলাকে প্রাচীন ঐশ্বর্য্য হ'তে বঞ্চিত করে' অগ্রসর হ'লে তা' ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তি বিধান করতে পারে, কিন্তু বিকশিত ফুলের মত শীর্ণ হ'তে দেরী হবে না।

স্পেনের কথা — কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

ক্যাষ্টেলার নগরোদ্যান—মাদ্রিদ

(১)

আমি স্পেনে যাবার আগে উত্তর ইটালী, সুইজারাল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলাম, আবার স্পেন হতে ফেরবার সময় প্যারিসে কয়দিন থেকে আশপাশে অনেক স্থান দেখে ইটালীতে আসি, ও সেখানকার প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখে শেষে নেপ্‌লস ও পম্পে হয়ে বৃন্দিসিতে জাহাজে উঠে এদেশে ফিরে আসি। আমি স্পেন দেশে ছিলাম পনের দিন। তার মধ্যে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান প্রায় সব দেখেছি ও শিক্ষার্থীর মত যতদূর পেরেছি সে সব স্থানের খবর সংগ্রহ করেছি। আমাদের দেশের লোক সচরাচর কেহ স্পেন দেশে যান না—যাঁরা continentএ ঘুরেন, তাঁরা ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড বা ইটালী দেখে থাকেন। কাজেই আমি স্পেন থেকে ফিরে আসার পর এমন কি যাঁরা বিলেত গেছেন ও কন্টিনেণ্ট্ ঘুরেচেন, তাঁদেরও স্পেন সম্বন্ধে জানবার খুব আগ্রহ জেগেছে। আর যাঁরা ও-সব দেশে যাননি তাঁদের তো জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। কাজেই স্পেনের কথায় আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। তবে পনের দিনের অভিজ্ঞতা এত বড় দেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট নয়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। কোনও দেশ সম্বন্ধে বলতে গেলে তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় কিছু না দিলে বক্তব্য বিষয় তেমন পরিস্ফুট হবে না। তাই কিছু বল্‌তে হচ্ছে।

উত্তরে পিরেনিস্ পর্ব্বতমালা স্পেনকে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা করে রেখেচে। সে দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী প্রাকৃতিক বাধারূপে পথ আগলে আছে। য়ুরোপের লোকেরা বিশেষ কাজে না আট্‌কালে কেবল সখ করে দেশ দেখবার জন্যে স্পেনে খুব কম গিয়ে থাকেন। কাজেই সে দেশ সম্বন্ধে তাঁদেরও পরিষ্কার ধারণা নাই। অনেকেই খবরের কাগজ পড়ে একটা মন গড়া ধারণা করে রেখেছেন। তাই আমি এদেশ ছাড়বার আগে আমার জন কয়েক য়ুরোপীয় বন্ধু আমাকে নানারকম ভয় দেখিয়েছিলেন; সে দেশে গিয়ে দেখলাম সবই অমূলক। অনেকে তাদের পিছিয়ে-পড়া জাতির মধ্যে গণ্য করে থাকেন—আমি যতটা দেখেছি তাতে তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। দেশটা পর্ব্বতবহুল—সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া য়ুরোপের আর কোনও দেশে এত বেশী পাহাড় নাই। আমি জ্যৈষ্ঠ মাসে সেখানে গিয়াছিলাম; তখন খুব শীত ভোগ করতে হয়েচে! অনেকে আমায় বলেছিলেন স্পেন দেশটা ভারতের মত গরম হবে, শীতের পোষাকের দরকার হবে না। সেখানে গিয়ে দেখলাখ সব উল্টো। স্পেনের জন্যে সূতী

পোষাক সঙ্গে নিছলাম—তার পাট খুলতে হয় নি। যেমনকার পোষাক তেমনই ফিরে এসেচে। দেশটা নদীবহুলও বটে—পাঁচটা বড় নদী শাখা প্রশাখা নিয়ে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। নদী-গুলোর মধ্যে Guadalquiver নদীর সঙ্গে আমার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেবিল সহরে থাকবার সময় আমার ডেনমার্ক দেশের বন্ধু আরহুস (Aarhus) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মিঃ ষ্টেন্‌স্‌গার্ডের সহিত এই নদীর সেতুর উপর বেড়াতে যেতাম। সেবিল

স্পেনের বিখ্যাত মল্লক্রীড়া—ষাঁড়ের সহিত লড়াই

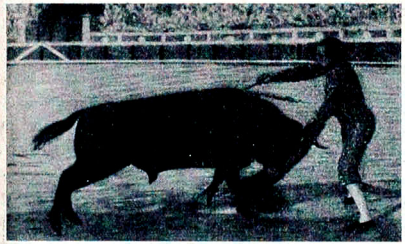

সহরের দিকে নদীর ধারে ধারে সারিবন্দী বৃক্ষশ্রেণী ও লম্বা পার্ক চলেছে, আর অপর দিকে সাদা রঙের একই ধরণের অট্টালিকাশ্রেণী নদীবক্ষে প্রতিফলিত হয়ে বড় সুন্দর দেখাতো। নদীটী বড় হলেও আমাদের গঙ্গার মত চওড়া নদী য়ুরোপে কমই আছে। লণ্ডনে টেম্‌স্ নদী প্যারিসের সীন্ নদীর চেয়ে চওড়া হলেও গঙ্গার চেয়ে অনেক ছোট। আবার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোমের টাইবার নদী আমাদের আদি-গঙ্গার মতও চওড়া নয়।

পর্ত্তুগালের শাসনতন্ত্র পৃথক হলেও স্পেনের সহিত পর্ত্তুগাল অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। পর্ত্তুগাল সমেত স্পেনের পরিধি—২২৪,৭০০ বর্গ মাইল। তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত, অপর দিকে দুর্গম পর্ব্বতমালা বজ্রকঠিন প্রাচীরের মত খাড়া থাক্‌লেও স্পেন আততায়ীর হাত হতে নিষ্কৃতি পায়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পৃথিবীতে যত রাজ্য-লোলুপ জাতির অভ্যুদয় হয়েছিল, সবাইকার শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল এই স্পেনের প্রতি। স্পেনের উর্ব্বর ভূমি কেবল তার বসুন্ধরাকে ফলফুলে ও ধনধান্যে পূর্ণ করে রাখেনি, খনিজ সম্পদেও তাকে গরীয়ান করে রেখেছিল। তাতেই শত্রুর লোলুপতা বেড়ে গিছলো। স্পেন দেশে কলকারখানার বাহুল্য নাই বলে হয়তো এই কল-খানার যুগে তাকে পিছিয়ে-পড়া জাতি বলে ধরে নেওয়া হয়েচে। আজ সমগ্র য়ুরোপ বেকার-সমস্যায় বিচলিত হয়ে উঠেছে। কল-কারখানার আবিষ্কারের উদ্দেশ্য হচ্চে কলের সাহায্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক মজুরের দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন। 'কলে হুহু করে সব রকম মাল তৈয়ার হচ্চে রাশি রাশি, চাহিদা থাকলে আর কোন গোল থাকে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হতে জগ-তের সর্ব্বত্র অর্থনৈতিক দুরবস্থার একশেষ হয়েচে। মাল কিনবার সামর্থ্য কমেছে, রাশি রাশি মাল জমে গেছে, বাধ্য হয়ে কলকার-খানা বন্ধ করতে হচ্চে। যে সব মজুর কলে খেটে খেত তারা বেকারের সংখ্যা বাড়িয়েই তুলেছে; য়ুরোপের সব স্থানেই গভর্ণমেণ্ট বেকার-সমস্যা পূরণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু স্পেন দেশে কলকারখানার বাড়াবাড়ি না থাকায় বেকার-সমস্যা প্রখর হয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

পর পর যে সব জাতি স্পেনে আততায়ীরূপে এসে-ছিল, তাদের অনেকেই এমন সোনার দেশের মায়া কাটাতে পারেনি, এদেশে বসবাস করে এদেশের সঙ্গে মিশে গেছে—পৃথক অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেনি, সব প্রায় এক হয়ে গেছে। যারা মিশতে না পেরে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তারা তাদের কৃতকর্ম্মের নিদর্শন

রেখে গেছে, এখনও সে সব দেদীপ্যমান আছে। স্পেনের আদিম নিবাসী কারা ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় না, প্রথম এসেছিল আইবিরিয়ানরা (Iberian), তাদের ইতিহাসও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। তবে তাদের নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়নি। তারপর খৃষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এসেছিল কেল্ট্‌স্ (Celts) তারা পর্ত্তুগাল ও গ্যালিসিয়া প্রদেশেই স্থায়ীভাবে জমিয়ে বসেছিল। তারা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রেখেছিল, কিন্তু যে সব কেল্ট্‌রা স্পেনের মাঝখানে এসে বসবাস করেছিল তারা আইবিরিয়ানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেল্টিবেরিয়ান (Celtiberian) জাতির উদ্ভব হয়েছিল। তার আগে এসেছিল খৃষ্টীয় জন্মের এগার শত বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসিওরা। তারা বসবাস করতে আসেনি, এসেছিল মৎস্য ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হবার জন্য। তারাই স্পেন দেশের নামকরণ করে Span বা Spania অর্থাৎ 'গুপ্তভূমি'। স্পেনের সংস্পর্শে এসে তারা একদিকে যেমন সম্পদশালী হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি তারা অক্ষর ও মুদ্রা প্রচলন করে গিছলো। সেবিল্ এল্‌জিসিরাস্ ও মালাগায় (Seville, Algecirias, Malagu) তাদের প্রভাব বেশীরকম চলেছিল। ক্রমে শোষণনীতি তাদের কালস্বরূপ হলো, দেশের লোক তাদের বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা করলে, বেগতিক দেখে ফিনিসিওরা কার্থেজের সাহায্য চাইলে। তারা এসে স্পেন জয় করে ফিনিসিওদের আমল দিলে না। নিজেরা জাঁকিয়ে বস্‌লো, ও স্পেনে নব কার্থেজ সহর গড়ে তুললে। এটা ঘটেছিল খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে।

প্রথম পিউনিক্ যুদ্ধে কার্থেজ সিসিলি হারিয়েছিল। স্পেন দখল করে সেটা পুষিয়ে নিলে, গ্রীক্‌রা এর আগে এসে সমুদ্র তীরবর্ত্তী জনপদে আস্তানা করেছিল। কার্থেজের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে দেখে রোমানরা স্পেনে এসে হাজির হল। রোমের তখন প্রবল প্রতাপ। কার্থেজীয়ানদের ক্রমে বেগতিক দেখে স্পেন থেকে সরে পড়তে হোল। রোম্যানরা তখন স্পেনে কায়েমী হয়ে বস্‌লো। স্পেনের অধিবাসীরা তাদের তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। রোমের কড়া শাসনে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ছয় শত বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০৬ হতে ৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেনের উপর রোমের প্রভাব অটুট ছিল। কিন্তু অন্তর্বিপ্লবে রোমকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে ফেল্লে। রোম্যানরা চলে গেলেও তাদের বহুনিদর্শন এখনও সগৌরবে মাথা তুলে আছে। রোম্যান রাজ্যের অবসানে তাদের স্থান দখল করে নিলে জার্ম্মাণ ভিসিগথেরা। তারা ৪০৯ খৃঃ হতে ৭১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেনে আধিপত্য করেছিল। তারপর ৭১১ খৃষ্টাব্দ হতে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানরা আধিপত্য করেছিল স্পেনের উপর। তারপর কিছুদিন ফরাসী প্রভাবও বিস্তৃত হয়েছিল। রোম্যানদের আমল থেকে যে যে জাতি স্পেনে রাজত্ব করে গেছে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সূক্ষ্ম শিল্প, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছে। এখনও

আলকাজার প্রাসাদ—সেবিল

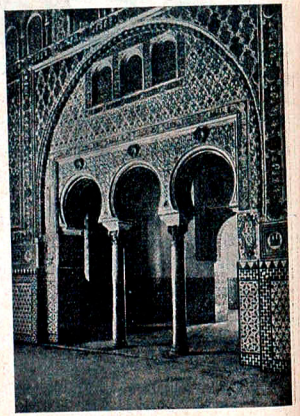

বহুকীর্ত্তি তাদের স্মৃতি বহন করচে। স্পেন দেশে একজন মুসলমান না থাকলেও গ্রেণাডায় আল্‌হাম্ব্রা কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়, সেবিলে এলজাকার প্রাসাদ এখনও মুসলমান প্রভাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যাহা হউক বহুজাতির সংমিশ্রণে স্পেনীয় জাতি গড়ে উঠেছে, তাতে তাদের অধোগতি না হয়ে উন্নতিই হয়েচে।

আমি এখন নিজে যা দেখেছি সংক্ষেপে তার পরিচয় দেব। আমি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রিতে মাদ্রিদ সহরে গিয়ে পৌছিলাম। আমাকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য ষ্টেশনে লোক ও মোটর গাড়ী ছিল। হোটেলে তারা যে সব খাবারের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, তা আমি স্পর্শ না করে কেবল গরম দুধ পান করে রাত কাটালাম। য়ুরোপে থাকা কালে আমি দুধ ও ফলের উপর নির্ভর করেছিলাম; তাতে শরীর ভালই ছিল—কখনও দুর্ব্বলতা অনুভব করিনি। পরদিন সকালে উঠে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ন্যাসানাল বিব্‌লোটেকায় (Nacionale Bibloteca) গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। লাইব্রেরীর সঙ্গে বড় মিউজিয়াম আছে। লাইব্রেরীর সঙ্গে মিউজিয়ামের সংযোগ য়ুরোপের নানাস্থানে দেখেছি। বিট্রিশ মিউজিয়াম ও তার বিরাট লাইব্রেরী ওতপ্রোতভাবে এক সঙ্গে মিশে আছে। একসঙ্গে এত বড় মিউজিয়াম ও এত বড় লাইব্রেরী জগতে দ্বিতীয় নেই। পুস্তক সংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ। পুস্তক সংখ্যায় ওয়াশীংটন লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস বেশী হলেও তার সঙ্গে এত বড় মিউজিয়াম্ নাই। প্যারিসে বিবলোথেকা ন্যাশানেলের পুস্তকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ ও তার সঙ্গে একটা বড় মিউজিয়াম বাড়ী আছে। তবে তার সংগ্রহ তত বেশী নয়। রোমে পোপের ভ্যাটিক্যান্ লাইব্রেরীর সহিত যে

মিউজিয়াম্ আছে তার সংগ্রহ বিরাট। একটা গ্রাম জুড়ে মিউজিয়াম বাড়ী চলেছে। মাদ্রিদের মিউজিয়াম তত বড় নয় ও সংগ্রহও তত বেশী নয়। তা যাই হোক, এখানকার পাঠগৃহ দেখে আমি পরম সন্তোষলাভ করেছিলাম, এর দৈনিক পাঠকসংখ্যা তিন হাজার। আমি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তিনি তখন এই পাঠগৃহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। সে ঘরে গিয়ে দেখলাম সব আসনগুলি অধিকৃত হয়ে রয়েছে। সকলে অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করছে। কেহ নোট নিচ্ছে। এত লোক সে ঘরে বসে পড়ছে কিন্তু টুঁ শব্দটী নেই, আমি বাহির হতে বুঝতেই পারিনি যে এত লোক

সেবিল পার্ক

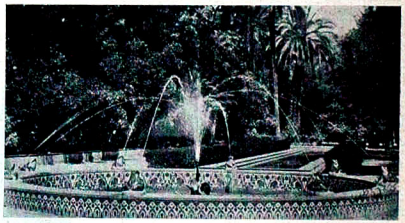

ও ঘরে বসে আছে। এখানে বাজে অপদার্থ বই রাখে না।

এই লাইব্রেরীর সামনে ও পাশ দিয়ে বড় বড় রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার মাঝখানে পার্ক চলেছে। সারিবন্দী গাছ ও মাঝে মাঝে ফোয়ারা ও মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি। বসবারও আসন আছে, তবে বসলেই কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণা বেশী নয়, দুই তিন সেন্টিম্। এখানে গাছের উচ্চডালে লাউড্‌ স্পিকার আছে। রেডিওতে যে সব গান বাজনা হচ্ছে তা পার্ক দিয়ে যেতে যেতে সব শুনা যায়। গান বাজনায় সর্ব্বদা সহরটীকে উৎসবময় করে রেখেছে। এখানকার এই সব পার্কে ছোট-খাট লাইব্রেরীও

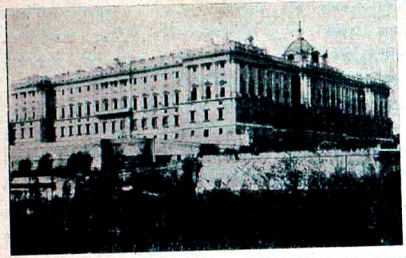

রাজ প্রাসাদ—মাদ্রিদ

একটা নোট বইয়ে অনেক কথা যায় উচ্চারণ লিখে রেখে ছিলাম, মাঝে মাঝে তাও দেখে নিতে হচ্ছিলো। যা হোক দুঘণ্টা পরে তাদের হাত হতে নিষ্কৃতি পেলাম, পরদিনের কাগজে দেখলাম ৭॥ কলম আমার দেওয়া খবর বেরিয়েছে।

কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ আমেরিকার ডাক্তার বিশপ (Dr. W. W. Bishop) ও জেনেভা জাতিসঙ্ঘের গ্রন্থাগারিক ডাক্তার সেব্‌নস্মার (Dr. Sevensma) সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। সাক্ষাৎ পরিচয় বলছি এই জন্য—

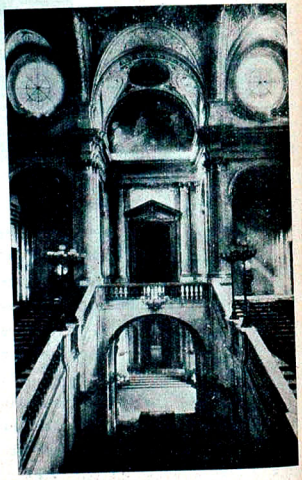

মাদ্রিদ প্রাসাদে উঠবার সিঁড়ি

থাকে। সেখানে বসে অনেকে বই পড়ে। কোথাও কোথাও কবিকুঞ্জ আছে, সেখানে জনপ্রিয় কবির বই থাকে পাঠক যে কবির ভক্ত তার বই নিয়ে এই সব কুঞ্জে সময় কাটায়। সেবিল্ সহরে একটী পার্কে এরূপ কবিকুঞ্জ দেখেছি। কুঞ্জের মাঝে ফোয়ারা ও আশে পাশে মর্ম্মরের বসবার আসন আছে। ভক্তেরা সেখানে বসে তাদের প্রিয় কবির কবিত্বের আস্বাদনে মজগুল হয়ে আছে। আমি রেডিওর গান বাজনা শুনতে শুনতে প্যালেস হোটেলে এসে উঠলাম; সেখানে আমাদের আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার কংগ্রেসের বড় আফিস বসে গেছে; আফিসের কর্ম্মচারী সবাই মহিলা। তারা সকলেই ব্যস্ত, প্রত্যেক সভ্যের জন্য তাকে নম্বর-আঁটা খোপ আছে। আমি গিয়ে আমার নম্বর বলবামাত্র আমার ৩১নং খোপ হতে চিঠিপত্র ও প্রোগ্রাম-পুস্তিকা যা ছিল সব বার করে এনে দিলে, আর জানালে আমার জন্য A, B, দৈনিক কাগজের দুজন রিপোর্টার অপেক্ষা করচে। আমি পাশের ঘরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তারা ভারত সম্বন্ধে খবর নিতে এসেচে। তারা ইংরাজী একবর্ণ জানে না, আর আমার স্পেনীয় ভাষার বিদ্যা তথৈবচ। তবু যাহোক কিছু শিখেছিলাম, তাই কষ্টে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম, তাই কি ছাই সব কথা মনে পড়ে।

গুলে আলাপ তাঁদের সঙ্গে অনেকদিন হতে চলছিল। সেদিন বৈকাল প্রথম অধিবেশন হবে, তাতে আমাকেই প্রথমে বলতে হবে। স্পেনীয় ভাষা কিছু কিছু শিখে-ছিলাম ও তা যৎসামান্য মাত্র—তাতেই বক্তৃতা দিতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হত তাই ইংরাজীতেই আমার বক্তব্য বলেছিলাম। ডাক্তার সেব্‌নস্মা সেটা ফরাসীতে তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দিলেন, তারপর নানাদিক হতে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আমর বক্তব্য শোনবার পর হতে ভারত সম্বন্ধে আরও খবর জান্‌বার জন্যে অনেকের আগ্রহ বেড়ে যায়। আমি যেকদিন ছিলাম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনেকটা সময় দিতে হয়েচে। এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পৃথিবীর তেত্রিশটী দেশ হতে পাঁচশত দশজন প্রতিনিধি এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ষাটজন ছিলেন তাঁদের নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি। প্রথম কন্‌কারেন্স্ হয় মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্বোধন করেন সে দেশের শিক্ষামন্ত্রী। ৬ই জৈষ্ঠ সোমবার মাদ্রিদ রাজপ্রাসাদে আমাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্পেনে এখন রাজা নাই। ৩৪ বৎসর হল সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। রাজার স্থান অধিকার করেছেন প্রেসিডেণ্ট্। রাজকীয় জাঁকজমক সব পূর্ব্ব-মতই বজায় রাখা হয়েচে। উপরে উঠবার সিঁড়িরদুধারে সশস্ত্র প্রহরী উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া লোক লস্করের বাহুল্য সর্ব্বত্র। বহুমূল্য আসবাবে রাজবাড়ী সুসজ্জিত থাকবে তা বলা বাহুল্য মাত্র। এসব দেশের সম্বর্দ্ধনার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মদ। কত বোতল মদ যে উড়লো তার সংখ্যা নাই, তা ছাড়া অন্য খাদ্যও ছিল। আমি মদ ব্যবহার করিনে সেজন্যে একটু মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল।

—:*:—

মোতি ঝর্‌ণা

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

কঠিন কৃষ্ণ শৈল-নিলয়ে
টুটিয়া সবলে পাষাণ-কারা,
সাবলীল গতি রম্য প্রকৃতি
দেখেছি ঝরিতে রজত-ধারা!
তার সেই বেগ-চঞ্চল বারি
করে প্রতি জনে ভাবের পূজারী,
ঝর্ ঝর্ জল-পতনের স্বর
কী চেতনা আনে পাগল পারা!

ভাবের সুষমা উঠছে বিকশি',
ভাষার আকারে মানস-লোভা;
ভাষা পুনঃ আনে অরূপ ছন্দ
বিজনে রচিছে কী নব শোভা!
সম তালে কানে বাজে মধু-গীতি,
উঠে সমতলে শ্যামলতা প্রীতি,
সুবরণা ঘর ঝরিছে ঝরণা
বিশ্বে যে তার পেতেছি সাড়া!

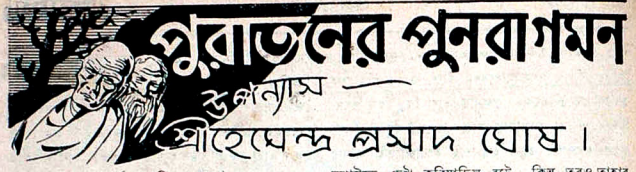

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ

সারারাত্রি মাধবী ঘুমাইতে পারিল না। তাহার পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে সে শুচিতার পরিবেষ্টনে অভ্যস্তা। বিশেষ পিত্রালয়ে মা'র ও শ্বশুরালয়ে শাশুড়ীর বৈষম্যের পর হইতে সে শুচিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। মালতীর শ্বশুরালয়ের আচার-ব্যবহার তাহার সেই শুচিতার ধারণায় ও আদর্শে আঘাত করিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মদ্যপান করিতে পারে, ইহা মাধবীর কল্পনাতীত ছিল। যে সম্মিলনে মদ্যপান চলিয়াছে, তাহাতে যে কামিনী-কুহক ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তাহার একবার মনে হইল, সে প্রমথনাথকে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া রবীন্দ্রনাথকে নিবৃত্ত করিতে বলিবে; কিন্তু তাহা বলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে মনে করিল, প্রমথনাথ মালতীকে লইয়া গিয়াছিল। সে যদি রবীন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া থাকে, তবে সে তাহার কর্ত্তব্য অবশ্যই করিবে; আর সে যদি তাহা জানিতে না পারিয়া থাকে, তবে সে কেবল মাধবীর কথায় ব্যথিত হইবে। মাধুরী গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল; সে দিদির বিনিদ্র অবস্থার বিষয় জানিতে পারিল না।

প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের কথা জানিয়া আসিয়াছিল। তাহা তাহার পক্ষেও আঘাত হইলেও সে মাধবীর মত বিচলিত হয় নাই। সেও বহুক্ষণ সেই কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়াছিল; কিন্তু আপনাকে আপনি বুঝাইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ যেরূপ চতুর তাহাতে সে যে সহসা আপনাকে অসংযত হইতে দিবে, এমন মনে হয় না। সে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের আচার-ব্যবহারের অত্যন্ত পক্ষপাতী বলিয়া মনকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও তাহার মনে একটা অস্বস্তির ভাব রহিয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রাতেই মাধবী আপনার বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যায় প্রমথনাথ ভগিনীপতিদিগকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। মনোজ আহারান্তে গৃহে ফিরিলে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "রবি এসেছিল?"

মনোজ বলিল, "হাঁ। কেন, না আসবার কি কোন কারণ ছিল?"

তখন মাধবী স্বামীকে পূর্ব্বদিনের শ্রুত কথা বলিল। স্বামীর নিকট সে পিত্রালয়ের কোন কথাই গোপন করিত না। সে তাহার শাশুড়ীর প্রদত্ত শিক্ষার ফল। তিনি পুত্রবধূদিগকে কন্যারই মত দেখিতেন—সংসারের কোন বিষয় তাহাদিগের নিকট গোপন রাখিতেন না; বলিতেন, তিনি যদি তাহাদিগকে "আপনার" না করেন, তবে তাহারাই বা সংসার আপনার বলিয়া মনে করিবে কেন! তিনি বধূদিগকে শিক্ষা দিতেন, স্বামীর কাছে যে স্ত্রীর গোপন করিবার কিছু থাকিতে পারে, তাহা যেন তাহারা মনে না করে।

মাধবীর কথা শুনিয়া মনোজ চিন্তিত হইল। সে বলিল, "ওরা যেমন চালাক, তাতে সহজে ধরা দেবে না। রবির ব্যবহারে অপ্রতিভ ভাব ধরবার কোন উপায় ছিল না।"

তাহার পর সে বলিল, "সে কেবল বলে গেছে, মালতী পুরী যা'বে না।"

মাধবী বলিল, "কেন? সেত বলে গেছল—যা'বে।"

মনোজ হাসিয়া বলিল, "বোধ হয় বুঝেছে, স্বামীকে পাহারা দেওয়া দরকার।"

"তা' নয়। রবি যতটা সপ্রতিভ, সে ততটা নয়। দাদা যে ব্যাপারটা জেনে এসেছে, সেই লজ্জায় সে যা'বে না। দাদা যদি রাত্তিরে না যেত, তবে ব্যাপারটা বেমালুম ঢেকে ফেলত।"

"অর্থাৎ সে তোমার মত বোকা নয়।"

"আশীর্ব্বাদ কর, যেন চালাক হ'বার দরকার না হয়; বোকা থেকেই যেতে পারি।"

"বিশ্বাস কি?"

"ও কথা বলো না। যেন তোমার উপর এই বিশ্বাসই রাখতে পারি।"

মনোজ আদর করিয়া করতলে তাহার গণ্ড স্পর্শ করিল; বলিল, "আর আমার ইচ্ছা, যেন তোমার ঐ বিশ্বাসের উপযুক্ত থাকতে পারি।"

"মালতী যা'বে না; তাহলে লজ্জাবতীও যা'বে কিনা সন্দেহ। মাধুরী একা গেলে মা'র দেখছি বড় অসুবিধা হ'বে।

সত্যি, মা সেকেলে লোক, মাধুরী এখনও লায়েক হয় নি; কাজেই মালতী না গেলে তোমাদের বৌটির বুদ্ধি মিলবে না—বিশেষ প্রমথও সেখানে গেলে মা'র অপ্রীতিকর কোন কাজ করতে পা'বে না।"

"তাই বটে।"

"তোমাকে ত যেতে বলছিল; না হয়, তুমি দিন পনের ঘুরে এস; তোমার মা'কে দেখা হ'বে; মা'রও তোমাদের দেখা হবে।"

"মাত অনুমতি দিয়েই রেখেছেন; কিন্তু যা'বার বিষয় এখনও স্থির করিনি।"

"প্রমথ ত বলে গেছে?"

"হাঁ।"

"মা'কে বলব?"

"না, আমিই বলব।"

পরদিন প্রাতে মাধবীর শাশুড়ীই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, পুরী যা'বে ত?"

মাধবী বলিল, "আপনি যা বলেন।"

শাশুড়ী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা'কে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে?"

মাধবী চুপ করিয়া রহিল।

শাশুড়ী বলিলেন, "দেখ মা, তিনি কেমন মায়া কাটিয়ে গেছেন; কিন্তু আমরা মায়া কাটাতে পারছি না। সব সময় ত সুবিধা হয় না; তুমি বেড়িয়ে এস।"

"তবে আপনার কাছে থাক।"

"সে কি হয়? ছেলে মানুষ—দেশ দেখবে, কত আনন্দ করবে; দিদিমা'কেও দেখে আসবে।"

"কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে!"

শাশুড়ী হাসিলেন, "পাগলী মেয়ে! ওকে যখন স্বামীর ঘর করতে যেতে হ'বে, তখন কি হ'বে? যদি তত দিনও বেঁচে থাকতে হয়, তবে দেখবে, তখন তোমরা কাঁদবে আর আমি হাসব।"

মাধবীর যাওয়াই স্থির হইল। মনোজ প্রমথনাথকে সংবাদ দিল, যে মাধবীকে ও ছেলেমেয়েদের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিয়া আসিবে! মাধবী যা'কে শাশুড়ীর কাযের বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিল।

যথাকালে ষ্টেশনে আসিয়া মাধবী দেখিল, মাধুরীর সঙ্গে লজ্জাবতীও পুরী যাইতেছে। মনোজও প্রমথনাথকে বলিয়াছিল, "মালতী যাবে না শুনে তোমার গিন্নীটি যেন যেতে অস্বীকার না করেন—মা তা'তে দুঃখিত হ'বেন"—মাধবী তাহা জানিত না। লজ্জাবতী যে কেবল প্রমথনাথের কথায়—অনিচ্ছায় যাইতে সম্মত হইয়াছিল, তাহাও সে জানিত না। তবে সে লক্ষ্য করিল, লজ্জাবতীর মুখে আনন্দের বিকাশ নাই। সে প্রমথনাথকে বলিল, "মালতী সত্যই এল না?"

প্রমথনাথ বলিল, "কি কাজ আছে।"

মাধবী আর কোন কথা বলিল না; তাহার মনে হইল, সে আসিলে ভাল হইত, মা ছেলে মেয়েদের এক-সঙ্গে পাইতেন। আবার কত দিনে সে সুযোগ ঘটিবে, কে বলিতে পারে?

সকালে ট্রেণ যখন পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন মা'র লোক গাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় উপস্থিত ছিল—প্রমথনাথ মেয়েদের গাড়ীতে বসাইয়া মাল লইবার ব্যবস্থা করিল এবং সব মাল একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই

দিয়া লোকটিকে তাহাতে আসিতে বলিল এবং স্বয়ং ট্যাক্সিতে বসিল।

ট্যাক্সী অল্পদূর অগ্রসর হইলেই অদূরে সমুদ্র দেখা গেল। মাধুরী পূর্ব্বে কখন সমুদ্র দেখে নাই; লজ্জাবতীও দেখে নাই। তরু "ঐ সমুদ্দুর" বলিয়া উঠিতেই উভয়ে সেই দিকে চাহিল। মাধুরী আনন্দে ও বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার!" লজ্জাবতীও বিস্ময়ে অভিভূত হইল বটে, কিন্তু কোনরূপে বিস্ময় বা আনন্দ প্রকাশ করিল না। প্রশংসা সুলভ করিতে নাই—এই শিক্ষা সে পাইয়াছিল; কাযেই বিস্ময়ে বা শ্রদ্ধায় অভিভূত হইলে সেভাব গোপন করাই সে সঙ্গত মনে করিতে শিখিয়াছিল।

সমুদ্রের কূলবর্ত্তী পথ দিয়া ট্যাক্সী অগ্রসর হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মা'র বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা গাড়ীর "ভোঁ" শুনিয়া বারান্দায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে হর্ষদীপ্তি! গাড়ী হইতে নামিয়া তরু সর্ব্বাগ্রে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং মাধবী "ছুঁয়ে দিস্‌নে—ছুঁয়ে দিস্‌নে" বলিতে না বলিতে দিদিমা'র পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার বড় ভাইটি তাহার অনুসরণ করিল এবং সেও তাহার মা'র বারণ মানিল না। মা হাসিতে লাগিলেন। প্রথমে মাধবী তাহার পর মাধুরী মা'কে প্রণাম করিবার পরে লজ্জাবতী প্রণাম করিল, কিন্তু পদধূলি গ্রহণ করিল না। ধূলা অপরিষ্কার এবং তাহাতে রোগবীজাণু থাকে; কাযেই পদধূলি-গ্রহণ অজ্ঞতার বিপজ্জনক নিদর্শন, ইহাই সে শিখিয়াছিল। মা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রমথনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালতী এল না?"

প্রমথনাথ উত্তর দিল, "না। আসতে পারলে না—কি কায আছে।"

মা আর কিছু বলিলেন না; কোন বিষয়ের অধিক আলোচনা করা তিনি ভালবাসিতেন না; পাছে তাহা অপ্রিয় হয়।

"মা পূজা করিতে যাইলে প্রমথনাথ সকলকে লইয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া মা'কে একান্তে পাইয়া মাধবী রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রুত সংবাদ দিল এবং বলিল, তাহার বিশ্বাস, সেই জন্যই মালতী আইসে নাই। শুনিয়া মা চিন্তিতা হইলেন। তাহা দেখিয়া মাধবী বলিল, "মা তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তা'র আপদ বালাই সব দূর হয়ে যা'বে।"

মাধুরীর শ্বশুরবাড়ীর ঘটনা মা সব শুনিলেন এবং শুনিয়া বলিলেন, "বেয়ানের খুব বিবেচনা—বৌকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

লজ্জাবতী বলিল, "অত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, পাঠাবেন না?"

মা বলিলেন, "না পাঠালেও' বলবার কিছু ছিল না; কেন না, তাঁ'র বাড়ীতে চিকিৎসার অভাব হ'ত না, সেবা শুশ্রূষারও ত্রুটি হ'ত না। পাঠিয়ে দিয়েছেন ভালই করেছেন।"

মাধুরী বলিল, "তিনি কাশীতে যা'বেন—সেখান থেকে আরও ক' যায়গা ঘুরে ফিরবেন।"

"তোমাকে কি সঙ্গে নেবেন?"

"বলেছেন, আমার কষ্ট হ'বে—তাই নেবেন না।"

"বাড়ীতে তোমার কাছে কে থাকবে?"

"আমি কলকাতার বাসায় থাকব।"

"ফিরে যা'বার সময় নিয়ে যা'বেন?"

"হাঁ।"

প্রমথনাথ বলিল, "দেবদত্ত যে বাড়ীতে আছে, সেই খানা কিনবার কথা বলছে; কিনে রদবদল করে নেবে। আমি বললাম, বাড়ী যদি করবে, তবে ফাঁকায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে যাও; সে বলে, মা এলে, গঙ্গা দূর হ'বে বলে' তাঁর ভাল লাগবে না।"

মা বলিলেন, "তা, যা' ভাল বুঝে তাই করুক।"

মা'কে পাইয়া মাধবী এমনই তৃপ্ত হইয়াছিল যে, সে আর কোথাও যাইবার কথা মনেও করে নাই। কিন্তু মা'র সঙ্গে লজ্জাবতীর কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই

ফুরাইয়া গিয়াছিল এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাই সেই মাধুরীকে বলিল, "সব দেখতে যা'বে না?"

শুনিয়া মাধবী প্রমথনাথকে বলিল, "দাদা, আমি আর কোথাও যা'ব না। আমরা মায়ে ঝিয়ে বাড়ী থাকি—একসঙ্গে জগবন্ধু দর্শনে যা'ব; তুমি আর সকলকে নিয়ে সহর ঘুরে এস।"

তরু বলিল, সেও দিদিমা'র কাছে থাকিবে।

প্রমথনাথ বলিল, "তুই সব দেখবি নে?"

মাধবী বলিল, "ও ওর ঠাকুরমা'র প্রকৃতিটি পেয়েছে—চুপচাপ থাকতে ভালবাসে।"

প্রমথনাথ বলিল, "সে হ'বে না—দেখতে যেতে হ'বে।"

তরু আর আপত্তি করিল না। তাহার পিতামহীর শিক্ষা—গুরুজনের আদেশ অমান্য করিতে নাই।

ট্যাক্সী আনাইয়া প্রমথনাথ লজ্জাবতী, মাধুরী এবং ভাগিনেয়ী ভাগিনেয়কে লইয়া চলিয়া গেল। লজ্জাবতী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মাধবী বুঝিল, এ পরিবেষ্টন লজ্জাবতীর ভাল লাগিবে না, সে শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে।

মাধবী যাহা অনুমান করিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল; সমুদ্রস্নান, দ্রষ্টব্যস্থান দেখা—এ সবই দুই তিন দিন পরে লজ্জাবতীকে আকৃষ্ট করিতে বিরত হইল। তখন ভুবনেশ্বর দেখিতে যাইবার প্রস্তাব হইল এবং সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। তাহার পর লজ্জাবতী কলিকাতায় ফিরিতে ব্যস্ত হইল। প্রমথনাথ মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মাধবী ভাব বুঝিয়া বলিল, "দাদা, বাড়ী ফেলে বেশীদিন বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। তুমি এইবার যা'বার উদ্যোগ কর। বৌও তোমার সঙ্গে যা'বে।"

প্রমথনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কবে যাবে?"

"মে ক'দিন ছুটী পাওয়া যায়।"

"মাধুরী থাকবে?"

"দেবু এসে নিয়ে যা'বে।"

ইহার পর মাধুরীর শাশুড়ীর পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, দেবদত্ত কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়াছে—এখন বাড়ীটার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে। সে সব হইয়া যাইলে তিনি কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে ফিরিবার সময় পুরীতে আসিবেন, মনে করিয়াছেন—তবে সে জগবন্ধুর দয়া। যদি জগবন্ধু কৃপা করেন, তবে সেই সময় আসিয়া মাধুরীকে লইয়া যাইবেন এবং তাহার কলিকাতায় থাকিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দেশে ফিরিবেন।

এই পত্র আসিলে স্থির হইল, মাধুরী এখন মা'র কাছেই থাকিবে।

তখন প্রমথনাথ লজ্জাবতীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল—মাধবীর কন্যা তরুও সেই সঙ্গে ঠাকুরমা'র কাছে ফিরিয়া গেল।

মা ও মাধবী—উভয়েরই মনে একটু বেদনার ভাব ছিল—সংসারে যে নূতন আচার-ব্যবহার প্রবেশ করিল, তাহার ফল কি হইবে? তবে মনোজ্ঞ মাধবীকে বুঝাইয়াছিল, হিন্দুনারীর কালগত সংস্কার তাহাকে ত্যাগ করিতে বিলম্ব করে; কাযেই বদ্ধ অশ্ব ছাড়া পাইলে যেমন খানিকটা ছুটিয়া আবার আস্তাবলে ফিরিয়া আইসে সে-ও তেমনই শেষে অভ্যস্ত আচারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মাধবী স্বামীর কথা সর্ব্বদাই বিশ্বাস করিত; তবুও সে সেই কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ছুটিয়া ফিরিয়া আসিবার মধ্যেও কি খানাগর্ত্তে পা পড়িতে পারে না?" এই প্রশ্ন মনোজ্ঞকে চিন্তিত করিয়াছিল—শিক্ষা যদি সুশিক্ষা না হইয়া কুশিক্ষা হয়, তবে মনে তাহার প্রভাব—রজকের হস্তে বর্ণের মত—কতকটা থাকিয়া যায়।

মা হিন্দু সধবার সাধ্যব্যচ্ছিন্ন আলতা পরা ভাল বাসিতেন—মাধবী তাহা লজ্জাবতীকে বলিয়াছিল। তবুও যে লজ্জাবতী আলতা পরে নাই, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু সে শুনিতে পায় নাই, যাইবার সময় লজ্জাবতী মাধুরীকে বলিয়াছিল, "শীগ্‌গির চলে এস; আর কিছুদিন এখানে থাকলে রংটি পুড়ে যাবে—পা ফুটি ফাটা হ'বে।"

মাধুরী জানিত, তাহার শ্বশুর বাড়ীর চাল যেরূপ তাহাতে তাহার শাশুড়ী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। আর, কিছুদিন পরে মা'র কাছে আসিয়া সে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল—কাযেই লজ্জাবতীর কথায় সে আকৃষ্টা হয় নাই—হইবার উপায়ও ছিল না।

পক্ষকাল যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল; তাহার পর মাধবীর শাশুড়ীর পত্র আসিল, "মা, কবে আসবে?"

মাধবী মাকে বলিল, "মা, আমাকে যেতে হ'বে।"

শুনিয়া মাধুরী বলিল, "আমি বুঝি একা থাকব? দিদি, তুমি মেজদিকে আসতে লেখ; তাঁর বাড়ীর কায নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।"

মা-ও সে প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

মাধবী তখন মালতীকে আসিতে লিখিল এবং মাকে বলিল, "এবার হয়ত মালতী আসবে।"

যেদিন মাধবী ফিরিয়া যাইবে, সেই দিনই মালতীকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ পুরীতে আসিল। সে দুইদিন থাকিয়া ফিরিয়া যাইবে, মালতী দিন কয়েক মার কাছে থাকিবে। মনোজ স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছিল; সে রবীন্দ্রনাথকে বলিল, "রবির উদয় আর আমার অস্ত।"

মালতী আসিলে মাধুরীর সঙ্গী মিলিল। দিদি যেন বড়ই সেকেলে—যে-চাঞ্চল্য যৌবনে স্বাভাবিক, দিদি যেন তাহাকেও সংযত করিয়া জয় করিয়াছেন।

মহারাণী ভবানী

শ্রীশান্তি সুধা ঘোষ

ধন্য করিলে পুণ্যভূমিরে উজল করিলে নারীর নাম
দেবি গো জননি! করুণারূপিণী,
ধন্য ভারত—পুন্যধাম।

দিকে দিকে হেরি দানের মহিমা, দিকে দিকে তব
ত্যাগের গীত,
বহু জনগণে বহুদান সঁপি ছিল গো তোমার হৃদয় প্রীত।
বরষ ব্যাপিয়া প্রতি ব্রাহ্মণে দিলে প্রতিদিন কাশীর বাস,
বিখ্যাত চির "ভবানীর দান" চলিল দিবস বরষ মাস।
আর্য্য রমণী, হিন্দু ললনা উজল করিলে নারীর নাম,
দেবি গো জননি! করুণারূপিণী,
ধন্য ভারত—পুন্যধাম।

স্বার্থ-কুটিল-কালীয়-নাগের সকল দর্প করিলে চুর;
ত্যাগেরে বরিয়া হৃদয়-আসনে ভোগ ও বিলাসে
রাখিলে দূর
শৌর্য্য-স্নেহ-বীর্য্য-গরবে। বিলাস-ব্যসনে ছিলে মা স্থির।
শান্ত-সলিলা স্নিগ্ধ-সমীরা হৃদয় তোমার নদীর তীর।
তীক্ষ্ণ তোমার ছিল মা শক্তি রাজনীতির কুটিলাবর্ত্তে,
বাত্যা আসিবে ভারত আকাশে বুঝেছিলে সেই
"সভার সর্ত্তে"—
বুঝেছিলে জাতি দুর্ব্বল আজি, পীড়নে কাঁদিছে তাহার
প্রাণ,
শত বেদনায় মথিত দলিত, তাই বিদেশীর চাহিছে দান!
অদূরদর্শী নয়ন তাদের, বুঝিতে বারেক হয়নি দেরী,
ভারত-ভাগ্য গগনে সহসা ঘনা'ল তমসা, বাজিল ভেরী।
তোমার ও পূত চরিত স্মরণে উজল আজিকে নারীর নাম,
দেবি গো জননি! করুণারূপিণী,
ধন্য ভারত—পুন্যধাম!

পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়েছি। আবার প্রায় দুইমাস বাদে পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হ'লাম। আড্ডা বেশ জমেছে। নানা গল্প—শিকার, মাছধরা, এমন কি লেখাপড়ার কথাও উঠেছে, যদিও ওসব 'আনপ্লেজাণ্ট টপিক্স্'!

একদিন সকালে চায়ের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় বীরেন এসে বল্লে "আমি ও টুনী বাইকে অল্ ইণ্ডিয়া 'টুরে' বেরুচ্ছি"। কথাটা শুনে তত ভাল লাগল না। ভ্রমণের আনন্দ থেকে বাকী আমরা সবাই বঞ্চিত হই কেন? চিন্তার কারণ হ'ল একটা। শেষে আমরাও মন স্থির করে ফেল্লাম। আমাদেরও 'টুরে' বেরুতে হবে, বাইকে নয় মোটরে। তারপর শুরু হ'ল গোছগাছ করার পালা। ইউনিফরম্ তৈয়ারী করা হ'ল। কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে তার লিষ্ট, কতদূর যাবে, কে কি করবে, কথানা মোটর হ'লে সুবিধা হয় ইত্যাদি সবই ঠিক করে ফেলা হ'ল। প্রচণ্ড মতদ্বৈধ হ'ল গ্রামোফোন নেওয়া হবে কি না—এই নিয়ে। ভোটের যুগ, সহজেই মীমাংসা হয়ে গেল। বিদেশে ঝাড়াঝাপটা যাওয়াই ভালো, ও সব বাজে সখের দরকার নেই।

এই সব চিন্ত-বিভ্রমকারী আলোচনায় পূজার ছুটি শেষ হয়ে গেল। আবার কলেজ···কত আর "প্রক্সি" চলোনো যায়। এদিকে দেশ থেকে বন্ধুরা চিঠির পর চিঠি চালাচ্ছে। বীরেন প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করে নি, এখন এতটা অগ্রসর হয়েছি দেখে তারও ভরসা হয়েছে। বাইকের বদলে এখন মোটরে বেরুবার দিক নিয়েছে।

এক মাস গেল, দু'মাস গেল, পরীক্ষাও নিকটে আসছে, আর আমাদের 'টুরে' বেরুবার তারিখ। সে কি আনন্দ, ভাবা যায় না। অবশ্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে 'টুরে'র আনন্দ তীব্র হৃদয়ে বল সঞ্চার করছিল। "টেষ্ট" পরীক্ষা দিয়ে গৌরীপুরে গেলাম। আবার জোর আলোচনা চল্ল; স্থির হ'ল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে

সদলবলে বেরুনো হবে। কয়দিন পর ক'লকাতায় ফিরে এলাম। কোথা দিয়ে দেড় মাস কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। শেষ প্রশ্নোত্তর লিখে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সেই দিনেই দার্জিলিং মেলে দেশে ছুটলাম। পরদিন বেলা দশটার সময় গৌরীপুর পৌঁছে আবার সেই রাত্রেই সাড়ে আটটার ট্রেনে শিকার ক্যাম্পে রওনা হ'লাম। পরদিন ভোর ছটায় ক্যাম্পে হাজির হ'লাম। সেদিন শিকারের ভাগ্য ভালই ছিল, প্রথম দিনেই এক প্রকাণ্ড "রয়েল বেঙ্গল টাইগার"। শিকার ভালই হ'ল—বার দিনে নয়টি "রয়েল টাইগার" নিপাতিত করা গেল। তারপর বাড়ীতে দিন কয়েক থেকে সদলবলে ১৭ই মার্চ্চ ক'লকাতায় এসে হাজির হওয়া গেল। ক'লকাতায় দু'দিন থেকে সব জোগাড় যন্ত্র ক'রে ১৯শে মার্চ্চ রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় দুখানা মোটর আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাঁচজন "সেভ্রোলে"তে ও বাকী পাঁচজন "ডজে"। হাওড়ার পুল পেরিয়ে আমরা সোজা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে চললাম। সেদিন চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছিল। গাড়ীর "হুড্" ফেলে দিয়ে আমরা চলেছি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে অপরিচিত পথের উদ্দেশে। দেখতে দেখতে চন্দননগর এসে পড়ল। চন্দননগরের শেষ সীমানায় আমাদের একটি সার্জ্জেণ্ট ও ১০।১২ জন পুলিশের সঙ্গে দেখা, তারা আমাদের গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল; তারপর যখন দেখলে যে, আমরা অন্য কোন অভিপ্রায়ে এখানে আসি নি তখন তারা আর আমাদের আটকাল না। আমরা আমাদের গন্তব্য পথে ছুটলাম। রাত সাড়ে এগারটায় মেমারি ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠলাম। "টিফিন বাস্কেট" খুলে ঠাণ্ডা লুচি ও আলুর দম খেয়ে রাত সাড়ে বারটায় শুয়ে পড়া গেল।···

গভীর রাত; হঠাৎ চেঁচামেচিতে জেগে উঠলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত সাড়ে তিনটা কিন্তু নগেন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। সে বলছে "না, ভোর হয়ে গেছে, ঘড়ি বোধহয় বন্ধ ইত্যাদি"। কি আর করা যায়, অগত্যা বিছানা-পত্তর বেঁধে রাত চারটার সময় বেরিয়ে পড়া গেল। পরিষ্কার কাকজ্যোৎস্না ছিল, তাই নগেন ভোর হয়ে গেছে বলে ভুল করেছিল। ক্রমাগতই চলেছি। বর্দ্ধমানে এসে দেখা গেল যে, রাস্তায় বাতি জলছে, তখন বিশ্বাস হল যে সত্যই রাত পোহায় নি। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল, তারপর রাস্তার দুধারের গ্রাম, ক্ষেত, ছোট ছোট খাল ও নালা, হাট বাজার, রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদি দিনের আলোয় একে একে পরিস্ফুট হতে লাগল। পথে একটি ছোট বনের ধারে গাড়ী দাঁড়াল। আমরাও নেবে "ষ্টোভ" জালিয়ে চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হ'লাম। চা খাওয়া হ'ল সেই সঙ্গে দলের একটি ফটো তোলা হ'ল। সেখান থেকে রওনা হবার সময় একটি গাড়োয়ানকে জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করা হ'ল, সে বল্লে "চড়াইখোলা"।

আবার গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ দিয়ে গাড়ী দুখানা ছুটল। দুধারে "কোলিয়ারি" দেখে বোঝা গেল রাণীগঞ্জ নিকটেই। ক্রমে "রাণীগঞ্জ" পেরিয়ে আসানসোলে হাজির হ'লাম। তখন প্রায় বেলা দশটা। এখানে "পেট্রোল" নেওয়া হ'ল তারপর পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই দামোদরের পুলের কাছে বরাকরের ডাক্ বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। দামোদর তখন বালির চর ছাড়া আর কিছু নয়, জল একদম নেই। রান্নার উদ্যোগ সেরে যখন খাওয়া হ'ল তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। একটু বিশ্রাম ক'রে সাড়ে তিনটার সময় বেরিয়ে পড়া গেল। দামোদরের পুল পেরিয়েই একটা ছোট বাজার গেলাম। সেখানে থেকে চাল ও কিছু মাংস কিনে নিয়ে আবার যাত্রা সুরু। এখন গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ আর অপরিচিত নয়, তার সঙ্গে পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। এখন এই আমাদের পরিচিত বন্ধু, এই আমাদের ফুর্ত্তির সহচর, পথ দেখিয়ে কত নূতন জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে। ক্রমেই সব বদলাতে আরম্ভ হয়েছে, বাংলা ভাষ এখন সাঁওতালীতে পরিণত। বাংলার সে শস্য-শ্যামলা শোভা অন্তর্হিত হয়েছে, এখন শুধু কাঁকর, পাহাড় ও

বন্ধুর পথ। বাঙ্গালীর বদলে সাঁওতাল...এসব দেখতে দেখতে ছটার সময় রাণীগঞ্জ নামে একটি জায়গায় পৌঁছান গেল। ডাক্ বাংলোয় উঠলাম; পাশেই ছোট বাজারের সন্ধান পাওয়া গেল। সেখান থেকে আলু, কাচ্ ইত্যাদি আনা হ'ল। তারপর রন্ধন ও আহারাদি সেরে ক্লান্ত শরীরে শয্যায় আশ্রয় নেবামাত্রই আরামে নিদ্রা।

পরদিন অর্থাৎ ২১শে মার্চ্চ ছটার সময় উঠে চায়ের জল চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। বিছানা পত্তর গাড়ীতে তোলা আরম্ভ হ'ল, ইতিমধ্যে চাও হয়ে গেল। চা খেয়ে সাতটার সময় বেরিয়ে পড়া গেল পরিচিত পথে। পথের ধারে মহুয়া গাছে নানা রকম পাখীর গান ও সাঁওতালী মাদলের বাজনা শুনতে শুনতে আমরা বেশ আনন্দে চল্লাম। এক জায়গায় নেবে মহুয়ার পাকা ফল খাওয়া গেল। আর একটু অগ্রসর হতেই পরেশনাথ "হিল্স্" দৃষ্টিগোচর হ'ল। তার ঠিক নিচেই "তোপ-চাঁচি" লেক্। বেশ বড় লেক্ তাতে বাঁধ দিয়ে জল

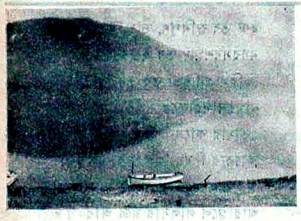

তোপচাঁচী হ্রদ

আট্‌কান হয়েছে এবং সেই জলই নাকি সমস্ত "কোলিয়ারিতে" পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা হয়। লেকের ধারে গিয়ে ফটো তোলা হ'ল। খানিকবাদে আমরা আবার যাত্রা করলাম। তারপর রাস্তা একটা ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চল্ল। পাহাড়ের নীচে একটি ছবির মত ছোটগ্রাম। দুশ্চটি উপভোগ করার জন্য আমরা একটু দাঁড়ালাম। সেখানে একটি পাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্ল "নিকটেই ডাক বাংলা আছে।" আশ্বাসের উদ্দেশে কিছুদূর গিয়ে একটা সাইন বোর্ড দেখা গেল—তাতে লেখা আছে "Suraj Kund,—Hot-water Spring," কোন দিকে তাও একটা তীর এঁকে দেখান আছে। কিন্তু রাস্তা নেই; মাঠের উপর দিয়েই চল্লাম। খানিকদূর গিয়েই সামনে বাঙ্গালীর স্বভাবগত লোকের ভীড় নজরে পড়ল। আমরাও গিয়ে ভীড়ে যোগ দিলাম। ছোট একটি "Spring"—একটা বড় পাথরের পাশ দিয়ে জল বেরুচ্ছে। চারিধারে লোহার রেলিং। গরম জলের মত "Spring"এর জল টগ্ বগ্ করে ফুটছে। দারুণ গন্ধকের গন্ধ। জলকুণ্ড দেখে আবার আমাদের গন্তব্য পথে ছুটলাম। মাইল সাতেক চলার পর পথের ধারেই একটা ডাক্ বাংলো দেখে নেবে পড়া গেল। সেখানে রান্না করে খেয়ে নিলাম। তারপর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। বেলা তিনটার সময় আবার গাড়ী চলতে সুরু করল। পথে "বারহি" নামে এক জায়গায় পেট্রোল নেওয়া হ'ল। সাড়ে ছয়টার সময় "চোরু পরাণ" নামে এক জায়গায় গাড়ী থামান হ'ল। এখানে রাতের আহার সারা গেল। এরপর "দাহুয়া ভালুয়ার" প্রসিদ্ধ বন। ডাকাত ও বন্য জানোয়ারের আবাস বলে এর দুর্নাম আছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল তাই আর ভয় কি! রাতেই এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলা যাবে ঠিক হ'ল। শিকারের আশায়.....আহারের পর বিশ্রাম করে রাত সাড়ে এগারটায় বেরিয়ে পড়া গেল। পথে গোটা দুই খরগোস মারা হ'ল। একপাল হরিণ ও একটা "হায়না" দেখা গেল বটে কিন্তু গুলি ছোঁড়ার সুযোগ না দিয়েই তারা অক্ষত শরীরে পালিয়ে গেল। রাতের বেলা রাস্তা ফাঁকা, আমরাও সুবিধা বুঝে গাড়ীর বেগ বাড়িয়ে চল্লাম। ক্রমে "সেরঘাটি" আওরাঙ্গাবাদ, ছাড়িয়ে রাত চাম্বটায় "সোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক" পৌঁছে গেলাম। ষ্টেশনমাষ্টারকে বলে আমাদের মোটর পার করার জন্য "truck" ঠিক করা গেল। কোনো হাঙ্গামা হয় নি। ভোর ছটায় গাড়ী

পার হ'ল আর আমরাও ডিহরিঘাটে নেবে মোটর

বারাণসীর পথে
চালিয়ে দিলাম বেনারসের দিকে ·····পথে এক জায়গায়

চা সেরে আমরা চল্লাম। একে একে সাসারাম, দুর্গাপুর, কর্ম্মনাশা নদীর পুল, মোহিনীয়া, মোগলসরাই, পেরিয়ে বেনারসে হাজির হলাম। পথে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নি।

এখন আর বাংলা দেশের কোন চিহ্নই নেই। বাড়ীঘর, লোকজন গরু বাছুর সবই অন্য ধরণের। ধানের ক্ষেতের বদলে গমের ক্ষেত। বাংলার শস্য-শ্যামলা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রকৃতির শুষ্ক ধূসর আকৃতি.....কে যেন বাংলার সবুজ ছবি সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ যুক্তপ্রদেশের ছাইরঙ্গের ছবি আমাদের চোখের সামনে খুলে দিল.....

—::—

কবিকঙ্কন ভারতচন্দ্র

শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সব সুর এক হয়ে দুঃখের রাগিণী
একমাত্র বাজে ভাল তোমার বীণায়,
তোমার উদার কাব্যে পাতায় পাতায়
ধনী কিংবা দরিদ্রের বেদনা-কাহিনী ;
সরলা নিরাভরণা তব বিষাদিনী
বাণী মন কেড়ে লয় করুণ ব্যথায়,
আনন্দ কৌতুক কিংবা মিলন কথায়
তোমার সুরের যাদু পরশ লাগেনি।
অত্যাচারী নৃপতির অন্যায় পীড়নে
স্বদেশ স্বগৃহ হ'তে চির নির্ব্বাসনে
চিরম্লান হয়েছিল তব মুখছবি,
আজিও আমরা পাই তারি ছায়াভাস ;
বেদনার বৃন্দাবনে হয়ে সুরদাস
দুঃখের গোকুল-গাথা গেয়ে গেছ কবি।

ছন্দ তব সুনিপুণ, ভাষা যাদুকরী,
নবরসবশংবদ তব ইন্দ্রজালে ;
ফিরিল প্রতিভা তব তবু কি খেয়ালে
নাগরনাগরীকুঞ্জে সাধি' মধুকরী ;
তোমার কাব্যের ছিল মহারাজ শ্রোতা,
কাব্যের বিষয় ছিল দেবী দশভুজা
অকস্মাৎ তার মাঝে সাজি কামহোতা
আরম্ভিলে লালসার যজ্ঞ আর পূজা।
অমার্জ্জিত রুচি তব, মার্জ্জিত লেখনী,
ভাবুক হ'য়া তব নাহি ভাবুকতা,
অগাধ পণ্ডিত হয়ে বুঝিতে শেখনি,
প্রেম তাই তব কাব্য হ'তে নির্ব্বাসিতা।
তোমার প্রতিভা যেন প্রতিভাহীনতা,
কবি হ'য়ে পার নাই লিখিতে কবিতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যে বয়সে হেমপ্রভার বিয়ে হ'ল তাতে স্বামী বা দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কোন মেয়েরই অনভিজ্ঞ থাকার কথা নয়—হেমপ্রভাও ছিল না। টুকরো টুকরো বহু দেখা ও শোনা ঘটনা, বহু রঙীন চমকপ্রদ কল্পনা একত্র ক'রে সে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা আলেখ্য গ'ড়ে রেখেছিল। সে নিজে যতখানি উৎসুক ব্যগ্রতা নিয়ে স্বামীর প্রেমের প্রতীক্ষায় ছিল, ঠিক ততখানি আকুলতা তার নিজের প্রেমনিবেদনের মধ্যেও ছিল। তাই ক'নে বিদায়ের সময় ভাতৃবধূরা যখন স্বামীধরার কৌশলগুলো তাকে শিখিয়ে দেবার জন্যে হুড়োহুড়ি করছিলেন, সে একটু মৃদু টিপে হেসেছিল।

কিন্তু সুলশয্যার রাত্রেই সে হঠাৎ বুঝতে পেরে গেল —তার বরাত মন্দ, স্বামী তার আর যাই হোন সাধারণ মানুষ নন এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁর অন্য যে ভাবই থাক, প্রেমের ভাবটা নেই। কাজেই সেই আশা-আশঙ্কায় দুরু দুরু বুকে একটি অপরিচিত পুরুষের উদ্দেশে বাঙ্গালী মেয়ের জীবনের মাত্র একদিনকার এই অভিসার তার পক্ষে ব্যর্থ হয়ে গেল। তার স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেল—না রইল লজ্জা-কুণ্ঠিত, আবেগ-ত্রস্ত অপার রহস্যময়তা, না রইল প্রথম প্রণয়ের রোমাঞ্চ-শিহরণ—ভয় এবং দুঃখে হেমপ্রভা ভেঙে পড়ল।

তার স্বামী ঘরের মেঝের উপর ব'সে একখানা বই পড়ছেন—তাকে দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা গেল না। একটা সাদর-সম্ভাষণ, একটু প্রীতিপূর্ণ সস্নেহ ব্যবহার, তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না—তিনি একটু তাকিয়েই আবার বইয়ে মন দিলেন। হেমপ্রভা ত এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না—সে জানত মেয়েদের জীবনে এই দিনটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় দিন। তার সমস্ত জীবনটা এরপর থেকে যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়বে আজই যে তার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা! পরস্পর পরস্পরকে আজই দেয় নিজের নিজের বহুদিন-লালিত নানা স্বপ্ন, নানা কল্পনার রঙে রঞ্জিত সেই ভালোবাসা, যাকে কবিরা বলেন প্রেম। এরপর ত আরম্ভ হয় দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিকর হিসাব নিকাশ —প্রত্যহের রূঢ় বাস্তবতার চাপে, সত্যের উলঙ্গ আলোকে, এই কুয়াসার আবরণটি যায় সরে এবং দু'জনের চোখে দু'জনের অসংখ্য ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা-গুলো ফুটে ওঠে—তখন তাদের কল্পনার আকাশে জেগে থাকে শুধু উষার উদয়-তারার মতো এই একটি রাত্রির স্মৃতি।

কিন্তু এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হয় পুরুষকে। বাংলা দেশের মেয়ের কাছে এটা আশা করা চলে না যে, সেই প্রথমে এসে স্বামীকে প্রেম-নিবেদন ক'রবে—কাজেই হেমপ্রভা স্বামীর এই নির্লিপ্ততায় শুধু ব্যথাই পেলো তা নয়, পূর্ণবয়স্কা একটি মেয়ে নির্জ্জন স্থানে একজন অচেনা লোকের সংশ্রবে খানিকক্ষণ থাকতে যে রকম একটা অস্বস্তি বোধ করে, তেমনি একটা ভাব হ'ল তার। সেই সঙ্গে লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে এলো —নিজের রূপ গুণ এবং যৌবন সম্বন্ধে সামান্য কিছু বোধ তার অবশ্যই ছিল এবং এও সে বহুবার ভেবেছে যে তার এই ক্ষুদ্র সম্পদটুকুর জোরেই সে তার স্বামীকে একদিন নিশ্চয় বেঁধে ফেলবে—কিন্তু আপনার কাছে আপনার হল পরাজয়! প্রতিহত বাসনাবেগ তাকে যেন বিদ্রূপের শাণিত চাবুক মারতে লাগলো!

এতই সে তুচ্ছ যে তার সম্বন্ধে স্বামী একটু আগ্রহও প্রকাশ ক'রলেন না—কিংবা স্বামী····· কিন্তু থাক! নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কারুকে দায়ী করার শিক্ষা হেমপ্রভা পায় নি!

কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ ক'রে স্বামী তাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন, "তুমি শুতে পারো—অসুবিধা হ'লে আমি না হয় অন্য জায়গায় যাবোখনি"। এতক্ষণ হেমপ্রভা জড়োসড়ো হয়ে মাটিতে ব'সে ছিল—এবার একবার মুখ তুলে চাইলো। কিন্তু না—কথা বলা ও না বলার মধ্যে তফাৎ কিছুই নেই তাঁর!

—"তা হ'লে আমার অন্য জায়গায় যাওয়ার দরকার হবে?"

হেমপ্রভা হঠাৎ চমকে উঠ্‌লো—একি! এই কিনা বিবাহিত দম্পতীর প্রথম সম্ভাষণ? তা হ'লে তার স্বামীর কি তাকে পছন্দ হয়নি, তিনি কি অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসেন, তিনি কি·····হাজার হাজার প্রশ্ন হেমপ্রভার মনের মধ্যে লুটোপুটি খেতে লাগ্‌লো। কিন্তু একটা উত্তর তাকে দিতেই হবে—নইলে স্বামী ত এখনই উঠে যাবেন সেখান থেকে।

হেমপ্রভা লজ্জা থুইয়ে ব'ল্‌লো, "না আপনি এখানেই থাকুন—এই বিছানায় শুন্—আমি এই মেঝেতেই রইলাম।"

—"বিছানার কোন দরকার হবে না—বিছানায় আমি শুইনে, এতদিন জুতো জামাটা পর্‌তাম্—আজ থেকে সেটাও ছেড়েছি—স্বামীজী·····যাক তুমি শুয়ে পড়ো। আমি এখানেই বসে থাকি—রাত্রে আমি সামান্যই ঘুমাই।"

হেমপ্রভার অবস্থাটা অনুমান করা কঠিন। স্বামীর বিছানায় না শোয়া, জুতো জামা না পরা, রাত্রে না ঘুমানো—এই সবের অর্থ কি? তিনি কি তা হ'লে সন্ন্যাসী? স্বামীজী ব'লে কি একটা কথা ব'লছিলেন, তিনি কি ওঁর গুরু? তবে, তবে, তাকে তিনি কেন বিয়ে ক'রলেন? কেন তার বহুসাধ বহুস্বপ্নভরা যৌবন জীবনকে বৈরাগ্যের মরুভূমির মধ্যে টেনে এনে টুঁটি টিপে মার্‌লেন! তাই বটে—তাই সকালে সে দেখেছে স্বামীর স্নান পূজো-আহ্নিক ও মন্ত্রপাঠের ঘটা এবং খাওয়া-দাওয়ার সাত্ত্বিক ব্যবস্থা! বিবাহ ত আর শ্রাদ্ধ নয়···হেমপ্রভা ভেবে রেখেছিল ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর সঙ্গে একটু ভাব হ'য়ে গেলেই এ নিয়ে সে একটা ঠাট্টা ক'রবে। কিন্তু এখন তার অবস্থাটা কি হ'য়ে উঠেছে ভেবে সে শুধু মুষড়েই প'ড়লো তা নয়—তার ইচ্ছে হ'ল সে জোরে কেঁদে ওঠে!

খানিকক্ষণ পরে অখিল—হেমপ্রভার স্বামী—ব'ল্‌লে, "দেখো তোমায় দু' একটা কথা ব'লে রাখি—নইলে হয়ত তোমার বোঝার অসুবিধা হ'চ্ছে। আমি ঈশ্বরের সেবায় জীবন সমর্পণ ক'রেছি—আমার সংসার ভালো লাগে না, এর ওপর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই—কিন্তু মা বুড়ো হ'য়েছেন এবং একটি পিসতুতো ভাই আছে—তাদের সেবা-যত্নের কেউ নেই। তাই গুরুর আদেশে আমি বিবাহ ক'রেছি, কিন্তু আর পাঁচজনের মতো হ'য়ে ঘরকরার ত আমার উপায় নেই—কারণ সে রকম মন আমার নেই। অতএব আমি যেমন সন্ন্যাসী, আমার স্ত্রী তোমাকেও হ'তে হবে তেম্‌নি সন্ন্যাসিনী—কারণ এই আমাদের জন্মান্তরীন অদৃষ্ট-লিপি!"

অদৃষ্ট-লিপিটা স্বামী যে-ভাবে দেখিয়ে দিলেন, তাতে হেমপ্রভার আত্মহত্যা করাই হ'ত একমাত্র উপায়—কিন্তু কি সেই ঈশ্বর সেবা যাতে একটা মেয়েকে এক মুহূর্ত্তের একটু প্রীতি দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়? আর কে সেই গুরু যিনি বৃদ্ধ শাশুড়ী এবং বেকার দেওরের আদর যত্নের জন্যে বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন? তিনিও হয়ত সন্ন্যাসী—তাই মেয়েমানুষের প্রাণের খবর জানেন না, তাই মেয়েমানুষকে তৈজস-পত্রের মতো ভাতের হাঁড়ির পেছুনে অসঙ্কোচে ঠেলে দিতে পারেন; তার কারণ, বুকের তলায় যে প্রচণ্ড ক্ষুধা আছে তা তিনি কি ক'রে বুঝবেন?

হেমপ্রভার বাপের বাড়ীতে যেদিন তার শাশুড়ীর চিঠি এলো যে তার স্বামী নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন, সেদিন বাড়ীর সকলেই খুব চৈ চৈ ক'রতে লাগলো! হেম-

প্রভার মা খুব কাঁদতে আরম্ভ ক'রলেন; ভাজেরা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'ললেন, "তবে যে ঠাকুরঝি ব'লতো স্বামী খুব ভালো লোক, খুব বিদ্বান আর দয়ালু"! মা কপালে করাঘাত ক'রে ব'ললেন, "সবই আমার ভাগ্যি, আর ঐ পোড়া কপালীর ভাগ্যি!" শুধু কাঁদলো না বা আশ্চর্য্য হ'ল না হেমপ্রভা! সে ত জান্‌তই তার স্বামীর এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা নেই—তাঁকে এই পথেই যেতে হবে। স্বামীর ওপর রাগ বা বিদ্বেষ প্রথম দিন থেকেই নেই, শুধু নিজের জীবনের ওপর তার এসেছে অপরিসীম ধিক্কার—কেন, কেন তার জীবনে এল অসমান সংস্থান হ'ল?

শাশুড়ী বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক দুঃখের কথা লেখার পর লিখেছেন, "এর পর বৌমাটিকে এখানেই এনে রাখা উচিত মনে করি—তিন চার দিনের মধ্যেই আশু আন্‌তে যাচ্ছে"—এই কথাটায় কিন্তু হেমপ্রভার ভীষণ ভয়!

আশু হেমপ্রভার পিসতুতো দেওর—বয়স প্রায় তার স্বামীরই সমান। কাজ কর্ম্ম কিছু করে না—ছোট বড় ক'রে চুল কাটে, মদ ভাং খায় এবং ইতস্ততঃ দৌ টৌ ক'রে বেড়ায়। তার কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, সব কিছুর মধ্যেই যেন কেমন একটা বয়াটে ভাব। প্রথম থেকেই সে হেমপ্রভার সঙ্গে একটু বেশী রকম মাখামাখি ক'রতে এসেছে—যা তার আদৌ ভাল লাগে নি। কিন্তু শাশুড়ীর ছিল তার ওপর অঢলা বিশ্বাস, তা হেমপ্রভা অন্নকয়েকদিনেই বুঝেছে—সুতরাং মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'লেও তাকে সে এড়াতে পারে নি। এখন স্বামী নেই, আত্মীয়-স্বজনরাও বোধ হয় একে একে গত হ'য়েছেন—নির্জ্জন প্রকাণ্ড বাড়ীতে এই আশুর সঙ্গে তাকে বাস করতে হবে। কিন্তু উপায়ই বা কি?

যথা সময়ে আশু এলো এবং হেমপ্রভাকে তার সঙ্গে বেরুতে হ'ল। পথে কেবল পান কিনে দেওয়া, আর সন্দেশ নিয়ে থাবার জন্যে সাধাসাধি করা, আর নানান আজগুবি গল্প করা ছাড়া অন্য কিছু উপদ্রব সে ক'রলো না। তবে গাড়ীতে আর একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-প্রসঙ্গে সে একবার তার দিকে তাকিয়ে ব'ললো 'wife'—আগা গোড়া কি সংশ্রব না বুঝলেও হেমপ্রভা যা অনুমান ক'রলো এ থেকে, তাতে তার লজ্জা হ'ল, ভয়ও হ'ল!

বিবাহের সময় দীপালোকিত, আত্মীয়-কুটুম্বের কোলাহল-মুখরিত সে বাড়ী আজ নির্জ্জন—কেউ কোথাও নেই, শাশুড়ী একটি ঘরে বিছানা আশ্রয় ক'রে পড়ে আছেন। বৌকে দেখে তিনি গলাছেড়ে কেঁদে উঠলেন; পাড়ার দু'একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে জুটলেন—এবং সকলকার সম্মিলিত অনুতাপ বিলাপ ও সহানুভূতির দাপটে হেমপ্রভার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো!

সকলের সম্মিলিত দৃষ্টি যেন তাকেই বিশেষ ক'রে অপরাধী ব'লে নির্দ্ধারণ ক'রে দিল—এটাই যেন তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে তার স্বামী যে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন এ শুধু তারই অক্ষমতা—এর ওপর সে যদি খাওয়া, পরা, বা বিলাস-ব্যসনের দিকে নজর দেয় ত তার মহা-পাতকের আর কিছুই বাকী থাকবে না।

কিন্তু বিপদ হ'ল আশুকে নিয়ে। সে দিবারাত্রি হেমপ্রভার পায়ে পায়ে ঘোরে। শাশুড়ী শোকে অবসন্ন, সংসারের কোন তল্লাসই তিনি রাখেন না—সমস্তটাই হেমপ্রভার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিজের ব্যথাকে একান্ত ক'রে বুকে আঁকড়ে রইলেন! হেমপ্রভাও এই নির্জ্জন হানা বাড়ীর মধ্যে দিনরাত্রি কাজের ভীড়ে ব্যস্ত থাকতে পেয়ে খুসী হ'য়ে উঠলো—কিন্তু দেহমুক্ত প্রেতাত্মার মতো আশু তার সঙ্গ ছাড়ে না! সে যেন বাড়ীর বাইরেই যাবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে—কখনো বলে যাত্রা-থিয়েটার পাঁচালীর গল্প, কখনো বারোয়ারি দুর্গোৎসবের গল্প, কখনো সাহা বাবুদের মেয়ের বিয়ের গল্প; আর মাঝে মাঝে তাকায়—এমন বিশ্রী ও স্পষ্ট সে তাকানো, যে হেমপ্রভা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

স্বামীর কথা তার মনে পড়ে। সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্ম সেরে রাত্রে শাশুড়ীর কাছে এসে ব'সতে ব'সতেই ঘুমে তার চোখ ভোরে আসে, আর জান্‌লার ওপিঠে বাঁশের ঝোপ থেকে ওঠে একটা বুনো গাছড়ার গন্ধ, সেই

সঙ্গে আসে ঝিঁঝির একটানা তীক্ষ্ণ করাতের শব্দের মতো ডাক ও গাছপালার চিট্‌পিট শব্দ। হেমপ্রভার বুকের ফলকে ভেসে ওঠে একখানি মুখ—তাতে আছে বৈরাগ্যের প্রশান্তি, আছে কমনীয় স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্য, আছে প্রশান্ত সুন্দর হাসি, ক্ষমা ও প্রেমে মাখানো—হেমপ্রভা উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম জানায়। তারপর লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে থাকে—হঠাৎ তার কান্নার শব্দে শাশুড়ী সজাগ হ'য়ে ওঠেন। কি হ'ল? তারপর তিনিও ডুকরে কেঁদে ওঠেন! পাশের ঘরে চৌকি বাজিয়ে আশুর তখন গান চলে—"মন মানে না, প্রাণ বুঝে না, প্রাণ বিকাতে ঘুরে মরি!"

রাত্রির অবগুণ্ঠিত রহস্য-লোকে হেমপ্রভার চোখে স্বামীর যে অপরূপ তেজোদ্দীপ্ত সুন্দর মূর্ত্তিটি জেগে ওঠে, দিনের বেলা তা কোথায় হারিয়ে যায়। সে কথা ভাব্‌তেও তার বিরক্ত লাগে—যেমন লাগে আশুর ঘ্যান্ ঘ্যান্‌নি, বা নিজের পেটের খাওয়া—পাড়ার লোকের সহানুভূতিপূর্ণ বক্র ইঙ্গিত বা শাশুড়ীর আর্ত্তনাদ! হেমপ্রভা ভেবেই পায় না, কেন দিনে ও রাত্রে তার চিত্তের এমন অবস্থান্তর ঘটে! দিনে সে যেন এই পৃথিবীর কোন বীভৎস রাজ্যে অনতিক্রমণীয় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে বেঁচে থাকে, আর রাত্রে সে যেন উড়ে যায় কোন্ মায়া-লোকে! সময় সময় তার মনে হয় আচ্ছা ঈশ্বর সত্যিই আছেন কি? তাঁর সন্ধানে যুগে যুগে মানুষ যে এম্‌নি ক'রে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিচ্ছে—একে অন্যের বুক ভেঙে দিচ্ছে—একি একটা ভুলের পেছনে দৌড়ানো, না এর কোন মানে হয়? আচ্ছা তার স্বামী এখন কোথায়? কোন দূর পর্ব্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন কি? ঈশ্বর কি তাঁকে দেখা দিয়েছেন?

ছোট বেলায় হেমপ্রভা দিদিমাকে চৈতন্যচরিত প'ড়ে শোনাতো। চৈতন্যের গৃহত্যাগের পর শচী দেবী জেগে উঠে কেঁদে কেঁদে যখন পাড়ার লোককে জড়ো করলেন, তখনও অবোধ বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বাসে ভর ক'রে ঘুমুচ্ছে! হঠাৎ চম্‌কে জেগে উঠে দেখে তার বিছানা খালি, তার বুকখানি...সেই জায়গাটা প'ড়ে হেমপ্রভা কত কেঁদেছে! কিন্তু সেই কান্না সেদিন ছিল নৈর্ব্যক্তিক—আর আজ তার অবস্থা যেন সেই কান্নাতেও সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ হয় না। অন্ধ বিশ্বাসে সে ওপরের দিকে হাত তুলে বলে—"এই ক'রলে!"

শাশুড়ী বিকেল বেলার দিকে মুখুজ্যে পাড়ায় ভাগবত শুন্‌তে গেছেন। চক্রবর্ত্তী-গিন্নী জোর জুলুম ক'রে তাঁকে নিয়ে গেছেন, নইলে ঘরের বার তিনি আর হন্ না। বলেন, "কোন্ মুখে আর লোকের সাম্নে বেরুবো? এখনো যে বেঁচে আছি, সেই লজ্জাতেই ম'রে যাই যে।"

কিন্তু চক্রবর্ত্তী গিন্নী ছাড়েন না—"মনটা একটু ভালো হবে—ঠাকুরদের কথা ত, চলো।" "আর ঠাকুরদের কথা! কিন্তু শেষটা তাঁকে যেতে হ'ল। হেমপ্রভা সাঁৎলা ধরা ভাঙ্গা বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাব্‌বে।

—কত এলোমেলো, পরস্পর-সম্বন্ধহীন কথা!

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বৌদি যে এখানে দাঁড়িয়ে? মনটা বুঝি খুসী নেই—থাক্‌বে কি ক'রে?"

হেমপ্রভা তাকিয়ে দেখে আশু। সে কাপড় চোপড় ঠিক ক'রে জড়ো সড়ো হ'য়ে দাঁড়ালো।

—"আচ্ছা বৌদি......না, ব'ল্‌বো না, তুমি হয়ত রাগ ক'র্‌বে।"

—"কি?"

—"এই...মানুষ কেন ভালোবাসে বলো ত?"

—"আর কখনো আমার সাম্নে একথা বলো না—তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি ঠাকুরপো! আমি সমস্ত বুঝি—যাও, নিজের কাজে যাও।" হঠাৎ হেমপ্রভা যেন বড্ড বেশী রেগে গেল।

আম্‌তা আম্‌তা ক'রে আশু বলে—"না আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম—উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা, তাই জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম, তা তুমি চটে গেলে...তুমি এসে ইস্তক আমার দু' চক্ষে দেখ্‌তে পারো না! আমি মন্দ লোক হ'লে...!" কি যে সে করত তা আর সে

ব'ল্‌লো না, তার ভাবভঙ্গী থেকেই হেমপ্রভা সেটা বুঝে নিল।

হেমপ্রভা হঠাৎ ভাবে হয়ত সত্যিই আশু মন্দ লোক নয়—হয়ত একটু বাচাল, একটু বোকা; তার নিজের মন খারাপ ব'লে সে হয়ত তাকে ভুল বোঝে—আজ পর্য্যন্ত সেত সত্যিই কোন দুর্ব্ব্যবহার করেনি! তার একটু দুঃখ হ'ল—কিন্তু আশু নিজে থেকেই সুর বদ্‌লে ফেলেছে।

—"দেখো বৌদি আজ আমরা ক্লাবে 'চিতোর গৌরব' প্লে ক'রছি—আমি আবার সাজ্‌ছি রাণী। তা তোমার হারটি দেবে? আবার ফিরিয়ে দোব কালই।"

অবিশ্বাসের কি আছে? তবে শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা না ক'রে দেওয়াটা কি ঠিক হবে? আবার না দিয়ে যদি সে শাশুড়ীর অনুমতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহ'লেও তিনি হয়ত তাকে নীচ ভাব্‌বেন—সাত পাঁচ ভেবে হেমপ্রভা হারটি গলা থেকে তার হাতে দিয়ে দিলো। আশু অম্‌নি হারটি আপন গলায় প'রে, হাহা করে হেসে বেরিয়ে গেল। হেমপ্রভা কিছুক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে ব'সে রইল—তারপর তার চোখ ফেটে কান্না এলো! মৃত্যু ভালো, এর চেয়ে মৃত্যু ভালো! লজ্জায় সে একথা আর শাশুড়ীকে ব'ল্‌তে পারলো না।

তারপর তিনচার দিন পরে আবার শাশুড়ীর অনুপস্থিত—এদিনে আশুর সাহস সীমা অতিক্রম ক'রেছে দেখা গেল। সে কোথা থেকে গোটা কতক গোলাপ ফুল ও একটা লেডিগেনি এনে হাজির করলো—ফুল দুটো সে ধাঁ করে হেমপ্রভার খোঁপায় গুঁজে দিলো, তারপর তাকে নিজেহাতে লেডিগেনিটি খাওয়াতে যেতেই হেমপ্রভা উঠান থেকে ঝাঁটা গাছটা কুড়িয়ে নিয়ে রীতিমতো ক'রে তার পিঠের ধুলো ঝেড়ে দিলে। প্রহার খেয়ে আশু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, কিন্তু তার বহুদিন-পোষিত দুরভিসন্ধির অসাফল্য তাকে নিশ্চয় উদ্‌ভ্রান্ত করলো—প্রতিশোধ নিতে হবেই তাকে। বিড় বিড় করে সেই জাতীয় কি একটা বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

শাশুড়ী ফিরতেই হেমপ্রভা কেঁদে কেটে সব কথা জানালো—তিনি বিস্মিত এবং বিমূঢ় হ'য়ে বললেন, "আশু...এই কাজ করেছে!" তারপর আরম্ভ করলেন কান্না! আশু রাত্রে কিছু খেলো না—গোঁজ হয়ে পড়ে রইলো। পরমেশ্বরী তাকে ডাকতে এসে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হঠাৎ আশুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের মতো। "দেখবে, তোমার বউয়ের সতীগিরির প্রমাণ?" তারপর আশু বের করে দিল হেমপ্রভার সেই হার, যা সে ইচ্ছে করেই এতদিন ফেরৎ দেয়নি এবং স্পষ্ট বললো, এই হার দিয়ে সে করেছিল তার সঙ্গে মালা-বদল—বড় ভাইয়ের স্ত্রী, গুরুজন—আশুত পাপের ভয় রাখে, তাই সে আজ তাকে করেছে খুব অপমান; সেই জন্যে মিথ্যে করে বউ তার নামে নালিশ করেছে। এ কথা যে তাঁকে জানানো হয় নি, তা শুধু তাঁর শোকের ওপর শোক বাড়ানো হবে মনে ক'রে!

পরমেশ্বরী স্তম্ভিত হ'লেন। আশুকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই—তার হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তারপর থেকে হেমপ্রভা বাপের বাড়ীতে—কেন না যার স্বামী গেছে বিবাগী হয়ে, সেতো হবেই ব্যভিচারিণী!

এরপর আট ন'বছর হেমপ্রভার আর কোন খোঁজ পাইনি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—আশু কি একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগে ভুগে শেষকালটা আত্মহত্যা করে ফেলে—কিন্তু মরার পূর্ব্বে সে একটা পুণ্য কাজ ক'রে যায়—পরমেশ্বরীকে সে হেমপ্রভা সম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়, হার সম্বন্ধে তাঁর যে ভ্রান্ত ধারণাটা ছিল সেটাও অপনোদন ক'রে যায়। আর দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে পরমেশ্বরীর মৃত্যু—একান্ত অসহায়ের মতো, পাড়ার লোকের অবহেলা-মিশ্রিত অনুগ্রহে তাঁর জীবননাট্যের সমাপ্তি ঘটে। শেষ মুহূর্ত্তে পরমেশ্বরী বউকে দেখতে চেয়েছিলেন, ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং প্রাণ খুলে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতক আশুকে

—সে আজীবন তাঁর খেয়ে, তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে গেছে। কিন্তু হেমপ্রভা এ সবের কোন খবর পাইনি—কেইবা খবর দেবে তাকে? বাপের বাড়ীর হাঁড়ি ধরেই দীর্ঘ একটানা দশবৎসর সে দিনের পর দিন পাড়ি দিয়ে গেছে!

হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মশায় হেমপ্রভার বাপের বাড়ী এসে উঠলেন। অখিল বাড়ী ফিরেছে, তার মতি বদ্‌লেছে—তিনি বউকে নিয়ে যাবেন বলে' এসেছেন। আনুষঙ্গিক সমাচারগুলোও তিনিই দিলেন।

তার স্বামী দেশে ফিরেছেন? দীর্ঘ দশবৎসরে সে স্বামীর মুখের আদল পর্য্যন্ত ভুলে গেছে—শুধু একটি ভাবময় স্বামী তাহার চিত্তকে অধিকার করে আছেন—তাঁর সঙ্গে গৈরিক, মাথায় জটা—সংযত আহার, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণায় তেজোদীপ্ত তাঁর শরীর—মুখে প্রশান্ত একটি পরিপূর্ণতার আভাষ! পরিব্রাজক সেই স্বামীর উদ্দেশে অদৃশ্য প্রণতি জানিয়েই সে যৌবন অতিক্রম ক'রে ক্রমে প্রৌঢ়া হতে চলেছে। যৌবনের প্রবৃত্তির দাহ যখন ছিল তখন হেমপ্রভার অভিমান হত, সময় সময় জাগত বিদ্রোহ—কিন্তু আজ তার মধ্যে এসেছে একটা প্রশান্তির ভাব। ক্রমে সেও নিয়মনিষ্ঠার দিকেই এগুচ্ছে—এই আধ্যাত্মিকতার মোহ তাকে যেন পেয়ে বসেছে। কে জানে যদি এই তার জীবনকে শেষ পর্য্যন্ত ষোল আনা অসাফল্য থেকে বাঁচায়!

তার সেই স্বপ্নের তৈরি স্বামী আজ কেন আবার ফিরে এলেন? বাইরে থেকে দেখলে এ ব্যাপারে খুশী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু হেমপ্রভার মনে যেন কি একটা অতৃপ্তির ব্যথা বাজতে লাগলো—না, না, যদি সে দেখে তার আদর্শের চেয়ে তার স্বামী অনেক নীচে নেমে আছেন! কিন্তু তবু তাকে আসতে হল।

প্রথম বাধা পেলো সে স্বামীর আকৃতিতে—যেমন মোটা, তেমনি কালো,—ঔজ্জ্বল্যহীন এবং কতকটা কুৎসিত। এই তার স্বামী? কৈ সেই বৈরাগ্য-দীপ্ত সতেজ তীক্ষ্ণ চেহারা, সেই প্রতিভা-ব্যঞ্জক মুখ—যা বুকে এঁকে সে এতদিন কাটালো? তারপর, নতুন পরিচয়ের আড়ষ্টতা মতই কাটতে লাগলো, হেমপ্রভা ততই আবিষ্কার করতে লাগলো যে, তার স্বামীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ত বিন্দুমাত্র নেইই, নারকীয়তা আছে অনেকগুলি—সে নেশা করে, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা তার অসীম, তারওপর সে একান্ত নির্দ্দয়! সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক নীচু বলেই হেমপ্রভার ধারণা হল। একদিন যে গুরু-দত্ত শিক্ষার ফলে কোন সত্যকে বুকের নিভৃতে পেয়ে তারই ব্যাপক প্রাপ্তির আশায় অনেকের স্নেহের নীড় পদদলিত করে' অজ্ঞাত সুদূরের দিকে ছুটে গেছলো, তার এই বিশ্রী প্রতিক্রিয়া! তার স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে জেগে উঠলো অপরিসীম হতাশা—যদি গোড়াগুড়ি সে এই স্বামীর সঙ্গেই ঘর করত, তাহলে এমনটা না হতেও পারত—কিন্তু কুয়াসাচ্ছন্ন কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, রঙীন যৌবন অতিক্রান্ত-প্রায়—আজ এই উলঙ্গ জান্তব-জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আসাই স্বাভাবিক। ক্ষুধামান্দ্য হয় খাদ্যের অভাবেই—তখন খাদ্য আনে বিরক্তি আর অরুচি! হেমপ্রভা নির্মম হয়ে পড়ল·····আশুর সঙ্গে তার স্বামীর তফাৎ এই যে সে স্বামী। আর কিছু কি?

হেমপ্রভা রান্নার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত—হঠাৎ পেছন দিক থেকে কাপড় ধরে টানলো অখিল। হেমপ্রভা কোন কথা না বলে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ গোমড়া করে রইল।

অখিল মিনতির সুরে বললো, "জানি তুমি বিরক্ত হও—আজ আট মাস ধরেই দেখছি তুমি বিরক্ত হও। কিন্তু কি করি? থাকতে পারিনে হেম, তোমার কাছে না এসে থাকতে পারি না!"

হেমপ্রভার সহানুভূতি হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয় একটা অস্বস্তি। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এতদিন পেরেছিলে কি ক'রে?

অখিল আবার বললো "তাহলে চলে যাবো"?

—"না। কিন্তু তুমি না সাধু হ'য়েছিলে? একটু তোমার সংযম নেই, তুমি এত·····!"

অখিল দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে বলে, "ফাঁকি, ফাঁকি মানুষের বিশ্বাস করার শক্তির ওপর জুলুম ক'রে মানুষ তাকে ভুলিয়েছে—বৃথা সব। নিজের প্রাণকে উপোসী রেখে মিথ্যে ধোঁকার পেছুনে ছোটা! প্রবৃত্তি কি যুক্তির জোরে মারা যায়? ও সব কল্পনা—ওর পেছুনে ছুটে আমোদ আসে·····রক্তমাংস সত্যি, তার দাবীও সত্যি!"

হেমপ্রভা অতশত তলিয়ে বোঝে না—তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে, পরকাল সম্বন্ধে, সত্য, সংযম, পবিত্রতা সম্বন্ধে, আত্মিক কল্যাণ সম্বন্ধে, চিরাগত বিশ্বাস তার মধ্যে হ'য়ে গেছে বদ্ধমূল—তার স্বামী ব'লছেন তার বিরুদ্ধে। অথচ এই স্বামীই একদিন বেরিয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা মা, তরুণী স্ত্রী, জমি জায়গা সব ফেলে এই বিশ্বাসের আকর্ষণে, ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে তিনি হ'য়েছেন বিরোধী। হয়ত সত্যিই এর ভেতরটা ফাঁকা—হয়ত সবটাই মানুষের মস্তিষ্ক খাটিয়ে গ'ড়ে তোলা একটা কিছু, যার কোন অর্থই হয় না, আত্ম-নিগ্রহ ছাড়া। হেমপ্রভা হাঁফিয়ে ওঠে।

—"তবে গেছলে কেন?"

—"কেন? একটা প্রতারক আমায় শিখিয়েছিল বড় বড় কথা—দিয়েছিল অনেক দম—তার ফলে শিথে-ছিলাম সংসারকে, মানুষকে, দয়া মায়া স্নেহ প্রেমকে ঘৃণা করতে—তাই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বহু তীর্থস্থানে গেছি—বহু সাধু মোহান্তের সঙ্গে মিশেছি। দেখেছি, সবাই অন্যকে ঠকাচ্ছে, ঠকাচ্ছে নিজেকে—প্রাণের গভীর জায়গায় উঁকি দিলে দেখবে কেউ রক্ত মাংসের হাত এড়াতে পারে নি; শুধু বৈরাগ্যের ঠাটটা বাঁচিয়ে চ'লছে—আসলে কিছুই ক'রছে না, করার উপায় নেই। কমলীকে তারা ছেড়েছে, কিন্তু কমলী তাদের ছাড়েনি—কেউ রাগ ক'রে, কেউ দায়ে প'ড়ে, কেউ নেশার ঝোঁকে—বেরিয়েছে, আর ফেরেনি। কিন্তু ফিরলে তারা মনুষ্য হ'তে পারত, এখন তারা জন্তুর মতো আত্মঘাতী হ'য়ে উঠেছে!"

আবেগের মাথায় অখিল অনেক কথাই ব'লে গেল—হেমপ্রভা কতক বুঝলে কতক বুঝলে না—শুধু তার মনে হ'ল তার স্বামী খুব বড় একটা ঘা খেয়ে ফিরেছেন—তাঁর চিন্তা বা বিশ্বাস একেবারে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে।

সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো, "কেন এমন হয়?"

—"হয় তার কারণ, মানুষ, মানুষ—রক্ত মাংসের ওপরে সে জোর ক'রে যেতে চাইলে প্রকৃতি তাকে বাধা দেবে। তখন তাকে এমন জোর ধাক্কা খেতে হবে যার ফলে সে একেবারে রসাতলে এসে প'ড়বে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর অখিল আবার ব'ল্‌লে, দেখো হেম, আমি যা দেখ্‌ছি তোমায় আমায় আর মিল হবার আশা নেই। তবে কেন মিছে তোমায় ঠকাই—? আমার জীবনের ভয়ানক কাহিনীটা তোমায় ব'লে নিই, তারপর ইচ্ছে হয় তুমি আমায় গ্রহণ করো, না হয় বলো আমি সোজা পথে চ'লে যাবো।"

হেমপ্রভা একবার ভাবলে বাধা দেবে—তারপর অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বস্‌লো—সে বল্‌লো, "কোন ভয় নেই, তুমি বলো!"

অখিল ব'লে চ'ল্‌লো, "বিয়ে ক'রে আমার মনে হ'ল আমার জীবন সব দিক দিয়ে বৃথা হ'য়ে যাচ্ছে—আমার সব রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে; আমি বাঁটি ভুলে মাটি নিয়ে মেতে উঠ্‌ছি—সেদিনই বাড়ী ছাড়্‌লাম। তিন বৎসর নানাতীর্থ ঘুরেছি—কত মঠে মন্দিরে; কখনো খাওয়া জুটেছে, কখনো অনাহারে—গাছতলায় প'ড়ে থেকে বর্ষা শীত গায়ের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে—গ্রাহ্য করিনি। অসুখ হ'য়েছে—কখনো ধর্ম্মশালায়, কখনো এষ্টেসনের যাত্রী-ঘরে—আবার সেরেছে—শুধু লক্ষ্য ছিল কি হ'লে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া যাবে! সাধু সন্ন্যাসীরা কত আসন, কত জপতপ প্রক্রিয়া শিখিয়েছে—সব ভুয়ো। ফল কিছুই হয়নি। একটা লোকও দেখিনি যে ব'ল্‌তে পেরেছে, "হ্যাঁ আমি পেয়েছি, আমি তোকে পাইয়ে দোব"। শেষে হতাশা এলো—বাড়ীর জন্যে প্রাণ কাঁদতে লাগলো। কিন্তু পুঁজি নেই, খাই ভিক্ষা ক'রে

—এদিকে ভীষণ চক্ষু লজ্জা! এই ভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নেপালে উপস্থিত হলাম্। সেখানে পথে হ'ল ভীষণ জ্বর—ক্রমে নিউমোনিয়া। যখন জ্ঞান হ'ল দেখি একটি ছোট গৃহস্থ বাড়ীর ঘরে শুয়ে, মাথায় শিয়রে একটি নেপালী মেয়ে * • * দুর্গা • • *। এতদিন তারই সঙ্গে কাটিয়েছি স্বামী-স্ত্রী রূপে। চারিটি সন্তান হবার পর এবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হ'ল—কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না, সামান্য জমি যা তার বাপ দিয়েছিল তাতেই চল্‌ছিল—অভাবের জ্বালায় তা বিক্রি ক'রে ফেল্‌লাম, তারপর সুরু হ'ল ঝগড়া ঝাঁটি, মারামারি পর্য্যন্ত—শেষে অসহ্য হ'তে রাতারাতি এলাম্ পালিয়ে সেই দুর্গাকে আর তার চারটি ছেলে মেয়েকে ফেলে রেখে···! মনে পড়লো বাড়ী আছে—আছে আমার স্ত্রী—আমার মা।"

হেমপ্রভা নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল এই বিচিত্র উপন্যাসের মতো কাহিনী। হুঁস্ হ'তে সে ব'ল্‌লো, "তুমি—তুমি এই ক'রেছো?"

—"হ্যাঁ আমিই—আমিই যে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম!"

হেমপ্রভা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ব'ল্‌লো, "না—এ একটা গল্প। এ সত্যি নয়—দুটি পায়ে পড়ি তোমার, বলো এ সত্যি নয়!

—"তাই হেমপ্রভা তাই, এ আমি ত আর সে নয়!"

—:০:—

দুঃখের বরষায়

উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২০)

হরেন্দ্রনারায়ণ মাত্র প্রাণে বাঁচিলেন। দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। মুখে অবিরত, শ্যামা, শ্যামা, শ্যামা রব! শ্যামাঙ্গিনীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করা কঠিন। উঠিতে, বসিতে, আহারে, নিদ্রার আগে পর্য্যন্ত, শ্যামাঙ্গিনীকে না হইলে চলে না; সর্ব্বদাই হারাই হারাই, কাছে আসিয়া হাত ধরিতে দেরী হইলে বালকের মত কাঁদিয়া আকুল হন। কথা বলিলে যে শুনিতে পায় না তাহাকে বোঝান শক্ত; অবহিত হইলে ধীরে ধীরে হাতের উপর লিখিয়া দিতে হয়! বুঝিলে নিরস্ত হন বটে; কিন্তু দুই চোখ হইতে অশ্রুর ধারায় বালিশ ভিজিয়া যায়; বলেন, শ্যামা, এ কি হ'লো আমার? এর চেয়ে মরাই যে ছিল ভাল! আমাকে বিষ দেবার ব্যবস্থা কর।

ভয়ে-ভাবনায় শ্যামাঙ্গিনীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে। হাত জোড় করিয়া তিনি বলেন, ভগবান, এ কি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছ আমায়, এর শেষ কোথায়?

শেষ যে মৃত্যুতে তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিতেন; তবুও আশা! শ্যামাঙ্গিনী হাতে লিখিয়া দিতেন, একটু সেরে উঠলে কলকাতায় নিয়ে যাব, সেখানে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে তোমায় ভাল ক'রবো...

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া হরেন্দ্র বলিতেন, আর ভালো হয়েছি, তোমাকে চিরজীবন কেবল জ্বালাতনই ক'রবো, শ্যামাঙ্গিনী, এ আমার কি হলো? কি পাপে এত বড় শাস্তি? আমাকে বিষ দাও······আবার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে!

কবিরাজ নিরাশ হইয়া চলিয়া গেছেন; মধ্যে মধ্যে হরিচরণ আসিয়া সংবাদ লইয়া যায়। সে বলে, তীব্র ডাক্তারি ঔষধের কুফলে এমন হ'য়েছে; চোখের উপর যে ছানি প'ড়েছে, ভাল ডাক্তারে তা কেটে পরিষ্কার ক'রে দিলে, আবার দেখতে পাবেন, ধীরে ধীরে শুন্‌তেও হয়ত' পাবেন; মানুষের দেহে বিষের কার্য্য-কারিতা খুব দীর্ঘদিন থাকে না; এ সবই সাময়িক; কিন্তু এদেশে সে ডাক্তার কোথায়? শুনেছি, জার্ম্মানিতে অসম্ভব সব সম্ভব হয়েছে!

শ্যামাঙ্গিনীর মনে হয়, বিষয় বিক্রয় করিয়া বিদেশে চলিয়া যান; কি হইবে টাকাকড়ি ধন-দৌলত লইয়া? গভীর বনের মধ্যে কাঠ কাটিয়াওত সাবিত্রী-সত্যবানের দিন চলিত! স্বামীর জীবনের জন্য যমের পিছনে পিছনে সাবিত্রী তো পর-লোক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আশা তিল তিল করিয়া মনের মধ্যে যে সৌধ গড়িয়া তোলে, নিরাশার একটা রূঢ় ঝাঁকুনিতে তাহা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যায়; মরুভূমির মধ্যে শ্যামাঙ্গিনীর বিক্ষুব্ধ হৃদয় আবার ছটফট্ করিয়া ছুটিয়া মরে! কোথায় জল, কোথায় জল? জলের কোন সন্ধান মেলে না!

রাণীমার বিশ্বাস—দৈবই একমাত্র উপায়; কোন্ অজ্ঞাত কারণে সেই দৈবকে ক্ষুব্ধ করা হইয়াছে, তাই দৈব এই প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিয়াছে; সেই দৈবকে তুষ্ট করাই কেবলমাত্র উপায়।

হরেন্দ্রনারায়ণের ঘরে আসিয়া বেশীক্ষণ টিকিতে পারেন না তিনি; বুক ধড়ফড় করে, হাত-পা হিম হইয়া ঝিন্ ঝিন্ করিতে থাকে; মুখে বলেন, বৌমা, তোমরা তো আমার কথা শুনবে না, শাস্তর বলে, বলং বলং দৈব-বলম্!

শ্যামাঙ্গিনীর দুঃখের সমুদ্রে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইতে চায়; কষ্টে নিরোধ করিয়া বলেন, মা, আমি তো কিছু জানিনে; যা কিছু করতে হয়, আপনি করুন।

রাণীমা বলেন, আমি কি আর মানুষ আছি! উনি যাওয়ার পর হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে; যারা জানে, তাদের ডাকাও না কেন?

আঁচলে চোখ মুছিয়া শ্যামাঙ্গিনী বলেন, কেউ তো কিছু ব'লতে পারে না।

রাণীমা রাগ করিয়া, তোমার ঐ এক কথা, বলিতে বলিতে চলিয়া যান।

নায়েব মশাই আসিয়া দাঁড়ান, তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা ফোটে না; এ অবস্থা কেহ স্বপ্নে চিন্তা করে নাই। তাঁহার মনে হয়, কি হইবে আর কাশীতে পড়িয়া থাকিয়া, এখন ঘরে ফিরিয়া গিয়া কেবল দিনগত পাপক্ষয় করা ভিন্ন আর উপায় নাই; তিনি জানিতেন এ কথা বলিলে শ্যামাঙ্গিনীর মনে আঘাত দেওয়া হয় মাত্র! ক্ষীণ আশার উপর ভর করিয়া তাঁহার জীবন-লতা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে চূর্ণ করিতে মমতা হয়! এই সেই জমিদার, যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একদিন বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত! কোথায় গেল সে প্রতাপ! শিশুটির মত শয্যায় পড়িয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

মোহিনীর উপর সংসারের চাপ ছিল; কিন্তু সে ফাঁক পাইলেই ছুটিয়া আসিত, শ্যামাঙ্গিনীর কাছে বসিয়া বলিত, বৌদি' আমি জানিনে, এমন হ'লে কি ব'লে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে হয়; সমস্তদিন বুকের মধ্যে কি-যেন নখ দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে; চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু ভয়ে পারিনে; মনে হয়, আবার যদি কোন অমঙ্গল হয়!

শ্যামাঙ্গিনী চুপ করিয়া শোনেন, মনে মনে ভাবেন শুধু মোহিনী একা নয়, বিশ্ব-সংসারের যে-কেহ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিবে না। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, বুকের মধ্যে যেন ফাটিয়া যায়!

মোহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিয়া চলিয়া যায়, রাণীমা তাহাকে এমন করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে আর রক্ষা থাকিবে না!

শ্যামাঙ্গিনীর দিন কাটে তো ক্ষণ কাটে না। আহারে

রুচি নেই ; চোখে ঘুম আসে না ; মন জুড়িয়া উদাসীনতা ! স্বামী-চরণপ্রান্তে বসিয়া ভগবানকে ডাকেন, বলেন, ঠাকুর এ দৃশ্য যে আর চোখে দেখতে পারিনে ; তোমার মনে কি একটুও দয়া-মায়া নেই ? তুমি কি জেগে আছ ?

দেবতা পাষাণ !

সেদিন হরেন্দ্রনারায়ণ আর কিছুতেই বিছানায় থাকিতে চাহিলেন না। রাত্রে বার কয়েক কাশী-ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছিলেন। শ্যামা, বাড়ী চল, কাশীতে থাকার দরকার নেই ; তারপর যাব ক'লকাতায়, সেখেনেও যদি উপায় না হয় তো·····শ্যামাঙ্গিনী তাঁহার ছুটি নিষ্প্রভ চক্ষুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হবে, নিশ্চয় উপায় হবে ; কিন্তু ডাক্তার বলে, ছানি না পাকলে কাটা চ'লবে না।··

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া হরেন্দ্র বলিলেন, ততদিন কাণের চিকিৎসা চ'লবে, এমন ক'রে একদিনও আর আমি প'ড়ে থাকতে পারিনে, মনে হয়, তোমরা ঠিক আমার যে কি অবস্থা তা' বুঝে উঠতে পার না···

কথাগুলির মধ্যে একটা অনুযোগের সুর ছিল ; শ্যামাঙ্গিনীর চক্ষু ভরিয়া জল উপ্‌চাইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর হাতের উপর লিখিতে লাগিলেন, আমার আর কাশী নেই, বৃন্দাবন নেই, তুমিই সব····. হাতের উপর এক ফোঁটা—চোখের জল পড়িল।

হরেন্দ্রনারায়ণ চমকাইয়া বলিলেন, তুমি কাঁদচো, শ্যামা ?

শ্যামাঙ্গিনীর হাত কাঁপিতে লাগিল।

শ্যামাঙ্গিনীর হাত দুইখানি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া গদগদ-কণ্ঠে হরেন্দ্রনারায়ন বলিলেন, তোমরা আমাকে বুঝতে ভুল ক'রো না, শ্যামা ; আমার সকল অনুযোগ-অভিযোগ সকল কলহ-দ্বন্দ তোমাদের সঙ্গে নয়, এ সবই অদৃষ্টের সঙ্গে চল্‌চে, দোষ কারুর নয় ; আমার কপালের, তাই তার সঙ্গে ঝগড়া করি, বকাবকি করি !

শ্যামাঙ্গিনী ধীরে ধীরে প্রিয়তমের হাতখানি টানিয়া লইয়া লিখিতে লাগিলেন, তুমি যে কত অশান্ত হও ; বিধাতার সঙ্গে কলহ ক'রে কি লাভ হবে আমাদের ?

হরেন্দ্রনারায়ণের ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, সে কথা সত্যি বলেছ শ্যামা, এ শুধু নিজেকে অশান্ত ক'রে তোলা·····শক্তির অপচয়, জীবনের আয়ুক্ষয় !

হরেন্দ্রনারায়ণের অলক্ষ্যে শ্যামাঙ্গিনীর চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বিগলিত হইল। শ্যামাঙ্গিনী আবার লিখিলেন, আজই কি সন্ধ্যের গাড়িতে যাব, আমরা ?

ব্যস্ত হইয়া হরেন্দ্র বলিলেন ; না, না, তাড়াতাড়ি কিসের ? কালও নয়, পরশু শ্যামা ; সব গোছ্‌গাছ্ ক'রে নিতে পারবে না ?

শ্যামা লিখিলেন, নি ··

ও বুঝেচি, আর লিখ্‌তে হবে না, লিখ্‌ছিলে নিশ্চয় না ?

নিজের হাতের মৃদু স্পর্শে শ্যামাঙ্গিনী জানাইলেন, হাঁ, তাই।

শ্যামাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বেজেচে শ্যামা' ?

শ্যামাঙ্গিনী লিখিয়া দিলেন।

ওঃ তবে তো বেলা হ'য়েছে ; আজ আমি বাথরুমে গিয়ে স্নান ক'রবো শ্যামা, লক্ষীটি, আপত্তি ক'রোনা ; আজ সাবান মেখে, পরিষ্কার হ'য়ে তোমার হাতের রান্না খেতে ইচ্ছে করছে ; কি রাঁধবে ?

—আমার এখানে রেঁধে কাজ নেই ; তোমার বাড়ী গিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন ভাত রেঁধে দেব ; মোহিনী তোমার জন্যে রেঁধেছে, আজ থাক্, বুঝেছ ?

—বুঝেচি, বেশ তাই হবে ; কিন্তু আমাকে তুমি বাথরুমে নিয়ে যাবে তো ?

—যাব।

হরেন্দ্রনারায়ণ আনন্দে চেয়ারে বসিয়া মৃদু মৃদু দুলিতে দুলিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিলেন।

শ্যামাঙ্গিনী স্নানের ব্যবস্থা করিতে ক্ষিপ্রপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

নিঃসঙ্গ একাকী হরেন্দ্রনারায়ণ বসিয়া গত জীবনের দিনের পর দিনের পাতাগুলি একের পর এক করিয়া

উল্টাইয়া চলিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের দিকে চাইতে ভয় করে। গাঢ় অন্ধকারে তাহা অবলুপ্ত !

শৈশবের নিরীহ উৎপাতের কথা মনে করিয়া সুখ হয় ; সেদিনের দুঃখের অনুভূতিটুকু মন হইতে অপসৃত হইয়া গেছে ; আছে শুধু মধুর স্মৃতিটুকু ! কেবল মনে পড়ে, বড় হইয়া উঠিবার বিপুল সাধ ; তাহা ছিল, দুর্ব্বার—বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্যের মধ্যেই ছিল না।

পাঠশালার গুরুমশাইএর কথা মনে পড়িল ; শান্ত নিরীহ মানুষটি ! কত আদর করিতেন, বলিতেন হরু দুই শ্রুতিধর, দুই কুলের মুখ উজ্জ্বল করবি। তাঁহার কথায় বুক ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিত।

সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে, যেদিন ঘর ছাড়িয়া পরের গৃহে আশ্রয় লইতে হইল। আত্মীয় কাঁদিল, শত্রু হাসিল ; লজ্জায়, অভিমানে বালকের ছোট মনটি দ্বিধায় কুণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনের বিচ্ছিন্ন শক্তি, আকাঙ্ক্ষার শক্ত নিগড়ে দৃঢ় হইয়া ঘোষণা করিল, বড় হ'তেই হবে, কে চেপে রাখবে কাপড় দিয়ে, প্রতিভার আগুনকে ?

তাহার পর, ভাগ্যচক্র কোথায় লইয়া গেল তাঁহাকে ! বাঙলার পল্লী হইতে বিশ্বেশ্বরের সৌধ-সমন্বিত, সমারোহ-পূর্ণ তীর্থক্ষেত্র কাশীতে। সেখানে ভাগ্য খুলিল, সেই-খানেই শ্যামাঙ্গিনীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ! হায় ! আর কি শ্যামাঙ্গিনীকে দুই চক্ষু তৃপ্ত করিয়া কোনদিন দেখিতে পাইবেন।

হাতের উপর মৃদু স্পর্শে সহসা তাঁহার অতীতের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ; হরেন্দ্রনারায়ণ জানিতেন শ্যামাঙ্গিনীই তাঁহার হাতে হাত দিয়াছেন, তবুও অতর্কিতে মুখ হইতে বাহির হইল ; কে ? কে ?

শ্যামাঙ্গিনী লিখিলেন, কি এত ভাব চো ?

—ভাবচি ? ব'লবো, কি ভাবছিলুম ? না ; তুমি কষ্ট পাবে মনে, শ্যামা। ব'লে কাজ নেই ; যে-কদিন আছি, আর কারুর মনে যেন কষ্ট না দি ! এই প্রার্থনা ; আর কিছু চাইনে।

শ্যামাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তিনি মনে মনে অবাক্ হইয়া গেলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কোথা হইতে, নিদারুণ বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার মনকে জুড়িয়া বসিয়া আছে !

শ্যামাঙ্গিনী লিখিলেন, তোমার ভাবনার ভিতর কি আমার অংশ নেই ?

মৃদুহাস্যে তাঁহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিস্ফারিত হইল, বলিলেন, একশো বার আছে ; আমার দুঃখের পূর্ণাংশই তো তোমাকে নিতে হয়েছে, শ্যামা ; আর কে আছে আমার, তোমার মত ?·····একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার তিনি বলিলেন, ভাবছিলুম, আর কি এই চোখে তোমাকে দেখার সৌভাগ্য হবে ?

শ্যামাঙ্গিনীর নারী-জন্ম যেন নিমেষে সার্থকতা লাভ করিল। এই নিবিড় প্রাণের কথা শুনিয়া মানুষ না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পাছে তিনি জানিতে পারেন, তাই শ্যামাঙ্গিনী এক পা পিছাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া বার বার করিয়া মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে অশ্রু নিরোধ মানিবার নহে !

হাত ধরিয়া শ্যামাঙ্গিনী তাঁহাকে স্নানের ঘরে লইয়া চলিলেন। অনেকদিন না চলিয়া, পা আড়ষ্ট হইয়া গেছে। চলিতে চলিতে হরেন্দ্র বলিলেন, আবার সবই নূতন ক'রে শিখতে হবে, শ্যামা। এযে দেখছি হাঁটি হাঁটি পা পা, সুরু ক'রলুম ! বিধাতাপুরুষ বিরাট্ পরিহাস আরম্ভ ক'রেছেন আমার সঙ্গে !

স্নানের ঘরে গিয়া হরেন্দ্র বলিলেন, এবার সব দেখে নিতে পারব আমি ; তুমি যাও। সাবান, গামছা হাতে দিয়া, শ্যামাঙ্গিনী তাঁহার বাঁ হাতখানি গরম জলের টবের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। হরেন্দ্র-নারায়ণ বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, আর দরকার নেই, তুমি যাও।

শ্যামাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। পায়ের কাছেই ঘটিটা ছিল, হাত বাড়াইয়া হরেন্দ্র তাহা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া বলিলেন, তাই তো ঘটিটা পাইনি যে, নিশ্চয়ই আছে এইখেনে·····

শ্যামাঙ্গিনী হাতের কাছে ঘটি আগাইয়া দিলেন; নিজে নিজেই হরেন্দ্র বলিলেন, এই তো আছে, তাই তো বলি, শ্যামার কাজের ভুল হয় না।

এত দুঃখেও শ্যামাঙ্গিনীর হাসি আসিল!

বাহির হইতে ডাক পড়িল, বৌমা।

বাহিরে আসিয়া শ্যামাঙ্গিনী দেখিলেন, রাণীমা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, একবার আস্‌বে? তোরঙ্গের চাবিটা কেমন শক্ত হয়ে গেচে, খুলতে পারিনে। হরুর জন্যে গরদের ধুতি-চাদর কিনে রেখে ছিলুম, আজকে পরিয়ে দেও; কিন্তু ছাই চাবিটা কিছুতেই খুলতে পারছিনে, একবার এসোতো।

তাড়াতাড়িতে তুল চাবি দিয়া তোরঙ্গ খুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া রাণীমা হায়রাণ হইয়া গিয়াছিলেন। শ্যামাঙ্গিনী দেখিয়া বলিলেন, এ চাবি নয় মা, এটা যে ঠিক ক'রে ভেতরে যাচ্ছে না।

তাই হবে, চোখে ভাল ক'রে দেখতে পাইনে, আজকাল আরও যেন কি হয়েছে পোড়া চোখের!

শ্যামাঙ্গিনী বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিলেন, আমাদের সঙ্গে চলুন মা, আর একলা থাকবেন না……

তাই ভাবচি, কিন্তু শেষকালে কাশী-ত্যাগী হব?

না, কলকাতা থেকে ফিরে আবার কাশীতে এসে থাকবো আমরা।

রাণীমা প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তাই যদি কর মা, বেশ হয়; এ অবস্থায় হরুকে ছেড়ে থাকতে আমার যে কি হবে তাই ভাবি; আর কাঁদি; কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো গ'লে যাবার মত হ'য়েছে, বৌমা…কিন্তু ঐ আবাগী কি যাবে?

কে, মোহিনী? না যায়, অনেক পাওয়া যাবে, আপনি চলুন মা। আমি ওকে রাজী ক'রে নেব……

কথাটা এইখানেই চাপা পড়িল, মোহিনী আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই।

ধুতি চাদর দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনী অবাক হইলেন। এমন পরিপাটী সুন্দর কাপড় হরেন্দ্রনারায়ণ জীবনে পরিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রাণীমার পছন্দ বটে!

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, কি সুন্দর কাপড়!

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, কত দাম?

রাণীমা যেন রাগ করিয়াই বলিলেন, সে কি আমার মনে আছে?

মোহিনীর এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে, সকল কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। তাহার ঘরে ঢোকা রাণীমার ভাল লাগে নাই, তাহার উপর এই অবান্তর প্রশ্ন, আদরের সামগ্রীটির সকল মর্য্যাদা যেন নষ্ট করিয়া দিল। ঘরের যুগপৎ স্তব্ধতা যেন মোহিনীর ঘাড়ে হাত দিয়া তাহাকে ঘর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল।

খাইতে বসিয়া শ্যামাঙ্গিনী মোহিনীকে অস্বাভাবিক চঞ্চল দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন। বুঝিলেন, মোহিনী বোকামি করিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিল তাহার জন্যায় অন্যায় বুঝিয়া এখন অনুতপ্ত হইয়াছে। তিনি তাহাকে আদর করিয়া ডাকিলেন, মোহিনী লক্ষী বোনটি আমার, একটা কথা যে তোমাকে রাখতে হবে আমার।

কি কথা, বৌদি'।

মাকে সঙ্গে নিয়ে যাব মনে করছি, দিন কতকের জন্য; কিন্তু তুমি না গেলে ওঁর যে ভারি কষ্ট হবে, বোন্।

মোহিনী ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, কিন্তু আমার বাড়ীর মত নিতে হবে তো?

শ্যামাঙ্গিনী জানিতেন মোহিনী বড় একটা কাহারো মতের তোয়াক্কা রাখিয়া চলে না। তাই বলিলেন, তোমার মত থাক্‌লে, শেষ পর্য্যন্ত সকলকে মত দিতেই হবে; তুমি স্বাধীন, নিজে উপার্জ্জন কর…

মোহিনী হাসিল, তবুও বৌদি' জিজ্ঞেস করাটা উচিত, নৈলে পরে কথা হবে।

তা ঠিক্, বলিয়া শ্যামাঙ্গিনী খাইতে লাগিলেন।

তবে আজই একবার খাওয়া দাওয়ার পর যাবো?

তাই ব'লে মাকে না বলে যেও না ভাই; বুঝেছ?

মোহিনী বলিল, জিজ্ঞেস ক'রে আসবো?

এসো সময় মত; এখুনি তো আর যাচ্ছ না, যাবে দাবে; আমি মাকে ব'লে রাখব এখন; তারপর তুমি ছুটি নিয়ে এসো গিয়ে।

রাতে আস্‌তে হবেনা তো?

যদি না-আস্‌তে পারো, আমাকেই চালিয়ে নিতে হবে।

এ কথার উত্তরে মোহিনী কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে তখনি হেঁসেল সারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাঙ্গিনী একলা বসিয়া খাইতে লাগিলেন। তিনি আশা করিতেছিলেন মোহিনী বড়নি ফিরিবে; কিন্তু মোহিনী আর ফিরিল না।

মুখ ধুইতে ধুইতে শ্যামাঙ্গিনী দেখিলেন, মোহিনী স্নান করিয়া ফিরিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমা! আবার যে নাইলে, মোহিনী?

সে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, কি একটা মাড়ালুম—সন্দেহ হ'লো, তাই……বলিতে বলিতে কথা সাঙ্গ না করিয়া কাপড় শুকাইতে দিতে ছাদের উপর চলিয়া গেল।

রাণীমা বারান্দা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, কার সঙ্গে কথা ব'লছ বৌমা?

ঐ মোহিনী, মা; সে আবার নেয়ে এলো, বলে, কি যেন মাড়িয়েছিল।

রাণীমা মনে মনে প্রসন্ন হইলেন; বলিলেন, তা বেশ ক'রেছে……

শ্যামাঙ্গিনী বলিলেন, ওতো রাজি হয়েছে, যেতে মা; রাতে ছুটি চায় আজ, নিজের লোকেদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আস্‌বে।

তা' যাক্ না কেন; কাল আস্‌বে তো? আমার আবার সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে কিনা, বৌমা।

কাল আস্‌বে বৈকি। যাবার সময় ব'লে যাবে; অমনিই কি যেতে পারে, ছুটি না নিয়ে…

মোহিনী সেখান দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু এ প্রসঙ্গে যোগ দিল না।

শ্যামাঙ্গিনী তাহাকে ডাকিলেন, মোহিনী, খেতে বসার আগে একটু তেল গরম করতে দিও,……ওঁর পায়ে মালিশ ক'রে দিতে হবে।

আমি খেতে পারবো না, বৌদি', গা ঘিন্ ঘিন্ করছে…বলিয়া, সে গিয়া রান্না ঘরে ঢুকিল।

২১

গরম তেলের বাটিটা রাখিতে রাখিতে মোহিনী বলিল, তা' হ'লে আমি আসি গিয়ে, বৌদি?

মাকে ব'লে যেও, নৈলে তুল্‌কালাম ক'রবেন।

কবেই বা তার কম হয়? বলিয়া মোহিনী ফিক্ করিয়া হাসিল।

না, না, তবুও যাবার আগে…

মোহিনী আর দাঁড়াইল না।

তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া শ্যামাঙ্গিনী মনে মনে হাসিলেন; এই এক আধ-পাগল মানুষ, যাবে মনে হয়েছে তো এক মিনিট দাঁড়াবে না, বকুনিও ত' কম খায় না!

সত্যই মোহিনী সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। শ্যামাঙ্গিনী তাঁহার সহজ মন দিয়া অধীরতার যে কারণ ঠিক করিয়াছিলেন, তাহাই যে কারণ নয়, এই কথা, রাণীমার কাছে যাইলে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে, মোহিনী তাহা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল; তাই সে তাঁহাকে এড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে রাণীমা আসিয়া বলিলেন, দেখ্‌লে বৌমা, মোহিনী আমাকে না ব'লেই পালিয়েছে।

শ্যামাঙ্গিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, অসম্ভব ভয় করে কিনা, একটু ছিটও আছে, বোধ হয়।

না; ও পেট কোঁচড়ে ক'রে কিছু নিয়ে গেছে, ওকে আমি চিনি…বলিতে বলিতে রাণীমা চলিয়া গেলেন।

পায়ে তেল ঘষিতে ঘষিতে শ্যামাঙ্গিনী ভাবিতে লাগিলেন:—মানুষের উপর মানুষের অবিচারের শেষ নাই! তাই কথায় কথায় মোহিনী কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। রাণীমা বলিয়াই এত গঞ্জনা সহিয়া টিকিয়া আছে; অন্য কেহ হইলে, একদিনেই পালাইত!

হরেন্দ্রনারায়ণ এতক্ষণ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন, পায়ে হাত দিতে তিনি জাগিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন, শ্যামা একটা ভুল হয়েছে…আমি আংটিটা বোধ হয় চৌবাচ্চার পাড়েই রেখে এসেছি; এখনো রামার মা আসেনি বোধ হয়, তার আসার আগে গিয়ে নিয়ে

এসো ·····ওদের হাতে গিয়ে প'ড়লে, আর পাওয়া যাবে না।

অবিলম্বে শ্যামাঙ্গিনী আসিয়া দেখিলেন, কাপড় কাচিয়া রামার মা রান্নাঘর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেছে। তাহাকে কিছু না বলিয়া তিনি স্নানের ঘরে ঢুকিয়া আতি-পাতি করিয়া খুঁজিলেন ; সেখানে আংটি নাই। বড় হীরাবসান আংটিটা, থাকিলে পাইতে দেরি হইত না। তিনি বুঝিলেন, তাহা রামার মার করতল-গত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই !

নামিয়া আসিয়া, রান্না ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া শ্যামাঙ্গিনী ডাকিলেন, রামার মা, আংটিটা দে,···

রামার মা কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, কি দেবো ?

নেকি, খুকি ! আংটিটা লো আঁটি, বাবুর অংওঠি···

ক্রমেই রামার মার চক্ষু বিস্ফারিত হইতে লাগিল ; তাহার দুইচক্ষু যেন চীৎকার করিয়া বলিতে চায়, সে আবার কি কথা ? বাবুর আংটির কথা আমিই বা জানতে যাব কেন, কি আমার দরকার ?

রামার মা ভিন্ন অপর কেহ লইতে পারে না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শ্যামাঙ্গিনী রামার মার মুখে অপরিসীম চালাকি দেখিয়া, কেমন যেন একটু রাগিয়া গিয়া বলিলেন, রাখ্ তোর হ্যাকামি আর চালাকি ; ভাল চাস্ তো বার ক'রে দে, নৈলে মরবি পুলিশের মার খেয়ে—শেষকাল পর্য্যন্ত জেল খেটে !

রামার মা ভালমানুষ, এই তিরস্কারই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। সে হাউমাউ করিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল ; সে তাহার ক্ষিপ্র মাতৃভাষায় বলিতে লাগিল, বৌমা, তুই রাণী, এই পবিত্র বাবা—বিশ্বনাথের ধামে আমি কি মিথ্যে ব'লবো ? আমি আংটির কথা কিছুই জানিনে ; আমার স্বামীর দিব্য, আমার ছেলের দিব্য !

তাহার চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারার মত জল পড়িতে লাগিল।

রাণীমা বাহির হইতে শুনিয়া ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিয়াছিলেন, তবুও পরিষ্কার করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন ; হয়েছে কি বৌমা ?

আংটিটা নাবার সময় ভুলে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন চৌবাচ্চার উপর, এখন মনে হলো ; এসে দেখি, নেই ; ও-ঘরে রামার মা ছাড়া আর কে যাবে ? ওই নিয়েছে। ওই তো কাপড়খানা কেচে দিয়েছে।

রাণীমা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, ও ভালমানুষ, পেলে দিতো ; দু চার টাকা বক্‌শিসের লোভেও দিয়ে দিতো শেষ পর্য্যন্ত।...ও নেয়নি, নিলে ভাতার পুতের দিব্যি ও গাল্‌তো না। নিয়েছে সেই হারামজাদি মোহিনী। এখন বুঝ্‌চি, কেন সে আমায় না ব'লেই পালিয়েছে !

কিন্তু মোহিনী ও-ঘরে কি করতে যাবে, মা ?

কি করতে ? এখনো তোমার ওকে চিন্‌তে ঢের বাকি আছে, বৌমা !···কি-মাড়িয়ে নাইতে যাবার ছলে, সে সুধীরের কাছে দিয়ে এসেছে···এতক্ষণে বিক্রি হ'য়ে গেল ; আমি জানি, কম ডাকাত ওই সুধীর ছোঁড়া ? পুলিশে খবর ? পুলিশরা সব ওর হাতের মুঠোর মধ্যে ! আংটিটা গেল ! আর সে-পাওয়া যাবে না···ও পীতাম্বর সিং, পীতাম্বর, পীতাম্বর······

হুজুর, বলিয়া, পীতাম্বর সামনে আসিয়া একটা দীর্ঘ সেলাম করিল।

আবৃভি মোহিনীকো পাকড় লে-আও, রাজাবাবুকো অঙ্গুঠি চোরায় কো ভাগ্ গয়ি।

পীতাম্বর পাগ্‌ড়ি কষিতে কষিতে দ্রুতপদে উধাও হইয়া গেল।

রাণীমা নীচে নামিয়া রামার মাকে বলিলেন, তুই আজ বাড়ি যাবিনে ; কাল সকালে চাল-পড়া হ'য়ে গেলে তবে যেতে পাবি, পীতাম্বর ফিরে এসে, তোর বাড়িতে খবর দিয়ে আস্‌বে এখন।

রামার মা একটুও আপত্তি করিল না। জানিত, এ হুকুমের রদ বদল নাই !

মোহিনীকে পাওয়া গেল না ; এই কথা পীতাম্বর সিং ফিরিয়া আসিয়া বলিল। রাণীমা কিছুক্ষণ চিন্তা

করিয়া বলিলেন, তুম্ থানামে যাকে রঘুবীর বাবুকো ব'লো যে হম্ অবভি ভেট করণে মাঙ্গতেঁ। দৌড়কে যাও, থোড়া ভী কঁহি দেরি মৎ করো।

পীতাম্বর আবার দৌড় মারিল।

নায়েব মশাইয়কে ডাকিয়া রাণীমা বলিলেন, দেখ বগলাচরণ, তুমি একবার সুধীরের দোকানে যাও, গিয়ে দেখ যদি যে, তার দোরে তালা বন্ধ ত' শব্দ না ক'রে কপাটে কান দিয়ে শুনবে, ভিতরে দুজনে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইচে কি না। বেশ ভাল ক'রে বুঝে এসো যে, দোরে তালা দিয়ে ভিতরে লোক লুকিয়ে আছে কি না। যদি বোঝ যে, আছে তো ফিরে এসো না। তোমার আসার দেরি দেখলে —আমি এদিকে একটা ব্যবস্থা ক'রবোই—বুঝেছ, আমার কথা ? আমার বিশ্বাস, মোহিনী ওই খেনেই আছে ; অনেক রাত পর্য্যন্ত থাকবে। তারপর রাত বারোটার গাড়িতে সুধীর আংটিটা নিয়ে কল্‌কাতা চ'লে গিয়ে বেচে আস্‌বে। মোহিনী কাল সকালে এসে সাধু সেজে ব'ল্‌বে, রামাপুরায় মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ! আমি ওর নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি, তুমি দেরি ক'রো না ; এখুনি এক-ছুটেই যাও।

দোকান যদি খোলা পাই ? বগলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ'লে কি ক'রবো।

বাইরে পথের উপর দাঁড়িয়ে থেক। মোট কথা মোহিনী ঐখেনেই আছে এখনও ; ওকে কিছুতেই পালিয়ে যেতে দিও না।

নায়েব মশাই ত্বরিৎ-পদে চলিয়া গেলেন।

শ্যামাঙ্গিনী অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। রাণীমা একটু হাসিয়া বলিলেন, একলা থাকি, চোরের নজর সর্ব্বদাই আমার উপর। ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে, এত শিখেছি বৌমা। আমি মানুষ চিনি ; বিশেষ ক'রে চোর আমার চোখ এড়িয়ে চল্‌তে পারে না। ভিখিরী ভিক্ষে করতে এলে, তার গলার আওয়াজ দেখে জান্‌তে পারি, সে চোর কি না।

কিন্তু মোহিনীর সম্পর্কে কি আপনার একটুও সন্দেহ নেই ? শ্যামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন।

ওকে যে আমি ও-ঘরে ঢুক্‌তে দেখেছি, গিছলো সাবান্ চুরি করতে ; কি ভালই বাসে ছুঁড়ি সাবান আর গন্ধ ; কিন্তু সাবান তো নেয়নি, তাতো আমি দেখে এসেছি। তাইতো অবাক্ হচ্ছিলুম, মোহিনীর আবার হোল কি ? আংটিটা পেয়ে আর সাবান নেয় নি। তারপর থেকে বাড়ী যাবার জন্যে কি ছট্‌ফটানি। মাঝে, একবার সুধীরের দোকানে ও গিয়েছিল, কিন্তু দেখা পায়নি ; সুধীর গিছলো খেতে। ঢং ক'রে নেয়ে এলো।···খাবে কি বৌমা, ওর প্রাণে কি কোন সুখ আছে ? অন্যলোকের হাতে আংটিটা দিয়ে, তারপর এম্নি সাধু সাজবে, এম্‌নি কাঁদবে যে, তোমার মনে হবে, ও একেবারে নির্দ্দুষী !

এত জেনে, ওকে রেখেছেন কেন মা ?

রাণীমা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, যাচ্ছি তো তোমার কাছে, একদিন ওর সব কথা ব'লবো—সে এক মস্ত মহাভারত।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক কাব্য ও সুধীন্দ্রনাথ *

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

'আধুনিক কাব্য' কথাটি প্রয়োগ করতে মন স্বতঃই দ্বিধাগ্রস্ত হয়। ভিন্নরুচি ব্যক্তির কাছে এর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। কেউ বা 'আধুনিক' অর্থে ভাববেন নূতন ও উন্নত, কেউ বা বুঝবেন অর্বাচীন ও উদ্ভট। কারুর মতে আধুনিক কাব্য হচ্ছে সহজ ও অনাড়ম্বর, যা প্রাচীন কাব্যের মত ছন্দবিলাসী নয়, অথবা অযথা বাগ্‌বিস্তার করে না। অপরের ধারণা আধুনিক কাব্যের মধ্যে আছে আধুনিকত্ব, নেই কাব্য। সে নবীনত্বের রূপ উগ্র ও উৎকট, তাতে অচিরস্থায়ী কাব্যের দুরূহতা আছে কিন্তু শাশ্বত রসের অভাব।

কিন্তু প্রাচীন ও অর্বাচীনের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ ও বিভাগ থাকলেও মানুষের শিল্প-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই আত্মকৃত ও যুগোচিত খণ্ডসৃষ্টির পক্ষপাতী আমরা নই। গত শতাব্দীর পণ্ডিতেরা এই রকম একটা বিভাগ প্রচলিত ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যে বৈষম্য কেবল আঙ্গিক অথবা রূপগত, তারি প্রাধান্য গ্রহণের মধ্যে দলভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কাল নিরবধি এবং কালবিভাগও প্রথাগত, সংস্কার-সুলভ। রসসৃষ্টি অখিল ও চিরন্তন। সময়োচিত দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে তার বাহ্য প্রকাশ অথবা অভিব্যক্তি নূতন বেশ ধারণ করে। সে পরিবর্তন অনেক দিনেও হতে পারে অথবা স্বল্প-পরিসর সময়ের মধ্যেও সংঘটিত হতে পারে। অতএব প্রচলিত রীতির বিপর্যয় ঘটলেই তাকে আমরা নবকালের সূচনা বলে ভ্রম করি। তথাপি অনন্তপ্রসারী রস-সৃষ্টির দিক্ থেকে বিচার করলে আমরা দেখি,—উপলক্ষণের তারতম্য থাকলেও উপকরণের সাদৃশ্য আছে। কাব্য-জগতে কাল-বিভাগ আংশিকতা-দোষে দুষ্ট, কারণ এ ক্ষেত্রে সকল রুচি ও সংস্কারই আপেক্ষিক। সমকালিক পাঠকের কাছে প্রাচীন কাব্যও আধুনিক। সুতরাং 'আধুনিক' কথাটি কাব্য-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-বাচক, তার সৃষ্টির কাল-বোধক নয়।

যাঁদের আধুনিক কাব্যরসে অরুচি, তাঁদের প্রধান আপত্তি হল সে কাব্য দুরূহ। এ আপত্তি ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু পাঠকেরা এ যাবৎ কাব্যকে অনুভূতির সামগ্রী হিসাবে দেখে এসেছেন, সেইজন্যে অভ্যস্ত আবেদনের বিরোধী কিছু পেলেই তাঁদের মন বিমুখ হয়। আধুনিক কাব্য অনেকস্থলে মাত্রালঙ্ঘন করেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না এবং তার মধ্যে দুর্বোধ্যতাও আছে। কিন্তু এই দুরূহতাই যদি নবীনত্বের একমাত্র উপাদান হয়, তাহলে আধুনিকতা গর্ব্বের সামগ্রী নয়, লজ্জার বস্তু। একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য যার মূলধন তা ভাঙ্গিয়ে কিছুকাল স্পর্দ্ধা করা চলে, নিত্যকালের রসসম্পদ তাতে সঞ্চিত হয় না। অপরপক্ষে এই দুর্বোধ্যতা এবং সর্ব্ববিধ সংস্কারবর্জ্জনের অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তা হলে সেইটি স্থায়ী সম্পদ্ বলে গণ্য হবে। অবয়বের উদ্ভ্রান্ত অংশ হল প্রাণ; এ প্রাণ যেখানে সঞ্চারিত হয়নি, প্রেরণা যেখানে নিঃস্ব, তা নবীন হলেও কাব্য নয়। যদি আধুনিক কবি তাঁর কাব্যবন্ধকে শুধু আত্মকেন্দ্রীয় করে থাকেন, অপরের মর্ম্মস্পর্শে অক্ষম হন, আর কেবল কয়েকটী অসঙ্গত চিত্রদ্বারা তাঁর কাব্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, তা হলে অভূতপূর্ব্ব হলেও তাঁর সৃষ্টি অসার্থক হয়েছে। অপরপক্ষে যুগপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হলেও সে কবিকে অপাঙ্‌ক্তেয় করা যাবে না, যদি তাঁর কাব্যে অশেষ ও অনিরূপিত সন্ধানের ইঙ্গিত থাকে। যিনি মনন ও আবেগ দুটোকেই স্বীকার করেন, যাঁর রচনায় উপমার সঙ্গে নিরুপমা ভারতীর রূপাকণা আছে, কেবল উৎকট বাক্য-প্রয়োগ নেই, অপরূপ কল্পনাও আছে,—

* অর্কেষ্ট্রা—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী-ভবন।

সংক্ষেপে, যাঁর সৃষ্টির পিছনে সাধনা আছে, তাঁকেই প্রকৃত কবির আখ্যা সাজে। প্রাচীন হলেও তিনি নবীন, নূতন হলেও তিনি সুপরিচিত। সুতরাং সত্যকারের আধুনিক কাব্য তাকেই বলা যায়, যাতে সৃষ্টিকার্য্য অব্যাহত, উপরন্তু এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা শুধু পূর্ব্বে ছিল না তাই নয়, বিগত যুগে অসম্ভব ছিল।

সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি। তাঁর কবিতার সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবসর আছে বলেই উপরের ভূমিকাটি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর কাব্যের রূপ অধুনা-বিশেষ হলেও তাঁর চিত্ত সনাতন ভাব-সন্ধানী। তাঁর কবিতা বিরলত্রুটি নয়, তবু তার মর্ম্মকোষে সম্পূর্ণতা ও পরিণতির বীজ রয়েছে। তাঁর সূক্ষ্ম ও নবরূপান্বেষী মন কাব্যের বহিরঙ্গের পিছনে অন্তরীণ সত্য ও সৌন্দর্য্য অনুসন্ধান করেছে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর স্বকীয় ও সক্রিয় মনের অজস্র নিদর্শন আছে। তাঁর কাব্যে গতানুগতিক চিন্তা-ধারা অথবা পুরাতন ও ব্যবহার-মলিন শব্দ—এ দুয়েরই অভাব। রবীন্দ্রনাথের ছায়া দু এক স্থলে আত্মপ্রকাশ করেছে—

যেমন—

"ঘাটে বাটে মাঠে ঘটেছে মোদের
আধো পরিচয় নিত্য নব,—
দেখেছি বিকচ দাড়িম্ববনে
প্রচুর পরাগ প্রসাদ তব;
তোমারি কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়;
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারি তনুর মদিরা ভরা;
পথপার্শ্বের অপরাজিতা সে
তোমারি নয়ন লক্ষ্যহরা॥"

আবার—

"ডাক দাও মোরে উদ্ধত প্রেমে
লগ্ন অতীত দেখি পথে নেমে;
বাদলশেষের ঝিল্লীর সনে
বাজায়ে নূপুর অধীর সুরে,
করি অবিরত উপেক্ষাহত
চলে যাও তুমি অগম দূরে॥"

কিন্তু কবিগুরুর দীর্ঘবিলম্বিত অপচ্ছায় প্রভাব থেকে আপনার বিশিষ্ট প্রতিভাকে মুক্ত ও সম্পূর্ণ করেছেন আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই। অনেকে বলবেন যে এতে কাব্যে ব্যক্তির প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য উগ্র। আমার মনে হয় অগ্রগামী কবিদের সমৃদ্ধ দান স্বীকার করেও প্রতিভার স্বকীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সুধীন্দ্রনাথ যে আন্তরিক প্রয়াস করেছেন তাতে পরিস্ফীত ঔদ্ধত্যের চিহ্ন নেই।

এই স্বাতন্ত্র্যের প্রধান উপকরণ হল কবির অপূর্ব্ব লিপিকুশলতা। প্রধানতঃ ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে তাঁর কাব্য বিকশিত হয়েছে। এই ব্যঞ্জনাধ্বনির অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর কাব্যগ্রন্থে ছড়ানো আছে। যেমন প্রথম কবিতা 'হৈমন্তী'তে

"বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকৃতি।
অন্তগত সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেলো রজনীগন্ধায়॥"

অথবা মহাশ্বেতায়—

"সপ্তসিন্ধু পরপারে বিচঞ্চল নারিকেল বন
মৃদুল মর্ম্মরে
সহসা সম্পূর্ণ করে
অসমাপ্ত পরিচয় তার।"

উদ্ধৃত অংশ দুটি থেকে প্রমাণ হয় যে, কবি সুস্পষ্ট প্রকাশের চেয়ে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের পক্ষপাতী। প্রথমটির মন ধ্বনি ও অলঙ্কারবহুল না হলেও দ্বিতীয় অংশটীতে কল্পনার অপরূপ প্রসার আছে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের যে কোনো স্থান, বিশেষ করে 'অর্কেষ্ট্রা'-নামক কবিতাটি, খুললে দেখা যাবে তাঁর 'কাব্যাত্মা ধ্বনি'।

ব্যঞ্জনাধ্বনি-প্রধান কাব্যের প্রকৃষ্ট আবেদন উপযুক্ত শব্দবিন্যাসে। অবশ্য শব্দচয়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

দানের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বাঙলা কাব্যের তথা সাহিত্যের সমৃদ্ধি এ জন্যে তাঁর প্রতিভার নিকট অনেক পরিমাণেই ঋণী। সচরাচর আমরা অজ্ঞাতসারে তাঁরই সৃষ্ট ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে আসছি। এবং এখনও পর্য্যন্ত তিনি অনেক নূতন শব্দ প্রয়োগ করে চলেছেন। শুধু দার্শনিক পরিভাষাই তাঁর হাতে পরিপুষ্টি লাভ করেনি, নাম ও ভাব-বাচক বিশেষণব্যবহারে ও জটিল চিন্তাধারার সহজ ও সরল প্রকাশে কবিগুরু অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বিশেষণ গুলির অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি যে সব শব্দ যোজনা করেছেন, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতানুগ। প্রাচীন ও অচল দেবভাষা থেকে বিশেষণ সংগ্রহ করে তিনি প্রচলিত ভাষায় সেগুলির শোভন ও সঙ্গত প্রয়োগ করেছেন। এতে কেবল মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারজনিত কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে তা নয়; বর্ত্তমান ভাষার নূতন সমৃদ্ধি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার আকৃতির ও প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে। যদি ভাবা যায় যে কবি কতকগুলি দুরূহ শব্দ সঙ্কলন করে আপনার কাব্যে সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। কারণ তাঁর কাব্যে নূতন শব্দগুলি পুরাতন ও আভিধানিক অর্থ অতিক্রম করে অনেকস্থলে নূতন সংজ্ঞা লাভ করেছে। আর যেগুলি প্রাচীন অথচ অপ্রচলিত, সেগুলিও সম্পূর্ণ স্থানোপযোগী। এটি সত্যকারের কৃতিত্ব, নিরর্থক শব্দবিলাস নয়। কারণ সংস্কৃত অভিধান জলধি-বিশেষ। দ্বাদশ বৎসর না হলেও সুদীর্ঘ কাল শব্দালঙ্কারের পর্য্যালোচনা না করলে এবং শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে ভাষার গাঢ়তা ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এই শব্দকৌশল অথবা লৌকিক নিরুক্তচর্চ্চা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে সার্থক হয়েছে।

তাঁর কাব্য গাঢ়বন্ধ; তাতে আর যাই দোষ থাকুক শৈথিল্য নেই। কবি যেখানে বলছেন—

"আছে কি স্মরণে সখি, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা,
করদ্বয়ে পরিপ্লুতি, চারিচক্ষে প্রগল্‌ভ বিস্ময়,
শূন্যপথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জার পরাজয়
প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্ত্তনা?"

অথবা,—

"দুর্ব্বল বুভুক্ষু দেহ; প্রতিশ্রুতি দয়ার্দ্র বঞ্চনা;
বসন্ত বার্ষিক পান্থ; ফাল্গুনী সুলভ হেথা সতী……।"

কিংবা—

আশা আজি প্রবঞ্চনা; দিবো না স্মারক অঙ্গুরীয়;
ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ।"

সেখানে সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করবার জিনিষ, খণ্ড খণ্ড বাক্যগুলির সুনিবিড় সংশ্লেষ। যদি কথার বাঁধন কোথাও শিথিল হ'ত তাঁর কবিতার বিশিষ্ট রূপ ত নষ্ট হতই, উপরন্তু প্রেমের আভিমানিক উক্তিগুলি তাদের স্বকীয় অর্থ ও দ্যোতনা হারাত। অবশ্য সনেটের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই,—তবু সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতাতেও এই গাঢ়বন্ধ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে 'ধ্বনিনাতিগম্ভীরেণ কাব্যতত্ত্বনিবেশিনা।'

তবু সত্যের খাতিরে বলতে হবে যে কখনো 'সংক্ষিপ্ত-সুকৃতি-শেষে' কবির সৃষ্টিসৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়েছে। 'কঙ্কণের প্রস্থিত নিক্কণে মরণের নিরিক্ততা কেঁদে ওঠে প্রাণের গহনে,' 'স্বার্থপঙ্গু সংসারীর অহেতু তরাস, ক্লীবের নিষ্পুণ্য প্রত্যাখ্যান', 'ভবিতব্যভারাতুর স্তব্ধ মূক মেঘের সমান'.

অথবা—

'চাহিনা থাকিতে বর্ত্তমান,
নিস্তাপ নিষ্কম্প, নিত্য চিত্রার্পিত দীপের সমান
নির্ব্বিকার অনন্তের রিক্ত পটপরে'।

প্রভৃতি পদগুলির রূপ ও ভাবের অনবদ্য সুষমা আমাদের মুগ্ধ করে। কবির লিপিকৌশলের প্রশংসায় মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন পড়ি—

"অবলম্ব নাহি মিলে, উচ্চারিয়া প্রলুব্ধ হুঙ্কার
নৈঃসঙ্গ্য গ্রাসিতে আসে রভসে দুর্ম্মদ।
বৈনাশিক বুদ্ধি চাহে অশ্রদ্ধায় করিতে প্রমাণ
আকস্মিক সে-বিস্ময় আপতিক অধৈর্য্যের দান"—

অথবা—

"দক্ষিণ সমীরে
নবতন্ত্র ক'রে থাকে যদ্যপি প্রেরণ
নিরতীত নৈরাজ্যের রূঢ় নিমন্ত্রণ
রাজভক্ত নিবৃত্তির দ্বারে;"

কিংবা—

"কিন্তু যদি অভিব্যাপ্ত অধুনার মাঝে
তোমারে বিনত করে লাজে
অবলুপ্ত অতীতের অনাহূত সেই ধূলিকণা,—"

তখন মনে হয় রচিত পদগুলি ভাবসমৃদ্ধ হলেও, কাব্যের রসহানি ও বোধসৌকর্য্যের ব্যাঘাত হয়েছে। যে কাব্য ধ্বন্যাত্মক সেখানে কবিকে অতি সাবধানে অগ্রসর হতে হয়,—নতুবা অতিকৃতি হলে উৎকটত্ব দোষ আসে। অনুপ্রাস, শ্লেষ ও ব্যঞ্জনাপ্রধান কাব্যের মূল বিপদ এইখানেই। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে অত্যয়দোষ নেই বললে সত্যের অপলাপ হবে। এই কারণেই বোধহয় তাঁর পাঠক অল্প-সংখ্যক। কঠিন ভাষা ও দুরূহ ভাবের জন্য তাঁর কাব্যশ্রী অনেকের কাছে অপমৃষিত ও সযত্নে পরিহার্য্য। তবে যে সব একদেশদর্শী পাঠক 'পরিচয়ে'র মতবাদপীড়িত কবিতাগুলির ভয়ে তাঁর প্রকৃত কাব্যগুণবিশিষ্ট রচনাগুলি বাদ দেবেন, তাঁরা রসবঞ্চিত হবেন একথা সত্য। মেরেডিথের রচনাপ্রসঙ্গে যে প্রশংসামূলক সমালোচনা করা হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের বেলায় তা সমভাবেই প্রযুজ্য। কারণ আপাত-চেষ্টা স্বীকার করে তাঁর কাব্যের ভিতরে প্রবেশ করলে তার অন্তরীণ সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করবে। বিরোধী ও উদ্বিগ্ন পাঠকচিত্ত কবির শিল্পপারিপাট্যে বশীভূত হবে।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটী তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয় সৃষ্টি। এই কবিতাটি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদের আশঙ্কা আছে। ব্যক্তিগতভাবে ভালো-লাগা না লাগার মানদণ্ডে বিচার করলে কবিতার সুবিচার হবে না। 'অর্কেষ্ট্রা'র বিষয়-বস্তু একেবারে নূতন এবং বাঙলা ভাষায় এ ধরণের কবিতা রচিত হয় নি। যখন নূতন কিছু সৃষ্টি করা যায়, অনেকেই তাকে নিরর্থক ও উদ্ভট কল্পনা বলে বাতিল করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় কবিতাটি রচয়িতার দোষ ও গুণের প্রতীক,—তাকে বাদ দিয়ে রসভোগ করা যায় কিন্তু কাব্যের সম্যক্ আলোচনা চলে না।

পূর্ব্বকালে কবিদের কাজ অপেক্ষাকৃত লঘুভার ছিল। কাব্যের বিষয়বস্তু অনেকটা নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং কবিও সেই সীমাবদ্ধ চিন্তাধারাকে বিচিত্র ছন্দের ফ্রেমে বিলম্বিত করতেন। কিন্তু রূপ ও আয়তনের বৈচিত্র্য থাকলেও গতানুগতিক ভাব ও বিষয়বর্ণনে অনুলাপ অবশ্যম্ভাবী। অনুমোদিত রীতির প্রবর্ত্তনায় কাব্যের সজীবতা রক্ষা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু কালের বিবর্ত্তনে কাব্যের অভিব্যক্তি সাধিত হয়েছে। এখন কবিরা কাব্যের বহিরবয়ব স্থির রেখে নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন। কবিতার স্বপ্রতিষ্ঠ রূপের ভিতরেই তার ভাবগরিমা সঞ্চার করা যেমন প্রচলিত প্রথা, তা তেমনি সংগত ও সুনিপুণ কৌশল-সাপেক্ষ। 'অর্কেষ্ট্রা' কবিতাটি মনোনিবেশ করে পড়লে এ উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। এর বাহ্যরূপ একপ্রকার সুনির্দ্দিষ্ট, কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় এর দ্রুত ভাব-বিপর্য্যয়। কবি-প্রকৃতির স্বপ্ন ও বিভিন্ন চিন্তাধারার সাহায্যে এই শততন্ত্র কাব্য রচিত হয়েছে। যখন যে ধরণের খেয়াল কবির চিত্তে প্রবেশ করেছে, কবিতার বিষয়বস্তু সেই দিকে পরিচালিত হয়েছে। 'অর্কেষ্ট্রা' কবিতার আর একটি লক্ষণীয় বস্তু কবির ছন্দোবৈচিত্র্য এবং বদ্ধ পদাবলীর নবরূপ গ্রহণ। এ ছাড়া যে শব্দগুলি এ কবিতায় প্রযুক্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যে এমন বিশিষ্ট বর্ণবোধ আছে যা সত্যই নূতন। পূর্ব্বে কোনো কবি শব্দের মধ্যে বর্ণসুষমা এমন সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেন নি বলে আমাদের বিশ্বাস। এ কবিতাটীতে শব্দসম্পদের যথাযথ সন্নিবেশ ও আনুষঙ্গিক সংস্থান গর্ব্বের বস্তু। যখন সুর লঘু ও অনায়ত, তখন ভাষাও স্বল্প এবং সাবলীল, যখন সুর ধীর ও গম্ভীর তখন উদাত্ত ও সমস্ত পদের ব্যবহার ছন্দ ও ভাবের

অনুরূপ, আর তাতে যথেষ্ট সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে কবি একমাত্র ছন্দ ও শব্দের সাহায্যে তাঁর অর্কেষ্ট্রার সুরসাম্য রক্ষা করেছেন।

কিন্তু অনুনাদী সুরের ক্ষেত্রে কবি যতটা কৃতকার্য্য হয়েছেন, বিবাদী সুরের সৃষ্টি ও সংপ্রসারণে ততদূর হননি। মোটামুটি আর্কেষ্ট্রার রূপ ও ভাব তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু বিরোধী সুরের কর্কশতা তেমন সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হয় নি। কারণ, এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সব কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে পরুষ নিনাদের আওয়াজ ধরা পড়ে নি। তার বদলে সৃষ্টি হয়েছে কর্কশতার প্রতিভাস। সংস্কৃত শব্দ যতই দুরূহ ও দুরুচ্চার হোক্ না কেন, তাতে গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্তি আনে, পীড়া-দায়ক ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় না।

তা ছাড়া বিদেশী বাদ্যে গতি-বিন্যাসে বিরতি থাকে—ব্যাখার প্রয়োজন হয় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরান্তরকালে গতিরাগের বিলম্বিত ব্যাখ্যা আছে। সে যাই হোক্, এ কবিতায় রূপ ও রসের চিরন্তন দ্বন্দ্ব মিটল না। এই নানাভাবসম্পৃক্ত, বিভিন্ন সুরসমন্বিত কবিতাটাকে একটি নবতম দুঃসাহসিক পরীক্ষা বলেই গ্রহণ করব।

সুধীন্দ্রনাথ আসলে প্রেমের কবি। তাঁর কাব্যের প্রধান সুর হল প্রেমের বিচিত্র বিলাস। তীব্র ও দুঃসহ প্রেমের অনুরণনে কবির হৃদয় ও মন ঝঙ্কৃত। তার প্রকাশ কখনো নির্ম্মম ও নির্ব্বাধ, কখনো দ্বিধাদুর্ব্বল অর্দ্ধগতিতে, কখনো বা আভিমানিক বক্রোক্তিতে। এই দিক্ থেকে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কাব্যের সঙ্গে ক্যারোলাইন কবিগণের রচনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আরো গভীর, আন্তরিক ও ব্যাপক। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কেবল প্রেমের বুদ্ধিগত বিচার অথবা কেবল দেহগত সম্ভোগস্পৃহা চিত্রিত করেননি। চিন্তা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা, এদুয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে।

প্রেমের কবিতাগুলি সযত্নে পড়লে লক্ষ্য করা যায় যে, কবি-চিত্ত একটি বিরোধের সুরে বাঁধা আছে। একধারে 'অসভ্য অরণ্যবাসী আসুরিক তীব্র যৌবন' মদমত্ত হয়ে বিচরণ করছে। দুর্ব্বল বুভুক্ষু দেহ তীব্র আসঙ্গলিপ্সায় বেপথু। একটি অপ্রকাশিত কবিতায় কবি বলেছেন—

"আমারি মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।
প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।"

অপরদিকে দেহাতীত রূপসন্ধান কবিহৃদয়কে ব্যাকুল করেছে,—

"দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়
উপলব্ধি করেছিলো আঁধারের অলক্ষিত পটে
অধরার চিত্রল লিখন।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একদিকে মিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে নিগূঢ় বেদনাময় অনির্ব্বচনীয় বিরহের আনন্দ। একধারে মর্ত্ত্যপ্রেমসুলভ ভীষণ ঈর্ষা ও সংশয়, ছলনাময়ী মানবীর অফুরন্ত লীলাবিলাসে গভীর অনাস্থা, অপরপক্ষে 'সনাতন মুহূর্ত্তের তরে বিশ্ব-লুব্ধ ইন্দ্রত্বের টীকা' ও স্মৃতি-সঞ্চিত অমৃতলিপ্সা।

কোনো কোনো কবিতায় কবির আত্মশ্লাঘা ও দাম্ভিকতা বর্ত্তমান,—

"হায় গর্ব্বান্বিতা,

* * * •

ভাবো কি তোমারি লাগি
থাকি জাগি
অনাশ্বস্ত দিনমান, উৎকণ্ঠিত নিশা?"

আবার—

"তবুও নিশ্চয়
আমার উদ্ধত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমারি লাগি নয়।"

কিন্তু তাঁর কাব্যের সম্যক্ আলোচনা করলে দেখা যাবে—এ দাম্ভিক আস্ফালন কবির বাহ্য প্রয়াস।

"অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে' কবি-প্রেয়সীর চরণ-পদ্মে তাঁর উন্নত শির অবনত আছে।

"তবু চায় প্রাণ মোর তোমারেই চায়।"

কিংবা—

"লজ্জিত মূকতা
তাই ঢাকে দুঃসহ ধিক্কারে
বিপ্রলব্ধ হৃদয়ের দাম্ভিক বিলাপ।"

কবির আত্মম্ভরী অসূয়া, অহমিকা-পূর্ণ সংক্ষুব্ধ চিত্ত প্রশান্ত আত্মবিলোপ ও সমর্পণের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

'অর্কেষ্ট্রা'র অনেক কবিতাতেই সুধীন্দ্রনাথের ক্ষণিক-বাদের পরিচয় পাই।

প্রথম কবিতাতেই আছে—

"নিমেষের আত্মবোধ, নিমেষের অধৈর্য্য অবল,
অখণ্ড-নির্ব্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন।"

ক্ষণিকার ক্ষণস্থায়ী প্রেম ক্ষণিকের গানে উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু তারি মধ্যে ফুটে উঠেছে অরূপ, অবিনশ্বর প্রণয়ের অভীপ্সা।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হ'লে তাঁর প্রণয়-কবিতার প্রতীক 'মহাসত্য' কবিতাটি ভালো করে পড়া উচিত।

কবির কাব্য এতদূর আলোচনা করে মনে হল বিশ্লেষণে কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখানো যায় কিন্তু রসোপভোগ অনেক দূরে পড়ে থাকে। বিচক্ষণ পাঠক লক্ষ্য করবেন যে কবিতাগুলিতে আধুনিক মনন-ক্রিয়া বর্ত্তমান থাক্‌লেও তাতে চিরন্তন ভাবের প্রেরণা আছে। তবে কবির অদৃষ্টার্থ কবিতাগুলি অতটা সাফল্যলাভ করেনি যতটা করেছে তাঁর প্রেমের কবিতা। কারণ আধুনিক চিন্তাজগতের সংস্পর্শে এসেও কবি এমন একটা স্থায়ী সত্যের ভিত্তি খুঁজেছেন যার জন্য তাঁর রচনায় প্রকাশভঙ্গীর নূতনতাসত্ত্বেও স্থিতিশীল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ত অন্বীক্ষণ-বৃত্তিই তাঁকে প্রকৃত কবি করেছে—নিঃসম্পৃক্ত দার্শনিক করে তোলেনি। আবহমান শিক্ষা ও সংস্কারের উপর নব বৈদগ্ধ্যের আলোক সম্পাত—এইটাই হল সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনা-প্রসঙ্গে যদি আমরা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বহুল প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী করি, তাহলে কবি-প্রতিভার পরিহাস করা হবে। কারণ, প্রথমতঃ কবিতাপুস্তকের সাধারণ সমাদর আমাদের দেশে অনেক কারণে সুলভ নয়। দ্বিতীয়তঃ সুধীন্দ্র-নাথের কাব্য সে জাতীয় রচনা নয় যা আমরা অনায়াসেই আয়ত্ত করতে পারি। তাঁর কাব্য-প্রতিভায় যে সবিশেষ স্বকীয়তা আছে তার যথাযথ মূল্য বিচারের জন্য সশ্রদ্ধ মনোনিবেশের প্রয়োজন ত আছেই, উপরন্তু সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির উদ্বোধন আবশ্যক। এই কারণেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে সুধিজনের অধিকার। যদিও এযাবৎ তাঁর দুখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে নবীন কবির আখ্যা সাজে না। তিনি অভিজ্ঞ কবি—তাঁর মন বিচিত্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট। তাঁর কাব্যে একদিকে পরিণত চিত্তের গম্ভীর সারবত্তা, অপর দিকে তরুণ মনের হৃদয়াবেগ ও মানসিক সংক্ষোভ। যাঁরা সুধীন্দ্রনাথের নাম কেবল সম্পাদক হিসাবে অবগত আছেন, তাঁরা বিস্মিত হবেন তাঁর সম্পূর্ণ নূতন ও নিজস্ব কাব্যের নিদর্শন পেয়ে। 'পরিচয়' সম্পাদনাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। পরম নিরীহ বিষ্ণুর মত নির্ব্বিবাদ দায়িত্ব-পরিচালনা অথবা নিষ্ক্রিয় গোষ্ঠীপালন তাঁর একমাত্র করণীয় নয়। চতুর্ম্মুখের ন্যায় তিনি সৃষ্টিও করেন এবং সে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রজাপতির নিঃসঙ্গ মনোবেদনা, কৌতূহলী পরীক্ষণ, আবার মর্ত্ত্যোচিত মানবীর আসঙ্গ-লিপ্সাও তীব্রভাবে বিদ্যমান।

———*———

ঢেউ

শ্রীমণি দত্ত

পেছন থেকে ডাক শুনে মিহির ফিরে তাকাল। অত্যন্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে সে চলেছিল,—রাসবিহারী এভিন্যুর পাশ দিয়ে যে ছোট একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে সেইটের ওপর দিয়ে। এখানে সে থাকে না,—থাকে সার্কুলার রোডে—এসেছিল বেড়াতে। এ জায়গাটার ওপর তার বেশ একটু মায়া পড়ে গিছল। মহানগরীর অশান্ত কোলাহল নেই। গ্রামের গভীর নিস্তব্ধতাও এখানে নেই। বেশ পরিষ্কার ছোট রাস্তা, দূরে দূরে ছোট ছোট সুন্দর বাড়ী,—ছবির মত। দুপাশে ঘন গাছের সারি,—গভীর রহস্য যেন বিরাজ করছে প্রত্যেক জায়গায়। মিহির তাই অবাক হয়ে গিছল কে এমন জায়গায় তাকে ডাকতে পারে,—স্পষ্ট তার নাম উচ্চারণ করে!

দেখলে একটী মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়ে? বিশেষ কোন মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা মিহির মনে করতে পারল না। মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেল, এইত সে দিন খবরের কাগজে দেখল,—লেকের কাছে কোন্ মেয়ে একটী ছেলেকে মিথ্যে তাকে অনুসরণ করছে মনে করে বেশ অপমান করেছে। তাই নাকি? কিন্তু সে ত কোন মেয়েকে দেখেনি,—না তার অন্যমনস্কতার জন্য ওই রকম কিছু হয়ে গেছে? নাম জানবে কি করে? মেয়েটী কাছে এসে বললে; বেশ ত, আমাকে দেখেও দেখলেন না? আমার ঠিক পাশ দিয়েই আপনি এলেন, তবু আমার সঙ্গে কথা বললেন না কেন?

মিহির চিনতে প্রথম পারে নি,—তারপর চিনল শীলাকে। সে শীলার সহপাঠী ছিল—একসঙ্গে দুজনে বি, এ, পড়েছে। মিহির উত্তর দিলে: বিশেষ ভাবে কোন মেয়েলোকের দিকে চেয়ে অপব্যয় করবার মত সময় নেই। তারপর এখানে কোথায়?

—ওই যে আমাদের বাড়ী! চলুন না অনেকদিন যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ হয় না! একটু গল্প করা যাবে…… শীলা বললে।

—মাপ করবেন,—আমার সময় হবে না—গল্প করবার ইচ্ছে থাকে, লেকের ধারে একটু যাব, সেখানে গেলেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। মিহির উত্তর দিলে।

শীলা হেসে বললে—একটুও বদলাননি দেখছি—আগের মতই আছেন।

—বদলাবার বয়স হচ্ছে স্কুল থেকে কলেজে ঢোকবার সময়টা। তখনই যা' একটু বদলেছি, আর বদলাবার দরকারও হয়নি—আর ইচ্ছেও নেই।

মিহির লেকের দিকে এগিয়ে চলেছে,…শীলা পাশাপাশি চলতে লাগল! শীলার বয়স একুশ কিম্বা বাইশ হবে। পরণে সাদাসিধে একখান কাল পাড় শাড়ী। হাত পর্য্যন্ত ঢাকা ব্লাউজ,—পায়ে একজোড়া অত্যন্ত কমদামী জুতো। শাড়ীখানা বেশ ভদ্রভাবে গায়ে জড়ান। মেয়েদের থেকে একটু বেশী বলিষ্ঠ এবং লম্বা।

মিহিরের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে হাতগোটানো একটা লংক্লথের সার্ট। অনেক দূর থেকে, বহু জনতার মাঝে তার চেহারাটা আগে লোকের চোখে পড়ে।

লেকের একটা কোণে এসে দুজনে বসল। মিহির চুপ করেই ছিল, কথা বলতে বলতে প্রায়ই হয়ে পড়ছিল অন্যমনস্ক। শীলা ছোট মেয়ের মত অবিশ্রান্ত কথা বলে চলেছিল। সহপাঠীরা কে কি করছে?

মিহির শুধু এস, এ, পড়ছে কেন?—ল' নিলে না কেন? —ইত্যাদি। মিহির সঙ্ক্ষেপে উত্তর দিয়ে চলেছে। এমনি কথা বলতে বলতে তারা এমন একটা জায়গায় এসে পৌছল, যেখানে কথা একেবারে থেমে যায়, আর যেন বলবার কিছু নেই। এমনি যখন অবস্থা, মিহির পকেট থেকে একটা সিগরেট বের করে বললে: সিগরেট খেলে আপনার কি বিশেষ অসুবিধা—

কথাটা টেনে নিয়ে শীলা বললে: মোটেই না, সিগরেটের গন্ধ আমার বেশ ভাল লাগে!

মিহির একমনে বসে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সিগরেটটা শেষ করে ফেলল। শীলা চুপ করে ছিল, সে যেন আরও কিছু বলতে চায়, আরও অনেক কিছু যেন মিহিরের কাছ থেকে জানতে চায়। কিন্তু কি যে বলতে হবে তার ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল তাদের মাঝে,—দুজনেই চুপচাপ্। মিহির যেন ভুলে গেছে তার পাশে একটী মেয়ে বসে আছে।

মিহিরের এবার চমক ভাঙ্গল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে: এবারে উঠতে হয়, আমার কাজ আছে।

—আর একটু বসুন না, এইত সবে সন্ধ্যে হয়েছে। —শীলা বললে।

মিহির প্রতিবাদ করে উঠল—অনেকক্ষণ ত বসে আছি, আর দরকার নেই।

শীলাকেও উঠতে হয়। উঠে বলে: আপনাকে আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসার ছিল, কিন্তু আপনার কাজ আছে—

হ্যাঁ, কাজ আছে। কাজ না থাকলেও বোধহয় আর বেশীক্ষণ বসতে পারতুম না। মেয়েদের সঙ্গে এর বেশী সময় কথা বলে কাটান যায় না—মিহির কথাটা টেনে নিয়ে বললে।

শীলা মুখের গোড়ায় হাসি এনে বললে: আমি আপনার সঙ্গে আরও কতক্ষণ আলাপ করতে চাইছি পুরুষ বলে নয়,—শুধু অনেকদিন পরে দেখা হল বলে।—হ্যাঁ, যদি সময় করতে পারেন, আসবেন কি আমাদের এখানে?

মিহির উত্তর দিলে, চেষ্টা করব, তবে ঠিক কথা দিতে পারলুম না—তবে আসব কোনদিন। আর একটা কথা—আপনার স্বামীর সঙ্গে পরিচয়টা সে দিনই করে যাব।

শীলা হো হো করে হেসে উঠল: স্বামী কোথায় পাব? আমার মাঝে বিয়ের কি লক্ষণ দেখলেন আপনি? মাথায় ঘোমটা নেই, হাতে শাঁখা নেই, কপালে সিঁদুর নেই—কি দেখে হঠাৎ ওরকম অদ্ভুত একটা কল্পনা করলেন?—শীলা আবার হাসতে লাগল।

—হয় নি নাকি? বিশেষ দুঃখিত—মিহির ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিলে।

শীলা হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল—দুঃখিত? কিসের জন্যে, বিয়ে না হওয়ার জন্য, না ভুল করে ফেলার জন্য?

—যেটা হোক্ ধরে নিতে পারেন,—আচ্ছা আসি, নমস্কার।—মিহির হন্ হন্ করে পা চালিয়ে চলে গেল। একবার ফিরেও শীলার দিকে তাকাল না।' শীলা অনেকক্ষণ মিহিরের চলার পথের দিকে চেয়ে রইল,—তারপর নিজের বাড়ীর দিকে চলল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তলায় আবার দুজনের দেখা। শীলা মিহিরের দিকে এগিয়ে ডাকলে: শুনচেন?

মিহির ফিরে জিজ্ঞাসা করলে: কি—কি বলছেন?

—যাবেন বলে আরত আমাদের ওখানে গেলেন না?

মিহির উত্তর দিলে: ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে, —মনে ছিল না আপনার কথা, তা না হলে বোধহয় দেখা করতে পারতাম। এর মাঝে অনেকবার ওদিকে গিয়েছিলাম!

—এবার একটু মনে রাখতে চেষ্টা করবেন—শীলা হেসে বললে!

মিহির উত্তর দিলে—দেখা যাক।

চলতে চলতে মিহির ও শীলা মেয়েদের ওয়েটিং রুমের কাছে চলে এসেছিল। শীলা বললে: আসুন ওখানে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করা যাক্।

বাধা দিয়ে মিহির বললে : না না ওখানে নয়। ওখানে গল্প করলে মেয়েরা এমনভাবে ভিক্ষুকের মত চেয়ে থাকবে, আমি তা' দেখতে পারব না, হয়ত কেউ কেউ দরজার আড়ালে কাণ পেতে শুন্‌তে চেষ্টা করবে আমাদের কথা।

শীলা একটু ভেবে নিয়ে বললে : মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার এরকম ধারণা কেন ?

—সত্যি বলে—মিহির নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিলে।

শীলা বললে—পুরুষ ও মেয়ে : দুদলের মাঝে খারাপ ভাল আছে। পুরুষদের মাঝে এরকম ধরণের লোক বেশ আছে। শুধু শুধু মেয়েদেরকেই আপনি দোষী করছেন !

মিহির হাসল : তর্ক করবার বিশেষ আমার সময় নেই,—তা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করবার মত ধৈর্য্য আমার নেই। যাদের বোঝবার ক্ষমতা আছে তাদেরকে বোঝান চলে,—কিন্তু যাদের সে ক্ষমতা নেই তাদেরকে যে বোঝাতে যায় সে মূর্খ।—ক্লাশের সময় হয়ে গেছে, চল্লাম।—

মিহির চলে গেল। শীলার সুন্দর মুখ অপমানে কালো হয়ে উঠল। মিহিরের স্বভাব সে জানে,—বি-এ, পড়বার সময় থেকে ঠিক এই রকমই সে দেখে আসছে। কিন্তু মিহিরের ঔদ্ধত্যকে শীলা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। মেয়েদের এই অকারণে অপমান করবার তার কি অধিকার আছে ?—এ সুযোগ শীলা নিজেই তাকে দিয়েছে। কি দরকার ছিল ওর সঙ্গে এরকম ভাবে যেচে আলাপ করবার। না, এর প্রতিশোধ শীলাকে নিতেই হবে। পুরুষরা সব সাধু! রাস্তায়, বাসে, কলেজে কোথায়ও ওদের জ্বালায় চলা যায় না। একসঙ্গে একশ'টা চোখ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে। বাসে পাশে বসতে দিলে—বসবার সাহস নেই—এদিকে চুরি করে অভদ্রভাবে চাইতে মজবুত।...কোন ছেলের কাছে একদিন যদি নোট চাও তাহলেই পেয়ে বসল—রোজ যেচে আলাপ করা চাই। রাস্তায় দেখা হলে আর রক্ষে নেই ; —কোথায় যাচ্ছেন ?—কেমন আছেন ?—আরও কত কি জিজ্ঞেস করে বসবে।—শীলা মনে মনে ভীষণভাবে গজরাতে লাগল। অস্থিরভাবে ওয়েটিং রুমে ঢুকে, সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। কি করলে যে মনে শান্তি পাবে বুঝতে পারছে না। এখুনি একটা ক্লাস আছে—শীলা ক্লাসে যাবে না ঠিক করে ফেলল।—লেক্‌চারই যদি না শোনা হয়, তাহলে ক্লাসে গিয়ে লাভ কি ?—ছেলেদের চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি দেখবে ?—শীলা বইগুলো ঠিক করে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে একবারে একতালায় নেমে এল। নামবার সময় মিহিরকে দেখতে পেল,—সিগরেট টানতে টানতে ওপরে উঠছে। শীলার একেবারে গা ঘেঁসে মিহির ওপরে উঠে গেল,—একবারও শীলার দিকে তাকাল না। দেখতে পায়নি নিশ্চয়—শীলা ভাবলে : হয়ত দেখেছে, ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে চলে গেল। শীলা উঠে পড়ল একটা ট্রামে। সারা রাস্তা কিছুতেই এই অপমান সে ভুলতে পারল না। না, আর যেচে কথা বলা হবে না—শীলা মনস্থির করে ফেলল।

ভোরের মিঠে বাতাস ঘরে ঢুকছিল—শীলা টেবিলটার কাছে একটা চেয়ারে বসেছিল। একটু আগে ব্যায়াম করেছে—সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা। শীলার সুন্দর অবয়ব—সুন্দরতর দেখাচ্ছিল। তার ঘরে আসবাবের বাহুল্য নেই। একটা আলমারীতে অনেকরকম বই রয়েছে। সুন্দর ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় !

শীলা দূরে একটা বাগানের দিকে তাকিয়েছিল। মনটা তার দূর হতে দূরান্তরে ভেসে চলেছে ! বেয়ারা ঘরে ঢুকে খবর দিলে কোন এক বাবু দেখা করতে চায় তাঁর সঙ্গে ! শীলা ভাবতে পারছিল না—এত সকালে কে আসতে পারে ? কারু আসবার ত কথা নেই। শীলা বেয়ারার সঙ্গে নীচে নেমে গেল !—মিহির বাইরের ঘরে একটা কোচে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে ছিল—হাতে একটা জলন্ত সিগরেট !

তার দিকে চাইলেই বেশ বোঝা যায় সে অত্যন্ত ক্লান্ত ! শীলা অবাক হয়ে গিছল,—এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে যে মিহির আসবে শীলা তা' ভাবতে পারে নি—! শীলা এগিয়ে এসে বললে : নমস্কার মিহির বাবু —যাক্ এবারে যে ভুলে যান নি, এটাই ভাগ্য !

মিহির প্রত্যভিবাদন করে বলল : না সকাল বেলা উঠেই আপনার এখানে এলুম।

—ওপরে চলুন।—শীলা বললে।

—হ্যাঁ চলুন।—মিহির উঠে শীলার পেছন চলল। যে ঘরটায় এসে মিহিরও শীলা ঢুকল,—সেটা আধুনিক রুচিমত বেশ সুন্দরভাবে সাজান। চারিদিকে চোখ বোলালে গৃহকর্ত্তার ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিহির নিজের হাতের সিগরেটটার দিকে তাকিয়ে বললে : মাপ করবেন—এতক্ষণ সিগরেটটার কথা মনেই ছিল না। গৃহকর্ত্তার বিনা অনুমতিতেই অবাধে ধূমপান করে চলেছি—হয়ত করছি এমন একটা ব্যাপার যেটা আমাদের সমাজে বাধে !

শীলা বললে : আপনি নির্ব্বিঘ্নে সিগ্‌রেট খেতে পারেন, গৃহকর্ত্তা এবিষয়ে বেশ উদার। সিগ্‌রেট খেলে এমন কিছু একটা মহাপাতক হয় না যা বাবা সহ্য করতে পারবেন না। আমার বাবা অত্যন্ত আধুনিক—সেদিকে আপনার কোন ভাবনা নেই !

শীলা পূর্ব্বদিনের কথা অনুসারে কিছুতেই মিহিরকে আঘাত করতে পারছিল না,—অবকাশও পাচ্ছিল না ! মিহির চেয়ারে এলিয়ে বসে গভীর মনযোগের সঙ্গে ধূমপান করছিল। শীলা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মিহিরের সামনে বসল। মিহির এবার কথা বলল :—আজ হঠাৎ কেন যে আপনার এখানে এলাম, বলতে পারছি না। মেয়েদের সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ করতে আমার ইচ্ছে হয় না, আর আলাপই বা কিং করব ? কথা বলতে বলতে সেই এসে উপস্থিত হতে হবে পুরানো গতানুগতিক স্থানে,—কোন লোকের নিন্দায় বা কারু প্রশংসায় আপনারা হয়ে উঠবেন উচ্ছ্বল। শীলা বললে : আপনার মেয়েদের সম্বন্ধে একটা অন্ধ ধারণা রয়েছে। হয়ত মিশেছেন যে ধরণের মেয়েদের সঙ্গে, তাদের রুচি চলাফেরা আপনার পছন্দ হয়নি। কিন্তু এ ধারণা আপনার একদিন বদলাতে হবে।

মিহির জোরে হেসে উঠল : না কোনদিন আমার ধারণা বদলাবে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের মেয়েদেরকে আমি দোষ দিই না। তারা শিখবেই বা কি ? স্কুল কলেজে পড়বার সময় করে শুধু নোট মুখস্ত। খুব জোর শেখে, কতগুলো বড় বড় লোকের, বড় বড় লেখকের নাম—হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে নোবেল প্রাইজ পাওয়া কতকগুলো বই !—আর একটা জিনিস খুব ভাল করে শেখে,—সে হচ্ছে ফ্যাসান। কি রকম ভাবে চাইলে—জোয়ান্ ক্রফোর্ডে'র মত দেখায়, কি রকম ভাবে চললে মনে হয় গ্রেটা গার্ব্বো,—কি রকম মুখভঙ্গী করলে মনে হয় মার্লিন্ ডিয়েট্রিচ্।

তাদের কথা ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হল—সেই পুরুষ ও নারীর পর্য্যায়ে।...কিন্তু কথাটা চাপা পড়ে গেল—বয় ঢুকল এসে ঘরে চা খাবার ইত্যাদি নিয়ে। শীলা নীজে চা তৈরী করে মিহিরের দিকে এগিয়ে দিল, ট্রে থেকে তুলে দিল এক প্লেট খাবার। মিহির কোন আপত্তি না করে খাবার ও চায়ের সদ্ব্যবহার করতে লাগল !

বেলা এদিকে বেড়ে এল। মিহিরের মিঃ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। বেশ, সুন্দর, উদার প্রকৃতির লোক এই মিঃ রায়। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে বললেন : বিয়েটা দরকার নিশ্চয়—কিন্তু সকলের পক্ষেই যে সেটা নেহাৎ দরকারী তা' নয়। আমার মেয়ে বোধ হয় বিয়ের প্রয়োজন মনে করছে না, তাই বিয়ে করছে না। যেদিন প্রয়োজন মনে করবে, সেদিন আমায় বলতে কোন কুণ্ঠা বা লজ্জা পাবে না। আমি বাংলা দেশের বাপদের মত মেয়েকে বিয়ের বাজারে চলতি করবার জন্য লেখা পড়া শেখাইনি বা ডিগ্রির বোঝা চাপাইনি। আমি মেয়েকে সত্যিকার শিক্ষা পাবার জন্যই লেখাপড়া শেখাচ্ছি !

মিঃ রায় মেয়েদের সম্বন্ধে, বর্ত্তমান সমাজ, নারী

প্রগতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। মিহির হল খুব খুসী, দেখলে, তার মত ঠিক্ মিলে যায় মিঃ রায়ের মতের সঙ্গে! বিদায় দিয়ে আর একদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিহির চলে গেল! শীলা একটা স্যান্‌ডেল পায়ে দিয়ে তাকে রাসবিহারী এভিন্যু পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল, বললে: এর পর আসছেন ত?

—নিশ্চয়—মিহির বললে: অন্তত আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করবার লোভেও আসব।

পরিচয়ের ঘন কুয়াসাটা হয়ে এল পাতলা। মিহির ও শীলা এসে নেমে পড়েছে আত্মপরিচয়ের লঘুতায়! মিহির প্রায়ই শীলাদের বাড়ীতে আসে। মিঃ রায়ের সঙ্গে করে গল্প, শীলার সঙ্গে খেলে টেনিস, আবার কোনদিন লেকের একটা কোনে বসে গল্প করে!

দিনটা রবিবার, কি এমনি একটা ছুটীর দিন। মিহির শীলার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছিল। ঠিক শীলা নেমন্তন্ন করেনি, করেছিলেন মিঃ রায়। শীলা মিহিরকে চেনে, জানে তার নেমন্তন্ন প্রত্যাখান করতে মিহিরের একটুও বাধবে না। তাই মিহিরের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এমনিভাবে নেমন্তন্ন করলে। সারাটা দুপুর গল্প গুজবের মাঝে কাটিয়ে মিহির ও শীলা লেকের ধারে এসে বসল। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল,—মিহির ও শীলা খুব কাছাকাছি বসেছিল! মিহির সিগ্রেট টানছিল, শীলা একটা কাঠি নিয়ে ঘাসের ওপর ইচ্ছামত রেখা টেনে চলেছিল।

সন্ধ্যা নেমে এল,—কালো পরদার মত অন্ধকার সমস্ত লেকের বুক জুড়ে বসল। শীলা বললে: কি মিহির, কথা বলছ না যে?

—কি বলব শীলা—মিহির উত্তর দিলে।

—কেন কথা বলবার কি কিছুই নেই—!

—আছে বই কি?—তবে প্রথম তুমিই আরম্ভ কর।

আবার তারা থামল। দুজনেই যেন কি ভাবছে। শীলা কি যেন বলতে চায় কিন্তু সে প্রকাশ করবার ভাষা খুজে পাচ্ছে না। শীলা মিহিরের আরও কাছে ঘেঁসে বসল। মিহিরের একটা হাত টেনে নিয়ে, আঙ্গুলগুলো নাড়া চাড়া করতে লাগল। মিহির কোন আপত্তি করল না। আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে শীলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা মিহির, জীবনে কোন মেয়েকে ভালবেসেছ?

—মিহির হো হো করে হেসে উঠল: মেয়েদেরকে ভালবাসা—? তাদের ভালবাসার মত কি আছে?—তাদের মন বলে কোন পদার্থ নেই তাদের মন ঠিক আয়নার মত, যখন যার ছায়া পড়ে তখন তারই প্রতিচ্ছবি জাগে। আনন্দের খোরাক জোগাবার মত তাদের মাঝে কিছু আছে বলে মনে হয় না। যাকে ভালবাসব তার সঙ্গ সব সময়ই আনন্দ দেবে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গ আমায় বেশীক্ষণ আনন্দ দিতে পারে না।

শীলা বললে: তাই কি? মেয়েদের মঝে কি এমন কিছুই নেই যা' দিয়ে তারা পুরুষের আনন্দের খোরাক জোগায়?

মিহির বাধা দিয়ে বললে: না, আমি সমস্ত পুরুষদের কথা বলছি না,—বলছি আমার নিজের কথা! তবে—

তবে কি?—শীলা মিহিরের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—না, কিছু না।—মিহির উত্তর দিলে, তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা তুমি কি কোন দিন কোন পুরুষকে ভাল বেসেছ?

শীলা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল না। স্বাভাবিক গলায় বললে: হ্যাঁ জীবনে একটা ভুল করেছিলুম। ঠিক ভালবাসা নয়, ভাল লেগেছিল—বোধহয় হয়েছিল একটু মোহ! পুরুষদের ভাল লাগে সত্যি, কিন্তু ঠিক পুরুষ হলেই লাগে! গতানুগতিক ছেলেদের আমি ঘৃণা করি,—তারা নারীর ভালবাসা চায়, ঠিক ভালবাসবার জন্য নয়—নারীর প্রতি পুরুষের যে চিরন্তণ একটা আকর্ষণ আছে তারই জন্য!—এবার শীলা একটু থামল, মিহির আগ্রহসহকারে শীলার কথা গুলো গিলে চলেছিল। শীলা মিহিরের দুর্ব্বলতা বুঝতে পারল। আজই প্রথম বোধহয় মিহির একটু আগ্রহান্বিত হয়েছে একজন নারীর ভালবাসার, ভাললাগার সেই পুরাণো পুনরাবৃত্তি শুনবার জন্য। শীলা আবার আরম্ভ করল: জীবনে চলার পথে এমনি জ্যোৎস্না রাতে, নির্জ্জন গৃহকোণে কিম্বা লেকের ধারে অনেক পুরুষই কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলেছে: আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তাদের কথায় উত্তর দিয়েছি একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে। তাদের ভালবাসা ছিল,—শুধু সেই মুহূর্ত্তের জন্য। কিন্তু বি, এ, পড়বার সময় আমাদের ক্লাশের একজনকে ভাল বেসেছিলাম। তাকেই আমার নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করবার অধিকার আমি পাইনি। নানারকমে তাকে আমার সাহায্য দিতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তার কাছে পেয়েছিলাম একটা নিদারুণ অবজ্ঞা। তাকেই আমি তখন ভালবেসেছিলাম—ঠিক ভালবাসা যাকে বলে। আজও তাকে ভালবাসি ঠিক বন্ধুর মত, এখনও তাকে ভাল লাগে!

মিহির হেসে জিজ্ঞাসা করলে: যাকে তুমি ভালবেসেছিলে সে আমারও সহপাঠী ছিল—তার নামটা জানতে পারি কি? যদি কোন আপত্তি না থাকে অবশ্য!

শীলা হেসে উত্তর দিল: নিশ্চয় শুনতে পার, তার নাম হচ্ছে মিহির সেন।—চমকে উঠলে নাকি?

—না একটুও চমকাইনি—এর আগে এরকম কথা আরও শুনেছি। মিহির হো হো করে হেসে উঠল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। শীলা মিহিরের গা ঘেঁসে জিজ্ঞাসা করলে: আচ্ছা তুমি যা' হারিয়েছ তার জন্য কোনদিন আপশোষ করবে না ত? জীবনের ঠিক সেই অপরূপ মুহূর্ত্তটীর কথা কি একদিনও ভাববে না?

—না। মিহির বললে: তুমি আমায় ভালবেসেছিলে বলে কোনদিন তোমার স্মৃতি আমার মনের পাতায় লেখা থাকবে না—থাকবে শুধু তোমায় আমি বান্ধবী ভাবতে পেরেছি বলে, আর তুমি আমায় বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পেরেছ বলে।

শীলা গভীর আনন্দে দুখানি সুন্দর হাত দিয়ে মিহিরের গলাটাকে জড়িয়ে ডাকল: বন্ধু?

মিহির শীলার লতার মতন শরীরটী নিজের আরও কাছে টেনে নিয়ে স্নেহআবেগমাখা সুরে ডাকল—বান্ধবী।

—:০:—

স্মৃতি

ক্যাপ্টেন্ ৺সুকুমার সান্যাল

বীণাটি গিয়াছে ভাঙ্গি; ছিন্ন তন্ত্রীগুলি
শিথিলিত; তবু আজো বুঝি বারে বারে,
তাহারি রাগিণী গান ফুলি ফুলি ফুলি,
ফিরিতেছে ঝঙ্কারিয়া তারি চারি ধারে।

প্রদীপ হয়েছে চূর্ণ শত খণ্ড ভাগে,
মৃতপ্রাণ; তবু তার যত রশ্মিরাশি,
ঘুমন্ত কক্ষের মাঝে আজো যেন জাগে,
আঁধারে সহসা যেন উঠিতেছে হাসি।

রজনী গিয়াছে চলে, সাথে সাথে তার
নিয়ে গেছে স্বপ্নময়ী শান্ত জ্যোৎস্নায়,
তবু রেখে গেছে তার অশ্রু-উপহার,
সঞ্জীবনী স্মৃতিরূপে শিশির-কণায়।

তুমি যদি যাও চলে দুঃখ নাহি তায়,
সাথে সাথে স্মৃতি তব যদি নাহি যায়॥

———

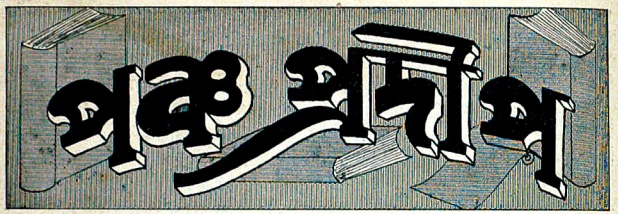

রসেটি সন্দর্শনে

হল্ কেন্

কবি শিল্পী রসেটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এক শরৎ-সন্ধ্যায়। শরীরটা কিছুদিন থেকে বেশ ভাল যাচ্ছিল না। তাই মনে করছিলুম বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে দক্ষিণ উপকূলের ওদিকটা একবার ঘুরে আসা যাক্। চিঠিতে রসেটিকে লিখে দিলুম লণ্ডন হয়ে যাবার সময় তাঁর অনেকবারের আকাঙ্ক্ষিত নিমন্ত্রণটা এবার রাখবো মনে করেছি। ফেরৎ ডাকে দুখানা চিঠি এলো। ডাকঘরের ছাপ দেখে বুঝলুম ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে চিঠি দুখানা পরপর ডাকবাক্সে দেওয়া হয়েছে।

একখানায় তিনি লিখেছেন—"যখন সহরে আসবে তখন আমার সঙ্গে দেখা করলে সত্যিই খুশী হবো। সহরের নির্জ্জন কোণে আমার যে বাড়ী আছে সেটা তুমি ঠিকই চিনে নেবে। দু'একটা কবিতাও তোমাকে শোনাবো মনে করছি। ব্রাউনের কাছে তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তোমাতে আমাতে নিশ্চয় মিল হবে।"

আর একখানায় তিনি লিখেছেন "আমার ইচ্ছে সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে আটটায় তুমি এখানেই খাও, আর সন্ধ্যেটা আমার এখানেই কাটাও।

পুনশ্চ—খাওয়া দাওয়ার সময়ে দুজনে মন খুলে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে। ছবি আঁকা শেষ করে খাওয়াটা সাধারণতঃ আমি ষ্টুডিয়োতেই সেরে নিই।"

তখনো চেন্-ওয়াক আমার কাছে এক রকম অচেনা জায়গাই ছিল। খালি শুনেছিলুম সাহিত্যিক জগতে সুপরিচিত অনেক লেখক লেখিকা এই রাস্তার ওপর বাস করেন। এই জায়গাটি পরে ছবিতে যেমন সুন্দর রূপে ফুটেছে তখনো চেন্-ওয়াক তেমন সুন্দর-ভাবে গড়ে ওঠেনি। অনেক বাড়ীর লাগাও বাগান আর বাঁধ চেন্-ওয়াককে বড় রাস্তা থেকে তফাৎ করে রেখেছিল। এতে জায়গাটির নিজস্ব সৌন্দর্য্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তবু তার মধ্যে প্রাচীন সৌন্দর্য্যের এখনো যেটুকু ছিল তা পাশাপাশি নতুন গড়ে ওঠা জায়গাগুলি থেকে চেন্-ওয়াককে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছিল। জায়গাটিতে ছায়াশীতল, নদীসন্নিকটবর্ত্তী গীর্জ্জার নিঝুম একটি ভাব ছিল।

মিঃ ক্রসের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর জর্জ্জ ইলিয়ট সবে চেন-ওয়াকের ৫নং বাড়ীতে বাস করতে সুরু করেছেন। চেন্-ওয়াকের দুটো গলি পরে পশ্চিম দিকে একটা রাস্তার ৫নং বাড়ীতে কার্লাইল তখনো বাস করছিলেন। চেন-রো থেকে একটু তফাতে ছোট একটি কুটীরে শিল্পী টার্ণার শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। রসেটি থাকতেন ১৬নং বাড়ীতে।

চিঠিতে বাড়ীর যেমন বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন বাইরেটা তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। মনে হোল চেন-ওয়াকে এইটিই সব চেয়ে পুরোণো বাড়ী। স্থাপত্য

সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল বাড়ীর মোটা মোটা থাম, উঁচু ভারী ফটক আর রেলিঙ দেখে বুঝলুম—এক কালে এ তল্লাটে এইটিই একমাত্র বাড়ী ছিল। বাড়ীর লাগাও জমীতে এখন অবশ্য আশপাশে অনেক-গুলি বাড়ী তৈরী হয়েছে।

বাড়ীটি রাণী এ্যানের যুগের সাদাসিদে ধাঁচে গড়া। কিন্তু বেখাপ্পা ধরণের কতকগুলো জানলায় তার আদৎ ধাঁচ অনেকটা বদলে গেছে। ইটগুলো খসে খসে পড়ছে, জানলা, দরজার রঙ চটে গেছে, জানলায় কতদিনের ধুলো জমে আছে, কোণে ঝুলও দেখা যাচ্ছে, বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির পাশে আর বাগানের রাস্তায় পাতা টালির উপর শ্যাওলা পড়ে গেছে; টালির ফাঁকে ফাঁকে আর রাস্তার আশপাশে আগাছা গজিয়েছে, জানলা, দরজার ফাঁকগুলো বাদে সারা বাড়ীর দেওয়ালে জড়াজড়ি করে এমন আইভিলতা গজিয়েছে যাতে মনে হয় জন্ম থেকে গাছগুলোর ছাঁটাই কোনদিন হয় নি।

শরৎকালের যেদিন বৈকালে রসেটির বাড়ী আমি প্রথম যাই সেদিন এই শিল্পী-কবির বাড়ীর এমনি চেহারাই আমার চোখে পড়েছিল। ভয়ে ভয়ে চৌকাট পার হয়ে যখন হলের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম তখন ভেতর-বাইরের কতকটা মিল, কতকটা অমিল আমার নজরে পড়লো। হলের মেঝে একদিকে যেমন বড়-মানুষী ধাঁচে শ্বেতপাথরে মোড়া, অন্যদিকে তেমনি ছেঁড়া সাধারণ মাদুরে ঢাকা। হল থেকে বাইরে যাবার তিনটে দরজা। দুদিকের দুটো দরজার সামনে দুটো বারান্দা আর একটা হলের লাগাও শিল্পীর ষ্টুডিয়োতে প্রবেশ-পথ। এদিক ওদিক তাকিয়ে সিঁড়ি কোথাও দেখলুম না। বাইরে থেকে সামান্য আলো যা ঘরের মধ্যে আসছিল তা ওই বারান্দার দিকে দরজার মাথায় বসানো কাচ দিয়ে।

যা একটু সময় হলে একলা দাঁড়িয়েছিলুম তাতে এই জিনিষগুলি আমার নজরে পড়লো। রসেটির বাড়ী দেখে প্রথম যা আমার মনে হয়েছিল তাতে বুঝে-

ছিলুম, ও বাড়ীতে স্ত্রীলোক কোনদিন বাস করেনি। বাড়ীর অধিবাসী একটিমাত্র পুরুষ—জীবনের আলো যিনি একদিন দেখেছিলেন, কিন্তু আজ যাঁর কাছে জীবনের অর্থ শুধু দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া।

বেশীক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল না। ষ্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে এলেন শিল্পী। আগ্রহভরে দুহাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে 'এই যে' ব'লে শিল্পী এমন প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, যা জীবনে আর কোন মানুষে কোনদিন আমি দেখিনি।

ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে রসেটি আমাকে তাঁর ভাই উইলিয়ামের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। তখন সপ্তাহ অন্তর একদিন উইলিয়াম নিয়মমত রসেটির সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ঘটনাচক্রে আমরা দুজনে একই দিনে শিল্পীর বাড়ী গিয়েছিলুম, তাই পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে গেল।

তখন রসেটির বয়েস বাহান্ন কিন্তু দেখে তাঁকে বাষট্টীর কম বলে মনে হচ্ছিল না। দৈর্ঘ্যে মাঝামাঝি; দেহের স্থূলতার ভেতর দিয়ে বার্দ্ধক্যের জড়তা তখন আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে। মুখখানা ভরাট, কিন্তু স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে মলিনতাই সেখানে বেশী করে ফুটে উঠেছিল। খাড়া নাকের উপর উঁচু অথচ পেন্সিলে আঁকা সরু দুটি ভুরু এসে মিলেছিল; তারই তলায় বড় বড় ধূসর দুটি চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি সব সময়ে আত্মসমাহিত, কি এক চিন্তার ভাবে বিভোর।

ঘন গোঁফ দাড়ীতে তাঁর মুখের নীচুভাগ সমাচ্ছন্ন। এককালে তা ঈষৎ রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণের প্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল, কিন্তু আজকাল তাতে বেশ পাক ধরতে সুরু হয়েছে। বিস্তৃত, মসৃণ কপালের দুধারে পাতলা কালো চুলের গুছি কাণের দুদিকে গড়িয়ে পড়েছিল। আমার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মাথা ও মুখ কি এক মহান্ রূপ নিয়ে জেগে উঠলো। চোখের উপর থেকে মাথার দিকটায় পেলুম প্রতিভার এক সমুজ্জ্বল আভাস।

পোষাক পরিচ্ছদ অগোছালো, কিন্তু তাতে কোথাও অসঙ্গতি ছিল না। ছবি আঁকার সময় ব্যবহৃত হাই

পর্য্যন্ত লম্বা, গলাবন্ধ ঝলঝলে জামাটা ছাড়া পরিচ্ছদে আর কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। লম্বা জামার দুটো পকেটে হাত দুটো পুরে কবি ঘরের এদিক ওদিক পায়চারী করছিলেন!

আলাপের প্রথমক্ষণে তাঁর পুরুষোচিত সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠ আমাকে মুগ্ধ করলে। গম্ভীর অথচ লীলায়িত সে কণ্ঠে আমি লুক্কায়িত এক মধুরতার আভাস পেলুম। বুঝলুম আবৃত্তিকালে এই কণ্ঠে বাতাসের দোলায় নেচে ওঠা সাগরের সংযত অথচ উচ্ছ্বসিত আবেগ ফুটে ওঠে। একটু পরে কবির মুখে আবৃত্তি শুনে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হোল।

কবি-শিল্পীকে প্রথম দেখে এমনি সব ভাব আমার মনে জাগতে লাগলো। দেহ সাধারণ ইংরাজের মত সুগঠিত অথচ চোখদুটি ইটালীয় কৃষ্টির আলোয় দীপ্ত। মনোবল আর ব্যক্তিত্ব সহজ সরলভাবে তাঁর বাহ্য আকৃতিতে পরিস্ফুট হয়ে আমাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক প্রতিভাশালীর সান্নিধ্য সব সময়েই মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

ত্রিশ ফিট লম্বা কুড়ি ফিট চওড়া এক ঘরে শিল্পীর ষ্টুডিয়ো। গড়ন দেখে প্রথম একটু অবাক হতে হয়! অগ্নিকুণ্ডটা ঘরের এক কোণে, আর তার চুপাশে শিল্পীর নিজের হাতে খড়ি দিয়ে আঁকা কতকগুলি ছবি ঝোলান ছিল। তার মধ্যে বেশীর ভাগই সুন্দরীদের মুখাকৃতি। নানা আকারের অনেকগুলো ইজেল ঘরের এখানে ওখানে দাঁড় করানো ছিল। প্রত্যেকটাতেই একখানা ক'রে ছবি। সবগুলোর কাজ সমানভাবে এগোচ্ছিল না। দেখে বোঝা গেল, স্রষ্টার খেয়ালমত সেগুলো আঁকার কাজ চলছিল। এই সবে ঘরটা একরকম ভর্ত্তি। যা একটু জায়গা বাকি ছিল, তারই মাঝে মাঝে পাতা ছিল মলিন মোটা চাদরে ঢাকা একখানা বড় সোফা, দুখানা নীচু আরাম কেদারা; সামনে আরসি আর প্যানেলে মহাকবি সেক্সপীয়ারের অর্দ্ধাকৃতি-মূর্ত্তি-বসানো বড় একটা বইয়ের আলমারি। বাগানের বড় একটা গাছের ছায়া ঘরে এসে পড়েছিল। ঘরের এক কোণে ছায়াময় এমনি একটা জানলার কাছে বসানো ছোট একটা টেবিল, তার সামনে বেতের একখানা চেয়ার।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে আলো কমে আসছে দেখে শিল্পী বড় একটা ইজেলে ঢাকা-দেওয়া চাদরখানি সরিয়ে নিলেন। দেখলুম ক্যানভাসখানা বসন্তের স্বর্য্যা-করোজ্জ্বল নব প্রাকৃতিক দৃশ্যের। একটা গাছ লাল-সাদা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, আর তলায় বসে সুন্দরী একটি মেয়ে বইয়ের পাতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ছবির বুকে ফোটানো এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে ঘরের মধ্যে ছড়ানো অমূল্য রত্নরাজী মিলে রঙের গন্ধে গুমোট আবহাওয়ার মাঝে মলিন এই শিল্পীর জীবনের এমন স্পষ্ট একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তুলছিল যাতে তাঁর সেই মলিন মুখচ্ছবি জীবনে কোনদিন আমি ভুলতে পারিনি। ধরাধরি করে ইজেলটা ছুজনে ঘরের একপাশে সরিয়ে রাখলুম। সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে শিল্পী কথাবার্ত্তা সুরু করলেন। পরে যতবার দেখেছি, কথাবার্ত্তার সময়ে শিল্পী এমনিভাবে শুয়ে পড়ে কথাবার্ত্তা কয়েছেন। একটু রহস্যের সুরে শিল্পী বলতে লাগলেন, তাঁর অতিপ্রিয় এক বন্ধুকে আমার বয়সে দেখতে নাকি আমারই মত ছিল। তারপর সুরু হোল শক্ত সুগঠিত আমার দেহ নিয়ে টীকা-টিপ্পনী। চিঠিতে আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে শিল্পী আমার শরীরের যে ছবি মনের পটে এঁকেছিলেন, তার সঙ্গে আমার আসল শরীরের কতখানি মিল আছে তাই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাসি-ঠাট্টা চললো।

সহজভাবে হাসতে হাসতেই কথাগুলো শিল্পী বলে চললেন। তবুও সেগুলো শুনে আধাবয়সী আমার মত একজন তাঁর প্রতি স্নেহভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এই কথাটাই জাগতে লাগলো যে শিল্পী রসেটির মন যেন স্নায়ুতন্ত্র ও কতকগুলি উচ্ছ্বাসে ভরা। আরও মনে হোল, জীবনের এই মুহূর্ত্তে আমার মত সামান্য একজন লেখকের সঙ্গে দেখা করাটাও তাঁর স্নায়ুবলের মস্ত একটা পরীক্ষা বিশেষ।

চিঠিতে যাঁদের কথা আমি তাঁকে লিখেছিলুম শিল্পী এক এক ক'রে তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলোচনা

সুরু করলেন। দেখলুম কত সহজ, সুন্দর অথচ তীব্রভাবে কবি-শিল্পী এই ধরণের কথাবার্ত্তা বলতে পারেন। যা সত্যিকারের বিদ্রূপ নয়, কবির ভাষার রসের প্রলেপে তাকেও সুমধুর করে তুলছিল। দেখলুম কথাবার্ত্তার সময়ে মেয়েদের মত সরু লম্বা আঙুলের নখ দাঁত দিয়ে কাটা আর আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যাসও তাঁর আছে।

উইলিয়াম এতক্ষণ এক রকম চুপ করেই ছিলেন। তিনি যোগ দিতে সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা সুরু হোল। যে কয়েকটি অতি-পরিচিত বন্ধু মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, খোলাখুলিভাবে রসেটি তখন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন। অজস্র হাসি হেসে বললেন মিঃ ওয়াট্‌স্‌এর মাথাটা নাকি নেপোলিয়ানের মত, আর শিল্পী তাঁকে মোটে দেখতে পারেন না; ফ্রেডারিক সিলডস্ নাকি শেলীর মত বাতিকগ্রস্ত, আর ফোর্ড ম্যাডকস্ ব্রাউনের ডাঃ জনসনের মত বড় বড় কথা আওড়ানোর বদ্‌রোগ আছে; এমনি সব কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো।

বুঝলুম আমাকে তাঁর বন্ধুদের হিতাকাঙ্খী জেনেই শিল্পী তাঁদের অসাক্ষাতে বন্ধুদের সম্বন্ধে এমন তীব্র সমালোচনা করছেন। কথা বলতে বলতে শিল্পী মাঝে মাঝে খুব এক চোট হেসে হঠাৎ চুপ হয়ে যাচ্ছিলেন। বন্ধুদের সম্বন্ধে এমন বিশেষ কিছু বলেন নি, এই কথাটা আমাদের বোঝাবার জন্যে তারপর আস্তে আস্তে দু'চারটি কথা বলছিলেন।

আজও বেশ মনে পড়ে, যাবার সময়ে রসেটি খোস-মেজাজে একটা ছুটো কবিতা ঝড়ের বেগে আবৃত্তি করে গেলেন। পঞ্চপদী কতকগুলো শ্লোকের সমাবেশে এই কবিতাগুলি তৈরী। এই ধরণের কবিতা-রচনায় রসেটি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এই সব কবিতা তিনি কথাবার্ত্তার মতই সহজে মুখে মুখে রচনা করতেন। তবুও তার ভেতর এমন দক্ষতা সহকারে রসের সমাবেশ ঘটাতেন যে অনেক সময়ে সেগুলো ব্যক্তিগত কুৎসারটনার পরিচায়ক হয়ে পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত শুনে তারিফ না করে থাকা যায় না।

তাঁর কোন কবি বন্ধুর মাথায় টাক পড়ে গিয়েছিল। বেশ মনে পড়ে এই নিয়ে একটা কবিতা রচনা ক'রে এই সময়ে তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন। এর মধ্যেকার বিদ্রূপবাণগুলো যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তা আজও মনে আছে। ও রকম কবিতা লেখার জন্যে কবিকে কেন যে কতবার কত রকম ক্ষ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল, তার কারণ আজ আমি বুঝতে পারছি।

খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই ষ্টুডিয়োতে গিয়ে জমায়েৎ হলুম। কবিকে বল্লুম, কথামত এইবার গোটাকয়েক গীতি-কবিতা তাঁকে আমাদের শোনাতে হবে। যাঁরা তাঁর কবিতা পড়ন্দ করেন, তাঁদের কাছে কবিতা আবৃত্তি করবার অদম্য একটা আগ্রহ কবির ছিল।

কবিতাগুলি উইলিয়ামের শোনা ছিল। তাই একবার তাঁর অনুমতি নিয়ে আর এ বিষয়ে তাঁরও আগ্রহ দেখে কবি বইয়ের আলমারী খুলে হাতে লেখা একখানা খাতা বের করলেন। চশমার উপর আর এক জোড়া চশমা পরে নিজের রচিত "সাদা জাহাজ" কবিতাটি কবি আবৃত্তি করে গেলেন। সম্পূর্ণ আত্মভোলা হয়েও এমন-ভাবে আবৃত্তি করার নাম যদি কলাকুশলতা হয় তাহলে বলতে পারি আবৃত্তিতে রসেটি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবির কণ্ঠের গুণে কবিতায় সুরের বৈচিত্র্য ফুটেছিল। জাহাজ-ধ্বংসের বর্ণনায় কবির কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন বীচি-বিক্ষোভিত, তরঙ্গমুখর সাগরকে বাস্তব ক'রে তুলছিল। স্থানবিশেষে কবির কণ্ঠে বালিকার কণ্ঠের নম্রতা ফুটে উঠছিল। শেষের দিকে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনায় কবি-কণ্ঠের ব্যাথাতুর ভাব আমাদের উতল করে তুলেছিল।

আবৃত্তির শেষ বেশ বদ্ধ ঘরের বাতাসে ঘুরে ঘুরে নিস্তব্ধতায় মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা উতরে গেল। বিদায় নেবার জন্যে উইলিয়াম সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আমিও উঠে পড়লুম। দক্ষিণ উপকূল হয়ে ফেরবার পথে কবির সঙ্গে সান্ধ্য-ভোজনের আর রাত্রি

যাপনের নিমন্ত্রণ নিয়ে আমি হলে এসে দাঁড়ালুম। আমাদের এগিয়ে দেবার জন্যে কবি হলের দরজা পর্য্যন্ত এলেন। শেষ পর্য্যন্ত কবিকে বেশ উৎফুল্লই দেখা গেল। বিদ্রূপাত্মক কথার টুক্‌রো আর প্রাণখোলা, বুকভরা হাসির ধ্বনি ফটক পর্য্যন্ত আমাদের কাণে আসতে লাগলো।

বগীতে চেপে আমি আর উইলিয়াম বেরিয়ে পড়লুম। পথঘাট আমার বিশেষ জানা ছিল না। তাই কথা রইলো সহরের নির্জ্জন কোণে যে হোটেলে আমার উঠবার কথা তার দরজায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে উইলিয়াম এগিয়ে যাবেন। যাত্রার অল্প একটু সময়ে মধ্যে আমি বুঝতে পারলুম যে তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সান্নিধ্য আমাকে বিস্ময়ে এমন ভাবে নির্ব্বাক করেছে যে তাঁর সঙ্গে পুরো একটি সন্ধ্যাযাপনের স্মৃতি আমার মন থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। এমন অনুভূতি মানুষের জীবনে একবার মাত্র এসে থাকে। রসেটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর এমনি একটা অনুভূতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। *

* Sir William Hall Caineএর আত্মজীবনী Story of my Lifeএর "My first meeting with Rossetti" পরিচ্ছদের অনুবাদ।

অনুবাদক—শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য।

—

আমার মাঝারে জাগিল দেবতা

শ্রীবিভুদান রায় চৌধুরী

মোর জীবনের অসীম আকাশ ভরি' তোল তব গানে
ওগো সুন্দর! সুন্দর করো তোমার পূর্ণ-দানে।
দূর হোতে দূরে আরো বহুদূরে
শাশ্বত তব বাঁশীর ও-সুরে
নিয়ে চল মোরে সেই পথে যাহা পরাণ কভু না জানে
জীবন-পাথারে আনো নৈবেন প্রেম-সুর-আহ্বানে।

যুগে যুগে আর লোকে লোকে তুমি প্রাণের বার্ত্তাবাহী,—
হাজারো পৃথিবী ব্যাপিয়া একাই চলিয়াছ গান গাহি'
গীতি-ভাণ্ডার গোপনে গোপনে
ছড়ায়ে রেখেছ এই ত্রিভুবনে
আকাশ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে—মাটি দিল যাহা চাহি';
তোমার অমৃত-তীর্থ-সলিলে সার্থক-অবগাহি'!

উদার-সুমল অপরূপ-রূপে এসো চির-বাঞ্ছিত!
তোমাতে আমাতে প্রাণে প্রাণে মিল,—দু হু মোরা
ভেদাতীত।

এ পৃথিবী মূক,—মুখর চেতনা
আমি আনি' দিব; মোর স্বর-কণা
তোমারই দানের অমৃত লভি' ভরায়েছ মোর চিত
সৃষ্টি তোমার আপন হোয়েছে; জীবন? মরণাতীত!

কারা অমরার পথ ভুল করি' আঁকড়ি' ধরেছে ধূলি?
জীবনের পটে বুলায়েছে খালি সোণার স্বপন-তুলি!
সুচির দিনের বহু-চলা-পথে,—
হারায়ে ফেলেছে আপনার রথে
কাহারা জীবন দেখিয়াছে শুধু আঁটিয়া আঁখিতে ঠুলি?
জীবন-দেবতা তাদেরই দুয়ারে; ক'রে নেরে কোলাকুলি

আর ভয় নাই ভেরী-আহ্বানে ভাঙিতে ভাঙের ঘুমে—
আমার মাঝারে জাগিল—দেবতা,—বিরাট বিশ্বভূমে!
মহাজীবনের বোধনের বাঁশী
আপনি দেবতা বাজালো যে আসি'
কে রহিবে আর অতি-পুরাতন মিথ্যা-সরণ-ঘুমে?
—ঊর্দ্ধ লোকের দেবতা যে আজি আপনি মাটিকে চুমে।

—:০:—

ইরাকে

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

(৬)

প্রথমেই মনে হইল—নদীর পরপারে কাজমেনে সিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মসজেদটি দেখিতে যাইব। মৌলবী সাহেবকে সে কথা বলিয়া সাথী হইতে অনুরোধ জানাইলাম। কিন্তু তিনি সহযাত্রী হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন —কারণটি প্রথমে প্রকাশও করিলেন না। ক্রমে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান বলিয়াই সিয়া সম্প্রদায়ের এই তীর্থ-স্থানে যাইবেন না! তখন মনে পড়িল, এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্ঘর্ষে বাগদাদের ভূমি কতবার নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছে—কতবার অগ্নিতে কত লোকের গৃহ, কত মসজেদ ভস্মীভূত হইয়াছে। ধর্ম্মমতে এই যে অসহিষ্ণুতা ইহা কি ধর্ম্মের গ্লানি নহে? ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

হরি ও হর ভিন্ন, কিন্তু

"অভেদে যে জন ভজে সে-ই ভক্ত ধীর।"

মহারাজা সার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট শ্রুত একটি গল্প তখন আমার মনে পড়িল। তাঁহার প্রমাতামহ (মহারাজা কাশিমবাজারের জমীদার বংশের দৌহিত্র) জলপথে বৃন্দাবন যাত্রাকালে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহার বজরা কাশীর নিকট উপস্থিত হইলেই দুইজন প্রহরী দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিবে এবং দূর হইতে কাশীর "বেণীমাধবের ধ্বজা" তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেই সে সংবাদ জ্ঞাপন করিবে। তখনই বজরার কামরার দ্বার ও বাতায়ন পর্দ্দা ফেলিয়া বন্ধ করিতে হইবে—পাছে শিবক্ষেত্র তাঁহার নয়নগোচর হয়! অথচ বংশপতি "কান্ত বাবু" যে কাশীতে গিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের কথা। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন চেৎ সিংহকে পরাজুত করেন, তখন তাঁহার ব্যবস্থায় অন্তঃপুরিকারা লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াই নাকি তাঁহাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা ও দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দিয়াছিলেন এবং তিনি তথা হইতে যে প্রস্তর-কক্ষ খুলিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা আজও কাশিমবাজারে তাঁহার গৃহের অংশ হইয়া রহিয়াছে।

মৌলবী যখন যাইতে অসম্মত হইলেন, তখন একাই যাইব, স্থির করিলাম। যিনি আমাদিগের দলের সুবিধাদি দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আমার সঙ্কল্প জানাইলে তিনি বলিলেন, তাঁহার কোন আপত্তি নাই। অশ্বযানে সেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে আসিয়া দেখিলাম, কাজমেন অবধি ট্রাম যায়। কলিকাতায় ঘোড়ার ট্রাম এখন লোপ্‌কর স্মৃতিগত হইয়াছে; বৈদ্যুতিক ট্রাম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কিন্তু ঘোড়ায় টানা ট্রামই ছিল। বড় বড় ঘোড়া আমদানী হইত—শ্যামবাজার লাইনের—"কর্ণওয়ালিস হরিদ্রাবর্ণ হাই কোর্টের গাড়ী" শ্যামবাজার ডিপো হইতে রওনা হইয়া প্রথমে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে—প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানের কাছে ডিপোয় ঘোড়া বদল করিয়া, মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে পুনরায় ঘোড়া বদল করিয়া যাইত—বৌবাজারের মোড়ে একটি তৃতীয় অশ্ব রক্ষিত হইত—

মোড় ফিরিবার সময় সেটিও গাড়ীতে যুক্ত করা হইত এবং সময় সময় তাহাতেও গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটে লওয়া অসম্ভব হইলে যাত্রীদিগকে নামিয়া গাড়ীর ভার লাঘব করিতে হইত। গ্রীষ্মকালে ঘোড়ার মাথায় টুপী দেওয়া হইত—সে সময় অনেক ঘোড়া মরিত। বাগবাদে এখনও ঘোড়ায় টানা ট্রাম—তবে গাড়ী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন এবং দ্বিতল। ফিরি-ওয়ালারা গাড়ীর কাছে—কয় প্রকার মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছে। গাড়ীতে যাত্রীরা প্রায় সকলেই আরব—দুই চারি জন ইহুদী। গাড়ীতে বসিয়া বলিলাম—"কাজমেন"। পরিদর্শক অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ভাড়া কয়-আনা তাহা বুঝাইয়া দিল। আমি আরবী জানি না, সে-ও ইংরাজী বা উর্দ্দু জানে না—সুতরাং ব্যাপারটা কতকটা দাঁড়াইল যেন—"সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা।"

গাড়ী চলিল—সহরের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া রাস্তা কাজমেনে আসিয়াছে। ট্রাম হইতে নামিয়া অল্প দূরেই কাজমেনের প্রসিদ্ধ মসজেদের সম্মুখীন হইলাম। মসজেদে বহুলোকসমাগম আমাদিগের দেশে তীর্থস্থানে মন্দিরের ও মসজেদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মসজেদের সম্মুখে রাজপথ যাত্রী ও দোকানে পূর্ণ।

কাজমেনের মসজেদ

মসজেদের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তথায় কয় জন ইংরাজ সৈনিক ও এক জন সামরিক কর্ম্মচারী আড্ডা লইয়াছেন। কর্ম্মচারীকে আত্মপরিচয় দিয়া ও পাস পোর্ট দেখাইয়া মসজেদে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি কয় মিনিট কি ভাবিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মসজেদের লোকের অনুমতি লইয়াছেন?" আমি বলিলাম, "না; এবং তাহার কারণ আমি আরবী জানি না।" তিনি এক-জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং দোভাষীর সাহায্যে তাহাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি মসজেদের মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমার গমনে তাঁহাদিগের কোন আপত্তি নাই। ইংরাজ কর্ম্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান? আমি মুসলমান নহি বলিলে তিনি বলিলেন, তবে তিনি আমাকে মসজেদে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। মসজেদের কর্ত্তারা আমাকে মসজেদে প্রবেশের অপুমতি দিতেছেন, আমিও যাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিব—কিন্তু তবুও তিনি যাইতে দিবেন না! "পঞ্চানন্দ" ব্যঙ্গ করিয়া সমাজ-সংস্কারকদিগের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—"আমি বলি, আমি সুখী; আমার গৃহিণী বলেন, তিনি সুখী; কিন্তু তোমরা বলিবে—যে হেতু আমাদিগের বাল্য-বিবাহ হইয়াছে, সেই কারণে আমরা অসুখী!" ইংরাজ কর্ম্মচারী বলিলেন, যদি মসজেদের মধ্যে অমুসলমান আমাকে হত্যা করা হয়, তবে বিষম ব্যাপার ঘটিবে—তাহার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না।

অগত্যা আমাকে বাহির হইতে মসজেদ দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। দেখিলাম, এই মসজেদে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। রৌপ্যের বৃত্তি—দ্বারগুলিতে মূল্যবান কারুকার্য্য—ইত্যাদি। ইহার তুলনায় আব্দুল কাদের জিলানীর মসজেদ ঐশ্বর্য্যম্লান। যেন দ্বারকা আর বেটদ্বারকা।

আবার ট্রামে বাগদাদে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পরে এ পারের বাজারে প্রবেশ করিলাম। এ সব দেশের বাজার একইরূপ—দীর্ঘ খিলান, মধ্যে পথ, দুই পার্শ্বে দোকানে শাকশব্জী, ফল প্রভৃতি হইতে মূল্যবান গালি-চার ও রেশমী কাপড়ের সমাবেশ। পথের মধ্যেই

পোদ্দার টেবল সম্মুখে লইয়া টুলে বসিয়া টাকা ঝন্ ঝন্ করিতেছে—বাটা লইয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া দিতেছে। বাগদাদের বাজারে ফলের ও তরকারীর প্রাচুর্য্য দেখিলাম—তুঁত ফল, বড় বড় কমলা জাতীয় নেবু, আনার অর্থাৎ দাড়িম্ব ইত্যাদি ফল, আর বড় বড় কুমড়া, শসা প্রভৃতি স্তূপাকারে দোকানে সজ্জিত। বসোরার পর—এই দৃশ্য নয়ন-রঞ্জন মনে হইল।

ফিরিবার পথে সেখ ওমরের সমাধি দেখিলাম।

অপরাহ্ণে আমরা সকলে বাগদাদের উপকণ্ঠে মুয়াজ্জম গ্রাম দেখিতে গমন করিলাম। পথে—কবরস্থান—নগরের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। মুয়াজ্জমে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম—এই স্থানে বহু লোকের এক চক্ষু দৃষ্টিহীন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না।

দলে দলে দুম্বা চরিতেছে। বাগদাদের বাজারে যে স্থানে মাংস বিক্রয় হয়, তথায় দেখা যায়, ছাল-ছাড়ান বৃহৎ বৃহৎ দুম্বা শিকে দুলিতেছে; ক্রেতা আসিলে দোকানী তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় এক টুকরা মাংস কাটিয়া দিতেছে এবং ক্রেতা তাহাই তথায় রক্ষিত অগ্নিতে ঝলসাইয়া লইয়া খাইয়া মাংসের স্বরূপ বুঝিয়া দর করিতেছে।

বলা বাহুল্য, মুয়াজ্জমেও বহু মসজেদ দেখিতে পাইলাম।

পরদিন সহর দেখিতে বাহির হইয়া বাগদাদের যে মসজেদটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিচিত, তাহা দেখিতে যাইলাম। মসজেদে পূর্ব্বে বৃহৎ বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে নাকি ৭৫ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত! কায়রোয় অল-অজহার বিদ্যালয় দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও এত ছাত্রের কথা শুনা যায় না। তথায় ছাত্র-সংখ্যা—১১ হাজারের কিছু অধিক।

মসজেদ ও কয়টি বাজার দেখিয়া হোটেলে আসিয়া শুনিলাম, জেনারল মডের অধীনে বাগদাদে সর্ব্বপ্রধান সামরিক কর্ম্মচারী জেনারল বীচ সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তিনি বেলা দুইটার পরই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তিনি অন্য হোটেল হইতে দলের আর কয় জনকে মোটরে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া সংবাদ দিলেন, যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগকে যখন পরদিনই যাত্রা করিতে হইবে, তখন তাহার পূর্ব্বে সেনাপতি মড আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন—আমরা যেন প্রাতঃকালের পরই প্রস্তুত হইয়া থাকি—আমাদিগকে লইতে গাড়ী আসিবে। তিনি আমাদিগের পত্রগুলি আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ত্যাগের পর পরিজনগণের যে সংবাদ পাইয়াছি, সে কেবল টেলি-গ্রামে—এই প্রথম পত্র পাইলাম। বলা বাহুল্য, পত্রে স্ত্রী ও কন্যাদিগের কুশল-সংবাদে সুখী হইলাম।

অপরাহ্ণে হোটেলের সারদাব দেখিলাম। সারদাব জমীর নিম্নে ঘর—যখন গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহ্য হয়, তখন ধনীরা গৃহের এই অংশে মধ্যাহ্ন যাপন করেন—সারদাব হইতে একটি চিমনির মত স্তম্ভ উঠে—তাহার গাত্রে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, সেগুলিতে বায়ুচলাচল ও আলোক প্রবেশ হয়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে বিলাসীরা এই সারদাবে সময় কাটাইয়া থাকেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে পুস্তিকো পর্ব্বত হইতে নীত বরফে শীতল নানারূপ সরবত পান করা হয়—কাচের ক্ষুরসীতে (নারগিলায়) ধূমপান চলে—দেখা যায় কাচপাত্রে নারগিলার জলে গোলাপের পাঁপড়ি ভাসিতেছে। আরব্য উপন্যাসের রাজ্য এই বাগদাদে অন্তঃপুরে সুন্দরীর অভাব নাই; বিশেষ মুসলমান ধনীরা কালদীয়, জিয়র্জীয়, গ্রীক—সুন্দরী বিবাহ করেন, ইহুদীর ত কথাই নাই। সুতরাং ধনীদিগের সারদাব যে বিলাসের লীলাক্ষেত্র হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সারদাব দেখিয়া গল্পের আখ্যানবস্তু মনে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণে মৌলবী সাহেব ও আমি বেড়াইতে বাহির হইয়া আব্দুল কাদের জিলানীর মসজেদের ইমাম-বংশীয় ভদ্রলোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহার শিষ্ট ব্যবহারে ও মিষ্ট আচার আপ্যায়নে তুষ্ট হইলাম। আজ তিনি আমাদিগকে কেবল কফী পান করাইয়াই ছাড়িলেন না।

১৬ই বৈশাখ বেলা প্রায় ১০টায় গাড়ী আসিল—আমরা জেনারল মডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। তিনি পুরাতন ইংরাজ দূতাবাসেই আফিস করিতেছিলেন। এই গৃহের প্রবেশপথে প্রাচীরে প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত—প্রাচীতে নেপোলিয়নের জয়-চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য এই দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

জেনারল বীচ আমাদিগকে জেনারল মডের কক্ষে লইয়া যাইলেন। আমরা উপবেশন করিলাম—জেনারল বীচও মেজর পুলী দাঁড়াইয়া রহিলেন। জেনারল মড বহুক্ষণ আমাদিগের সহিত নানা কথার আলোচনা করিলেন। দেখিলাম, বিলাতের রাজনীতিকরা ইস্তাহারে যাহাই কেন লিখিয়া থাকুন না, তিনি তুর্কদিগের বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলিলেন, তুর্ক সৈনিকের মত সৈনিক তিনি কোথাও দেখেন নাই—তাহারা দুই তিন দিন অনাহারেও এত দ্রুত এত পথ অতিক্রম করে যে, অনুসরণকারী ইংরাজ সৈনিকরা তাহাদিগকে ধরিতে পারে না;—তাহারা তিন চারিটি গুলীতে আহত হইয়াও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গুলী চালায়। তুর্ক কৃষকদিগের দল হইতেই সৈনিক সংগৃহীত হয়। তুর্কীর অভিজাত বংশীয়গণই তুর্কীর অধঃপতনের কারণ। তাহারা প্রকৃত তুর্ক নহে। অভিজাত-বংশীয়রা গ্রীক, ইহুদী, ফরাসী—নানা জাতির স্ত্রী গ্রহণ করে; সে সকল স্ত্রীলোক সমাজের উচ্চ স্তরেরও নহে। তাই সংমিশ্রণফলে তুর্ক অভিজাত-বংশীয়দিগের অধঃপতন হইয়াছে। তাহারা প্রকৃত জাতীয়তাও জানে না, জাতির ইষ্ট-চিন্তাও করে না তিনি বাগদাদে তুর্কদিগের সহায় জার্ম্মাণ জেনারল গ্রোৎসম্যানের সহিত তুর্ক সেনাপতি যুবক নাথিম পাশার তুলনা করিয়া শেষোক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন—তিনি যেভাবে সমগ্র ইরাকে সেনাবল চালিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, বলিলেন।

তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা যে যাহার হোটেলে ফিরিলাম। যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা বাগদাদ হইতে যাত্রা করিলেন। মৌলবী সাহেব পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহযাত্রী হইবেন, প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাকেও যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সহসা—নাটকোচিত অতর্কিত ভাবে—মত-পরিবর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলেন।

সেদিন বসোরাযাত্রী অভাবে আমরা যাইতে পারিলাম না—কবে যাইতে পারিব, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

সন্ধ্যায় যখন হোটেলে আসিলাম, তখন মৃদু ঝড় বহিতেছে।

ততক্ষণে উপন্যাসের আখ্যানবস্তু অঙ্কুরিত হইয়াছে। রাত্রিকালে আহারের পরে বসিয়া উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিলাম। তাহার নামকরণ—আরবীতে অভিজ্ঞ এক জন বাগদাদবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া করিলাম—মেদিদা।

কবে যাইবার জাহাজ পাইব জানি না। কিন্তু কায ছিল—সহর দেখা ও সহরবাসীদিগের আচার-ব্যবহারের সন্ধান লওয়া; এখন আর একটি কায জুটিল—বাগদাদী পরিবেষ্টন লইয়া উপন্যাস রচনা; সে জন্য আবশ্যক উপকরণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরদিনও সেনাপতির আফিসে যাইলাম—জানিলাম যাইবার জাহাজ নাই। বাগদাদে সব পুরাতন নগরের মত দুর্গ ও দুর্গমধ্যে অস্ত্রাগার। এই অস্ত্রাগার এখন "ওমরিক"—ইহাতে পূর্ব্বে নাকি বৃহৎ বিদ্যালয় ছিল। সে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যাহা শুনিলাম, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু আরবরা যে বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওমরিকে কুটে তুর্কদিগের নিকট হইতে গৃহীত কয়টি বৃহদাকার জলযানের কামান দেখিলাম।

উপন্যাস রচনা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

মঙ্গলবারে বেলা ১১টার সময় আবার জেনারল মডের আফিসে যাইয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইলাম—জাহাজ নাই। জেনারল বীচ আমাদিগকে সেই কথা বলিবার

সময় তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট এক জন ইংরাজ বলিলেন, "কিন্তু আজ ত একখানি জাহাজ বসোরায় যাইতেছে।" আমরা বিদায় লইয়াছিলাম, কথাটি শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। জেনারল বীচ আমাকে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন—আমি সংবাদ লইতেছি।"

তিনি টেলিফোনে সংবাদ লইয়া বলিলেন, একখানি জাহাজ সেই দিন বেলা ৪টার সময় যাত্রা করিবে—বাগদাদের উপকণ্ঠে সেখানিতে উঠিতে হইলে অবিলম্বে যাত্রা করিতে হয়; আমরা যদি তাহাতে সম্মত থাকি, তবে তিনি জেনারল মডকে সে কথা বলিবেন।

অস্ত্রাগার

মৌলবী সাহেব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—এখনই কেমন করিয়া যাওয়া যায়? আমি বলিলাম, আমি এখনই যাইতে প্রস্তুত—তাহার ব্যবস্থা করা হউক—মৌলবী সাহেব যায়েন ভালই—না যায়েন তিনি থাকিতে পারেন।

মৌলবী সাহেব তখন বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার ঘোষ যদি যায়েন, আমিও যাইব।"

তখন জেনারল বীচ জেনারল মডের অনুমতি লইতে গমন করিলেন এবং আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইলেন। জেনারল মড আমাদিগকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া জেনারল বীচকে বলিলেন—"আমার মোটর বোট ডাকাইয়া দিউন।"

জেনারল বীচ আমাদিগকে লইয়া আফিসের নিম্নে ঘাটে আসিলেন এবং জেনারল মডের মোটর বোটের চালককে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, আমাদিগকে লইয়া হোটেল মডের ঘাটে যাইয়া জিনিষপত্র তুলিয়া আমাদিগকে লইয়া বাগদাদের উপকণ্ঠে জেঠিতে পি ২৫নং বসোরাগামী জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে—বিলম্ব করিলে জাহাজ পাওয়া যাইবে না। ইংরাজ চালক বলিল, সে তাহাই করিবে। জেনারলকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বোটে উঠিলাম—অতি দ্রুত বেগে বোট চালাইয়া চালক হোটেলের ঘাটে উপস্থিত হইল এবং নামিয়া সে ও তাহার সহকারী দুই জন আমাদিগের প্রদর্শিত জিনিষগুলি বোটে তুলিল। আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র সব গুছাইয়া লইলাম।

আমরা বোটে উঠিলাম—জেনারল মডের বোট দেখিয়া সব জাহাজ ও বোট তাহার পথ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।

মৌলবী তখনও বলিতেছিলেন, "এত তাড়া করিলেন, কাহারও কাছে বিদায় লওয়াও হইল না!"

শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "বাগদাদে কি আমাদের এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধু আছেন যে, বিদায় না লইয়া যাওয়া অপরাধ হইবে?"

বাগদাদের নিকট বিদায় লইলাম। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর—কাশীর মত সঙ্কীর্ণ গলি আর তেমনই দুই পার্শ্বে উচ্চ গৃহ, কেবল গৃহগুলি যেন দৃঢ় মনে হয় না। এ বাগদাদ আরব্য উপন্যাসের বাগদাদ না হইলেও সম্পূর্ণ নূতন দেশ। এখনও ইহাতে পুরাতনের আভাস পাওয়া যায়—হয়ত যুদ্ধান্ত ব্যবস্থায় দশ বৎসর পরে আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

টাইগ্রীসের জল কাটিয়া বোট অগ্রসর হইতে লাগিল—আমি শত গম্বুজ ও স্তম্ভশোভিত বাগদাদের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি স্বপ্ন?

এসো

কথা, সুর ও স্বরলিপিঃ—শ্রীদিলীপ কুমার রায়

মিশ্র জৌনপুরী—চৌতাল

ভাতি' স্নেহ-জলধনু সুন্দর-তনু !
শান্তি-সুষমা
বিছনে এসো।
ফুল-সন্ধানে ঝঙ্ক' পরাণে
দীপি' দিশা—রমা,
জীবনে এসো॥

ধূপছায়া-তালে এসো মা মর্ম্মে,
এসো মা নিরালে—জনতা-নর্ম্মে ;
বিধুর তিমিরে উছলি' মিহিরে
বিরহের তীরে
মিলনে এসো॥

তোমার গন্ধ- নিবিড় ছন্দ
ভোলে যদি হিয়া ;
মলয়ে এসো।
যদি বা পান্থ পথ-ভ্রান্ত
হয়—নন্দিয়া
অভয়ে এসো॥

দুলিব না আর কালো-তরঙ্গে,
এসো সুধাসার আলো-বিভঙ্গে !
তোমার চরণ যাচে প্রাণমন,
দাও মা শরণ—
প্রণয়ে এসো॥

[এ গানটী দ্বিজেন্দ্রলালের "কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি, কি সাজ মিলিবে উহার সাথ ?" (সোরাব রুস্তম) গানটীর ছন্দে ও সুরে রচিত। এ-সুরটী দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুস্থানি জৌনপুরীর ঢঙে রচনা করেন ও চৌতালে গাইতেন। এতে নানাবিধ তান প্রভৃতিও লাগানো চলে—ভৈরবীর, আশাবরীর, জৌনপুরীর। ধ্রুপদ ও খেয়ালের বড় বিচিত্র সমন্বয় হওয়া সম্ভব এ শ্রেণীর গানে। গ্রামোফোনে এ গানটী দিয়েছি আমি। তবে তানাদির ইঙ্গিত দিয়েছি অল্প কয়েক মিনিটে যতদূর সম্ভব। যেটা এ গানটীর সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে বক্তব্য সেটি হ'ল এর ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গি, অর্থাৎ এই শ্রেণীর গানের সুরে দ্বিজেন্দ্রলাল তান কর্ত্তবের অবসর রেখেছেন নূতন ভঙ্গিতে জৌনপুরী রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে। পরে চিত্রালিতে এ শ্রেণীর ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গির গানের আরও কয়েকটী স্বরলিপি দেওয়ার ইচ্ছে রইল। ইতি—

শ্রীদিলীপ কুমার রায়।]

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১
সা সা -া | রা -া | মা -া | পা -া | দা দা | পা -া | মা -া | পদা ণর্সা | র্সা -া | দা -া |
ভা তি - স্নে - হ - জ - ল - ধ - নু - সু - ন্ - - দ

০ ২ ৩ | + ০ ১ ০ ২ ৩
পা -া | মজ্ঞা রা | জ্ঞা -া | জ্ঞা -া | পা মা | পা -া | পমা পা | দা দা | পা জ্ঞা |
র - ত - নু - | শা - - ন্ তি - সু - ষ - মা -

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১
সজ্ঞা মপা | জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া | ঋা -া | সা -া | সা সা | রা -া | মরা মা | পদা ণর্সা |
বি - ছ - নে - এ - সো - ভা তি স্নে - হ - জ -

০ ২ ৩ + ০ ১ ০ ২ ৩
দা দা | পা -া | পা -া | সা র্সা | র্সা -া | র্সা গা | র্সা -া | র্রা -া | সা -া |
ল - ধ - নু ফু - ল সন্ - - - ধা নে

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১
ণর্সা ণর্সা | দা পা | পদা ণর্সা | দা পা | মজ্ঞা রা | জ্ঞা -া | জ্ঞা -া | পমা পা | পা -া |
রং - - - কু - প - রা - ণে - দী পি - দি -

০ ২ ৩ + ০ ১ ০ ২ ৩
দা -া | পা -া | দপা মজ্ঞা | সজ্ঞা মপা | জ্ঞা জ্ঞা | সা জ্ঞা | ঋা -া | সা -া | সা সা |
শা - র - মা - জী - ব - নে - এ - সো - ভা তি

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১
রা -া | মা -া | পজ্ঞা পা | দা দা | ণা পা | পা -া | মা -া | পা -া | দা দা |
স্নে - হ - জ - ল - ধ - নু - ধূ - প - ছা -

০ ২ ৩ + ০ ১ ০ ২ ৩
মা -া | পা -া | পদা ণর্সা | ণা র্সা | -া -া | ণদা ণা র্সা -া | র্রা -া | র্সা -া |
য়া - তা - লে - এ সো - - মা - ম - - র্ মে -

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১ ০
র্সা -া | র্রর্সা র্রা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা -া | র্সা -া | র্রা ণা | ণা -া | র্সা -া | র্রা ণা | দা পা |
এ - সো - মা - নি - রা - লে - জ - ন - তা - ন -

- র্ মে - বি - ধু - র - তি - মি - রে - উ -
জ - লি - মি - হি রে - বি - র - হে - র -
তী - রে - মি - ল - নে - এ - সো - - -
স্নে - হ - জ - ল - ধ - নু - তো - মা - র -
গন্ - - - ধ - নি - বি - ড় - ছন্ - - - দ -
ভো - লে - য - দি - হি - য়া . ম - ল য়ে -
এ - সো - - - য - দি - বা - পা - - ন্ থ -
প - থ - - - - ভ্রা - - ন্ ত - হয় - -

নন্ - - - দি - য়া - অ ভ - - য়ে - এ - - সো - - -
ডু লি - - ব - না - আ - - র কা - লো - ত -
রং - - - - গে - এ - সো - সু - ধা - সা -
- - আ - লো - বি - ভং - - - - গে -
তো - মা - র - চ - র - ণ - যা - চে - প্রা -
ণ - ম ন - দা ও মা - শ - র - ণ - অ -
ভ - য়ে - এ - সো - - - স্নে - হ জ - ল
ধ - নু -

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

নয়া মাইক্রোফোন্

বিজ্ঞান মানুষের কোনও রকমের অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্যই আর রাখলে না, দেখা যাচ্ছে। এতদিন ধ'রে মাইক্রোফোনের একেবারে কাছে মুখ রেখে কথা কইতে হ'ত; অন্যদিকে ঘুরে ফিরে কথা কইতে না পারায় বক্তাদের অসুবিধা হ'ত খুব বেশী। ছবিতে একটা ডাণ্ডার ওপরে আপেলের মত যে নয়া মাইক্রোফোন্ আবিষ্কার করা হয়েছে, তাতে ঘুরে ফিরে যে দিক থেকে ইচ্ছা বক্তৃতা করা চল্‌বে। কাজেই বক্তাদের আর কোন রকমের অস্বাচ্ছন্দ্য রইল না।

হেলিকপ্‌টার

ফ্রান্সের লুই ব্রেগ্ বহু এরোপ্লেন তৈরি ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন। হালে তিনি এই অদ্ভুত এরোপ্লেনটি তৈরি করেছেন। প্যারিসের কাছে এক বিমানের ঘাঁটিতে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, এই এরোপ্লেন একদম সোজা ওপরে উঠ্‌তে পারে এবং পাখীর মত ডানা ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চলভাবে বাতাসে ভেসে থাক্‌তেও পারে। এর গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইল।

দশ চোখো বিরাট ক্যামেরা

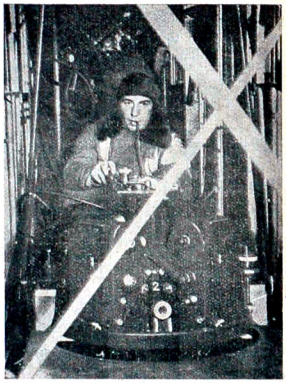

নিউ মেক্সিকোতে জমি জরীপ করবার উদ্দেশ্যে এক বিশালকায় ক্যামেরার সৃষ্টি করা হয়েছে। এরোপ্লেনে ক্যামেরা বসিয়ে চার মাইল ওপর থেকে ২শত বর্গ মাইল স্থানের ফটো এর সাহায্যে অনায়াসে নেওয়া যায়। ক্যামেরাটিতে ১০টি লেন্‌স্ আছে, এই দশটি লেন্‌সে এক সঙ্গেই ফটো তোলা যায়। পৃথিবী থেকে চার মাইল ওপরে বায়ু এত হাল্কা যে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে, তাই ফটোগ্রাফারকে অক্সিজেনের সাহায্যে নিশ্বাস নিতে হয়। পৃথিবীতে এত বড় ক্যামেরা আর তৈরি হয় নি। এক একটা ফটোর পরিমাণও অদ্ভুত প্রায় ছ' হাত লম্বা আর ছ'হাত চওড়া।

একপাশে সরিয়ে বাড়ী মেরামৎ

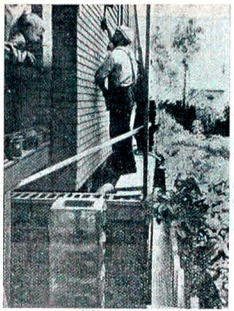

আমেরিকার চিকাগো শহরে এক মহিলার বাড়ীর একটি দেয়াল মেরামৎ করার দরকার হয়; কিন্তু সেই দেয়ালের বাইরে তাঁর নিজের এমন একটু জায়গাও নেই যে সেখানে মই লাগিয়ে বা বাঁশ বেঁধে রাজমজুররা কাজ করতে পারে। প্রতিবেশীও তার জায়গা এ কাজের জন্য ছেড়ে দিতে রাজী হ'ল না। তখন বাধ্য হ'য়ে তাঁকে গোটা বাড়ীটাকেই ৩০ ইঞ্চি সরিয়ে নিয়ে মেরামৎ করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সেই ৩০ ইঞ্চি জায়গার ওপরে মাচানে দাঁড়িয়ে রাজমজুররা কাজ কচ্ছে।

কলের মানুষ

নূতন আবিষ্কৃত রেডিও দ্বারা চালিত চালকহীন এরোপ্লেনের কথা পূর্ব্বেই কিছু বলা হয়েছে। হালে আমেরিকার ক্রক্‌লীন্ শহরের মিল্‌টন্ টেনেন্ বম্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই এরোপ্লেনে চালক-রূপে থাক্‌বার জন্য এক কলের মানুষ তৈরি করেছেন। জীবন্ত মানুষের মতই এই কলের মানুষ কথা কয়, চুরুট খায় এবং জল বা মদ পান করে! চালক নীচে ব'সে মাইক্রোফোনে কথা কন, সেই কথাই কলের মানুষের বুকে ও পেটে লাগানো লাউড স্পিকারের সাহায্যে তার মুখ দিয়ে বেরোয়। আশ্চর্য্য এই যে, কথা কওয়ার সময় আমাদের ঠোঁট যেমনি নড়ে, কলের মানুষটিরও ঠোঁট তেমনিই নড়ে! চালক যেখানে থাকেন সেখান থেকে শত শত মাইল দূরে গেলেও কলের মানুষটিকে দিয়ে কথা কওয়ানো যায়, আর সিগারেটও খাওয়ানো চলে!

সূর্য্যরশ্মির বিরাট চুল্লী

ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাকড়সার জালের মত একটা বিরাট ফ্রেম। ফ্রেমটিতে শত শত খুব শক্তিশালী লেন্‌স্ বসানো আছে। একজন কারিকর ঠিক মাকড়সার মত ফ্রেমটি ধ'রে লেন্‌সগুলো পরিষ্কার কচ্ছে। শত শত লেন্‌স্ জুড়ে যে বিরাট লেন্‌সটি তৈরি করা হয়েছে তার ব্যাস হচ্ছে প্রায় ১০ ফুট! স্পেন দেশের রাজধানী মাদ্রিদ সহরের এক বৈজ্ঞানিক এটি আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সূর্য্যরশ্মি একটা কেন্দ্রে এসে পড়ে এবং এত উত্তাপ সৃষ্টি করে যে, কাচ এবং যে কোন ধাতু তাতে গ'লে জল হ'য়ে যাবে। এই আবিষ্কারের ফলে অতি কম খরচে বড় বড় কারখানায় কাজ চল্‌তে পারবে। ফ্রেমটীর সঙ্গে একটা মোটর-

চালিত যন্ত্র লাগানো থাকে, সেই যন্ত্রটা এই কাচের বিরাট চুল্লীটাকে সূর্য্যের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সূর্য্য যখন যেদিকে থাকে কাচের ফ্রেমটাও তখন সেই দিকেই ঘুরে যায়।

নীচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক তাপকেন্দ্রে নানান জিনিস ফেলে দিয়ে পরীক্ষা কচ্ছেন।

ডুবুরী জাহাজে টর্‌পেডো স্থাপন

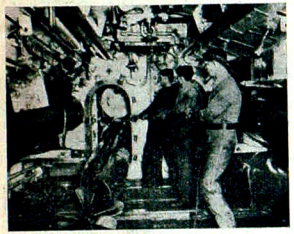

ডুবুরী জাহাজের সব চেয়ে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র হচ্ছে টরপেডো। এক একটা টরপেডোর স্পর্শে বিশালকায় এক একটা যুদ্ধের জাহাজ মুহূর্ত্তমধ্যে হ'য়ে যায় একেবারে চুরমার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, জাহাজের লোকেরা একটা নলের মধ্যে টরপেডো বসাচ্ছে।

আমেরিকার বৃহত্তম ডুবুরী জাহাজ

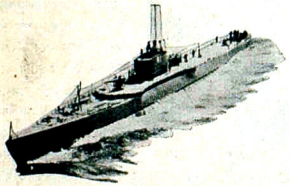

আমেরিকার এই বৃহত্তম ডুবুরী জাহাজের নাম নর্‌হোয়াল্‌। এই জাহাজে ৮৮জন লোক থাক্‌তে পারে। এর গতি হচ্ছে ঘণ্টায় সমুদ্রের ওপরে ১৭ মাইল।

এরোপ্লেনের কক্ষাভ্যন্তর

অতি আধুনিক এরোপ্লেনের কক্ষের অভ্যন্তরের দৃশ্য এই ছবিটিতে কেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! যাত্রীরা মহা আরামে ব'সে আছেন, এরোপ্লেন্‌টা যেন তাঁদের বাড়ীর বৈঠকখানা আর কি!

পৃথিবীর বৃহত্তম ফেরি বোট

আমাদের দেশে খুব বড় নৌকা বা ছোট ষ্টীমার নদী দিয়ে চলে এবং লোক পারাপার করে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সবই অদ্ভুত। "কলকল" নামে এই অদ্ভুত ফেরি বোটটি পৃথিবীর নদীগামী বৃহত্তম ষ্টীমার, তবে ষ্টীমারের মত কয়লায় একে চালানো হয় না, এটা চলে মোটরে। পর্ব্বতের মত বিরাট আকৃতি হ'লেও এর গতিশক্তি খুব বেশী, ঘণ্টায় ১৮ মাইল। এর দৈর্ঘ্য ২৭৬ ফুট, আর এতে একসঙ্গে ধরে ২০০০ যাত্রী এবং ১১০ খানা গাড়ী। ফেরির যে নাম দেওয়া হয়েছে তা নাকি আমাদের দেশের কথা, আর অর্থ 'উড়ন্ত পাখী'।

কাচের শক্তি।

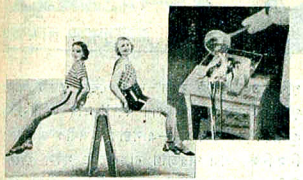

ওহিওতে এক কাচের কারখানায় এমন কাচ তৈরি হয়েছে যে, এর সহনশীলতার শক্তি অসীম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, একটা সরু পাতলা কাচের সিটের দুই প্রান্তে দুইটি মহিলা ব'সে আছেন, কিন্তু ভাঙচে না। পাশের ছবিটীতে দেখানো হচ্ছে,—একটা খুব পাতলা কাচের সিট বরফের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কাচের ওপরে সীসা গালিয়ে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে; কাচ ফাটুচে না। একটা চতুষ্কোণ পাতলা সিটের ওপরে এক মহাকায় হস্তীকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে কাচের সিটের কিছুই হয় নি, অর্থাৎ প্রচণ্ড উত্তাপ, শৈত্য এবং অত্যন্ত গুরুভারও পাতলা কাচের সিট অনায়াসে সহ্য করতে পারে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ডুবুরী জাহাজ

ফ্রান্সের সার্‌কুট্‌ নামক এই বিশালকায় জাহাজখানি হচ্ছে পৃথিবীতে বৃহত্তম ডুবুরী জাহাজ। এটাকে পাতালের যুদ্ধ জাহাজ বলা যায়। আশ্চর্য্য এই যে, এর মধ্যে একটা এরোপ্লেন্‌ও থাকে।

বন্যা

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

এসেছিলে তুমি মোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাহীন উল্লাস-হিল্লোলে,
পরিপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গীত-মুখর কলরোলে
চেয়েছিলে তব হিয়া যুক্ত ক'রে দিতে মোর সাথে।
তরুণ উষার আলো প'ড়েছিল তোমার বয়ানে,
তোমার রহস্যময় অধরে, কপোলে, কেশপাশে;
অকুণ্ঠ দেবীর মতো প্রস্ফুটিত যৌবন-উচ্ছ্বাসে
চেয়েছিলে মোর পানে স্মিতহাস্য-উজ্জ্বল-নয়ানে।

চাহিনি সেদিন আমি সেই ব্যগ্র আকুল আগ্রহে
প্রসারিত বাহু তব; তুচ্ছ ক'রেছিনু ও হৃদয়
যশ পেতে, খ্যাতি পেতে ইচ্ছা ছিল ব'লে; কত ভয়,
উচ্চাকাঙ্খা-নিরাশাতে দ্বন্দ্ব কতো। আর কিছু নহে।
আজ তুমি কতো দূরে!
ব্যাকুল প্রাণের ডাকে মোর
দেবে না কি সাড়া তুমি?
হবে না কি দুখনিশি ভোর?

—:০:—

(১২)

সাইগন

ফুংম পেন হ'তে মোটর ভ্যানে আবার রওনা হলেম, ইন্দোচীনের Saigon বন্দর অভিমুখে। দুপুর বেলায় কাম্বোজ সীমানা অতিক্রম করে কোচিন চীনের মধ্যে গাড়ী চলতে থাকে।

গাড়ীতে লোক ভর্ত্তি। কিন্তু কথা কার সঙ্গেই বা বলি। অন্তহীন সমুদ্রে যেমন তৃষ্ণাহরা এক বিন্দু বারি নেই, তেমনি আমাদের এই ধরণীর দেশের পর দেশে, জনারণ্যের মাঝে বিদেশীর কথা বলার উপায় নেই, বা থাকলেও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। দুটিলোক,—দুটি সুশিক্ষিত সভ্য কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ, যদি গাড়ীতে পাশাপাশি ৫ ঘণ্টা কাল বসে কাটায়, কিম্বা জাহাজের কেবিনে একত্রে ১৩ দিন বসবাস করে, তবু তাদের মধ্যে ইঙ্গিতে এক আধটা ভাবপ্রকাশ ছাড়া এখনও অন্য উপায় আবিষ্কার হয় নি। এ অসহায়তা ও ব্যর্থার পরিসীমা কোথায়! সভ্য মানুষ যতদিন না দুনিয়ার সকল দেশের সভ্য মানুষের সঙ্গে অন্ততঃ ভাব প্রকাশের ও কথাবার্ত্তা বলার উপায় বাস্তবে পরিণত করতে পারবে, ততদিন মানুষ সভ্যই হয়নি স্বীকার করতে হবে। পৃথিবীর এক প্রান্তের জ্ঞানী, দার্শনিক ও কবির সকল সম্পদ অন্য প্রান্তে হয়ে থাকে স্তব্ধ কিম্বা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। গান্ধীর সঙ্গে রোমাঁ রোলাঁর কথোপকথন হতে পারে অন্য লোক সাহায্যেই। চীনা দার্শনিক কিম্বা ইরাণের কবিশ্রেষ্ঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনা হ'তে পারবে না সোজাসুজি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম আবেদন ও বক্তৃতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কত বিদ্বৎ-জনের মাঝেও নিরর্থক। তাই সভ্যতার গৌরব করা পৃথিবীতে আজও সম্ভব নয়। কোন একটি জাতি পৃথিবীর সমস্ত দেশ অধিকার করে', তার ভাষা সর্ব্বত্র প্রচারিত করতে পারবে—এ সম্ভাবনা অলীক ও মিথ্যা। নিজ নিজ ভাষা পরিত্যাগ না ক'রেও সকল দেশের শিক্ষিত নরনারী আরও এমন একটি সহজ ও সুন্দর ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না কি, যা হবে পৃথিবীর সকল শিক্ষিত নরনারীর পরিচিত? সভ্য জগতে এমন দিন কবে আসবে?

কাম্বোজের শ্রমণ

মাতৃভাষার প্রয়োজন যদি স্বদেশে থাকে, বিদেশে তা আরও বেশী! ভাষা এক হলেই যে মানুষে মানুষে, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের লোকের মাঝে ঐক্য, প্রেম ও মিলই চলতে থাকবে তা নয়, তবে ভাষা জানলে মানুষে মানুষে যে মিল, ঐক্য ও প্রেম আছে, তা প্রকাশিত

হওয়ার ও জানবার উভয় পক্ষে কত না সুযোগ ও আনন্দ ঘটে। বিশ্বসংসারে কত কিছু আনন্দের আছে, কিন্তু যে টুকুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সেখানটিতেই আনন্দ। অন্য সব আমার কাছে শূন্য। চোখ না থাকলে ফুলের ও ফলের রূপ শূন্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় না থাকলে গন্ধ নাই, রসনা না থাকলে রসবোধ কোথায়? ভাষা না থাকলে অন্তরের প্রকাশ ও স্পর্শ নিতান্ত সীমাবদ্ধ। প্রকাশ না থাকলে পরিচয় কোথায়? পরিচয়ের আনন্দ আছে। এ আনন্দে যে বাধা পেয়েছে, সহজ সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে সকল দেশে সর্ব্বত্র মেশবার বা কথা বলবার অন্তরায়ে যে ব্যথা পেয়েছে, সেই জানে। সভ্য জগৎ এ চীনা প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে আজও মাথা ঠুকছে। অথচ সকল দেশের সভ্য মানুষের দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা মিললে এ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের পথ হতে পারে সহজে। জগতে সেদিন আনবে একটা নবতর যুগ।

ইন্দোচীন ওটি কয়েক প্রধান প্রদেশ—কাম্বোজ, আনাম, টংকিন, কোচিন চীন—নিয়ে গ্রথিত, এদিককার ফরাসী সাম্রাজ্য। সাইগন হ'ল ফরাসী অধিকৃত এই সমগ্র ভূখণ্ডের প্রধান বন্দর। বিকালের দিকে সাইগনের বেতার বার্ত্তার সুউচ্চ থামগুলি দূর হ'তে চোকে পড়ে। ক্রমে সহরের নানা প্রকাণ্ড ও বড় বড় বাড়ী অতিক্রম করে সাইগনের বাজার। গাড়ী থেকে নেমে, কোন রকমে উপযুক্ত হোটেল সন্ধান করে ঘর নিলাম। হোটেল লুইর ঘর অনেক, 'লিফ্‌ট' প্রভৃতি আধুনিক ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু সামান্য ইংরাজি বলতে পারে এমন লোকও নাই।

ফরাসী প্রতিষ্ঠিত নবনগরী এই সাইগনের বিস্তৃতি কতকটা আছে, কিন্তু তেমন একটা লোকবহুল সহর নয়, লাখ খানেকের কাছাকাছি ধরা যেতে পারে। রাস্তাঘাটগুলি বেশ চওড়া, ওটি কয়েক 'বুলভার'ও আছে। হোটেলগুলির নীচের তলায় প্রশস্ত ফুটপাথের ও খানিকটায় পান ভোজনের টেবিল চেয়ার থাকে। রৌদ্রের সময় খানিকটা পরদা ফেলে দেয়। কোন 'কাফে'তে Miniature Billiards Tableএর আড্ডায়

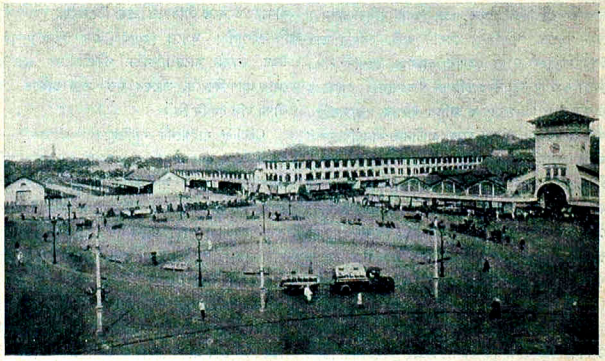

প্রধান বাজার (Central Market)

ফরাসী 'গেণ্ডারমি'দের আমোদে উল্লাস দেখা যায় সন্ধ্যায় আলো জ্বললেই।

সেণ্ট্রাল মার্কেটটি হল সাইগন সহরের একটি প্রধান কেন্দ্র। এর ক্লক টাওয়ারের সামনের দিকে গোলাকার একটি পার্ক। এর সামনের রাস্তার মত প্রশস্ত পথ সচরাচর চোকে পড়বে না। মার্কেটের ভিতর দিকটায় শুধু তরিতরকারী ও মাছ মাংসের বাজার। বাহিরের দিকটায় হরেক রকম জিনিষের দোকান পাট। সন্ধ্যার আগেই দেখা যায় মার্কেটের ভিতর দিককার সকল ফটকগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিষ্কার করে সর্ব্বত্র ধুয়ে রাখা হয়, পরের দিনের জন্য রাখা থাকে না।

রু কাটিনায় (Rue Catinat) হচ্ছে সাহেব-পল্লীর অলমোস্ট সাজান দোকানের সারি। টংকিন ও আনামের শিল্প-সম্ভারের যে নমুনাগুলি সাইগনের দোকান-গুলিতে সজ্জিত দেখতে পাওয়া যায়, তাতে এদিককার শিল্প-কুশলতায় মুগ্ধ হতে হয়। সিল্কের উপর সুন্দর সুচের কাজ এখানকার প্রসিদ্ধ। টংকিনের Brass Wares চমৎকার বস্তু। তামা বা অন্য কি মিশিয়ে আর কি রং দিয়ে করে এরা, কখন মলিন হয় না। যেমন গড়নের পরিকল্পনা, তেমনি রংটি, তেমনি তার উপর মনোরম কাজ, তেমনি ভারি ও তেমনি দাম। ফুলদানি ও ধুনোদানি প্রভৃতি যে কত আকার প্রকারের ও কত সুন্দর! কাঠের ও হাতির দাঁতের কাজগুলিও অতি চমৎকার! চীনা হচ্ছে প্রাচীন ও নানা শিল্পকুশল জাতি। টংকিন, আনামও তারই দক্ষিণের প্রতিবেশী। চীনা শিল্প ও সভ্যতা ইন্দোচীনের টংকিন ও আনামের মাঝে বহুভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আনামি মেয়েদের খোঁপায় পাথর বসান ফুল-কাঁটাগুলি কি সুন্দর ও কি সুরুচির পরিচয় দেয়। হাতে প্রবালের মত বালাও খুব চলতি। খড়মের উপর গালার পালিশও এখানকার বিশেষত্ব।

সাইগনের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে, এখানকার শাশ্বত ভুবন। চিড়িয়াখানার ওপাশে এই মিউজিয়ামটিতে

ইন্দোচীনের কাম্বোজ, আনাম ও টংকিন প্রভৃতির নানা শিল্পদ্রব্য, প্রাচীন পোরসিলেন, এবং প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তিশিল্পের কিছু চিত্তাকর্ষক সংগ্রহ আছে। ভারতের প্রভাব ইন্দোচীনে যাঁরা খুজবেন তাঁরা এই শাশ্বতভবনে অনেকগুলি মনোজ্ঞ নিদর্শন পাবেন। ইন্দোচীনের অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিতে ভারতের ভাব রয়েছে।

সাইগনের প্রধান গির্জ্জার ভিতরে অনেকগুলি মনোরম খৃষ্টীয় মূর্ত্তি ও লিথন আছে। প্রতি ধর্ম্ম-প্রসারের পিছনে মানবের জন্য কিঞ্চিদধিক সেবা আছে, সত্য। কিন্তু churchianityর বর্ত্তমান বিস্তার দেখলে মনে হয়, জগতের যে কোন প্রান্তে, বুদ্ধিবল ও অর্থবল থাকলে এবং বিশেষ করে রাজশক্তি সহায়ক হলে, যে কোন ধর্ম্মপ্রচার করা চলে যেন! আর ভাল কথা ও ভাল আচরণ—এ কোন্ ধর্ম্মেই বা নেই?

গির্জ্জার পরে আছে Great Warএর স্মৃতিস্তম্ভ। ইংরাজের চাইতেও বেশী, ফ্রান্সের বহু প্রজা ন্যায় ও সত্যের জন্যই শুধু সে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল। ন্যায় ও সত্য যেটুকু যখন যেখানেই থাক্, মৃত মানব-জীবনের উদ্দেশ্যে জীবিতের শ্রদ্ধা-নিবেদনের মালাখানি কি মর্ম্মস্পর্শী! জগতে prophet এবং false prophet উভয় রকমই আছে। সত্য পথপ্রদর্শকের জন্য মত লোক প্রাণ দিয়েছে, ভ্রান্তের জন্য তার চাইতে বেশী জীবন বলি হয় নি কি?

Cholon সাইগনের অনতিদূরে আর একটি ভিন্ন পল্লী। এখানকার বাজার, দোকানপাট ও বসতি অধি-কাংশ চীনাদের। সাইগনে ট্রামগুলি ট্রেণের মত বৃহদাকার, বাঁশির শব্দটিও সেই মত অনেকটা। অনেক সময় তিনখানা গাড়ী থাকে পর পর। শেষের খানায়, যারা বাজারে জিনিষপত্র বা অন্যান্য ভারি বোঝা নিয়ে যায়, তাদের জন্যই।

সাইগনের পথেঘাটে আনামি বেশী। আনামি মঙ্গোল টাইপ সত্য। চীনার প্রভাব এদের মাঝেও বিস্তর। তবে এদের চেহারায় এমন একটু সরসতা ও

লালিত্য আছে, যা চীনাদের মাঝে সাধারণভাবে নাই। এ জাতি পৃথক এবং এদের ভাষাও ভিন্ন। দেখে মনে হয়, নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি, তবে কর্ম্মঠ। বর্ম্মায় যা দেখিনি, শ্যামে যা দেখিনি, কাম্বোজেও যা নাই, আরও দূরে এসে দেখি এদের মেয়েদের মাথায় রুমালের মত একটু করে আবরণ বাঁধা। কোথায় কোন্ পথ দিয়ে কোন্‌ভাবে ভারতের সঙ্গে এদেরও কিছু মিল ঘটেছিল, আজ তার সূত্রটি আবার কেমন করে হারিয়ে গেছে। প্রাচীন চম্পার কাছে ভারত একদিন পরিচিত ছিল। আধুনিক সাইগন সেই চম্পা দেশের মাঝেই। এখানকার মেয়েদের মাথায় চুল তেলে চিকণ, খোঁপাটিও যেন বাঙ্গালী ধরণের, তবে আধুনিক প্রণালীর চুল টেনে কাণের নীচে অস্বাভাবিক অতিরিক্তভাবে ঢাকা নেই। খোঁপার পাশে পাথর বসান, অর্দ্ধগোলকার ফুল, কাণে দুল, গলায় মালা। কালো কিম্বা সাদা (নানা রঙ বিবর্জ্জিত) পোষাকের মধ্যে এক একটি শুভ্র সুষমা-সম্পন্ন মুখ এবং দুটি সাদা হাত।

সাইগনে ইয়ুরোপীয়ানদের সহিত সংমিশ্রিত আনামি সন্ততি বিরল নয়। এদের আকৃতি ও শারীরিক সৌন্দর্য্য যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে দেখা যায়। ব্যাঙ্ককের পথেঘাটেও এইটি চোখে পড়ে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এই দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়।

টংকিনের অধিবাসীও সাইগনে অনেক। এ হচ্ছে একটা ভিন্ন জাতি। এরা আনামিদের মত ছিপছিপে নয়। রংটা আর একটু পরিষ্কার এবং আর একটু গোলগাল। কতকটা আমাদের ওদিকে সিকিমের লেপচাদের মত। নেপালি, তিব্বতি, ভুটিয়া, লেপচা, খাসিয়া, টংকিনি—পর পর মানব পরিবারের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। এদের কেশে বেণী একটি করে মলমলের ঝাপের মধ্যে থাকে। আর ঝাপে ভরা এই বেণী মাথায় জড়ান থাকে একটা বিঁড়ার আকারে। এখানকার অনেক বড় বড় curioর দোকান-পাট, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুবেশা টংকিনি মহিলারাই দেখছে। এখানকার টংকিনিদের চেহারা ও চলাফেরার মাঝে একটা আভিজাত্য চোখে পড়ে। ইন্দোচীনেও পর্দ্দাপ্রথা দেখা যায় না।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির নর-নারী শিশু, যুবা, বৃদ্ধ,—ভিন্ন তাদের পোষাক, ভিন্ন অনেক কিছু ব'লেই আরও ভাল লাগে। ধরণীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গেলে, সর্ব্বত্রই যদি একই রকম সকল কিছু চোখে পড়ে, তবে তাতে আনন্দের কিছু নেই। এবং তা হবে দুঃসহ। ভুবনের বৃহৎ বাগিচার সবথানি যদি একই রকম ফুলে ভরে থাকে, সর্ব্বত্র, সকল মানুষ, সব সময় যদি ড্রিলের সময়ের মত একই পোষাক পরে থাকে, সকল মানুষ যদি একই সুরে গান গায়, সকল দেশে সকল গৃহ ও তৈজসপত্র যদি একই রকমের হয়, তাতে লাভ কি? এ বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্যরস প্রাণপণে উপভোগ করবার জন্য কিন্তু মানুষের মাঝে প্রাণবন্তা ও সহিষ্ণুতা কত কম! তা না হলে, বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যের পথে টিটকারি পেতে হয়েছিল কেন? কাবুল থেকে আরম্ভ করে জাপান পর্য্যন্ত সকল রকম পোষাকের জন্যই ভারতীয়ের মাঝে বিদ্রূপ, অসহিষ্ণুতা ও রসবোধের অভাব পাওয়া যায় কেন? অন্যের ভাল জিনিষ গ্রহণ করতেও মানুষের বাধে!

ইন্দোচীন হচ্ছে ধরাতলে ভারি একটি চিত্তাকর্ষক প্রান্ত! নানা জাতি, নানা সভ্যতা এখানে বাসা বেঁধেছে, ভেঙেছে, আবার বেঁধে আছে, কত কাল থেকে। সভ্যতায় অনগ্রসর জাতিও আছে Suang Prabang-এর ওদিকে। টংকিন হচ্ছে ইন্দোচীনের উত্তর দিকটায়, সাইগন থেকে আরও অনেকটা পথ। তাই টংকিন সভ্যতাকে এখান থেকে শুধু উঁকি মেরেই দেখা হল। সে সভ্যতার হৃদিমন্দিরে যেয়ে দুরাগত এ পথিকের প্রণাম জানিয়ে আসতে পারলেম না। ধরণীর বুকে, যেখানে, যে প্রান্তে মানবশিশু তার বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে গোষ্ঠিরূপে ফুটে উঠেছে, সেই গোষ্ঠি-সভ্যতার মূর্ত্তিটিকে খুঁজে দেখতে চাই। কোন বিশিষ্ট মানুষকে নয়, কোন বিশিষ্ট মানুষকে বাদ দিয়েও

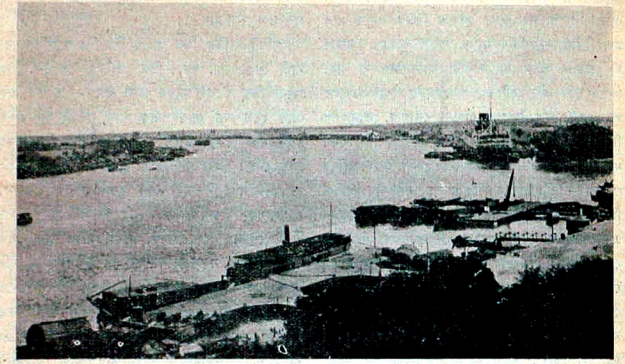

সাইগনের বন্দর

নয়, শুধু কোন বিশিষ্ট লোকের জীবনাঙ্ক, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, রীতিনীতি দেখে নয়, প্রত্যেক জাতির ভাল ও মন্দ সকল কিছু নিয়ে, তার সমগ্রতার একটী করে' বিশিষ্ট রূপ যদি থাকে, তার সামনে যেয়ে নতমস্তকে দাঁড়াতে চাই, আমি সেই তীর্থের পথিক—যাত্রী। কিন্তু সে দেবমন্দিরের দ্বার আমার কাছে খোলে কই? মনের উপর অনেক সংস্কারের আবরণ, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, আত্মাভিমান, সম্প্রীতির অভাব, স্বল্প সুযোগ, সংক্ষিপ্ত অবসর, ভাষার সীমা—কত কি না অন্তরায় হয়ে আছে, যেখানে যাই সেখানেই।

সাইগন থেকে ইচ্ছা করে আরও যেতে—Dalat, Djiving, Quilhon, Touraine, Hue, Vinh, Haiphong, Hanoi প্রভৃতি—প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানব-বৈচিত্র্যের এই চিত্তাকর্ষক কেন্দ্রগুলিতে, তারপর আরও উত্তরে য়ুনানের গ্রামে গ্রামে। কিন্তু মানুষের বাহিরে দেখার সীমা-রেখা বোধকরি কোথাও টানতে হয়। মানুষের যত সময়ই থাক্, তার সময়ের সীমা আছে, অর্থেরও সীমা আছে অনেকের, তাই এ বিশাল পৃথিবীর সকল দ্রষ্টব্য দেখে কেউ কোন দিনই শেষ করতে পারবে না বলে' মনকে বুঝাই।

দেশকে ও জাতিকে দেখা ও জানার মাঝে, ভিতরে ও বাহিরে কত অন্তরায়, তবু সময় সময় মনে হয় এই ভাল। দেবতা আরাধ্য হওয়াই ভাল, নচেৎ পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র যা ছড়াছড়ি, যা অতি সহজ প্রাপ্য, তার অন্তঃস্থলে যাওয়ার ব্যাকুলতা কোথায় বা কতটুকু? আমরা সকলেই জানি বহুর মাঝে, পৌনঃপুনিকতার মাঝে, অনায়াসলভ্য নিশ্চয়তার ও দৈনন্দিন পাওয়ার মাঝে আমাদের মন ঝিমিয়ে থাকে। তাই মনে হয়, এই ভাল; যা কিছু ক্ষণিক ও অসম্পূর্ণ দেখলাম, জানলাম, আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করতে পারলাম, অনাদর দিয়ে অপমান করে চলবার উপায় নেই এখানে। বহুকালের বহু সুযোগের মাঝে বস্তু ও ব্যক্তির দেখা ও জানার জন্য বিস্ময়টি আমাদের থাকে না। স্বল্পক্ষণের স্বল্প সুযোগের মাঝে, বিস্ময় ও পুলকের স্বর্ণদণ্ড স্পর্শে আমাদের দেখা ও অনুভবের সীমাকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেক বেশী,—তখন এমন একটু দ্বার খুলতে

পারে যেখানকার সংক্ষিপ্ত দেখাও আমাদের সার্থক হয়। ..... ভাষা (জিভ্ ও কান) যেখানে কাজ করে কম, চোখ ছুটে' কাজ পায় বেশী। কোন দেশের বা জাতির গুটি-কয়েক লোক দেখে, তার মধ্য দিয়ে সে জাতির সমগ্র রূপটির সত্য পরিকল্পনাও খানিকটা সম্ভব,—দেহের মনের, পোষাকের, আচার, রীতিনীতি, শিল্পকলা ও ভাষার একটি বিশিষ্ট ধারা ও ছাপ নিয়ে যেখানে জাতির প্রত্যেকটি মানুষ চ'লে এসেছে, কতকাল ধ'রে!

——:•:——

কি যেন হারায়ে গেছে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি
এ বিশ্বের আলো অন্ধকারে।
কি যেন হারায়ে গেছে—কি যেন খুঁজিয়া ফিরি
উষা সন্ধ্যা বেলা—
রূপা নয় সোনা নয় পদ্মরাগ মণি নয়
চুনি পান্না পোখরাজ পরশ-পাথর নয়,
কিশোরী মেয়ের এক সচপল চলা নয়
তরুণী চোখের দুটী তারকার আলো নয়
দেহের বাঁশীতে বাজা জ্যোতির সঙ্গীত নয়
মর্ম্মে তার উজলিত প্রেমের প্রদীপ নয়—
কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি—
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি ধরার ধূলায়।

কি যেন হারায়ে গেছে!—
কি যেন হারায়ে গেছে—
নিভে-যাওয়া প্রদীপের নিঃশেষ শিখার মতো
বরষা-রাতির শেষে মিলন-স্মৃতির মতো
বসন্তের ভুলে-যাওয়া সবুজ মায়ার মতো
মনে আসে আসে যেন—নাহি পড়ে মনে
কি যেন হারায়ে গেছে।
বাতাসে করিয়া ভর ভেসে আসে কপোতের উদাস সঙ্গীত,
নীলিমা-সাগরে ভাসে স্বপনের ছায়া ওই দূর নভোগায়,
কোথা হ'তে কে বা যেন বাঁশরি বাজায়—
মোর শুধু মনে আসে—আসে—আসে যেন
কি যেন হারায়ে গেছে—
কি যেন হারায়ে গেছে—নাহি পড়ে মনে।
উষাবায়ে দূর্ব্বাদলে শিহরে শিশির,
সন্ধ্যারাতে দূর নভে জ্বলে এক তারা,
রূপালি জোছনা রাতে জোছনার সুর পড়ে ভেঙে ভেঙে দিগন্তের গা'য়
ফাল্গুনী পূর্ণিমা সাথে আমের মুকুলরাশি সুবাস ছড়ায়,
মোর শুধু মনে জাগে—কি যেন হারায়ে গেছে—
কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি—
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি ধরার ধূলায়।

কি যেন হারায়ে গেছে!—
কবে যে হারায়ে গেছে নাহি পড়ে মনে—
বুঝি গেছে শৈশবের বিদায়-বেলায়
নবীন আঁখির দুটী উজল তারায়
সঙ্গোপনে ছিল আঁকা সহজ সঙ্গীতে
অবলীলার ভঙ্গিতে।
কবে যে হারায়ে গেছে নাহি পড়ে মনে—
বুঝি গেছে কৈশোরের ফেলে-আসা তীরে
ধমনী-শোণিতে ছিল কোন্ মন্ত্র দিয়ে কোন্ যাদুকরী মায়া,
উষা হ'তে সন্ধ্যাবধি অজ্ঞেয় কে চলিত সঞ্চরি'
প্রাণের গোপন পথে পুলক-মূর্চ্ছনা
মুঞ্জরিয়া হেলায় লীলায়;
বনে উপবনে ফোটা কুসুমের রাশে
তারি বর্ণে গন্ধে গীতে,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে, বিহঙ্গম সুরে,
আকাশের নীলিমায়, তারার সঙ্গীতে,
প্রজাপতির ইঙ্গিতে,
সাথীদের কলতানে, সখার প্রণয়ে আর হাসি পরিহাসে
হারায়েছি তারে বুঝি কৈশোরের ফেলে-আসা তীরে
আজি আর নাহি পড়ে মনে—
কিম্বা বুঝি হারায়েছি যৌবনের ভীড়ে
ধন জন যশ মান খ্যাতির তিমিরে
সহস্র আকাঙ্ক্ষা যেথা বাঁধিয়াছে বাসা তার মত্ত লালসায়,
সহস্র লালসা তার দোলায় দোলায়
জীবনেরে করি চলে গভীর বন্ধন।
তারি তলে হারায়েছি—
কিন্তু কি যে হারায়েছি নাহি পড়ে মনে,—
শুধু মনে পড়ে কি যেন হারায়ে গেছে
উষা সন্ধ্যা বেলা।
কি যেন হারায়ে গেছে—কি যেন খুঁজিয়া ফিরি
উষা সন্ধ্যা বেলা।

সোনা নয় রূপা নয় পদ্মরাগ মণি নয়
চুনি পান্না পোখরাজ পরশ-পাথর নয়
কিশোরী মেয়ের কোন সচপল চলা নয়
তরুণী চোখের দুটী তারকার আলো নয়
দেহের বাঁশীতে বাজা জ্যোতির সঙ্গীত নয়—
মর্ম্মে তার উজলিত প্রেমের প্রদীপ নয়—
কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি—
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি এ-জীবন-সিন্ধুর বেলায়।

——:•:——

আর্টের আটচালা

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

দো-আঁশ্‌লা-প্রীতি

সাম্প্রদায়িকতার বিষ শিক্ষাক্ষেত্রে তথা ছাত্রদিগের মনে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার কিরূপ চেষ্টা চলিতেছে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রহায়ণের 'প্রবাসীর' পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'প্রবন্ধমালা' নামে একখানি পুস্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরকার কর্ত্তৃক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকের লেখক—খান্ বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক বি-টি।

হিন্দু ছাত্রদের জন্য উদ্দিষ্ট অংশগুলিতে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করিয়া লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি অবিমিশ্র বাঙ্গলা লিখিতে পারেন। তথাপি মুসলমানদের জন্য উদ্দিষ্ট অংশে 'সোলেহ' 'এবারত' 'মশরেকী', 'মগ্‌রেবী' প্রভৃতি অজস্র উর্দ্দু কথার বুক্‌নী ব্যবহার করিয়াছেন। এইভাবে ভাষাকে "কতল" করিয়া অপভাষার "নীল দরিয়ায় ঢালিয়া" দিয়া লেখক কি সুখ পাইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন! বাঙ্গলার সহিত উর্দ্দু বুক্‌নী জুড়িয়া দিলে, তাহা না হয় বাঙ্গলা, না হয় উর্দ্দু। বিশুদ্ধ উর্দ্দু চর্চ্চা করিতে যাহাদের ইচ্ছা ও শক্তি আছে, তাহারা তাহা করুক; কিন্তু এইরূপ দো-আঁশ্‌লা প্রীতি মোটেই শোভন নহে।

'দুলালী' গল্প

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে শ্রীদুলাল চন্দ্র মিত্র নামক জনৈক লেখক এক 'দুলালী' গল্প লিখিয়াছেন। দুলালী গল্প বলিতেছি এই জন্য যে, উক্ত গল্পে ঘটনার ক্রম কোনও কার্য্য-কারণ বা স্থান-কালের সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম মানিয়া ঘটে নাই, লেখকের আব্‌দার অনুসারে ঘটনাগুলির আকস্মিক ও অস্বাভাবিক আবির্ভাব হইয়াছে।

গল্পটির নাম দ্বিধারা। জনৈক পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটী তাঁহার বিলাতফেরত পুত্রের জন্য যখন অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা খুঁজিতেছেন ততক্ষণে তাঁহার পুত্র ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইয়া ফেলিল—অর্থাৎ একটি অতি-আধুনিকার সহিত প্রেম করিয়া ও বিবাহ স্থির করিয়া পিতাকে সংবাদ দিল। পিতাকে নিরুপায়ভাবে তাহাতেই সায় দিতে হইল—ইহাই হইল গল্পের প্রতিপাদ্য। কিন্তু কি পিতার পুত্রবধূ-অন্বেষণে, কি পুত্রের প্রেম-চর্চ্চায়—কোথাও ঘটনার পারম্পর্য্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইচ্ছামত কথা ও কাহিনী সাজাইয়া গেলেই যে গল্প হয় না, এই কথাটা প্রবীণ জলধরদাদা যদি লেখক মহাশয়কে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল হয়।

ডাক্তারের নাড়ী জ্ঞান

উক্ত সংখ্যা ভারতবর্ষে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক "উপন্যাসের উপাদান" নামে এক বিরাট বক্তৃতাময় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত আধুনিক উপন্যাসের উপর তিনি খড়্গহস্ত। এই সকল উপন্যাসে আছে কেবল "অসংযত চরিত্রের নরনারীর নিতান্ত অসংযত আচরণ…"উপন্যাসে চিত্রিত সমস্ত চরিত্রের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয় যেন কদাচারী হইলেই নরনারীর চরিত্র স্বাভাবিক ও কলাসম্মত হয়।"

এই সকল উপন্যাসে যে সমস্ত সমস্যার কথা আলোচিত হয়, তাহা আমাদের দেশের সমস্যা নহে, বিদেশ হইতে ধার করা—ইহাও লেখকের অন্যতম অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন "বিদেশী ধারকরা ভাব বা সমস্যার মিশ্রণে এক প্রকার অপক্ক দুষ্পাচ্য খিচুড়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে যাহাতে প্রাণের খিঁচুনী বা Intellectual Dyspepsia (Intellectual Dyspepsiaর কি অপূর্ব্ব বঙ্গানুবাদ) ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি।"

লেখক মহাশয় কোন উপন্যাসের বা উপন্যাস সমূহের নাম করেন নাই অথবা কোন্ সমস্যাটি এদেশের এবং কোন্‌টিই বা বিদেশের তাহারও উল্লেখ করেন নাই। যাহা নিজের ভাল লাগে না তাহার বিরুদ্ধে যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিলেই তাহা সাহিত্য সমালোচনা হয় না কিংবা সকল উপন্যাসকেই এক চিহ্নে চিহ্নিত করায় সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি সূচিত হয় না। তাড়াতাড়ির সময় সকল জ্বরেই এক মিকশ্চার ও জোলাপ হাসপাতালে হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সেরূপ তাড়াহুড়া বাঞ্ছনীয় নহে। লেখক মহাশয়ের জানা উচিত যে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (চতুর্থ ভাগ), দিলীপকুমার রায়ের 'দোল'

আধুনিক উপাখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত অথচ ইহার একটিও লেখক-উল্লিখিত কোনও দোষে দুষ্ট নহে।

স্বর্গ ও মর্ত্ত

বৈকুণ্ঠের লোক মর্ত্ত্যভাষায় কথা কহিলে কি বিপদ হয়, তাহার প্রমাণ যদি চান, তো কার্ত্তিকের 'মাসিক বসুমতীতে' শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা লিখিত "ঘুমের মায়া" শীর্ষক কবিতাটি পড়িয়া দেখুন। লেখক প্রথমেই বলিতেছেন :—

"আমার যদি থাকতো পাখা—পাখী হতেম।
যখন খুসী তোমার পাশে আসতে পেতেম।
পাখা আমার নেইকো—আমি নইকো পাখী
তাইতো দূরে মলিন মুখে সরে থাকি।"

লেখকের এই নিদারুণ দুঃখে সহানুভূতি করিবে না এমন পাষাণ-হৃদয় কে আছে? "পাখা আমার নেইকো—আমি নইকো পাখী"—কি মৌলিক ও করুণ আবিষ্কার! কিন্তু শর্ম্মা মহাশয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। মানুষ হইয়া প্রিয়ার কথা ভাবিতে বা ট্রেণে, ষ্টীমারে বা পথ হাঁটিয়া প্রিয়ার নিকট বিলম্বে পৌঁছিতে পারিলে যে সুখ, পাখী হইয়া অবিলম্বে কাছে পৌঁছিতে পারিলে কি সেই সুখ পাওয়া যায়? পাখী হইয়া কাছে গেলে প্রিয়ার হাতের ছাতু খাওয়া ভিন্ন অন্য কোনো সুখ তো পাওয়া সম্ভব নহে। শর্ম্মা মহাশয় কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

লেখক মহাশয় অবশেষে লিখিতেছেন :—

জেগে দেখা পাইনে তোমার স্বপনে পাই!
তাইতো বসে ঘুমের আশে বেলা কাটাই!

আমরাও তাই চাই। লেখক যত শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়েন ততই ভাল; তাহাতে লেখকও সান্ত্বনা পাইবেন এবং কাব্য-সরস্বতীও আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিবেন।

অনশনের এপিডেমিক

মহাত্মাজীর কৃপায় অনশন ব্যাপারটা নানাস্থানের নানালোকের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিল! কিছুকাল পূর্ব্বে কাশী-হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রাহক কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ ভি, এ, সুন্দরম্ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া অনশন করিবেন বলিয়া ব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন। দুগ্ধের সাহায্যে অনশন করিয়া মিঃ সুন্দরম্ কেমন আছেন তাহার পরবর্ত্তী সংবাদ অবশ্য আমরা জানিনা। কিন্তু এই সংবাদ পড়িয়া কেবলই মনে হইতেছে যে, যাহার যখন মাথায় যে খেয়াল চাপিবে তখনই যদি সে সেই খেয়াল চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অনশন লাগাইয়া দেয় তাহা হইলে বোধ হয় মন্দ হয় না! অর্থাৎ ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই মহার্ঘ্যের বাজারে গরীবের কিছু সুবিধা বোধ হয় হইতে পারে!

শিল্প বাণিজ্য ও অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়

১৯৩৩ সনে ভারতীয় বীমা-ব্যবসায় সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৫ বৎসর যাবত—অর্থাৎ অসহযোগ এবং স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পর হইতে—দেশীয় কোম্পানী গুলি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯২০ সনে ভারতীয় কোম্পানী গুলির মোট আয় ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৩ সনে তাহাদের মোট আয় দাঁড়াইয়াছে—৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা অর্থাৎ ৪ গুণেরও বেশী। ভারতীয় বীমাকারিগণ সর্ব্বতোভাবে দেশীয় কোম্পানীগুলিকে সাহায্য না করিলে তাহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না।

রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি আলোচনা করিয়া আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৩৩ সনে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় কোম্পানী কর্ত্তৃক সংগৃহীত নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪ কোটি ও ৯ কোটি টাকা। দেশীয় কোম্পানীগুলি প্রত্যেকটি পলিসিতে (Average amount assured per policy) ১৫৪৭৲ টাকা এবং বিদেশীয় কোম্পানীগুলি প্রত্যেকটি পলিসিতে ৩২১৪৲ টাকার ব্যবসায় সংগ্রহ করিয়াছিল। এতদ্বারা বোঝা

যায় যে, অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণ—যাঁহারা বেশী টাকার বীমা করিতে পারেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশীয় কোম্পানীগুলির নিকট বীমা করেন; এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিগণ অধিকাংশই দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করিয়া থাকেন। ধনী ব্যক্তিগণের পক্ষে বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর প্রতি এতটা প্রীতি-প্রকাশের সপক্ষে কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছিনা। ভারতীয় কয়েকটি কোম্পানীর অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে সন্তোষজনক, যে কোনও ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে এই সমস্ত কোম্পানীতে বীমা করিতে পারেন। এমতাবস্থায়, কোনও ব্যক্তির পক্ষেই বিদেশীয় কোম্পানীতে বীমা করার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালী কোম্পানীর অবস্থা

সরকারী রিপোর্টে বাঙ্গালী কোম্পানীগুলির যে অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমরা আশান্বিত হইতে পারি নাই। বাঙ্গলা দেশে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৬টি কোম্পানী বীমা-ব্যবসায় করিতেছে। তাহার মধ্যে তিনটি মাত্র কোম্পানী—ন্যাশান্যাল, ন্যাশান্যাল ইণ্ডিয়ান এবং ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল—অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ ও বীমাকারীদিগকে বোনাস প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। অবশিষ্ট কোম্পানীগুলির মধ্যে কেহ কেহ বীমাকারীদিগকে বোনাস দিয়াছে বটে, কিন্তু অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারে নাই।

বোম্বাই ব্যতীত ভারতের অন্য যে কোনও প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় বেশী টাকার বীমা সংগৃহীত হইয়া থাকে। অথচ, নূতন ব্যবসা সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী কোম্পানীগুলি অন্যান্য প্রদেশজ কোম্পানীর সহিত পারিতেছে না। বাঙ্গলার অধিকাংশ কোম্পানীই কায়ক্লেশে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে—আর, অন্য প্রদেশজ বহু নিকৃষ্ট কোম্পানীও বাঙ্গলা হইতে প্রচুর কাজ সংগ্রহ করিতেছে। প্রতিষ্ঠাপন্ন তিন চারিটি কোম্পানী ব্যতিরেকে অন্যান্য বাঙ্গালী কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে কেন সুবিধা করিতে পারিতেছে না, তাহার অনুসন্ধান করা এবং বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার করা প্রয়োজন। বাঙ্গালীর মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের এবং বীমা-ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী প্রভুত্ব

জীবন ব্যতীত অন্য সকল প্রকার (অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা মোটর, ভূমিকম্প বীমা প্রভৃতি) বীমা ব্যবসায়ে অভারতীয় কোম্পানীগুলি এখনও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ১৯৩৩ সালে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায় হইতে মোট আড়াই কোটী টাকা প্রিমিয়ম পাওয়া গিয়াছিল। দেশীয় কোম্পানীগুলি তন্মধ্যে মাত্র ৭১ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। অবশিষ্ট ১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ম বিদেশীয় কোম্পানীগুলি হস্তগত করিয়াছিল। ভারতীয় কোম্পানীগুলি বিদেশে সাধারণ বীমার কাজ করিয়া প্রিমিয়ম বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, বিদেশে ভারতীয় কোম্পানীগুলির যেটুকু প্রতিষ্ঠা আছে—ভারতে তাহা নাই; বিদেশে তাহারা যে পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে পারে, ভারতে সে পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে পারে না। ব্যবসায়ী, কল কারখানার মালিক প্রভৃতি ধনীব্যক্তিগণই এই শ্রেণীর বীমা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে বীমা করিলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত—বেশীরভাগ প্রিমিয়ম ভারতীয় কোম্পানীগুলি প্রাপ্ত হইত—তাহাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। ভারতীয় কলকারখানাগুলি আজও স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ লইয়া বাজারে পণ্য বিক্রয় করিতেছে—অতএব তাহারা স্বদেশীয় বীমা ব্যবসায়কে যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়—তদ্রূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের পক্ষে কতটুকু সংরক্ষণ সুবিধা প্রয়োজন, তাহা বিবেচনা করার জন্য ভারত সরকার একটি ট্যারিফ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। বৃটিশ ব্যবসায়ী ও ও অর্থনীতিবিদ্ স্যার অটো নিমেয়ারকে এই বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করায় ভারতীয় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহলে এবং অন্যান্য স্থানে

সরকারী ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। যাহা হউক প্রতিবাদ সত্বেও সরকার স্যার অটোর নিয়োগ বাতিল করেন নাই।

উপর্য্যুক্ত ট্যারিফ বোর্ড বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতে আমদানী বস্ত্রের উপর রক্ষণ-শুল্ক হ্রাসের চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারস্থ বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের একদল প্রতিনিধি উক্ত ট্যারিফ বোর্ডের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে আসিতেছেন। কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশ,—বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলের মালিকগণও নাকি বস্ত্রের উপর সংরক্ষণ-শুল্ক হ্রাসের তীব্র বিরোধিতা করিতেছে।

সংরক্ষণ-শুল্ক বাবদ যে অর্থ আদায় হয়, ক্রেতাই তাহা প্রদান করিয়া থাকে; উহা পরোক্ষ কর মাত্র (Indirect taxation)। বিদেশীয় কলগুলি পড়তা দামের উপর কিছু লাভ রাখিয়া তাহাদের পণ্য বিদেশে চালান দেয়। উহার উপর জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয়ের টাকা যোগ করিয়া যে পড়তা পড়ে, তাহারও উপরে কিছু টাকা লাভ রাখিয়া বিদেশে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হয়। সংরক্ষণ শুল্কের অথবা আমদানী শুল্কের পরিমাণ বাড়াইলে পড়তা দামও বাড়িয়া যায়; এবং ক্রেতাকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিতে হয়। বিদেশী বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কলকারখানাগুলিও স্বদেশী বস্ত্রের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি! ইংলণ্ডজাত কাপড় আমদানী করিয়া কলিকাতার জাহাজঘাটায় প্রতিজোড়া কাপড়ে দেড় টাকা ব্যয় পড়িল। বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ শতকরা ৩৩ টাকা হইলে ঐ একজোড়া কাপড়ের জন্য আট আনা শুল্ক দিতে হইবে; তাহা হইলে আমদানীকারকের গুদামে উহার পড়তা পড়িবে—জোড়া প্রতি দুই টাকা। তাহার উপর আমদানীকারক, মধ্যবিত্ত-ব্যবসায়ী, এবং খুচরা দোকানী আরও চারিআনা লাভ করিবে এবং প্রতিজোড়া কাপড় দুই টাকা চারি আনা মূল্যে বিক্রয় হইবে। শুল্কের হার শতকরা ৩৩এর পরিবর্ত্তে ১৬৷৷০ হইলে প্রতিজোড়া কাপড়ে আট আনার পরিবর্ত্তে চারি আনা শুল্ক দিতে হইত এবং ক্রেতা চারি আনা কম মূল্যে ঐ কাপড় পাইত, সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, শুল্কের হার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যও কম মূল্যে বিক্রয় হইবে।

উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনের ফলে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কারখানার মালিকগণ দেশীয় বস্ত্রের মূল্যও চড়াইয়া দিয়াছে এবং সাধারণ ক্রেতা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্য দিয়া উহা ক্রয়ে বাধ্য হইতেছে। অথচ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বস্ত্রের জন্য এত বেশী মূল্য দেওয়া সম্ভব নহে। বস্ত্রের উপর শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করা এবং তাহার ফলে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করা সম্ভব কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

বৈদেশিক বার্ত্তা

শ্রীপ্রমোদ সেন

ম্যাকডোনাল্ড কুপোকাৎ

ইটালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের হিড়িকে বৃটিশ পার্লামেন্টের একটা সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল; কিন্তু ফল হ'ল 'ঢেলে সাজা', অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের মত রক্ষণশীল-দলের হাতেই রইল। আরও বছর পাঁচেক তারা অপ্রতিহত প্রভাবে বৃটেনের ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে।

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড

রক্ষণশীল দলের এত তাড়াতাড়ি নির্ব্বাচন আসরে নামার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল এবার শ্রমিকদল বেশ ভাল রকমই হুড়ো দেবে। চারিদিকে সেই রকম লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল। এমন সময়ে যুদ্ধের হিড়িকে রক্ষণশীল-দল 'সাজ সাজ' করে রৈ রৈ ক'রে উঠ্‌লো, এবং বল্‌লে বৃটেনের রক্ষার্থে যে আমরা অস্ত্রশস্ত্র বাড়াচ্ছি তা'তে জনসাধারণের সায় আছে কিনা দেখা যাক্। গৃহরক্ষার জন্যে কে না উৎকণ্ঠিত? কাজেই সাধারণ লোক ভাব্‌লে শ্রমিকদলের শান্তিবাদ সময়োপযোগী নয়, সুতরাং রক্ষণশীলদলেরই জয় জয়কার হ'ল।

রক্ষণশীলদল বেশ জানে কিভাবে সাধারণ লোককে ধোঁকা দেওয়া যায়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-ভীতি দেখিয়ে ওরা শ্রমিকদলকে গদি থেকে তাড়িয়েছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ধুয়ো ধর্‌লে শ্রমিকদল জাতির আর্থিক সর্ব্বনাশ করবে, আর শ্রমিকদলপতি ম্যাকডোনাল্ড ভিড়লেন ওদের দলে—আর দলে দলে নরনারী ভোট দিলে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে। অবশ্য বেশী ভোট পেলে রক্ষণশীল দলই। এবারও ব্যাপার অনেকটা ঐ রকমই হয়েছে, তবে শ্রমিকদলের ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনের মত ফেলেঙ্কারী হয়নি।

তবে শ্রমিকদল দলদ্রোহী ম্যাকডোনাল্ডের ওপর এবার বেশ প্রতিশোধ নিয়েছে। এতদিন পরে ম্যাকডোনাল্ডের আর পার্লামেণ্টে স্থান নেই। কিছুদিন আগে রক্ষণশীল দলের ষড়যন্ত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সর্‌তে হয়েছিল। এবার তাঁর 'শ্যামও গেল কুলও গেল।' এখন তাঁকে রক্ষণশীল দলপতি বল্ড্‌উইনের দয়ার উপর নির্ভর করতে হ'চ্ছে। বল্ড্‌উইন নাকি তাঁকে আবার মন্ত্রীসভায় টেনে নেবেন, তবে তাঁর পুত্র ম্যালকলম ম্যাকডোনাল্ডকে নয়। হায়! শ্রমিক দলপতি! ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে যাঁর রাজনীতিক জীবন আরম্ভ, আজ তাঁর এই পরিণতি!

পূর্ব্বেই বলেছি শ্রমিকদল বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি, তবে পার্লামেণ্টে তাদের সদস্য-সংখ্যা প্রায় দেড় গুণ বেড়েছে। মধ্যপন্থীদলের আরও দুর্দ্দশা হয়েছে। তাদের দলপতি স্যর হারবার্ট স্যমুয়েল কুপোকাৎ হয়েছেন। ইনি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রেমে প্রথমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ পেয়েছিলেন, পরে শুল্ক-ব্যাপার নিয়ে কুঞ্জভঙ্গ হ'ল—এবার রক্ষণশীলদল তা'র শোধ নিয়েছে। লয়েড জর্জ্জ নির্ব্বাচনের ঠিক আগেই খুব রাজনীতিক আসর গরম করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দলও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

অথ নির্ব্বাচন ফলং:—বৃটেন সাম্রাজ্যনীতি ও বাণিজ্য-সংরক্ষণনীতি পূর্ব্বের মতই চালাবে। শস্ত্রবৃদ্ধির হিড়িক আগে থেকেই পড়ে গেছে, সেটা পুরোদমেই চল্‌বে। পররাষ্ট্রনীতিতে বৃটেন সময়ে সময়ে বজ্র আঁটুনি দেবে, কিন্তু কিন্তু শেষে গিরো ফস্কা হয়ে যাবে। সব সময়েই "চাচা আপনা বাঁচা" নীতি চল্‌বে। ভারত-নীতি পূর্ব্ববৎ—সাম, দান, দণ্ড—দানটা অবশ্য লৌকিক, তবে তার জন্যে যথেষ্ট আস্ফালন। গৃহনীতিও পূর্ব্ববৎ—জনসাধারণের মঙ্গল সাধনার্থ অনেকটা সোশ্যালিষ্ট নীতির অনুসরণ।

জাতিসঙ্ঘে বৃটেনের খেলা

বৃটেন সব সময়েই গভীর জলের মাছ—ভূমধ্য সাগরের রাজনীতিতেও সে গভীর জলে বিচরণ করছে। ইটালীর বাড়াবাড়ি দেখে বৃটেন জাতিসঙ্ঘের সাহায্যে তা'কে খানিকটা সায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছে, আর এই সুযোগে আবিসিনিয়ার শস্ত্র বেচে সুবিখ্যাত বৃটিশ অস্ত্রকারখানাগুলির লাভের অঙ্ক হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ রণপোতগুলি পূর্ব্বের মত মোতায়েন রয়েছে; ইটালী তা নিয়ে যতই হুঙ্কার দিচ্ছে বা অনুনয় বিনয় করছে সে দিকে বৃটেন বিশেষ কান দিচ্ছে না।

জাতিসঙ্ঘকে নিয়ম রক্ষা করিয়ে বৃটেন বেশ চুপচাপ বসে আছে। ও-দিকে ইটালী আবিসিনিয়াকে যে খুব গুঁতো মার্‌ছে সে বিষয়ে বৃটেনের দৃকপাত নেই, কাজেই জাতিসঙ্ঘেরও নেই। আবিসিনিয়া যখন ইটালীর কুক্ষিগত হবে তখন বৃটেন ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে, এবং বোধ হয় নিজের ভাগ বখ্‌রারও ব্যবস্থা করবে।

জার্ম্মানীকে নৌবহর বৃদ্ধি করতে প্ররোচিত ক'রে, বৃটেন সেই সুযোগে নিজের নৌবহর ও বিমানবাহিনী বৃদ্ধি করতে বিশেষ তৎপর হয়েছে। আবার ফ্রান্সেকেও জার্ম্মান-ভীতি সম্বন্ধে আশ্বাস দিতেও বৃটেন এখন একেবারেই গরুরাজি। কাজেই ফ্রান্সও ইটালীকে বেশী চটাতে চায় না। ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইটালী এই eternal triangleএর লীলা খেলা সাগরপার থেকে বৃটেন বেশ মজা ক'রেই উপভোগ করছে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের গতি

দু মাসের ওপর হ'ল আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলেছে, তবে সেখানে আসলে কি ব্যাপার ঘট্‌ছে তা জানার উপায় নেই। আদ্দিস আবাবা থেকে একরকম খবর আসে, রোম থেকে আসে আর এক রকম। রোমের খবরগুলো দিনের পর দিন পড়লে মনে হয় যে, ইটালীর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপে ভ্রমণ-কালে আবিসিনীয় সম্রাট যুব আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন—এমন কি রোমেও। চিত্রে হাবশী সম্রাট ও সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।

জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে চলেছে এবং তার দুচার জন সৈন্য মাত্র হতাহত হয়েছে। আবার আদ্দিস আবাবা থেকে মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যায় ইটালীর

অতগুলি সৈন্যও সেনাপতি হতাহত হয়েছে, আবিসিনীয়-গণ তাদের ট্যাঙ্ক কেড়ে নিয়েছে, বিমানপোত ভূঁয়ে নামিয়েছে, ইত্যাদি।

মোটের ওপর অবস্থা এই যে উত্তরাঞ্চলে ইটালীগণ কয়েকটা সহর দখল করে ভবিষ্যৎ অভিযানের আয়োজন করছে। দক্ষিণাঞ্চলে তা'রা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে বিমানপোতগুলি আবিসিনীয়দের সর্ব্বনাশ করছে; তা'র উপর বিষবাষ্পও আছে। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র আবিসিনিয়ার এপর্য্যন্ত খুবই কম ছিল, তবে সম্প্রতি কিছু রপ্তানী হচ্ছে। ইটালীয়দের তুলনায় আবিসিনীয়দের রণসজ্জা কিছুই নয়। তবুও তা'রা যে ইটালীয়দের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়ছে এই আশ্চর্য্য।

আবিসিনীয় যুদ্ধের একটী চিত্র। পরিখা খননে আবিসিনীয়গণ পটু নহে, কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থায় গোপনে যুদ্ধ চালাইবার খুব সুবিধা। ঝোপের মধ্যে কয়েকটী সৈন্য মেসিনগান চালাইতেছে।

আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী দেশ আবিসিনিয়া নয় একথা সুবিদিত। বৃষ্টি আরম্ভ হ'লেই মহামুস্কিল। কাজেই ইটালীয়গণ খুবই বাধা পাচ্ছে এবং তাদের অগ্রগতি হয়েছে মন্থর। এতে নাকি মুসোলিনি সন্তুষ্ট ন'ন। কাজেই পূর্ব্ব আফ্রিকার বৃদ্ধ সেনাপতি ডি বনোকে সরিয়ে আনা হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় গেছেন সেনাপতি বোদাগ্লিও। ইনি কি কেরামতি দেখান, দেখা যাক্।

ডি বনো খুব সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন বলে তাঁর গতি চমকপ্রদ হয়নি। নূতন সেনাপতি বোধ হয় ঝটকা মেরে হাব্‌সীদের কাহিল করবেন। আবিসিনীয়রা

ইটালীর ন্যায় আবিসিনিয়ায়ও বালক-সৈন্য আছে।" বালক-সৈন্যের মিছিল আদ্দিস আবাবায় কুচ কাওয়াজ করিতেছে।

বলে যে, তা'রা ইটালীয়দের আস্তে আস্তে দেশের মধ্যভাগে টেনে আন্‌ছে, তা'র পর দেখাবে তা'রা তাদের কৌশল। দেখা যাক্ কি হয়।

জাতিসঙ্ঘের আর্থিক ব্যবস্থায় ইটালী বেশ একটু কাহিল হয়েছে বটে, কিন্তু মুসোলিনি স্পষ্টই বলেছেন যে আবিসিনীয় অভিযান কিছুতেই বন্ধ হবে না। পৃথিবীর প্রায় ৫২টা দেশ ইটালীর পণ্য ১৮ই নভেম্বর থেকে বর্জ্জন করেছে, এবং তাদের মধ্যে কেউ আর্থিক সাহায্যও করবে না। ইটালী পূর্ব্বে থেকেই তা'র জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল—এখন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ট্রেণ মোটরের সংখ্যা কমিয়ে কয়লা ও পেট্রোল সঞ্চয় করা হয়েছে। আহারের বিলাসিতাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিবাহিতা রমণীরা বিবাহের অঙ্গুরীগুলি মুসোলিনির কাছে অর্পণ করছে। এই রকম নানা উপায়ে সমগ্র জাতি যুদ্ধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কাজেই সঙ্ঘের ব্যবস্থায় ইটালী তার গোঁ ছাড়বে না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তার উপর জার্ম্মানী ইটালীতে শস্ত্র-রপ্তানী বন্ধ করেছে বলে, কিন্তু পণ্য-রপ্তানী করছে অবাধে—। জার্ম্মানীকে কারও কিছুই বলার বিষয় নেই, কারণ সে পূর্ব্বেই জাতিসঙ্ঘকে কদলী প্রদর্শন ক'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তবে একটা ভাল খবর এই যে, আমেরিকা ইটালীতে পণ্য রপ্তানী বন্ধ করার যথেষ্ট চেষ্টা করছে।

রুজভেল্টের-আসন টলমল

রুজভেল্ট নানাকারণে আমেরিকার জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছেন। এখন সন্দেহ হচ্ছে তিনি

ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট হুভার; ইনি বোধহয় আগামী বৎসরে রুজভেল্টের সহিত নির্ব্বাচন আসরে নামিবেন।

আগামী বৎসর প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হতে পারবেন কিনা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে তাঁর দলের সিনেটের নির্ব্বাচনে পরাজয় ঘটেছে। আর একটার পর একটা তিনি যে কাজই করছেন, তার সমালোচনায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা পঞ্চমুখ। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা ও কানাডার মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা করেছেন, তা'তে বহু ব্যবসায়ী ক্ষেপে উঠেছে। তাঁর "নব বিধান" নিয়ে গত দু বছর ত' আমেরিকা টলমল করেছে। শেষে আইনের কবলে পড়ে তাঁর শিল্পোন্নতি ব্যবস্থার শ্বাসরোধ হয়েছে। কিন্তু ও ব্যবস্থার এখনও জের মেটেনি। সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট হারবার্ট হুভার তীব্রভাবে রুজভেল্টের কার্য্যাবলীকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করেছেন। আগামী বৎসর রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে হুভার ও রুজভেল্টে আবার লড়াই হবে।

যুদ্ধে নিরপেক্ষতা নিয়ে রুজভেল্টের গভর্ণমেণ্ট খুব গালাগালি খাচ্ছে। এ সমালোচনায় অগ্রণী সুবিখ্যাত কেল্লগ প্যাক্টের জন্মদাতা মিঃ কেল্লগ। তিনি বলেন ইটালী এই যুদ্ধ নিবারণী চুক্তি ভঙ্গ করা মাত্র, আমেরিকার তাহাকে নিন্দাবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু আবিসিনিয়া সম্রাটের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রুজভেল্টের গবর্ণমেণ্ট একেবারে নির্লজ্জভাবে চুপ করে ছিল।

রুজভেল্টের ভাল কাজের মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জকে স্বাধীনতা দান। আর দশ বৎসর পরেই ঐ ক্ষুদ্র দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। এখনই নূতন রাষ্ট্র-নীতি প্রচলিত হয়েছে যার ফলে দশ বৎসর ফিলি-পাইন স্বাধীনতার শিক্ষানবিশী করবে।

জাপানের স্বর্ণ-সুযোগ

আমরা অনেকদিন আগেই বলেছিলাম যে, জাপান ক্রমশঃ চীনকে গ্রাস করবে। আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইউ-রোপ যেন মেতে আছে দেখে জাপান এবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করেছিল, এবং তারপর চীনের মহাপ্রাচীর পর্য্যন্ত স্বত্ব কায়েমী করেছিল। এবার নজর পড়েছে উত্তর চীনের পাঁচটা প্রদেশের ওপর। জাপান দাবী করেছে এই পাঁচটা প্রদেশকে নানকিংএর অর্থাৎ চীনের জাতীয় গবর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করতে হবে।

চ্যাংকাইসেক

জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বরাবরই জাপানের কাছে মাথা হেঁট করে এসেছে। এবারও হেঁট করবে। কাজেই

বোধ হয় বিনাযুদ্ধে ঐ পাঁচটা প্রদেশ জাপানের কবলে যাবে। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নেতা চ্যাংকাই-সেকের কীর্ত্তিকলাপ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি, তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করাই অন্যায়।

সম্প্রতি নাকি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে দক্ষিণ কাণ্টনের জাতীয়দলের (এরা সানইয়াতসেনের মতাবলম্বী) একটা বোঝা পড়া হচ্ছিল, এই হচ্ছে জাপানের আক্রোশের কারণ! আর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন আগে চীনের আর্থিক সুব্যবস্থার চেষ্টা করেছিল এবং প্রস্তাব করেছিল যে চীনকে একটা আন্তর্জ্জাতিক ঋণ দেওয়া হোক। জাপান এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং তারপরই এই নতুন অভিযান। জাপান চীনকে একাই ভোগ করতে চায়। আর বর্ত্তমানে পাশ্চত্য শক্তিবর্গের এরকম অবস্থা নেই যে চীনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়। কাজেই চীনের ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট।

জাপানের আর একটা মতলব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কয়েক বছর হ'ল চীনের সাম্যবাদী দল, মধ্য প্রদেশে বেশ প্রবল হয়েছে। চ্যাংকাইসেক এদের সঙ্গে বার-বার লড়াই করেও এদের কাবু করতে পারেন নি। জাপান এইবার বোধহয় উত্তর চীন থেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। কারণ এদের প্রতিপত্তি যতদিন থাকবে ততদিন সমগ্র চীনে জাপান অধিকার বিস্তার করতে পারবে না।

কায়রোয় হাঙ্গামা

মিশর নিয়ে বৃটেন আবার বিব্রত হয়ে উঠেছে। মিশরের জাতীয়দলের (এরা পরলোকগত জগলুল পাশার অনুবর্ত্তী) আশঙ্কা হয়েছে যে, আবিসিনীয় যুদ্ধের হিড়িকে বৃটেন আবার মিশরে খানিকটা অধিকার কায়েমী করবে। প্রয়োজন হলে ইটালীর নৌ বহরকে সায়েস্তা করবার জন্যে বৃটিশ নৌবহর মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে হাজির হ'য়েছে। এতে মিশরীদের শঙ্কা আরও বেড়েছে। মিশরের বৃটিশ আশ্রিত গভর্ণমেণ্টই প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল যে, বৃটেন এই অজুহাতে যেন মিশরের উপর চড়োয়া না হয়। বৃটেন মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু তা'তে জাতীয় দল সন্তুষ্ট নয়। এই জন্যে কায়রোয় এক হাঙ্গামা হয় এবং তা'তে একজন ছাত্র নিহত হয়। মিশরের জাতীয় দল এই সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘে অনুযোগ করেছে, কিন্তু তাদের প্রতিবাদপত্র যথারীতি ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে।

—:*:—

বিকশিতা

শ্রীদীনেন্দু সুন্দর দাস

অয়ি লাবণ্য-পুঞ্জে!
কেমনে লো সখি পশিয়াছ আজি
আমার জীবন-কুঞ্জে॥
কুসুম-কলিকা সম ছিলে যবে
রূপ-রস-দ্বার রুধিয়া;
কভু তো তোমারে স্মরি নাই নারী
এ দু'টি নয়ন মুদিয়া।

তব জীবনের সোণালী উষায়
হাসিয়াছ কত ছন্দে!
কভুতো সে-হাসি উতলা করেনি
বিভোল মিলনানন্দে॥

(আজি) মধু-যৌবন-প্রাতে
আসিয়াছ অয়ি কল্পনাময়ী
হিরণ কিরণ মাঝে!!

রূপ-রসে আজি ফুটেছে কুসুম,
বিকাশ-পুলকে টুটিয়াছে ঘুম,
নয়নে লেগেছে স্বপন কাজল,
আশার আলোক সাথে।
জীবনের রূপে ফুটিয়া গো নারী
তুষিয়াছ তব নাথে॥

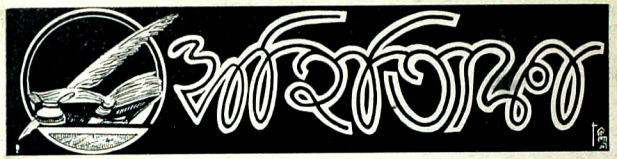

(সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক প্রেরিতব্য)

সঙ্গীত-মঞ্জরী—সঙ্গীত নায়ক ও সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দশ টাকা।

সঙ্গীত সম্বন্ধে এতাবদি আমাদের দেশে দুই একখানি ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কোন পুস্তকই প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য "সঙ্গীত মঞ্জরী" ও "গীতসূত্রসার"। শেষোক্ত পুস্তকখানি সঙ্গীতশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ জটিল, সেইজন্য উক্ত পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই শাস্ত্র শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ সুবিধাজনক নয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তক "সঙ্গীত-মঞ্জরী"-তে গ্রন্থকার সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও বহু স্বরলিপি দিয়া পুস্তকখানিকে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পুস্তকে পরিণত করিয়াছেন। গ্রন্থকার পুস্তকের সঙ্গীত-সাধনা স্তম্ভে বলিয়াছেন—"স্বর ও মাত্রা সংযোগে সঙ্গীতের সৃষ্টি। মনুষ্য কণ্ঠোত্থিত স্বরসমূহের উচ্চতা, কোমলতা, কম্পন প্রভৃতি নিয়মিত করিবার প্রণালী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বাদ্য এবং নৃত্য সঙ্গীতের অঙ্গীভূত হইয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের পূর্ণ ত্রিতন্ত্রী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। সদ্‌গুরু সন্নিধানে শিক্ষালাভ ব্যতীত সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রবেশের অন্য পথ নাই। তথাপি সঙ্গীত সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় এ স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে গুরুপদিষ্ট মার্গে কথঞ্চিৎও প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার দ্বারা সঙ্গীত সাধনার মূলতত্ত্বগুলির আভাস পাইবেন।"

গ্রন্থকার এই পুস্তকে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি এই চারিশ্রেণীর গানের সঙ্কলন অতি নিপুণতার সহিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রাচীন হিন্দি সঙ্গীত সঙ্কলনে যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী (বীরবল) যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। "সঙ্গীতমঞ্জরীর গ্রন্থকার প্রাচীন হিন্দি গীতগুলি সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হন নি। যাতে এই গীতগুলি লোকে শিক্ষা করতে পারে, তার জন্য প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন। এতগুলি গানের নির্ভুল স্বরলিপি প্রণয়ন করা যে কতদূর সময়সাপেক্ষ, তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। তাঁর এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তার প্রমাণ, আমি এমন দু-চারজনকে জানি, যাঁরা ঐ স্বরলিপি দৃষ্টে এর অনেকগুলি গান অবলীলাক্রমে কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, আরও বহুলোক এ গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হন নি।"

সুখের বিষয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন সঙ্গীতবেত্তার চেষ্টায় বাঙ্গলা দেশে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের চর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে অনেকের সুযোগ্য শিক্ষকের অধীনে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা হয় না। তাঁহাদের পক্ষে আলোচ্য পুস্তকখানি অপরিহার্য্য।

শ্রীবিশ্বাসু রায় চৌধুরী

প্রতিশোধ—শ্রীসুহৃৎ নাথ চট্টোপাধ্যায়। অভয় কুটীর, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রোড, বেহালা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

'প্রতিশোধ' বইটি একখানি বাঙলা 'টকি ড্রামা'। আমাদের সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের বই অপেক্ষাকৃত বিরল। গ্রন্থকারের পূর্ব্বপ্রকাশিত 'নবান্ন' ছাড়া আর দু একখানি সিনেমার জন্য লিখিত বই যা আমরা দেখেছি, সেগুলিকে একরকম সাধারণ নাটক পর্য্যায়েই ফেলা যায়।

সুহৃৎবাবুর 'প্রতিশোধের' কথা স্বতন্ত্র। সর্ব্বপ্রথম যে বৈশিষ্ট্যটুকু আমাদের নজরে পড়েছে, তা বইখানির টেক্‌নিক্ অথবা পরিপাট্য। 'প্রতিশোধে' নাটকীয় উপাদানের অভাব নেই, অথচ তা যথার্থতঃ নাটক নয়। গল্পের ধারা কোথাও ব্যাহত হয়নি, বরং অক্ষুণ্ণ আছে—তবুও একে যথার্থ গল্প বলা চলে না। বইখানি কয়েকটি সুসংবদ্ধ খণ্ডচিত্রের সমষ্টি। ঘটনার পারম্পর্য্য, বিপরীত ও দুরস্থিত ছবির আনুষঙ্গিক সংস্থান, এবং স্থানোচিত শিরোনামগুলি কাহিনীর নাটকীয়তাকে ঐক্যদান করেছে। এতে ছবিতোলার কাজে প্রয়োগশিল্পীর গুরুভার লাঘব হয় এবং সম্পাদকের অনাবশ্যক কাজ কমে আসে।

সুহৃৎবাবু অতি কৌশলের সহিত দৃশ্যপট এবং গল্পে বর্ণিত দেশ, কাল, পাত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। ঘটনাস্থল বাঙলাদেশের পল্লী-অঞ্চল,—যেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে স্নিগ্ধ দৃশ্যাবলীর সঙ্গে নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণের মানসিক বিবর্ত্তন ও সূক্ষ্ম সংযোগের আভাস পাওয়া যায়।

একটি জিনিষ বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়, —সেটি হল বইখানির আয়তন। 'প্রতিশোধ' একখানি বড় একাঙ্ক নাটকের সমান। একাঙ্ক নাটকের বিশেষত্ব এই যে, এত স্বল্প আয়তনের মধ্যে লেখক স্বকীয় বিষয়বস্তুকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করে' তাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যান। বড় নাটকে শিল্পী যেরূপ সুযোগ ও সুবিধা পান, ছোট নাটকের সীমাবদ্ধ রূপের ভিতর তার অবসর পাওয়া যায় না। এই জন্যই একাঙ্ক নাটকে গ্রন্থকারের সংযম ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন, এবং কৃতিত্বের পরিমাণ বেশী। 'প্রতিশোধে' আমরা সুহৃৎবাবুর শিল্পকৌশলের কিছু কিছু নিদর্শন পেয়েছি। প্রথম পনর পাতায় তিনি গল্পাংশের অবতারণা করেছেন, পরের তিরিশ পাতায় তাকে পরিবর্দ্ধিত করে শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় তার স্বাভাবিক পরিণতি দেখিয়েছেন।

গল্পের প্রারম্ভ বেশ ভালই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পড়লে মনে হয় যে, লেখক সব জায়গায় সমান তালে চলতে পারেন নি। দু'এক স্থলে কাহিনী একটু শিথিল হয়ে পড়েছে। নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। অনাড়ম্বর পল্লীজীবনের পরিবেশের মধ্যে তারা বেশ সরলভাবেই ফুটেছে। বইএর ভাষা সহজ ও লঘুগতি, তবে কয়েক জায়গায় আমরা দু'একটি মুদ্রাদোষ ও বাক্যের অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছি, যেমন "চালক যেন ঈষৎ রাগিয়া বলিল", "যেন ব্যাঘাহত তার কণ্ঠস্বর", "যেন শ্রান্ত, অবসন্ন তাঁহার চলার গতি", "তাহার মাথার ভিতর একটা বড় করুণ বিষাদ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছিল"—ইত্যাদি। এ ছাড়া যে গানগুলি বইয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলির সংস্কার আবশ্যক।

কিন্তু সাহিত্যিক মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে লেখকের উপর অবিচার করা হবে। নাটকীয় রূপ ছাড়াও বইখানির অপর একটি সার্থকতা আছে—সেটি তার ব্যবহারিক অথবা ব্যবসায়িক মূল্য। সুদক্ষ প্রয়োগশিল্পীর তত্ত্বাবধানে ও নিপুণ সম্পাদনায় 'প্রতিশোধ' সবাক চিত্রে রূপান্তরিত হলে সাফল্য লাভ করবে আশা হয়।

শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

দোলা (উপন্যাস)—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সংসারকে যাঁহারা খেলাঘর এবং সেই খেলাঘরে মানুষের জীবনকে যাঁহারা রঙ্গীন ঠুন্‌কো খেলনা মনে করেন, তাঁহাদিগের নিকট "উপন্যাস" অর্থে এই খেলনা লইয়া খানিক ছেলেমানুষী করা। তাঁহারা চান প্রেমের নামে কতকগুলি চিরপরিচিত গালভরা কথা ও ন্যাকামির মধ্য দিয়া উপন্যাসের সরস ও চিত্ত-চমকপ্রদ আখ্যানভাগটি জমিয়া উঠুক। ট্রেনের যাত্রা-কালে অথবা আহার ও নিদ্রাকর্ষণের মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুকে সুখদায়ী করিতে পারিলেই উপন্যাস তথা ঔপন্যাসিকের যথাকর্ত্তব্য সমাধা হইল। এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পাঠকের তো অভাবই নাই, দুঃখের বিষয় অনেক সাহিত্যিককেও এই দল পুষ্ট করিতে দেখা যায়। ফলে অধিকাংশ বাজার-চলতি উপন্যাসের মধ্যে জীবনের মহাসাগরের কল্লোল শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইয়া উঠে সঙ্কীর্ণ জীবনের পঙ্কিল পল্বলেরই প্রতিচ্ছবি।

'দোলা' এই শ্রেণীর চটুল গল্প-সর্ব্বস্ব উপন্যাস নহে। রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত প্রভৃতি বাদ দিলে বাঙ্গলায় এ ধরণের উপন্যাস বেশি আছে বলিয়া মনে হয় না। তবু ইহাদের চেয়ে আনাতোল ফ্রাঁস, অল্‌ডাস হাক্সলি প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টির সহিত 'দোলার' জাতিত্বই যেন অধিক—অর্থাৎ যেখানে আখ্যানভাগ গৌণ এবং এই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী তাঁহার জীবন ও জগৎসম্বন্ধে সুন্দর ও গভীর অনুভূতিগুলির সুন্দরতম অভিব্যক্তি দিয়াছেন অপরূপ লিপিকুশলতার মধ্য দিয়া।

জনৈক অভিজাতবংশীয় ধনীপুত্র শিল্পী স্বপন প্যারিসে আসে সেখানকার বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী মসিয়ে বেনারের নিকট চিত্রবিদ্যা শিখিতে। গৃহে তাহার অনতিকালপরিণীতা বিদুষী কবিভাবাপন্না স্ত্রী সন্ধ্যাকে রাখিয়া আসিয়াছে। ইউরোপে আসিয়া স্বপনের পরিচয় হইল মসিয়ে বেনারের মডেল আনা, তাঁহার এক চৈনিক শিষ্য চাং ও চাংএর প্রেমাস্পদা স্পেনের অভিজাতবংশীয়া তরুণী ইসাবেলার সহিত। আনা তাহার স্বামী বিখ্যাত তরুণ কবি মরিস্‌কে অন্তরের সহিত ভালবাসে কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভালবাসে নারীর মর্য্যাদাকে, বিশ্বাস করে মানুষের—কি নারীর কি পুরুষের—স্বাধীন সত্য অধিকারে। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা ও পাশব পৌরুষের বিরুদ্ধে আনা করে বিদ্রোহ। ফলে স্বামী করে তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। এদিকে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম ও অনুরক্তি বশতঃ ইসাবেলা ঘর ছাড়িয়া চাংয়ের সহিত বাহির হইয়া পড়ে। স্পেনের বিশিষ্ট অভিজাতবংশীয় কুমারী একটা সামান্য চৈনিকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে—এ চিন্তাও ইসাবেলের পিতা জেনারল সেরানোর অসহ্য। তাই তিনি কন্যাকে উদ্ধার কিংবা তাহা সম্ভব না হইলে উভয়কে হত্যার জন্য লোক লাগাইয়া দেন। সেই বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা স্পেন হইতে নীস্, নীস্ হইতে মার্সেল্‌স্‌এ আত্মগোপন করে। প্রথমে আনা-মরিস এবং পরে চাং-ইসাবেল ঘটনাবর্ত্তের মধ্যে স্বপন পড়িয়া যায়।

ইহাই হইল উপন্যাসের আখ্যানভাগ। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া স্বপনের অভিজ্ঞতা, এবং স্বপনের অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবনের যে বিচিত্র ও গভীর কথা, আলাপ-আলোচনা লেখক আমাদের দিয়াছেন—তাহাই সবিশেষ উপভোগ্য। মসিয়ে বেনার, আনা, মরিস, চাং ইসাবেলা, স্বপন এবং নেপথ্যে সন্ধ্যা—মাত্র এই ছয়টি চরিত্র। কিন্তু এই ছয়টি চরিত্রের মধ্য দিয়া নরনারীর সম্পর্কের যে বিচিত্র বিশ্লেষণ, প্রেমের যে সুন্দর আলেখ্য, জীবনের যে বিচিত্র গতি ও বিস্তৃত পরিধি লেখক পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যে সত্যই

বিরল। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান্। নরনারীর দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠতম ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত আলাপ-অলোচনা তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলির মুখে আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু কোথাও সুষ্ঠু-শালীন তার এতটুকু মাত্রাও অতিক্রম করে নাই। ইহা লেখকের আত্মসমাহিত শিল্পীমনের রসজ্ঞান ও স্বভাবগত মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

"দোলার" ভাষাও হইয়াছে অনুপম। কি প্রাকৃতিক বর্ণণায়, কি চরিত্র-চিত্রণে, কি আলাপ-আলোচনায়—ভাষার সচল গতি, সুন্দর উপমা, স্থানে স্থানে সরস ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি ও গভীর ব্যঞ্জনা অন্তরকে স্পর্শ করে।

—কৈশোর জীবনে মরিসের প্রেমের কবিতা পড়িয়া তাহার আবেগময় মনোভাবের বর্ণনাপ্রসঙ্গে আনা বলিতেছে :—

"কিশোর জীবনের বিকচোন্মুখ কলিকায় প্রেমের রাঙিমা যেন শুধু একটি অনাগত অতিথির চুম্বন-রশ্মিপাতেরই প্রতীক্ষায় আছে—যেমন থাকে—শুভ্রায়মান উষার হাসিটুকুর প্রতীক্ষায় শেষ রাত্রের বজ্রবীথি। তারপর ধীরে ধীরে আধফোটা কুঁড়িটুকু উদ্যত চুম্বনের স্পর্শে ওঠে জেগে,—যেমন জেগে ওঠে বালারুণের সোহাগস্পর্শে ঘুমন্ত বিহগ-কাকলী। এ নিখিল যেন পথ চেয়ে আছে—সেই অনাগত নূপুরধ্বনির জন্যে—কান পেতে। কিশোর মন যৌবনোন্মেষের মাহেন্দ্রলগ্নে পরম অতিথির কিঙ্কিনীর জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে তেমনি অধীর সংশয়ে, তেমনি দোলায়মান আশাভয়ের মাঝে, তেমনি কম-আগ্রহের আঁচল বিছিয়ে। ধরণীর বুকে ফোটে ভাষা—চাঁদের আলোয়, তারার চাহনিতে, পাখীর গানে, কবির তানে। কিশোরীর বুকে ফোটে যৌবন—চির-কিশোরের প্রথম সম্ভাষণে, পেলব মূর্চ্ছনায়, অভিসারের অগ্রদৌত্যে। এ যেন ঘরছাড়া বাঁশীর অচেনা আহ্বান, অজানা মধু। তার সুরলহরীতে বুকের মধ্যে ভয়ের কাঁপনও জাগে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সব-ছাড়ার বেদনার সব-হারাণোর কল্লোল উদ্বেল হয়ে না উঠেও পারে না।......(পৃষ্ঠা ৯১)

অথবা, যেখানে ইসাবেলের সহিত সুন্দর ও ঘনিষ্ঠ সৌভ্রাত্র্য স্থাপনের পর স্বপন নরনারীর সম্পর্কের কথা ভাবিতেছে, সেখানকার বর্ণনাও চিত্তকে স্পর্শ করে :—

—"সত্যি, নরনারীর সম্বন্ধ কত সুন্দর হ'তে পারে! কত পবিত্র! কত কমনী, পেলব, শুভ্র!......কিন্তু হয় না! শুধু হয় না নয়; হ'তে পারে ভাবতে কেন কুণ্ঠা জাগে মনে হয় কবিকল্পনা। কেন মাঝ পথে বাসনার ঘোরালো মেঘ সহজ দৃষ্টির সিত সৈকতকে ক'রে তোলে ঝাপসা! সোজা গতিকে নাড়া দিয়ে ক'রে তোলে সর্পিল! কেন এমন হয়? নরনারীর সম্বন্ধে মধ্যে দেহের ছোঁয়াচে কেন আসে কাল-বৈশাখী ঝড়-তুফান! চক্ষের পলকে কোথা থেকে কী যে ঘটে যায়......কী ওলটপালট...ঘূর্ণী...বিহ্বলতা ...দিগভ্রম, এক একটা সংসার মুহূর্ত্তে যায় ছারেখারে। রইলো বুকভরা অতৃপ্তি। আর বাইরের সুষমা, সামঞ্জস্য যদি বা বজায় থাকে তাহলেও সেইখানেই বা অতৃপ্তির দানবী জঠর ভরে কই? যে টান এত প্রবল, এত মাদকতাময়, এত দুর্ব্বার, সে আনে কেন শুধু, দীর্ঘনিঃশ্বাসেরই বোঝা বহন ক'রে......(পৃঃ ৩১৩)

স্থনাভাবে অধিক উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে।

লেখক যদিও বলিয়াছেন ইহার গল্পাংশ গৌণ, তবুও আখ্যানভাগেরও এমন একটি সজীব নূতনত্ব ও স্বাভাবিক সচলতা আছে যাহা পাঠকের মনকে আগ্রহান্বিত করিয়া রাখে।

রহস্যময় জগৎ ও ততোধিক রহস্যময় জীবনের প্রবাহে গা ভাসাইয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, গভীর অতলে ডুবিয়া মণিমুক্তা সংগ্রহে যাঁহারা অভিলাষী 'দোলা' তাঁহাদের আকাঙ্খিত খোরাক যোগাইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীসুবোধ রায়

মহিলা মজলিস

সঙ্ঘবদ্ধ নারীশক্তি

শ্রীননীবালা মুখোপাধ্যায়

কথাটা নিতান্ত পুরাণো হ'লেও অত্যন্ত সত্য যে, সঙ্ঘবদ্ধ না হ'তে পারলে, শুধু শিক্ষাদ্বারা নারীগণ অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারবেন না। নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সৃষ্টি প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যই। বিভিন্ন প্রদেশের সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী ও মণীষী সভানেত্রী-দের অভিভাষণও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাই বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করে। সম্মেলনগুলি সত্যিই যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীকে একই মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারেন, অন্ততঃ কতক পরিমাণেও, তার চেয়ে বড় আশার কথা আর কিছুই নেই। একটা কথা কিন্তু মনের মধ্যে বড়ই ঘুরপাক খায়। সেটা হচ্ছে এই যে, এই সব সম্মেলনগুলিতে বোধ হয় অভিজাত ও অত্যন্ত শিক্ষিতা মহিলারাই যোগ দিয়া থাকেন, এবং অল্প শিক্ষিতা, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা বেশী দেন না। রাণী, মহারাণী, যুব-রাণীরা সভানেত্রীত্ব করুণ, খুব ভাল কথা, কিন্তু সেই নেত্রীত্ব বছর অন্তে সম্মেলনের অভিভাষন পাঠেই যেন শেষ না হয়। আন্দোলন যদি সম্মেলনের বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাতে সত্যিকার কাজ কিছু হয় কি? দেশের সত্যিকার কাজ সকলকে নিয়েই। এই জন্যে চাই সর্ব্বত্র, ঘরে ঘরে কর্ম্মিদের প্রচার কার্য্য। সম্মেলনের বার্ত্তা নিয়ে যদি অভিজাত ও শিক্ষিতা নারী, তাঁর দরিদ্র, অবজ্ঞাত, অজ্ঞ ভগ্নীর কাছে নেমে আসতে পারেন, তাতেই সত্যিকার কল্যাণ-সাধনের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। এক কথায় মনোভাবের পরি-বর্ত্তন চাই, নইলে সম্মেলন দাঁড়িয়ে যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারীর বার্ষিক social gathering-এ। আমার মনের এই সন্দেহ অমূলক হলে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবেন না, একথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

বেগম শা নওয়াজ এবার কল্‌কাতায় নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের উদ্যোগে আহত এক সভায়ও নারীদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে অনেক মূল্যবান উপদেশই আমরা পেয়েছি। উপযুক্ত মাতা ও উপযুক্ত গৃহিণী হওয়ার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, এবং বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী যে ভারতীয় নারীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন, এবং নারী সম্মেলনও এই কয়েক বছর ধরে একথা প্রচার ক'রে আস্‌ছেন। ইউরোপের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষার একটা মূলগত বৈষম্য আছে। আর ভারতের বৈশিষ্ট্যমূলক শিক্ষা নারীদের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে লিখিল ভারত নারী সম্মেলন দিল্লীতে লেডী আরউইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ খুব আশা ও আনন্দের কথা নিশ্চয়ই। একই আদর্শে শিক্ষা সঙ্ঘবদ্ধতা অনেকটা সহজ করে দেয়।

আজ যে ভারতের চারদিকে নারী-প্রগতির সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাচ্ছে, তার মূলে নারী সম্মেলনের প্রয়াস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ কথাও নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যেতে পারে যে, দেশব্যাপী বিরাট জাতীয় আন্দোলনই এই জাগরণকে এত শীঘ্র এত জীবন্ত করে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর উদাত্ত আহ্বানে ভারতের নারী সমাজের বিধিনিষেধ, বাধা-বিপত্তি চূর্ণ ক'রে দিয়ে স্বদেশের সকল রকম কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

এক জায়গায় একটা বড় খট্‌কা ঠেকে। দেখা যাচ্ছে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের দিল্লী শাখার অধিবেশনের সভানেত্রী রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের অভিমত এবং বেগম শা নওয়াজের

অভিমত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বেগম সাহেবা বল্‌ছেন :—

"তারপর আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের কতকগুলি নাগরিকের অধিকার যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাদের কাজের বিশেষ অসুবিধা হইবে। ইহার ফলে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তাহার অনেকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তারপর তিনি বলেন যে আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আমি হতাশ হই নাই। আমরা যতটুকু ক্ষমতালাভ করিয়াছি তদনুসারে যদি কাজ করিয়া যাই, তবে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন আমরা আমাদের প্রার্থিত জিনিষ লাভ করিব। সেইজন্য আমি চাই যে, আপনাদের যে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা আপনারা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত নিয়োজিত করিবেন।"

রাণী লক্ষ্মীবাই বলছেন :—

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে নূতন শাসনতন্ত্র ভারতের জন্য প্রণয়ন করিয়াছেন, ভারতের নারীরা উহার প্রতি মোটেই সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন, বরং উহা দেখিয়া তাঁহারা একান্ত হতাশ হইয়াছেন। প্রথম এবং প্রধান কারণ নূতন শাসনতন্ত্রের সাম্প্রদায়িক ভিত্তি এবং এই সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে নারীকেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট টানিয়া আনিয়াছেন,—যদিও ভারতের সমস্ত নারী সঙ্ঘ, সমিতি প্রভৃতি এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। মুসলমান, ইউরোপীয় প্রভৃতির ন্যায় নারীদের জন্যও স্বতন্ত্রভাবে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহাদের জন্য নির্ব্বাচক-মণ্ডলীও স্বতন্ত্র হইয়াছে। আমাদের সম্মিলিত দাবী যেভাবে পদদলিত করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা অতিমাত্র হতাশ হইয়াছি। নারীদের জন্য ভোটাধিকার, নির্ব্বাচন-প্রণালী প্রভৃতির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় অতীব গর্হিত।"

বেগম সাহেবা হতাশ হন নি, কিন্তু রাণী লক্ষ্মী বাঈ হতাশ হয়েছেন। বেগম সাহেবার মূল কথা হচ্ছে এই যে, ইংরাজ সরকার কিছুই দেন নি বটে, তবু যা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করতে হইবে, এবং আপাততঃ তাতে সন্তুষ্টও থাক্‌তে হবে। রাণী লক্ষ্মী বাঈ তা মনে করেন না, তাঁর কথা হ'ল এই যে, এতে অনিষ্টই হবে খুব বেশী, কারণ এতেও একটা বিষম সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদেরও তাই মনে হয়। সাম্প্রদায়িকতা একতার এক ভয়ানক অন্তরায়। নারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই—এই কথাই বেগমসাহেবা বলেছেন।

তাঁর একথা সত্যি। অন্তঃপুর যদি এই মহাপাপ থেকে মুক্ত থাক্‌তে পারে, তবে আশা হয় সাম্প্রদায়িকতা দীর্ঘায়ু হবে না। আমাদের দেশের নারীরা, বিশেষ করে পল্লীবাসী নারী প্রায় সকলেই অশিক্ষিতা। জাতি-গঠনে ও একতাবদ্ধ হওয়ার পথে এত বড় অন্তরায় আর কি হতে পারে? সুতরাং রাণী লক্ষ্মীবাঈ যে বলেছেন—উচ্চ শিক্ষার প্রসারের চেয়ে নারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী, তা অত্যন্ত সমীচীন। মেয়েদের দুটো কলেজ প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা না পেলে কাজের কথা শুনবেই বা কে বুঝবেই বা কে?

সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হলে চাই সমপ্রাণতা। বড় যদি ছোটকে ঘৃণা করেন, শিক্ষিতা যদি অশিক্ষিতাকে অবহেলা করেন, তবে মিলন হওয়া কি সম্ভব হয়? আমরা আশা করি যে নারী সম্মেলনের নেত্রীদের এই Inferiority complex নেই।

"আমার দেশের ভগ্নীদের নিকট আমার এই অনুরোধ, যেন তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের উন্নতির চেষ্টায় ব্রতী হন—যেন আলস্যে কালক্ষেপ না করেন। আমাদের জীবন যেন একেবারে খেলার জীবন না হয়—আমরা যেন আমাদের জীবনকে প্রকৃত কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারি তারপর তরুণীদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, তোমরা জাতির স্বার্থের উন্নতির জন্য কি করিয়াছ? সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে তোমাদের জাতিগঠন করিতে হইবে। তোমাদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ এবং ছোটদের নিকট আমার এই উপদেশ যে, সকলে একতাবদ্ধ হউন কারণ একতাবদ্ধ না হইলে আমাদের পতন নিশ্চিত। আসুন আমরা পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা একতাবদ্ধ হইয়া আমাদের উৎসাহকে কেন্দ্রীভূত করি একটী বিরাট জাতিগঠন করিবার জন্য"।

বেগম সাহেবার এই কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। আশা করি আমার ভগ্নীরা যদি এগুলি অন্তরে উপলব্ধি করেন, তবে দেশের মঙ্গল অবশ্য অবশ্যম্ভাবী।

——:*:——

শ্রীসত্যানন্দ শর্ম্মা

অলিম্পিক প্রতিযোগীতা

আগামী বছর জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন সহরে যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগীতা অলিম্পিক খেলাধূলোর অনুষ্ঠান হবে তা আগেই জানানো হয়েছে। সেই সম্পর্কে বার্লিনে কতদূর কি এগিয়েছে তা মোটামুটি এবার আপনাদের জানাবো।

* * *

বার্লিন প্রতিযোগীতার আগে গেল ১৯৩২ সালে আমেরিকার লস এঞ্জেল্‌স সহরে যে অলিম্পিকের অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে নানা কারণে মতদ্বৈধতার জন্যে আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলা বাদ পড়ে যায়। অলিম্পিকে ফুটবল খেলার প্রচলন ১৯০৮ সাল থেকেই চলে আসছিল কিন্তু প্রথম গোলমালের সূত্রপাত হয় ১৯২৮ সালে অ্যামষ্টারডাম প্রতিযোগীতার সময়ে। কিন্তু অ্যামষ্টারডামে তখন বন্দোবস্ত সব হয়ে গেছে, বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে প্রতিযোগী দলগুলিও এসে পৌছে গেছে, তাই ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ সেই গোলমাল কোন রকমে একটা মিটমাট করে সে বছরকার মত নিজেদের মান ইজ্জত রক্ষা করেন। কিন্তু সেই তাড়াতাড়ির মিটমাট বেশী দিন স্থায়ী হোল না, পরের বার আবার ভীষণতর রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। ফলে হোল যে, লস এঞ্জেল্‌সে ফুটবল আর হোল না। কিন্তু সুখের কথা, শোনা যাচ্ছে সব গোলমাল মিটে গেছে, বার্লিন অলিম্পিকে আবার ফুটবল খেলা হবে। যে সব কারণে প্রথম গোলমালের সূত্রপাত হয় সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান করার পর নূতন করে আবার আইনকানুন এমনভাবে গড়া হয়েছে যাতে আর কোনদিক থেকে কোন রকম আপত্তি শোনা না যায়। ফুটবল খেলার বিষয়ে যাঁরা ভারপ্রাপ্ত তাঁরা জানিয়েছেন যে বিভিন্ন দেশ যারা ফুটবল খেলায় যোগদানেচ্ছু, তাদের আগামী ১৯৩৬ সালের ২০শে জুনের মধ্যে নাম পাঠাতে হবে এবং যে সব খেলোয়াড় যাবে তাদের নামও পাঠাতে হবে ১৮ই জুলাইয়ের ভেতর। ভারতবর্ষ থেকে কোনদল অলিম্পিকে ফুটবল খেলায় যোগদান করবে কি না, তা এখনোও ঠিক হয় নি; কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের দেশ থেকেও একটী দল যাওয়া উচিৎ। ভারতীয় ফুটবল সভার (Indian Football Assn.) এ বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

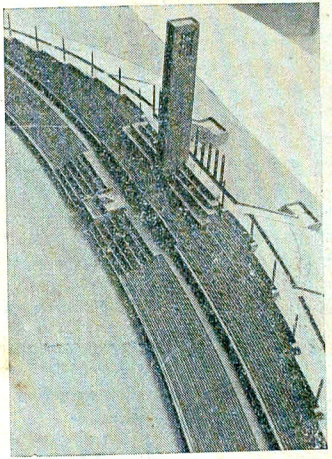

অলিম্পিকে পোলো দর্শকদের আসন সারি।

এবারকার অলিম্পিক সম্পর্কে সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে যে বার্লিনে ১৯৩৬ সালে ১৫ই থেকে ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত একটা আন্তর্জ্জাতিক নাচের প্রতিযোগীতা হবে। প্রত্যেক দেশই ইচ্ছে করলে প্রতিযোগী পাঠাতে পারে। নাচগুলো সম্বন্ধে সঠিক বিচার করবার জন্যে তার কয়েকটী শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, যেমন, ঐতিহাসিক, জাতীয় এবং ঐক্যতান-বাদন সংযোগে নাচ ইত্যাদি। বিশ্বের সকল দেশের নৃত্যবিশেষ নিয়ে নৃত্য-প্রতিযোগীতার বিচারক-সঙ্ঘ গঠন করা হবে।

* * *

এ পর্য্যন্ত মেয়েরা অলিম্পিকে দৌড়-ঝাপ প্রভৃতি বিষয়ে খেলাধূলো দেখিয়ে এবং প্রতিযোগীতা করে এসেছিল। তবে অ্যামষ্টারডাম প্রতিযোগীতার সময় সর্ব্বপ্রথম মেয়েরা জিমনাষ্টিকের বিষয়ে প্রতিযোগীতা সুরু করে, এবং এবারেও তারা জিমনাষ্টিক দেখাবে। তবে তাদের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের প্রতিযোগীদের এই পার্থক্য থাকবে যে তারা কেউ তাদের নিজের নামে প্রতিযোগীতা করতে পারবে না। তাদের হার বা জিৎ তারা যে দেশ থেকে আসবে, সেই দেশের নামে লেখা হবে। এবং এ ছাড়াও মেয়েদের জিমনাষ্টিক দলগত হিসাবে বিচার করা হবে—অর্থাৎ যে দেশের দল সব বিষয় মিলিয়ে বেশী নম্বর পাবে, তাকেই জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে।

অষ্ট্রেলিয়ার খেলা

পাতিয়ালার মহারাজার চেষ্টায় যে অষ্ট্রেলিয়ান দল এদেশে ক্রিকেট খেলতে এসেছে তারা আজ পর্য্যন্ত সাতটা ম্যাচ খেলেছে এবং তার মধ্যে পাঁচটা ম্যাচ তারা জিতেছে, বাকী তিনটে তারা ড্র করেছে। এ থেকে অনেকেই মনে করছে যে অষ্ট্রেলিয়ান দল মহাশক্তিশালী। কথাটা সত্যি কিনা তা বিচার করতে বসার আগেই জেনে রাখা উচিৎ যে এযুগের নামকরা অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় একজনও এ দলের সঙ্গে নেই। যদি এই বিগতশক্তি দলই এ দেশে মহা ক্ষমতাশালী বলে বিবেচিত হয়, তবে ব্র্যাডমান, পন্সফোর্ড, উডফুল, গ্রিমেট এলে লোকে যে কি বলতো আমরা শুধু তাই ভাবছি। এই ভাঙ্গা দলের এ দেশে এত ভীতি উদ্রেকের কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের খেলোয়াড়দের আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাব। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে উইকেট পর্য্যন্ত পৌঁছবার আগেই আমাদের খেলোয়াড়রা আধখানা আউট হয়ে থাকেন এবং বাকিটুকু আর কিছু সময়েই শেষ হয়। ভারতবর্ষীয় বোলাররা অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাট্সম্যানদের বল দেবার আগেই রান দিয়ে বসে থাকেন। আমরা তো মনে করি অষ্ট্রেলিয়ান দল এমন কিছু 'অসাধারণ' শক্তিশালী নয়। নিজের কার্য্যক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখে সাহস করে খেলতে পারলে ওদের হারিয়ে দেওয়া এমন শক্ত কাজ নয়। যাই হোক, আজ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া দল যে কটা ম্যাচ খেলেছে তার একটা মোটামুটি হিসেব নিকেশ নিচে দিচ্ছি।

যাদের বিরুদ্ধে খেলে তারা জিতেছে

(১) সিংহলী একাদশ
(২) পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ
(৩) গুজরাটী একাদশ
(৪) রাজপুতানা ও মধ্যভারত
(৫) সিন্ধুর একাদশ

যে কটা ম্যাচ তারা ড্র করেছে

(১) জামনগর
(২) মহারাষ্ট্র একাদশ
(৩) বোম্বাই সহর

অষ্ট্রেলিয়ার স্বপক্ষে শতাধিক রান

(১) সিংহলী একাদশের বিরুদ্ধে ওয়েণ্ডেন বিলের ১০১ রান
(২) জামনগরের বিরুদ্ধে ম্যাকার্টনীর ১০৬ রান
(৩) গুজরাটের বিরুদ্ধে রাইডারের ১৩৯ রান
(৪) বোম্বাই সহরের বিরুদ্ধে ওয়েল্ডেন বিলের ১০৭ রান
(৫) বোম্বাই সহরের বিরুদ্ধে ব্রায়ান্টের ১৫৫ রান

অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শতাধিক রান

(১) মহারাষ্ট্রের পক্ষে এম, এম, নাইডুর ১২৫ রান
(২) বোম্বাই সহরের পক্ষে এল, পি, জয়ের ১১৫ রান

মিরণা লয় লোকের কাছে যেন রহস্যময়ী হ'য়ে উঠেছেন। কেউ জানে না কোথায় তিনি, তাঁর পরবর্তী চিত্র কী? চারিদিকেই রহস্যভেদের জাল ফেলা হয়েছে—কিন্তু খবর নেই কিছু-ই।

মেরিয়ন মার্শ তাঁকে এবার দেখা যাবে, নতুন রূপে, নতুন ভাবে। নীল নয়ন দু'টির ভেতর থেকে আঁখি-তারকার নতুন খেলা ফুটে উঠবে 'কলোম্বিয়া'-র "দি ব্লাক্ রুম্ মিষ্ট্রী" ছবিতে।

কাননের আনন ভারি নাকি ভাল। লোকে যখন ভাল বলে নিশ্চয়ই ভাল। আর ভাল তাঁর গানের গলা আর সাবলীল অভিনয়। 'রাধা'-র "কণ্ঠহার" আসছে তাতে আমরা দেখব তাঁর সুন্দর অভিনয় আর "কৃষ্ণ-সুদামা"-য় শুনব মধুর গান।

চিত্রালী

রূপ ছায়া

শ্রীমিলন মিত্র

কেবল ভাবি আর অবাক হই। সাগরের পারে এই ছায়াছবি সবার কতদূর আগ্রহের জিনিষ। সবার সম্মিলিত এই আগ্রহ না থাকলে একটা শিল্পের আকাশে এতখানি মাথা তোলা বাস্তবিকই অসম্ভব। অথচ এই আগ্রহটা যাদের—তারা সবাই আমার আপনার মতই লোক। ছায়াছবির সঙ্গে সম্বন্ধ তাদের পর্দ্দার সামনে দর্শকের, ষ্টুডিয়োর সূক্ষ্ম সব নীতি-পদ্ধতির ধার তারা ধারে না। তারাও আপনার আমার মত সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, তাদের ঘরেও সব সময়ে সুখের সোনালী আলো জ্বলে না। তবুও তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা ফুলের সঙ্গে কয়লার। সৃষ্টিকর্ত্তা তো মাঝখানে বিরাট একটা সমুদ্রেরই পত্তন করে গেছেন।

বক্তা—হ্যাঁ, আমার এই বক্তা সাজবার কারণ আর কিছুই নয়—শুধু বিদেশী সংবাদপত্রে এক পাঠকের ছোট্ট একটি চিঠি।

গোল্ড্‌উইন-এর মেয়েরা নাচে, আর রূপে মুগ্ধ করে সবার মন

একবার ছুটি পেলে মডরিন ও' সুলভান-এর আর দেখা নেই। ছুটে দে যায় নীল সাগরের ধারে। সেখানে তার জাহাজ আছে 'মডরিন্'।

প্রায় দু'মাস ধরে' ঐ সাপ্তাহিকে কয়েকজন পাঠক চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করে—যে তাদের এই এই অভিনেতার অভিনয় ভারী ভালো লাগে, তাই তার প্রমাণ স্বরূপ তারা তাদের এতগুলো করে' ছবি জমায়।

বলা বাহুল্য, সম্পাদক চিঠিগুলোয় বিশ্বাস তেমন করেন নি। এই আভাস পাওয়া মাত্র তারা তাড়া তাড়া তাঁকে ছবি পাঠাতে আরম্ভ করে।

সম্পাদক ভদ্রলোক শেষকালটা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে একটি লোককে ঠিক করে' নিলেন। তার কাজ হ'লো—ছবি গোণা। আপাততঃ এই সপ্তাহে ছবির যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা হ'চ্ছে—৬,২৭৫। সংগ্রাহক হচ্ছেন এক মহিলা—নাম, জে, ডুনফয়। তিনি লিখছেন—'আমার এই ৬,২৭৫ খানা ছবির ভেতর ক্লার্ক গেবল্‌এর ছবি আছে ৬৮৯ খানা, আর রবার্ট মন্‌টোগোমারীর ৬০৬ খানা।'

মার্ক—এই তো গেলো ছবি জমানোর কথা। আপনারা বলতে পারেন—যান্ মশাই, অতো উৎসাহ ও সময় নষ্ট করবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। ছবি অনেক দেখতে পারি বটে, তবে জমাতে পারি নে।'

তার উত্তরে আমি জিজ্ঞেস করছি—ক'টা ছবি আপনি দেখেন—একমাসে ?

ঐ সপ্তাহেই আই, জি, ওয়াট্‌সন বলে এক ভদ্রলোককে চরম পরীক্ষা করে' সম্পাদক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—যে—মিঃ ওয়াট্‌সন গত ডিসেম্বর থেকে এই নভেম্বর পর্য্যন্ত ছবি দেখেছেন মোটমাট্ ২৭০ খানা। মানে, মাসে, অন্ততঃ ২৫ খানা ছবি তিনি অত্যন্ত আয়াসের সঙ্গে দেখে এসেছেন। ২৭০ খানার ভেতর তাঁর ২০৪ খানা তৈরী হচ্ছে আমেরিকায়, আর বাকী ৬৬ খানা—বিলেতে। ছায়াছবির সমালোচক তিনি নন, তাঁর চোখে আজ বারো বছর ধরে' চশমা থাক্‌লেও আজ পর্য্যন্ত বদ্‌লাবার প্রয়োজন হয় নি।

মেরিয়ান মার্স এর চেহারায় এমন একটা কিছু আছে—যা অনেক মেয়ের ভেতর নেই। কলম্বিয়া তার কদর বোঝে, তাই কলম্বিয়ারই সে মেয়ে।

'রূপ-ছায়া' যখন লিখ্‌ছি, তখন সময় সন্ধ্যে হলে'ও—বিশ্বাস করুন—গুলি কিম্বা গাঁজায় কোনো রকম আসক্তি আমার নেই। ঐ ভদ্রলোক ও মহিলার নাম, ধাম ও ঠিকানা সবই ঐ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, এবং আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেগুলো রক্ষা করেছি। আপনাদের

প্রয়োজন হলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে সেগুলো আমি পাঠাতে পারি। চিঠি লিখে আপনারাই আমার কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে পারেন।

সেক্স্পীয়ার্কে নিয়ে হলিউড সম্প্রতি যে খুব মেতে পড়েছে—এ খবর গেল মাসে দিয়েছি। 'এ মিড্সামার নাইট্স্ ড্রিম' আপনারা ইতিমধ্যেই হয়তো দেখেছেন, এবং আরো দু'টি ছবি শিগ্গিরই দেখবেন। সে দু'টি হচ্ছে—'রোমিয়ো-জুলিয়েট্' আর 'টুয়েল্ফ্থ নাইট্'। নায়িকা দুটি ছবিরই নির্ব্বাচন হয়েছে, তবে নায়ক এখনও কল্পনার অন্তরালে। প্রথম ছবিটির প্রযোজক ও প্রধান নায়িকা হচ্ছে—মেট্রো গোল্ড্উইন ও নর্ম্মা শিয়ারার। দ্বিতীয় ছবিটির—ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ও মেরিয়ান্ ডেভিস্। রোমিয়োর অংশটির জন্য মেট্রো বিলেতের রবার্ট ডোনাট্কে নেমন্তন্ন করেছিলো। কিন্তু, সে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। লেস্লি হাওয়ার্ডও তাই। নর্ম্মার রোমিয়ো কে হবে—এই ভেবে মেট্রোর চোখে আর ঘুম নেই।

দ্বিতীয় ছবিটির সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে এই যে—মেরিয়ানকে 'টুয়েল্ফ্থ্ নাইট্'-এ মানাবে কি না। ওয়ার্ণার তাতে বলে—মানাবে না কেন শুনি। 'মিড্সামার নাইট্স্ ড্রিম'-এ স্বপ্নেও কি আপনারা ভাবতে পেরেছিলেন জেমস্ ক্যাগ্নি, জো ই, ব্রাউন আর হিউ হার্বার্ট ছবিটিকে মানাবে?

কন্স্টান্স্ বেনেট্

এ কথার প্রতিবাদ আজ পর্য্যন্ত কেউ যে করেছে শোনা যায় নি।

মার্লিন-এর 'পার্ল নেক্লেস্'-এর নতুন নামকরণ হ'লো—'ডিজায়ার'। তবে নায়ক ঠিকই আছে গ্যারী কুপার। পরিচালক—ফ্রাঙ্ক বর্জেস্। এতে ডিট্রিশের বিখ্যাত পা আবার নাকি দেখা যাবে।

এই ডিট্রিশের পা'র কথায় ভারী মজার এক কথা মনে পড়লো।

প্রবাদ আছে বার্ণার্ড শ' যখন পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তখন হলিউডে মার্লিন্-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। সুনামের উজ্জ্বল আলো মার্লিন সবেমাত্র তখন দেখতে আরম্ভ করেছে। ভন্ ষ্টার্ণবার্গ তখন তার সুগঠিত সুন্দর পা'কে বিখ্যাত থেকে বিখ্যাততর করে' তুলছেন।

কথায় কথায় মার্লিন হঠাৎ নাকি জিজ্ঞেস করে—আমার পা আপনার কি রকম লাগ্ছে?

বার্ণার্ড শ' তাতে বলেন—আমায় মাপ্ করবেন ম্যাডাম্, আমি নিরামিশাষী, মাংস আমি খাইনে।

শ' লোকটা ঐ রকম। একদা তাঁর লেখায় মুগ্ধ এক পূজারী গদগদ ভাবে শ'কে জিজ্ঞেস্ করলেন—আচ্ছা, কী করে আপনি ওরকম অদ্ভুত-অনিন্দ্যসুন্দর লেখেন?

বার্ণার্ড শ' তাতে জবাব দিয়েছিলেন—কেন?—ফাউন্টেন পেন্ দিয়ে!

জি-বি-এস্'-এর এই অদ্ভুত আচরণের অনেক উদাহরণই আমি দিতে পারি—কিন্তু, এ 'রূপ-ছায়া', রূপ-রাজ্যের আরো খবর আপনাদের আমার শোনাতে হবে। সিনেমা-হাউসের সংখ্যা কলকাতায় সৌখিন মেয়ের দোদুল-দোলা 'দুলে'র মতই বেড়ে চলেছে। চৌরঙ্গীতে রঙ্চঙ্-এ মেট্রোর মাথায় আলো জলতে না জলতে, নিউ

এম্পায়ার-এর কর্তৃপক্ষ আরেকটি ঘরের নক্সা এঁকে ফেলেছেন। শুনতে পাচ্ছি এর বসন নাকি হবে শুভ্র। মানে, আগাগোড়া মর্ম্মরের এ নাকি হবে আনন্দের মন্দির।

'মেট্রো' ঘরটির বাইরের সাজ হয়েছে গত-যৌবনা এক বাইজীর মত। এর ঘাঘ্ড়া, এর কাঁচুলীতে ভিড়-করা মণি-পান্না, ঠুন্কো আলো ঠিক্রে পড়ে। এক কথায়—রূপের সাধ সে মিটিয়েছে রূপোয়। কিন্তু, তা হ'লে কী হবে!—বাইজীর নূপুরে নাচে উর্ব্বশী, গলায় আছে কোকিল!

বাস্তবিক, 'মেট্রো'র বাইরের সাজ আর ভেতরের সাজে তুলনা হয় না। এর বন্দোবস্ত, এর আব্হাওয়া—সবই নতুন, সবই আধুনিক। তবে বস্বার বন্দোবস্ত—মামুলী, একটু উন্নত ধরণের মান্ধাতা আমলের।

মে ওয়েষ্টের জীবন-যাত্রার প্রণালী অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর তুলনায় একেবারে যে আলাদা—তার প্রমাণ আমরা একবারের বেশী পেয়েছি। সেদিন সে অনুভব করলে তার একটি প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রয়োজন। অন্য লোক হ'লে এ ক্ষেত্রে কী করতো আমরা জানি। খবরের কাগজে দিতো বিজ্ঞাপন, অসংখ্য নরনারী তাদের সঙ্গে করতো দেখা। কিন্তু, মে ওয়েষ্টের মতামত, পছন্দ, পরিচ্ছদ অন্য রকম। ভূতপূর্ব্ব রাজা আল্ফন্সোর সেক্রেটারীকে সে ডেকে পাঠালে। তাকেই সে রাখলো।

ভদ্রলোকের কাজ আর কিছু নয়—এই কয়েকখানা চিঠিপত্র লেখা, আর মে ওয়েষ্ট-এর বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করা।

সিল্ভিয়া সিড্নীর সম্বন্ধে সব সন্দেহ আমাদের ভেঙ্গে গেছে। সে বিয়ে করবে না—এ কথা যে সত্যি নয়, তার প্রমাণ আজ আমরা পেয়েছি।

বেনেট্ কার্ফ বলে এক ভদ্রলোককে সিল্ভিয়া সেদিন তার স্বামিত্বে বরণ করে' নিয়েছে। ভাগ্যবান আমেরিকার প্রকাণ্ড বড় এক সাহিত্য-প্রকাশক।

অনেকে সন্দেহ করছিলো—বিয়ের পর সিল্ভিয়া সিনেমায় নাব্বে কি না। তার জবাবও সে দিয়েছে—হ্যাঁ, তা নাব্বো না কেন? ক্যামেরার সামনে আমি সিল্ভিয়া সিড্নী থাক্তেই চেষ্টা করবো, কিন্তু তারপর, আমার বাড়িতে যখন জলবে ছুটির আলো—আমায় সিডনী বলে' কেউ চিন্তে পারবে না, চিন্তে পারবে মিসেস্ কার্ফ ব'লে।

হলিউডে বিয়ের আগে কিম্বা পরে এ হেন শ্রুতিমধুর বক্তৃতা অনেক নায়িকার মুখ থেকেই শুনেছি। কিছুদিন পরই আবার তাদেরই মুখে শুনেছি—সেই বিশেষ স্বামীর সঙ্গে জীবন চালানো তার পক্ষে অসহ্য।

বিয়ের আসল বাজনা আজ পর্য্যন্ত হলিউডে খুব কম্ বাড়িতেই বেজেছে। ও রূপোর বাঁশীর নকল সুরে আর আমরা ভুলিনে। সিল্ভিয়ার কথার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা তাই আমাদের কম।

এই সঙ্গে হলিউড আর যাদের বিয়ের অপেক্ষায় আছে তাদের কথা একটু বলি।

পয়লা নম্বর হচ্ছে কে ফ্রান্সিস্ আর ডেল্মার ডেভস্। একসঙ্গে এদের দেখা তো যাচ্ছেই, তা ছাড়া এক সঙ্গে প্রায়ই এরা নৈশ-ভোজে উপস্থিত থাকে।

দু'নম্বর—এলেনর পাওয়েল্। পৃথিবীতে মেয়েদের ভেতর যে সব চেয়ে বড় ও বিখ্যাত ট্যাপ্ নাচের নাচিয়ে। তাকেই আমাদের কাছেও আর বিখ্যাত—

জর্জ্জ র‍্যাফ্ট্

মেরী পিকফোর্ড্ তার ভবিষ্যত ঠিক করে' ফেলেছে। সে হবে প্রযোজক। জেসি ল্যাস্কী আর মেরী ভাগাভাগি করে' এখন থেকে তুল্বে ছবি। তাদের প্রথম ছবি হবে—ফ্র্যান্সিস্ লিডারার্কে নিয়ে।

বাঁ দিকে ফক্সের মেয়ে কেটি গ্যালিয়ান্। নীচে ঐ কোম্পানীরই আরেকজন অ্যালিস্ ফে। তারপর—চন্দ্রাবতী—'অচিনপ্রিয়া'। তার নীচে—চোখে স্বপ্ন—ক্যারল লম্বার্ড্।

একটি ছবিতে একবার মাত্র অভিনয় করে' 'ষ্টার' হয়েছে বলে'। এর ভাবী-স্বামীর নাম—এলেনরই সেদিন বলেছে—এর লিম্যান। বাজনা পরিচালনা করা এর পেশা।

তিন নম্বর—নিনো মাটিনী। বিলেতে রিচার্ড্ টবর যেমন গান গেয়ে সবার মন ভোলাতে পারে—নিনো তারই নাকি এক জুড়িদার। মিঃ মাটিনীর ভাবী স্ত্রী—সবাই ঠিক করে' নিয়েছে—অ্যানিটা লুইস্।

আর, তার ভূতপূর্ব্ব স্বামী কী কর্ছে—ডগ্লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্? জাপান নাকি তাঁকে নেমন্তন্ন করেছে ছবি

সেখানে প্রযোজনা করবার জন্যে।

এ নিমন্ত্রণের উত্তর ফেয়ারব্যাঙ্কস্ এখনও দেয় নি।

আমাদের দেশ

চিত্রগৃহ কল্কাতায় শুধু বিদেশী প্রযোজকরাই তৈরী কর্ছেন না। আমাদের দেশী চিত্রগৃহের ভেতর নবতম গৃহ হচ্ছে ইষ্টইণ্ডিয়া-রাধার 'প্যারাডাইস্'। 'মেট্রো'রই কাছাকাছি, রূপে, গুণে, আরামে এও নাকি বড় কম হবে না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বাংলা ছবি—'পথের শেষে' জ্যোতিষ মুখার্জ্জীর পরিচালনায় ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

ওপরে সিল্‌ভিয়া সিড্‌নী। এর বিয়ে হয়েছে নতুন। বাঁ দিকে কানন-বালা—ভারী সুন্দর ওর চোখ। তারপর জিন পার্কার—খালি হাস্‌ছে। তারপর আবার মউরিন।

রাধা ফিল্মের 'কণ্ঠহার' রূপবাণীতে অতি শীগ্‌গীরই মুক্তিলাভ করবে। আস্‌চে বারে চিত্রটি কীরকম হয়েছে

কিছু বল্‌বো।

এঁদের 'কৃষ্ণ-সুদামা'ও প্রস্তুত। তবে কোথায় বা কবে মুক্তিলাভ কর্‌বে এখনও জানা যায় নি।

নিউ থিয়েটার্স-এর 'এ ইউনিটে' প্রমথেশ বড়ুয়া তুলছেন 'গৃহদাহ'। কাজ আরম্ভ হয়েছে।

'বি ইউনিটে' ধীরেন গাঙ্গুলী হাসির ছবি 'অচিন প্রিয়া' তুলছেন।

শোনা যাচ্ছে নীতীন বাবু নাকি নরেশচন্দ্রের একখানি উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবার

ন্যান্সি কারল্—কলম্বিয়ার মেয়ে।

জল্পনা-কল্পনা করছেন।

কালী ফিল্ম্‌স্‌-এর 'প্রফুল্ল' আস্‌চে সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রটির ভূমিকা যা ভারী তাতে মনে হচ্ছে এক অভিনয়ের জোরেই এ বেশ চলে যাবে।

নব প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্র ফিল্ম্‌স্‌' জানুয়ারী মাসেই 'পরপারে'র কাজ আরম্ভ কর্‌বে বলে' প্রকাশ। এ প্রতিষ্ঠানটীর দীর্ঘ-জীবন আমরা কামনা করি।

—

কলম্বিয়ার মেয়ে এই ফ্লোরেন্স রাইস্ প্রতিদিন সুনামের সোনালী আলো মাথায় করে চলেছে। এর অভিনয়ে, এর ভাবে, এর ভঙ্গীতে লোকে অভিনব কিছু দেখ্‌তে পায়।

ছয়ের পাতায়
ড্রু লেইটন

চারের পাতায়
জুন নাইট, মোনা ব্যারী
অ্যালিস্ ফে

তিনের পাতায়
ফ্রাঞ্জেল ফর্‌বোস্

সম্পাদকীয়

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের কনক জয়ন্তীর উৎসব দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে সারা ভারতে উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

কংগ্রেস কনক জয়ন্তী

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছিল, "আবেদন ও নিবেদনের থালা" বহন করাই যাহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কেমন করিয়া অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে তাহা আজ পূর্ণ স্বরাজকামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল তাহার ইতিহাস যেমন মনোহারী তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সেই শত শত বাধা-বিঘ্ন-অতিক্রমের ইতিহাস, সেই দুঃখবরণ ও ত্যাগের ইতিহাস, সেই বহু চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরের আত্মভোলা কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস জাতির মনে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা প্রয়োজন।

সেই জন্য বাঙ্গলা কংগ্রেসের ভাইস্‌প্রেসিডেন্ট হিসাবে জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলির নিকট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র যে আবেদন করিয়াছেন তাহা যথোপযুক্তই হইয়াছে। এক হিসাবে বাঙ্গলাকেই কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিতে পারা যায়। অতএব সভাসমিতি ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদির দ্বারা বাঙ্গলায় যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে ভারতীয় কংগ্রেসে বাঙ্গলার বিশিষ্ট দান কি, সেই কথাটি যাহাতে পরিস্ফুট হয় এই দিকে যেন উৎসব-অনুষ্ঠাতাদের নজর থাকে।

এতদুপলক্ষ্যে কলিকাতা করপোরেশানেও যে উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বিনা-প্রতিবাদে গৃহীত হইয়াছে—ইহা একান্ত আনন্দের কথা।

২৮শে ডিসেম্বরের উৎসব আমাদিগকে উৎসাহে উদ্দীপিত করিয়া যেন ভবিষ্যতের লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিতে পারে, ইহাই প্রার্থনা করি।

সংবাদপত্র জগতে যেমন মুদ্রাকর-প্রমাদ তেমনি সরকারী দপ্তরে বোধহয় কেরাণীর ভুল—নতুবা সুভাষচন্দ্রের নূতন ছাড়পত্রে লণ্ডন গমনের অনুমতিকে নাকচ করা কঠিন হইত।

সুভাষচন্দ্রের ছাড়পত্র

ভাগ্যে, কেরাণীরা ভুল করে, তাই এই একঘেয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের (routine work) মধ্যেও একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অনুমতি-প্রত্যাহারে আমরা ততটা বিস্মিত হই নাই যতদূর হইয়াছিলাম তাঁহাকে লণ্ডন গমনে অনুমতি দানের সংবাদ পাঠ করিয়া। তখনই মনে হইয়াছিল হঠাৎ এতদূর সদাশয়তা বরাতে সহিবে তো!

সংবাদপত্রে যে সকল পত্র প্রকাশিত হয় তাহার উপর সাধারণতঃ মন্তব্য থাকে যে, এই সকল পত্রে প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। এরূপ মন্তব্য স্বাভাবিক, কারণ পত্র-প্রেরকগণ বাহিরের লোক।

সরকারী রিপোর্ট

কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত অর্থাৎ সরকারী চাকুরিয়ার (সাধারণতঃ আই, সি, এস) দ্বারা লিখিত সরকারী রিপোর্ট সম্বন্ধে সেরূপ কথা কি করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। অথচ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৩-৩৪ সালের শাসনবিবরণী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, রিপোর্টটি সাধারণভাবে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত বটে কিন্তু তাহাতে ব্যক্ত সমস্ত মতামত গবর্ণমেণ্টের নহে। অথচ রিপোর্টের মধ্যে কোন্ মতটি সরকারী এবং কোন্‌টি তাহা নহে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উল্লেখ নাই। এসেই Tweedledum ও Tweedledee'র মধ্যে পার্থক্য আর কি!

এই রিপোর্টে অনেক কথাই বলা হইয়াছে যাহার সহিত জনসাধারণ এক মত হইতে পারিবেন না। তবে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একটা কথা বলা হইয়াছে যাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য!

"বাঙ্গলা দেশ হইতে বিপ্লববাদ সমূলে উৎপাটিত হয় নাই, এবং শুধু বিশেষ আইন প্রণয়ন দ্বারা কদাপি বিপ্লববাদের উচ্ছেদ হইবেও না। বিশেষ আইনের বলে লব্ধ ক্ষমতা যদি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় তবেই উহা কিয়দংশে দমন করা যায়। বিপ্লববাদী-দের এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেই বিপ্লববাদের উচ্ছেদ হইতে পারে।"

কি বাহিরের সভা-সমিতি কি আইন-সভা সর্ব্বত্রই এই কথা বলিতে বলিতে ভারতবাসীর গলা প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল, অথচ কোনো সুফলইতো ফলিল না।

জরুরী আইনের মেয়াদবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং রাজবন্দীদের মুক্তির স্বপক্ষে যখনই আমরা কিছু বলিয়াছি তখনই ঐ কথাটার উপরই জোর দিয়াছি যে, "শুধু বিশেষ আইন প্রণয়ন দ্বারা কদাপি বিপ্লববাদের উচ্ছেদ হইবে না……… বিপ্লববাদীদের এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেই বিপ্লববাদের উচ্ছেদ হইতে পারে।"

সরকারী রিপোর্টে যাহা স্বীকৃত হয়, সরকারী দপ্তরে তাহা কবে গৃহীত হইবে?

সীমা-নির্দ্দেশক কমিটী

অগ্রহায়ণের প্রথমেই কলিকাতার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সীমানির্দ্দেশক কমিটীর অধিবেশন তিন দিনের জন্য হইয়াছিল। ইহাতে প্রদত্ত সাক্ষ্যাদি হইতে মনে হয় যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধের বীজ যাহাতে পূর্ণভাবে উপ্ত হইতে পারে, এই কমিটির কার্য্যাবলী পরোক্ষে তাহারই সাহায্য করিবে। সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে মুসলমানদের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১১৯টি আসন সংরক্ষিত হইয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আবার বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আসনের কয়েকটি সুরক্ষিত করার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে।

"মোস্‌লেম চেম্বার অফ কমার্স" নামে একটি ভুঁইফোড় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আসন দাবী করা হইয়াছে এবং বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, এই সাম্প্রদায়িক দাবী সমর্থন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় হইলেও নলিনীবাবুর মনোভাবের সহিত যাঁহারা সম্যক্ পরিচিত আছেন তাঁহারা ইহাতে অবশ্য বিস্মিত হন নাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, এইরূপ চোরাবালির উপর নির্ভর করিয়া দেশের অগ্রগতি যে অসম্ভব—একথা আমরা কতদিনে বুঝিব?

বৃটেনের নব নির্ব্বাচন

এবার বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যপার সপুত্রক র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের পরাজয়। অবশ্য রক্ষণশীল তথা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দলের নেতা মিঃ বল্‌ড্‌উইন দয়া করিয়া ম্যাল্‌কম্ ম্যাকডোনাল্ডকে পার্লামেণ্টের সরকারী দপ্তরে লইয়াছেন এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে উপনির্ব্বাচনের সাহায্যে পার্লামেণ্টে আনার চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি ইহাকে অদৃষ্টের করুণ পরিহাসই বলা যাইতে পারে! এক সময়ের শ্রমিকদলের একচ্ছত্র অধিপতি আজ রক্ষণশীল দলে কৃপার ভিখারী! ইহাকেই বলে রাজনীতি!

এই নির্ব্বাচনে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় বৃটেনের বর্ত্তমান দলবিভেদ সম্বন্ধে; অর্থাৎ সেখানে বর্ত্তমানে রক্ষণশীলদলেরই জয় জয়কার, শ্রমিক এখনও দুর্ব্বল ও অনেকটা ছত্রভঙ্গ! শ্রমিকদলের এই বিচ্ছিন্নতা ও শক্তিহীনতার জন্য মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডেনাল্ড ও তাঁহার গত চার বৎসরের কার্য্যকলাপই দায়ী। সেই হিসাবে শ্রমিকদল তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষাই দিয়াছে।

ভোটযুদ্ধে পরাজিত হইবার পর সংবাদপত্র-প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বেশি কিছু বলিতে অক্ষম কারণ তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তবে, রাজনীতিক্ষেত্রে যতরূপ হীনতা ও নীচতা থাকিতে পারে নির্ব্বাচনের সময় সে সকলই তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। যখন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড একথা বলিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত যে, পদমর্য্যাদার লোভে যে ভাবে তিনি আত্মবিক্রয় এবং দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছিলেন তাহা কি বিশেষ উন্নত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, তবে তিনি কি উত্তর দিতেন তাহা শুনিবার লোভ হয়!

অবশ্য, এই নির্ব্বাচনের ফলাফলে ভারতের বিশেষ লাভ বা ক্ষতি নাই। পার্লামেণ্টের তক্তে যে দল আসিয়াই বসুক না কেন, ভারতের ভাগ্য সেই যথানির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইবে!

ইরাকে ভারতীয় বিদ্বেষ

কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক ইরাকপ্রবাসী ভারতীয় রবীন্দ্রনাথকে ইরাক সরকারের ভারতীয়

বিদ্বেষ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সম্প্রতি বসোরার এম, এন, দীন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী লীডার পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিকট অনুরূপ মর্ম্মের এক সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, "ইরাকের গবর্ণমেণ্ট বাসোরার কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর উপর তিন মাসের মধ্যে ইরাক পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া নোটীশ জারী করিয়াছেন।

ভারতের নিকট ইরাকের ঋণ কম নহে। ইরাকের বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যেই ঘটিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতি বৎসর অসংখ্য ভারতীয় হজযাত্রী এবং দানশীল ভারতীয়দের নিকট হইতে ইরাক বহু অর্থলাভ করে। তৎসত্ত্বেও এই ব্যবহার বাস্তবিকই অতিশয় পরিতাপের বিষয়। কিন্তু পরিতাপ করিলে কি হইবে! নিজের ঘরে যাহার পূর্ণ অধিকার নাই, পরের ঘরে তাহার দাবীর মূল্য কি? সাউথ আফ্রিকাও ভারতবাসীর নিকট কম ঋণী নহে, কিন্তু সেখানেও ভারতবাসীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার কি ভুলিবার!

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ইরাকের এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পরিষদের অধিবেশনের এক স্থগিত নোটীশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতসরকারের মনোভাব এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করা হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

এবারের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কাশীতে হইবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আগামী বড়দিনের ছুটীতে নয়া দিল্লীতে ইহার অধিবেশন হইবে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিয়া এবং নয়া দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটী শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা এই সম্মেলনের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

কবিবর নোগুচি

জাপানের সুবিখ্যাত কবি ও কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক য়েনোজিরো নোগুচি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ভারতে আসিয়া সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি হইতে জাপানের কাব্য ও শিল্প-প্রতিভা এবং জাপানের সংস্কৃতি ও ভাবধারা সম্বন্ধে অনেক নূতন ও জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া গেল। বহির্জগতে জাপান পাশ্চাত্যের পূজারী হইলেও, অন্তরজগতে তাহার এখনও প্রাচ্য ভাবধারা বজায় আছে—ইহাই আনন্দের কথা; এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে য়েনো নোগুচি প্রমুখ ধ্যানী কবি ও শিল্পীদের দ্বারা। ওকাকুরা এবং নোগুচির জাপানের সহিত ভারতের অন্তর-লোকের জ্ঞাতিত্ব চিরদিন বজায় থাকিবে। বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পক্ষ হইতে আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত জাপানী কবিকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

নিখিল উৎকল সঙ্গীত সম্মেলন

আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৫)—এই তিন দিন কটকে নিখিল উৎকল সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। বাঙ্গলা, বিহার ও মাদ্রাজ হইতে গায়ক ও বাদকগণ যোগদান করিবেন। ৭ বৎসরের নিম্নবয়স্ক, ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ও সাধারণ—এই তিন শ্রেণী থাকিবে। নৃত্য, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত,—সকল রকম ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। বালিকাদের স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও আছে।

এই সঙ্গীত সম্মেলনের সহিত আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা আছে। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ভারত সেবক সমিতির সভ্য কটকের মিঃ এল, এন, সাহু ইহার সাফল্যের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আশাকরি এলাহাবাদ ও আগরা প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত সম্মেলনে যেরূপ বাঙলা হইতে বহু গুণী যোগদান করেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটী হইবে না।

ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী কিছুদিন পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল তারা-

কিশোর চৌধুরী। সুদূর শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি এম-এ, বি-এল ও পরে হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহার-জীবী হ'ন। মধ্য বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে কাঠিয়া বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিম্বার্ক সম্প্রাদয়ভুক্ত হ'ন। যে সময়ে তিনি প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার হাই-কোর্টের জজ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, সেই সময়ে তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন এবং পরে কাঠিয়া বাবার দেহরক্ষার পর মোহন্তের গদীতে আরোহণ করেন। তিনিই ব্রজমণ্ডলের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রথম বাঙ্গালী মহান্ত। তাঁহার ন্যায় ভগবদ্বিশ্বাসী, তেজে ও আন্তরিকতায় উদ্দীপ্ত সত্যকার নির্লিপ্ত সাধু এযুগে অত্যন্ত বিরল।

পরলোকে

গত ১লা অগ্রহায়ণ ভারত সেবক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দেবধর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দেড়মাসকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মময় জীবনের প্রধান মূলমন্ত্র ছিল জনসেবা এবং এই জন সেবার অভিব্যক্তি বহুমুখী। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বহুবার দুঃস্থদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি পুণা হইতে দেশীয় ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল উহার সম্পাদকও ছিলেন। বিগত মহা-যুদ্ধের সময় তিনি বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য এবং বোম্বাই সরকারে প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণকালে তিনি সেখানকার নানা দেশের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসেন এবং দেশে ফিরিয়া তিনি সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও আছে। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যকার কর্ম্মী হারাইল।

বিহারের বিখ্যাত জননেতা স্বর্গীয় দীপনারায়ণ সিং-এর অকালমৃত্যুতে আমরা একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। ধনী সন্তানদের মধ্যে এইরূপ নির্ভীক ও আন্তরিক স্বদেশসেবক একান্ত বিরল। তাঁহার প্রদেশের শিক্ষা ও ব্যবসার প্রসারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণের জন্য কারাবরণ করিতেও তিনি পশ্চাদ্পদ্ হ'ন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যকার স্বদেশব্রতী ও স্বরাজ আন্দোলন একজন শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক হারাইল। স্যার তারকনাথ পালিতের কন্যাকে বিবাহ করায় বাঙ্গলাদেশের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে তাঁহার সংযোগ ঘটিয়াছিল। আমরা শ্রীযুক্তা লীলা সিংহকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সম্পত্তি লীলা-দীপনারায়ণ ট্রাষ্ট নামে একটি ট্রাষ্টের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পত্তির যাবতীয় আয় শিল্প-শিক্ষার (Technical education) জন্য ব্যয়িত হইবে। এই দান তাঁহার পিতা তেজনারায়ণ সিং ও তাঁহার শ্বশুর স্যার তারক নাথ পালিত—উভয়েরই জীবন-ধারার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

অল্পদিন রোগ ভোগের পর বিহার ন্যাশান্যাল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ললিত কুমার ঘোষ মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০৬ সালে উক্ত কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যে যোগদান করেন এবং গত মার্চ্চ মাসে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রগুণে জনসাধারণ ও ছাত্রগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বঙ্গের বাহিরে এই কৃতী বাঙ্গালী সন্তানের অকালমৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

চিত্র-পরিচয়।

প্রচ্ছদপট—"নবান্ন"—বাংলা দেশে অগ্রহায়ণ মাসের একটি শ্রেষ্ঠ পার্ব্বণ। চিত্র-শিল্পী শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র। শিল্পীর পরিচয় বাহুল্য মাত্র। তুলিকা ও রংয়ের সাহায্যে অপূর্ব্ব রূপজাল সৃষ্টি করিতে ইনি অদ্বিতীয়। ভবিষ্যতে "চিত্রালী"তে ইঁহার গুণের আরো পরিচয় আপনারা পাইবেন।

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ "খেয়ালী প্রেসে" শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
৯, রামময় রোড হইতে প্রকাশিত।

চিত্রালী—

খেয়াঘাটে

শিল্পী : শ্রীঅজিত কৃষ্ণ গুপ্ত

মুদ্রণ খেয়ালী প্রেস

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এফ, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেড
সম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়

প্রথম বর্ষ | পৌষ—১৩৪২ | ৮ম সংখ্যা

ভৃগুসংহিতা ও জীবন রহস্য

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

(১)

আজ দশ-পনের বৎসর হইতে ভৃগুসংহিতার গণনা লইয়া বাঙ্গালা দেশে বেশ একটা আন্দোলন চলিতেছে আজকাল দেখিতেছি এই গণনা করানো যেন একটা ফ্যাসানে দাঁড়াইয়াছে, ধনি-মধ্যবিত্ত অনেকেই অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ভৃগুর মতে নিজের নিজের কোষ্ঠী-বিচার করাইতেছেন। এই গণনা করাইবার প্রধান পীঠস্থান বা কেন্দ্র বা মূল আড্ডা হইয়াছে কাশী। কলিকাতাতেও দুইচারজন জ্যোতিষী ভৃগুর মতে গণনা করি বলিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এই হুজুগের টানে পড়িয়া প্রতারিতও হইতেছেন। লক্ষ্য করিতেছি, এতাবৎ যে ভাবে কোষ্ঠী-বিচার বা গণনা দেশে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে অনেকটা মন্দা পড়িয়াছে, আর সেই অনুপাতে ভৃগুর গণনা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে, কাশীর অলিতে গলিতে ভৃগু-গণনা কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কাশীকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত ভৃগুগণকগণ ভারতের নানা নগরে তাঁহাদের দালাল রাখিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা মক্কেল সংগৃহীত হওয়ায় গণকগণ বেশ ফালাও ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছেন।

অনেকদিন হইতে ফলিত জ্যোতিষ লইয়া একটু-আধটু নাড়াচাড়া করা আমার অভ্যাস। কিন্তু ভৃগুসংহিতার গণনা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ন্যায় আমারও ধারণা ছিল যৎকিঞ্চিৎ এবং ভাসাভাসা। এই গণনার দ্বারা প্রত্যেক লোকের পূর্ব্বজন্ম, ইহজন্ম এবং পরজন্মের সকল কথা—সব ব্যাপার জানা যায়, এবং ইহজন্মের সকল বিষয়—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—হুবহু, ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়, ভৃগুগণনা সম্বন্ধে আমারও জ্ঞান ছিল মোটামুটি এইটুকু। ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। দেশপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিয়া ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দিয়াছেন,—বলিয়াছেন, 'ও সব জাল জুয়াচুরি, মহাশয়, সব ফাঁকি; ও সব দিকে মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই।'

অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের বশে গত বর্ষে তিন

মাসের মধ্যে দুইবার ভৃগুর পীঠস্থান কাশীতে যাই, শুধু এই বিষয়ের একটা পাকা রকম ধারণা করিয়া লইবার জন্য, সত্যই ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে, না সব ফক্কিকার—ইহাই অনুসন্ধান করিবার জন্য। আমার এই অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমি যতদূর জানি, ভৃগু-গণনা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনা কোন পুস্তক বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই; কেবল পূজনীয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার উপন্যাস 'মা'র মধ্যে এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধার করিতেছি।

"ইনি যে শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তাহার নাম ভৃগুসংহিতা। কোন্ সে পুরাকালে,—যে যুগে মানুষ নিজের বিদ্যার পরিচয় নিজেই জাহির না করিয়া তাহা চির-রহস্য যবনিকার তলে লুক্কায়িত রাখিয়া,—যাঁহা হইতে উত্তরাধিকারিত্বে বুদ্ধি, বিদ্যা ধারাবাহিকভাবে পাইয়া আসিয়াছেন,—সেই গোত্রপতি, বংশপতি ঋষির নামেই নিজ পরিচয় মিলাইয়া দিতেন, সেই যুগেরই কোন 'ভার্গব' এই শাস্ত্রের প্রণেতা। জ্যোতিষ এবং ত্রিকালজ্ঞের দিব্যদৃষ্টি—এই দুইয়ে মিলাইয়া ভৃগুসংহিতার এই 'কুণ্ডলাধ্যায়' বিরচিত।

*   *   *   *

মানব-জীবনের ভাল মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যেক সমাচারটুকু, কোন্ স্থলে কোন্ গ্রহের অবস্থান-জনিত কি ফল, কোন্ দুঃখই বা অপ্রতিবিধেয়, কিসেরই বা প্রতিবিধান সম্ভব, সে প্রতিকার কি?—এ সকল কথাই শরণাগতের জন্য ঋষিদ্বয়,—ভৃগু ও শুক্র পরস্পরে কথোপকথনছলে জানাইয়া দিয়াছেন।

*   *   *   *

শত শত অতীত বর্ষের কীটদষ্ট, পুরাতন জীর্ণ পুঁথির পাতায় এই যে মানব-জীবনের ফলাফল,—কোন্ সে অজ্ঞাত লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—বহু শতাব্দী অন্তে এই বর্ত্তমান যুগের, এই বঙ্গদেশীয় ব্রজরাণীর জীবন কথার সহিত কেমন করিয়া এ এমন সম্মিলন সাধন করিল? এ কি শুধু জ্যোতিষ-গণনা? অথবা ত্রিকালজ্ঞের ত্রিলোকবিজ্ঞাত জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের, ইহপর সমস্ত লোকের চিরযুগ এবং যুগান্তরের গর্ভশায়ী সমুদায় মানব ও মানবীর জীবন-রহস্য আলেখ্য লেখনের ন্যায় চক্ষে দেখিয়া চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন? স্থূল প্রত্যক্ষ দর্শনেও এ শাস্ত্রের অপূর্ব্বত্ব যে অস্বীকার করিবার নহে। যদি শুদ্ধমাত্র জ্যোতিষ-বিদ্যারই এ ফল হয়, তবে যাঁহাদের হস্তে গণনা-শাস্ত্রে এতবড় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের শক্তিকে প্রণিপাত!"

ভৃগুসংহিতা সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র আলোচনা আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে পাইয়াছি। কিন্তু এই বিষয় বিশেষ ও বিস্তারিত আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই ঋষিদ্বয়—ভৃগু এবং শুক্র কে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভৃগুসংহিতা গ্রন্থখানির (?) কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

ভৃগুসংহিতা বিষয়ক অনেক পুঁথি ট্যাঞ্জোর, ইন্দোর, জয়পুর এবং কাশ্মীররাজ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। এতদ্ভিন্ন কাশীর রামনগরের রাজ-লাইব্রেরীতে ও কুইন্ কলেজ লাইব্রেরীতেও বহুসংখ্যক পুঁথি আছে। কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটিতেও অনেক পুঁথি আছে। কিন্তু সকল স্থানের পুঁথিগুলিই কোনরূপ বিভাগ বা শ্রেণী হিসাবে সজ্জিত নাই,—যেমন যেমন সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত আছে। তবে শুনিয়াছি, নেপালের দরবার লাইব্রেরীতে নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পুঁথি আছে, কিন্তু সেগুলিও শ্রেণীবদ্ধভাবে বা বিষয়-বিভাগে সজ্জিত হইয়া রক্ষিত হয় নাই।

কাশীতে চার পাঁচজন ব্যক্তি এই সংহিতা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী; তাঁহার নিকটে অনেক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, এবং তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে লোক নিযুক্ত করিয়া এখনও পুঁথি সংগ্রহ করাইতেছেন, এইভাবে তাঁহার সংগৃহীত অসম্পূর্ণ পুঁথিগুলি পূরা হইতেছে। এই কাজে তিনি এ পর্য্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই পুঁথিগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। ইহাঁর নিকটে আজ পর্য্যন্ত যে কয় শ্রেণীর পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় দিতেছি।

নিম্নলিখিত নয় শ্রেণীর পুঁথি আমি দেখিয়াছি:—

(১) কুণ্ডলাধ্যায়, (২) যোগাধ্যায়, (৩) প্রশ্নাধ্যায়, (৪) ভাবাধ্যায়, (৫) প্রয়াণাধ্যায়, (৬) বর্ষপ্রবেশাধ্যায়

(৭) মাসপ্রবেশাধ্যায়, (৮) দশাখণ্ডাধ্যায় এবং (৯) করকুণ্ডলাধ্যায়।

এই নয় প্রকার অধ্যায় অথবা খণ্ডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সকলগুলিই ভৃগু ও শুক্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কথোপকথনের ভাবে লিখিত, শুক্রাচার্য্য প্রশ্ন করিতেছেন, ভৃগু উত্তর দিতেছেন। সকল অধ্যায়গুলি অতি সরল ও সহজ সংস্কৃতে অনুষ্টুভ ছন্দে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। ভাষা পড়িয়া এইগুলিকে অতি আধুনিক বলিয়াই মনে হয়; সবগুলিই রাশিচক্র অবলম্বনে লিখিত। যাঁহারা জ্যোতিষ লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, আমরা বাঙ্গালা দেশে রাশিচক্রের মধ্যে যেভাবে গ্রহের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, ভারতের অন্য কোন স্থানে সেইরূপভাবে গ্রহের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় না। আমরা মেষ, বৃষ প্রভৃতি বারটি রাশিকে চক্রের উপর দিক্ থেকে লেখকের বাঁ দিক্ হইতে (ঘড়ীর কাঁটা যেরূপভাবে ঘোরে তাহার বিপরীত দিকে) ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া দিই, কিন্তু ভারতের অন্যদেশবাসিগণ, বিশেষতঃ উত্তরভারতের অধিবাসিগণ এই ভাবে সাজান না। তাঁহারা যে রাশিতে লগ্ন অবস্থিত সেই রাশিকে প্রথমে কুণ্ডলের মধ্যে বসাইয়া পরে বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বাকি এগারটি রাশির মধ্যে গ্রহগণের সংস্থান নির্দ্দেশ করেন।

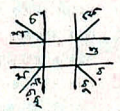

মনে করুন, কোন ব্যক্তি ১৮০৭শকের ৫ই পৌষ ৪৪দণ্ড ৪ পলের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার জন্ম সময় সংক্ষেপে এইরূপ লিখিঃ ১৮০৭।৮।৪।৪৩।৩ এবং তাঁহার জন্মকুণ্ডলী এইরূপভাবে লিখিত হয়:—

অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-সময়ে বৃষরাশিতে চন্দ্র, মিথুনে শনি, সিংহে মঙ্গল, কন্যায় লগ্ন, রাহু ও বৃহস্পতি, বৃশ্চিকে বুধ, ধনুতে রবি, মকরে শুক্র এবং মীন রাশিতে কেতু ছিল। আরও বুঝা যায়, তাঁহার জন্ম-সময়ে মেষ, কর্কট, তুলা এবং কুম্ভ রাশিতে কোন গ্রহ অবস্থিত ছিল না।

উত্তর-ভারতের জ্যোতিষীরা এই ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলী এইভাবে ছকিয়া থাকেন:

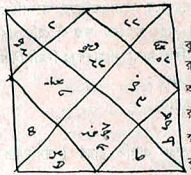

এইছক হইতেও বুঝা যায়, ৬ অর্থাৎ কন্যা রাশিতে তাঁহার লগ্ন, আর সেই রাশিতেই রাহু ও বৃহস্পতির অবস্থান, ৮ অর্থাৎ বৃশ্চিকে বুধ, ৯অর্থাৎ ধনুতে রবি, ১০ অর্থাৎ মকরে শুক্র, ১২ অর্থাৎ মীনে কেতু, ২ অর্থাৎ বৃষে চন্দ্র, ৩ অর্থাৎ মিথুনে শনি এবং ৫ অর্থাৎ সিংহে মঙ্গল। আরও বুঝা যায়, ১, ৪, ৭ এবং ১১ অর্থাৎ মেষ কর্কট, তুলা এবং কুম্ভ রাশিতে কোন গ্রহ অবস্থিত ছিল না।

ভৃগুসংহিতার সকল অধ্যায়ের রাশিচক্র এই দ্বিতীয় প্রকারে সন্নিবেশিত আছে।

(১) কুণ্ডলাধ্যায়—পূজনীয়া অনুরূপা দেবী শুধু এই কুণ্ডলাধ্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থান করায় ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক মানবের কি কি পরিণাম, তাহাই এই অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে আছে। এই ফলাফল উল্লেখ করিতে গিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরজন্মে কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে, তাহারও অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে! এতদ্ভিন্ন যে সব অশুভ ফল প্রতিবিধেয়, কি কি উপায় অবলম্বিত হইলে সেই সকল আধিব্যাধির প্রতিবিধান হইতে পারে, তাহাও এই অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের প্রতিবিধান অধিকাংশই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদির জপ ও পূজার ব্যবস্থা। এই কুণ্ডল্যাধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সকল অধ্যায়গুলির সাধারণ বিষয়-সম্বন্ধে আরও দুই চারি কথা বলা দরকার।

অধ্যায়গুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীবের তাপ দূরীভূত করাই গ্রন্থকারের একমাত্র

উদ্দেশ্য। পূর্ব্বজন্মের কোন্ কোন্ দুষ্কৃতির ফলে ইহজন্মে কোন্ কোন্ অশুভ ও অমঙ্গল ঘটিতেছে, সেই সব কথাই বিশেষভাবে অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হইয়াছে; এই সকল অশুভ খণ্ডনের জন্য বা প্রতিকার বিধানের উদ্দেশ্যে সংহিতা-মধ্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :

(ক) দেবার্চ্চনা ও দান

(খ) মন্ত্রাদি জপ

(গ) মাদুলি ও কবচ প্রভৃতি ধারণ (দেবদেবীর মন্ত্রসমন্বিত)

(ঘ) ঐ (বিভিন্ন গাছগাছড়া ও ওষধি-সমন্বিত)

(ঙ) আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-সেবন

(চ) মনি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি রত্নাদি ধারণ

(ছ) ওষধি হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন ধূপাদি প্রজ্বালন

(জ) বিবিধ ব্যবস্থা

বিভিন্ন অধ্যায়গুলি পড়িলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ভৃগুঋষি জন্মান্তরবাদী, দেবদেবীর পূজার্চ্চনায় আস্থাবান্, কর্ম্মফলে ঘোরতর বিশ্বাসী। তাঁহার মতে মানবগণ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য ইহলোকে এবং পরলোকে নির্দ্দিষ্ট ফল ভোগ করিয়া থাকে; এই সকল কৃত কর্ম্মের ফলের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিবিধেয়—ভগবৎ কৃপায়, দেবদেবীর আরাধনায়, ভেষজাদির ব্যবহারে এবং দ্রব্যাদির গুণে, এবং কতকগুলি অপ্রতিবিধেয়—সেগুলির ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহলোকে অথবা পরবর্ত্তী লোকে তাহাদের ফল ভোগ করিতেই হয়, সেগুলি অনিবার্য্য। তাঁহার মতে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এই ভবচক্রে ঘুরিতেছে এবং আচরিত কৃত্য ও কর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া যদি তাহারা তাঁহার নির্দ্ধারিত পথের পথিক হয়, যদি তাহারা পুরুষকারের দ্বারা তাঁহার নির্দ্ধারিত অশুভ প্রতিবিধান স্বরূপ অনুষ্ঠানে রত হয়, তাহা হইলে তাহাদের এই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত, এই ক্রমাগত জন্মমরণের হ্রাস হইয়া অন্তিমে তাহাদের পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। কি করিলে জীব শোকতাপ, দুঃখদৈন্য, আধিব্যাধির কবল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে ত্রাণ পাইতে পারে, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষের দুঃখকষ্ট অনেকটা কমাইতে পারা যায়, এই সকল কথাই অতি বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভৃগুঋষি এই সকল অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই এই সংহিতাকে ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ বলা যায় না; ভৃগুঋষি কিয়ৎপরিমাণে জ্যোতিষিক গণনার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার অলৌকিক ত্রিকালদর্শী জ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র জীবের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত করিবার উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব্ব সংহিতা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ চিরকালই সন্দেহবাদী; সে সহজে কোন কথা বিশ্বাস করে না। এই সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া মানুষের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে ভৃগু এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে প্রত্যেক মানুষের বর্ত্তমান জীবনের অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলেন; মানুষ দেখিল যে, তাহার বর্ত্তমান জীবনের অতীত ঘটনা হুবহু মিলিয়া যাইতেছে; তাহার পর তিনি দুইচারিটা কারণ দর্শাইয়া লিখিলেন, এই সব কারণের জন্য অচির ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তির জীবনে এই এই ঘটনা ঘটিবে; মানুষটি দেখিল, বাস্তবিকই অচিরভবিষ্য ব্যাপারও সংঘটিত হইল; তখন তাহার বিশ্বাস হইল যে, দূর ভবিষ্যতে যাহা যাহা ঘটিবে বলিয়া ভৃগু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলিও ঘটিবে। ক্রমে ভৃগুর সকল কথায় সে আস্থাবান্ হইল। তাঁহার নির্দ্দেশিত অনুষ্ঠানাদি সে আচরণ করিতে যত্নবান্ হইল, ইহলোকে তাহার মঙ্গল হইল, পরবর্ত্তী লোকে তাহার ক্রমোন্নতি হইয়া সে সদ্‌গতির দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। পূজনীয়া অনুরূপা দেবী ঠিকই লিখিয়াছেন যে, অতীত জীবনের কোন্ মহাভ্রান্তি ইহজীবনের এই সমাগত অশান্তিকে বরণ করিয়া আনিয়াছে, কি উপায়েই বা সহজে লঘুচিত্ত মানবজীবের সেই ভুলভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হইয়া অতীত পাপের স্খালন হইতে পারে,

এই দিকেও ইঁহারা কৃপা-কটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। শুধু ভুলেন নাই নহে,—এই দিকেই তাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষ বিশেষভাবে সন্নিবদ্ধ—অন্যান্য অধ্যায়গুলি আলোচনা করিলে এই কথাই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। কিসে জীব পাপবিমুক্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারে, এই সংহিতা প্রণয়ন করিবার ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমার একজন আত্মীয়ের কুণ্ডলাধ্যায় হইতে কয়েক স্থল উদ্ধার করিয়া কুণ্ডলাধ্যায়ের সম্যক্ পরিচয় দিতেছি।

"শুক্র উবাচ

ভবেদেতাদৃশী পত্রী যজ্জীবস্য মহামতে।
তৎ কিং ফলমবাপ্নোতি বিস্তরাদ্ বদ মে প্রভো।

ভৃগুরুবাচ

মিথুনেপি ভবেৎ জন্ম তদীশঃ পঞ্চমে কবে।
চিত্রগুপ্তগৃহে জন্ম গৌরবর্ণোঽপি মধ্যমঃ॥
মধ্যপাদ করোনূনং পুষ্টদেহোঽপি জায়তে।
কোষগে দেবনাথোঽপি ধনস্থানস্থখং কবে।
বিংশতিসর্প বর্ষে চ ভাগ্যবৃদ্ধি উবিষ্যতে।
রাজবিদ্যা প্রজায়েত চিকিৎসা কামদায়িনী।
রসত্রিংশে অভ্রবেদে তদাপূর্ণধনী ভবেৎ॥"

* * * *

অতঃপর ভৃগু সকল গ্রহের অবস্থান-জনিত ফলাফল বলিয়া গেলেন। অনন্তর

"শুক্র উবাচ

পুর্ব্বজন্মনি কিং কর্ম্ম কৃতং তদ্ ঘোর রূপকম্।
তন্মে বদ মহাযোগিন্ যেন ভূয়স্ত্রিকালগঃ॥

ভৃগুরুবাচ

পূর্ব্বজন্মন্যয়ং রাজা সত্যং তাত মরুৎস্থলে।
প্রজাবিত্তং হৃতং পূর্ব্বং তেন পাপ প্রভাবতঃ॥

শুক্র উবাচ

কিং দানং তত্র কর্ত্তব্যং কস্য পূজা মহামতে।
যেন পাপং প্রণশ্যতে পূর্ণায়ুঃ সুখদং ভবেৎ॥
পুত্রদার ভয়ং নৈব সর্ব্বশৌখ্যং যতোভবেৎ।
তন্মে বদ মহাযোগিন্ যেন ভূয়স্ত্রিকালগঃ॥

ভৃগুরুবাচ

তত্র রৌপ্যময়ে পাত্রে শক্তিমাসাধ্য নির্ম্মিতে।
শুদ্ধ রৌপ্যসমুদ্ভূতে পরিতোপি রসাঙ্গুলে॥
তন্মধ্যে চ রিধানেন শঙ্করমূর্ত্তিমালিখেৎ।
রক্ষাবীজং লিখেন্নাভৌ কামবীজঞ্চ মস্তকে॥
জয়দং হৃদয়ে লিখ্য পাদয়োঃ শর্ম্মদং লিখেৎ।
ভুজদ্বয়ে প্রবন্ধঞ্চ জিহ্বায়াং সাপহং লিখেৎ॥
বেষ্টতাং শ্বেতপট্টেন প্রতিষ্ঠাঞ্চ ততশ্চরেৎ।
সংস্থাপ্য কলসে তাত তদগ্রে মন্ত্রমাচরেৎ॥

ওঁ ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ আং শং শঙ্করায় সকল জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ বিধ্বংসানায় শ্রীমতে আয়ুঃ প্রদায় ধনদায় পুত্রদারাদি সৌখ্যদায় মহেশ্বরায় তে নমঃ। কষ্টং ঘোর ভয়ং বারয় বারয় পূর্ণায়ুর্বিতর বিতর মধ্যে মাখণ্ডিতং কুরু কুরু। সর্ব্বান্ কামান্ পূরয় পূরয়। শং আং ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ ওঁ॥

ইতি মন্ত্রজপং কৃত্বা অর্দ্ধলক্ষং তপোধন।
হবনং তর্পণং তাত মার্জনঞ্চ বিধানতঃ॥
মূর্ত্তিং সংকল্প্য সংদধ্যাৎ আচার্য্যায় তপোধন।
আশীর্ব্বাদঞ্চ গৃহ্লিয়াৎ যজ্ঞান্তে স্নানমাচরেৎ॥
এবং যত্নে কৃতে পূর্ণে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
প্রতিষ্ঠামানমধিকং লাভোভবতি গৌরবৈঃ।"

সাইগন

(১৩)

সাইগনে ভারতবাসী আছে, হাজার চারেকের কাছাকাছি। মাদ্রাজী অধিকাংশ, পাঠান, কিছু সিন্ধী, এবং জনকয়েক শিখ। বাঙালী নেই। সিন্ধীদের কারবার সিল্ক এবং 'কিউরিও' দ্রব্যের। তাদের এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি জগতের বহু সহর ও বন্দরে সাফল্য ও ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হয়ে আছে। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, বোর্ণিও, জাভা মলয়, সিংহল, ভারত, আমেরিকা, ইয়ুরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, শ্যাম ও ইন্দোচীন সর্ব্বত্র এগুলি বিক্রয়ের ব্যবসায়ে এদের প্রধান অংশ। হায়দ্রাবাদের অনুর্ব্বর জমি, কঠোর জীবন সংগ্রামে এই সিন্ধীদের ব্যবসা-জগতের দিকেই ঠেলে দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছে। এদের এক একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানেরই আবার নানা দেশে শাখা আছে। যেখানে যেখানে কারবার, সেখানকার ভাষা তারা বেশ আয়ত্ত করে' নেয়। এই সিন্ধী প্রতিষ্ঠানগুলি ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে', সেল্‌স্‌ম্যান্ ও কেরাণীর কাজে সিন্ধী ছাড়া কাউকেই নেয় না দেখা যায়। সিন্ধী ছাড়া অন্য কাউকে শিখতে দিতে চায় না। এখানেও দেখি এদের কর্ম্মচারীরাও কেমন ফ্রেঞ্চ ও আনামি ভাষা আয়ত্ত করে' কাজ চালাচ্ছে।

মাদ্রাজীদের কিছু আছে দোকান পাট, কিছু কেরাণী ও চেট্টি মহাজন। এই চেট্টিদের পাড়ায় দ্রবিড় দেশীয় একটি সুনির্ম্মিত মন্দিরও আছে। ভারতের পণ্য এবং ভারতীয়ের ব্যবসায়ে এখানে একসময় যা কিছু প্রসার ছিল, এখন হতে চলেছে লুপ্ত। কিছুকাল হ'তে ফরাসী সাম্রাজ্যের পণ্যবাদে অন্য সকল দেশের সকল রকম আমদানি দ্রব্যের উপর Tarriff ও আমদানি-শুল্ক বসান হয়েছে, তা একেবারে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ভারতের ঘৃতের উপর এখানকার নির্দ্ধারিত দাম ও তার শুল্ক বর্ত্তমানে এত বেশী বসান হয়েছে, যে শতকরা ৯০ মুদ্রা পড়তা বেশী। এক পণ্ডিচারি বন্দর থেকে, ফরাসীর ব'লে যে সব মাল আসে, তার certificate of origin ঠিক থাকলে, তার উপর এ মাশুল ধার্য্য নেই। প্রতিযোগিতার অভাব ঘটায়, পণ্ডিচারি আগত বস্তু যে পরিমাণ অপকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, সে সম্বন্ধে সকলে সচেতন হলেও, এখানে যে মাশুল আমদানি নিষিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যেই বসান হয়েছে, তা বন্ধ না হয়ে পারে না। ধূপ ও চন্দন যদি পণ্ডিচারি ভিন্ন ভারতের অন্য বন্দর হতে আসে, তবে তার হয়ে পড়ে এখানে অত্যধিক দাম। এখানকার একজন দোকানদার কলকাতা হতে কিছু বাসন আনিয়েছিলেন, সাইগনে এসে যখন পৌছাল, নূতন শুল্ক ব্যবস্থার মাহাত্ম্যে তার মূল্য হয়ে পড়ে আড়াইগুণেরও বেশী। সেজন্য সেটা ছাড় না করে, পুনরায় ভারতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়াই তাঁর কাছে সুবিধাজনক হ'ল। এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে ভারতে প্রস্তুত অন্যান্য কত দ্রব্যের অবস্থা। শুধু ভারতের কেন, ফরাসী সাম্রাজ্যের বাহিরের সকল পণ্যের দশাই সাইগন বন্দরে এরূপ শোচনীয়।

Preferential এবং Prohibitive duty বসানর এ খেলাটি আজ সকল সাম্রাজ্যসম্পন্ন জাতিই মনোযোগের সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করেছে, সাধ্যমত। একের Tariff Wallএর ধাক্কায় অন্যের পণ্যসম্ভার-পূর্ণ জাহাজ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এতে স্বচ্ছন্দতা বাড়িয়ে ক্ষুধিতের হাহাকার কোন দেশেই ঘুচছে না। যে পন্থা সকলে অবলম্বন করে' ফেলল, তার বিশেষ সুবিধা আর থাকল না। অন্য দিকে নিজের পণ্য অন্য দেশেও বিকোবার উপায় হয়ে পড়ে সঙ্কীর্ণ, কর্ম্মফলের চক্রে। সাম্রাজ্যের সুখ সুবিধা ও তার স্বার্থ-সাধন অন্যের দুর্দ্দশা বাড়িয়ে চলে, ঈর্ষাবহ্নিও কোথাও ধূমায়মান হয়, পরিশেষে ক্ষুধার লেলিহান জিহ্বায় দাবানল প্রজ্বলিত হয়। এ অর্থনীতির যে গলদ ও ক্ষয়শীলতা আছে, তার অনিবার্য্য পরিণাম আসছে এগিয়ে; তার ফলে Economicsএর কতকগুলো অধ্যায় নূতন ভাবে লিখিত হবে। একের অনিষ্ট ক'রে অন্যের পুষ্টি আর সহ্য হবে না। দুনিয়ার সম্পদগুলো এবং তার বাঁটোয়ারা ভিন্ন দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য। অনাবশ্যক অপচয় যা, তা সত্য অর্থনীতি কতদিন সহ্য করবে!

ফরাসী সাম্রাজ্য পরিচালনার একটু কদর্য্য নমুনা চোকে পড়ে তার ইমিগ্রেশন বিভাগের ব্যবস্থা-বিধানে। শ্যাম থেকে স্থলপথে সাইগনে আসার জন্য 'ভিসা' ব্যাংককেই ফ্রেঞ্চ কনসুলার অফিস হতে দক্ষিণা দিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর কাম্বোজ সীমান্ত পোইপেত (Poipet) ফরাসী অফিসার বেশ কতকগুলো 'পিয়াস্তার' দক্ষিণা পুনরায় নিয়ে ছাড়পত্র দিলে। সঙ্গে যে ছাপা কাগজ কিছু ছিল, তা কয় রঙে ছাপা, তারও বই খুলে হিসাব ধরে' মোটা মাশুল আদায় করেছিল। সাইগনে আবার ইমিগ্রেশন অফিসে যেয়ে বেশ দক্ষিণা দিতে হ'ল কয়েকটি দফা বাবদ। ভারতীয় আগন্তুকদের জন্য ফরাসী সরকারের এজেন্ট গোছের দুইজন ভারতীয় নিযুক্ত আছে। তাদেরও কিছু নাকি দিতে হবে। অফিসে এজেন্টের কর্ম্মচারী ভারতীয় পণ্ডিচারির লোক। সে বললে যে কম্বোজ সীমান্তে যে piastre গুলো নিয়েছে, তা নাকি ভোগা দিয়ে একরকম, অর্থাৎ না দিলেও চলত। যদিও তারা সেখনে রীতিমত রসিদ দিয়েছিল, এখানে যা চায় তার জন্য কিছুই দিতে চাইল না। আবার হাতের ছাপও চায়, না দিলে চলবে না। অস্বীকার করলেম। একজন উর্দ্ধতন ফরাসী অফিসারের কাছে নিয়ে গেল, তাকেই নিয়ে যেতে বললাম, কারণ অন্য কাকেই বা তার কাছে যেতে চাই—এ কথা বুঝিয়ে বলব। সব বলতে চাইলাম; ভ্রমণকারী ত immigrant নয়। প্রধান জাঁদরেল অফিসার ইংরাজী জানে না একবর্ণও। ইমিগ্রেশন বিভাগের কাজই ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের, অথচ ইংরাজিও জানে না। বুঝলাম এখানে শাসক ব'লে অবিবেচক হয়েছে। আমিও বললাম, সেও বলল। আমার যা বলার তাকে কিছুই বোঝান হ'ল না। পণ্ডিচারির মাদ্রাজী তাকে যা ব'লে দিলে, তাতে তার মেজাজ কিছু রুক্ষ হল, এই বুঝলাম। এখানে ব্যর্থ হয়ে, সেই মাদ্রাজীটিকেই বললাম, ব্রিটিশ কনসালের সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করতে পারব না। তাতে বললে, তাহলে বিলম্বের দরুণ অর্থ আদায় করব বেশী, এবং তাঁকে এ সকল কথা জানালে দুর্ভোগও আছে অনেক। নিরুপায়। প্রতিবাদ জানিয়ে হাতের ছাপ দিলাম। পাশপোর্টে কোন্ জাহাজে যাব, তার নামটাও দিয়ে দিয়েছিল, নচেৎ কোন জাহাজ কোম্পানী ওখানে টিকিট বিক্রয় করে না।

পরে এই ব্যাপার নিয়ে, ওখানকার British Consul Generalএর সঙ্গে দেখা করলাম। সকল কথা বললাম; ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করলেন, মাদ্রাজী কর্ম্মচারীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন, হাতের ছাপ নেওয়া অন্যায়ও বললেন এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন জানালেন। এবং এও বললেন যে ভবিষ্যতে কারও সঙ্গে ওরকম ব্যবহার না হয়, তা দেখবেন। কিন্তু, তিনি এর প্রতিকারের জন্য বিশেষ কিছু করবেন কি

না এবং নিজে কিছু করতে পারেন কি না সন্দেহ হ'ল। ভারতীয়ের এবং চীনাদের জন্য বিধানগুলি তিনি কিআর কিছুই জানেন না! ভদ্রলোক prohibitive duty সম্বন্ধেও আপশোষ করলেন, ব্রিটিশ পণ্যও এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না! কিন্তু যে শুল্কের প্রাচীর তাঁরা নিজেদের সাম্রাজ্যে খাড়া করেছেন, অন্যত্র তারই সম্বন্ধে আপত্তি জানান যায় আর কোন মুখে!

মাদ্রাজীটি শেষটায় বলেছিল, যে তারা কি করবে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এজন্য জোর দিলেই, ভারতীয়ের হাতের ছাপ নেওয়া বন্ধ হতে পারে। ভারতে ফরাসী আসে, তাদের হাতের ছাপ চাইলে, এখানে এটা বন্ধ হতে পারে সেই দিনই। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজার জন্য এ সম্মানটুকু দাবী করবেন কি? জাপান তা করেছে। জাপানী প্রজা এখানে এলে হাতে কালি মাখিয়ে ছাপ দিতে হ'ল যেন দাগী অপরাধী! তার প্রতিবিধান কল্পে যখনই তারা নিয়ম প্রচলন করলে যে ফরাসী নরনারীও জাপানে ঢুকবার সময় হাতের এবং পায়ের ছাপ দিয়ে যেতে হবে, তখনই ইন্দোচীনে জাপানীদের সম্বন্ধে সে নিয়ম রহিত হয়ে গেছে। আমাদের ভারতে এ আত্ম-অবমাননার প্রতিকারের চেষ্টা কোন্ দিন হবে?

সাইগন থেকে Messageris Maritiemesএর French Mail Boat D'Artagnanএ চাপলাম, সিঙ্গাপুর অভিমুখে। সিঙ্গাপুরে ও হংকংএ যেমন বহু কোম্পানীর জাহাজ ধরে, এ বন্দরে তা নয়। ফ্রেঞ্চ কলোনিতে ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর জাহাজগুলোরই সুবিধা হয় বেশী। Chargeur Reunis প্রভৃতি আরও ২।৩টি কোম্পানী এ দিককার কাঁচা মাল নিয়ে যাওয়া এবং তৈরী জিনিষ পৌঁছে যাওয়ার কাজ করে। ফ্রান্স থেকে সাইগন পর্য্যন্ত Air France কোম্পানী উড়ো জাহাজও নিয়মিত চলাচল করে। এ জাহাজখানি পূর্ব্ব আফ্রিকার ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যাণ্ডের Djibouti বন্দর হয়ে যাচ্ছে মার্সাই। শাংহাই, রেঙ্গুন ও কলকাতার মতই নদী পথ দিয়ে জাহাজ চলল একটি বেলা; দুধারে সবুজ ক্ষেত, মাঠ। তারপর চীন সমুদ্র। খাওয়ার ঘরে এ জাহাজে একটা কারণে অনেকেই খুসি। কারণ ফরাসী জাহাজে grape juiceটা মুফ্‌তোই পাওয়া যায়। ফ্রান্সের দ্রাক্ষাবনের প্রাচুর্য্য হেতু এগুলো নাকি সেখানে জলের মতই সাধারণের পানীয় এবং সস্তা। সন্ধ্যা হয়ে গেলে জাহাজ পার হয়ে চলে Pulo Condare দ্বীপের বাতি। এটা হল ইন্দোচীনের কয়েদীদের আন্দামান। বন্দীদের দুঃখ-জীবনের বাতি হতে যেন দূর থেকে ঐ আলোটি জ্বলে!

রস-সাহিত্যে কেদারনাথ

শ্রীসুবোধ রায়

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন বিদ্যালয়ের বেড়া টপ্‌কাইবার সময়। হঠাৎ একখানি চটি কাব্যপুস্তিকা হাতে পড়িল—"কাশীর কিঙ্কিং"। লেখক শ্রীনন্দী শর্ম্মা। আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারি না। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মনে সপ্রশ্ন কৌতূহল জাগিল—কে এই মিঠে-কড়া মৌতাতের রসিক সাহিত্যিক। তখনকার দিনে অধ্যাপক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই বিদ্যায় অগ্রণী ছিলেন। তাই মনে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না যে লেখক নিশ্চয়ই ললিতবাবু। মুগ্ধবিস্ময়ে ও আনন্দে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ করিলাম। মনে মনে ললিতবাবুকে বলিলাম—"নন্দী শর্ম্মার অন্তরালে যতই আত্মগোপন করিয়া থাক—তোমাকে ধরিয়াছি ঠিক।" এমন সময়ে চোখে পড়িল পুস্তকের প্রথমেই একটা ভূমিকা আছে। যতদূর মনে পড়ে ভূমিকার পরিবর্ত্তে লেখা ছিল "মাটিকা", এবং তাহার লেখক স্বয়ং ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতে ললিতবাবু লেখক সম্বন্ধে সমস্ত সত্য পরিচয়ই দিয়াছেন, কেবল তাঁহার নামটি ছাড়া। নিজের কাছে নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া বোকা বনিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর অগ্রজোপম দুইচারি জনকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু কেহই নন্দী শর্ম্মাকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই। ইহার বার বৎসর পরে কাশীতে গিয়া "নন্দীশর্ম্মাকে" আবিষ্কার করি। মহাদেবের দেশ না হইলে কি নন্দীর সাক্ষাৎ মিলে। কাশীতে গিয়া যুগপৎ বিশ্বনাথ ও "কেদার নাথের" দর্শন পাই। এই দর্শনফলের পুণ্যে কোন্‌দিকের পাল্লা ভারি, তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

এই হইল তাঁহার সাহিত্য ও তাঁহার সহিত পরিচয়ের প্রথম পর্ব্বের কথা। এতদিন পরে তাঁর সমগ্র সাহিত্যের একটা পরিচয় দিবার মানসেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য নিরাবিল আনন্দের উৎস। যে সাহিত্যে অন্তরের আনন্দের মন্দাকিনী খরস্রোতা, সেই সাহিত্যই যুগ যুগ ধরিয়া বাঁচিয়া থাকে, তার চির অক্ষয় আনন্দ-উৎস মন্দীভূত হয় না, হইতেও পারে না, রূপে ও রসে তা হইয়া উঠে অপরূপ।

বাঙ্গলা দেশে রস-সাহিত্য যে নিতান্তই অপ্রচুর, তা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় হইতে যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও আমরা বর্ত্তমান সময় অবধি কয়খানা রস-সাহিত্যের গ্রন্থ পাই? হাস্যরসপূর্ণ সাহিত্য-স্রষ্টার মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, দিবাকর শর্ম্মা ও কেদারনাথই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত বড় একটা বিরাট যুগের মধ্যে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে, সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীতে শত শত মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, বহু কবি ও গ্রন্থকার আজ বিশ্বের দরবারে সম্মানিত হইয়াছেন, কিন্তু রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই কয়জন ছাড়া আর নাই।

রসরাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীর মলিন মুখে হাসি ফুটাইয়াছিলেন, আজ স্বর্গে বসিয়া বুঝিবা দেবতাদের হাসাইতেছেন। সন্তান-বিয়োগের দুঃসহ ব্যথা আজ পরশুরামকে স্তব্ধ করিয়াছে, আর দিবাকরতো দুপুরেই ডুবিয়া গিয়াছে। শিবরাত্রির সলিতার মত একমাত্র কেদারনাথই আজ বাঙালীর দৈন্যমলিন মুখে হাসি দিয়া তাঁর আয়ু বৃদ্ধি করিতেছেন।

কেদারনাথের রস-সৃষ্টির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর হাসির অন্তরালে রহিয়াছে কান্না। বাংলার সকরুণ বাস্তব ভিত্তির উপর তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন হাসির ফোয়ারা। বাঙালীর জীবনের বহু দুঃখ, বহু জ্বালা বিভিন্ন রকমের দারুণ দৈন্যের ছবি হাসির আবরণে উজ্জ্বল করিয়াই তিনি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

কেদারনাথের বর্ণনাভঙ্গী, শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যে যেমনি অভিনব, তেমনি অননুকরণীয়। কেদারনাথের যে কোন পুস্তকের যে কোন পৃষ্ঠায় এই অভিনব বৈশিষ্ট্যই মনকে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া দেয় খুব বেশী। এ যেন এক অফুরন্ত ফোয়ারা, দ্ব্যর্থবোধক যুগ্মশব্দ ক্রমাগত চলিয়াছে অতি সুষ্ঠু সুন্দর প্রয়োগের মধ্য দিয়া, "অনুপ্রাসের এমন অট্টহাস"ও বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল।

"বেহারে যার বাড়ীতে চাল আছে তার বন্দুকের চালও থাকা চাই, এটা সম্ভ্রমের সরঞ্জাম। অবশ্য ব্যবহার হয় কেবল পাখীর ও মাছের প্রাণ নিতে, আর বিবাহের পটহপীড়নে। দুর্ব্বলের লজ্জাকর দম্ভের দোসর।"

(আই হ্যাজ—৭২-৭৩ পৃঃ)

সম্প্রতি কেদারনাথের এই পুস্তকখানি * পড়িয়া শেষ করিলাম। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, বহু চরিত্র ও অভিনব ঘটনার সমাবেশ এবং অপূর্ব্ব লিপিকুশলতায় সেই সকলকে একটি সুমধুর পরিণতি দান—প্রত্যেক বিষয়ে কেদারবাবু অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শতাধিক পৃষ্ঠার বই আপনার গতিবেগে পাঠকের মনকে অতি অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। রসের স্বচ্ছ প্রবাহ কোথাও ঘটনা বা বর্ণনার উপলে প্রতিহত হয় নাই। 'কোষ্ঠীর ফলাফল' বা 'ভাদুড়ী মশাই' পড়িয়া মনে হইয়াছে যে বই দুইটি যেন আর একটু স্বল্পায়তন হইলে পরম উপভোগ্য হইত। কিন্তু এইখানি শেষ করিয়া মনে হইল—বইখানি আর একটু বড় হইলেও ক্ষতি ছিল না।

"আমরা কি ও কে" হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক কেদারনাথ আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন সমস্তগুলির মধ্যেই লেখকের একটা গভীর দরদ্ বর্ত্তমান। অনাবিল হাসির তলে তলে একটা ক্রন্দনভরা ব্যথার প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। একথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দুঃখ ব্যথা, অভাব অভিযোগ, চরিত্রের ক্রটী ও দুর্ব্বলতা তাঁহার মনকে গভীর ব্যথায় দোলা দিয়াছে। গভীর দরদের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তিনি সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাছে কান্নার বড়ি দেখিয়া লোকে মুখ ফিরায় তাই তাহাকে হাসি দিয়া sugar-coated করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্গূঢ় ব্যথাপূর্ণ হাস্যরসাপ্লুত রচনা পড়িলে মনে হয় যে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে এমন মধুর ভাবে রচনাসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহাতে আমরা হাসিতে হাসিতে পড়িতে পারি। রামশর্ম্মার ছড়া তাঁহার সম্বন্ধে উল্টাইয়া বলিতে পারা যায় :—

"যত কান্না তত হাসি
উছলে তোমার বাঁশী"

"আই হ্যাজ্" হইতে তাঁহার রচনার এই বৈশিষ্ট্যের দুই একটা নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মাঠে এগুলি কি ? পাটনেয়ে রামছাগল বুঝি—সাইজ তো বেশ ! হ'বে না—রামের শ্বশুরবাড়ীর হাওয়া পায় ! এটাতেই·········

সঙ্গী বাধা দিয়া বলিলেন, গরু যে মশাই, এখানে এই রকমই হয়। গয়লারা, দেহাতি লোকেরা, ষাট, সত্তর, একশো, দেড়শো রাখে,—রাখে না কেবল তা'দের আহারের বন্দোবস্ত। চ'রে খায়—বিউলে ঘরে আনে। দুধ-একপো, দেড়পোই 'এভারেজ' (Average), কদাচ কোনটি দেড়-সেরও ছাড়ে,—তিনি হ'লেন উচ্চৈশ্রবা ! নইবাছুরগুলো না খেতে পেয়ে প্রায়ই মরে—তা'দের আদর যত্ন নেই। নজর থাকে বৎসতরের উপর। বাঙলা দেশে কন্যা পুত্রে যেমন পার্থক্য গো ! এরা জমি চোষে ফসল দেবে, বিবাহেও কিছু টান্‌বে। এই আর কি !" (আই হ্যাজ্ ১৭ পৃষ্ঠা)

মা ভগবতীর দেশ কিনা ! আত্মদুর্দ্দশাকারী হৃদয়হীন গো-পালনের এমন বর্ণনা খুব কমই পড়িয়াছি !

বিদেশী মাল স্বদেশীর ছাপ দিয়া বাজারে প্রায়ই বিক্রয় হয়। "আই হ্যাজে"র নায়কের এক বন্ধু প্রতুল তাহাই করিতেছিল। সেইখানকার কথোপকথন হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"বল্‌লুম মাল যা উতরেছে এর আর মার নেই, পড়তে পাবে না,—দেখ্‌ছি একদম নিখুঁৎ।"

প্রতুল হাসতে হাসতে বল্‌লে—"শুধু একদম নিখুঁৎ নয়—বিলিতি বলো। তুমি কাশীবাস করো—সত্যভ্রষ্ট হ'তে হ'বে না।

কথাটা তেমন মন দিয়ে শুনিনি। বল্‌লুম—বাস্তবিক ভাই এযা বানিয়েছে-য়ুরোপেও বির্লিতি নয় ব'লে কেউ সন্দেহ করবে না। তোমরাই প্রকৃতই দেশের কাজ ক'রছ। এতদিন এসব কারিকর······

প্রতুল বাধা দিয়ে বল্‌লে—সবই ছিল,—গোপনে গোকুলে, কেবল সুযোগ ছিল না ভাই। স্বদেশী কথাটি—সেটি এনে দিলে।—যা 'মরা' ছিল তা' অমনি 'রাম' হ'য়ে কামদিলে।—অনেকে ঋষি বনে গেলো. অর্থাৎ দ্রষ্টা, চোখখুলে গেল—বুঝলে ?"

"তা ও লোকটি তোমাকে বার ক'রলেন কি করে ?"

মাণিকে মাণিক চেনে যে ভাই ! নাসিকে ওর বড় কারবার। লোকটা খুব ওস্তাদ, দশ বিশ হাজার জার্ম্মাণীর শাল ওর হাতে প'ড়ে কাশ্মীরী মাল হ'য়ে গেছে ! বোর্ণিও, যাভা, সুমাত্রাদি দ্বীপপুঞ্জ ওর একচেটে তালুক,—আমদানীকুঞ্জ। আমার অনেক শিক্ষাই ওর কাছে। তবে গুরুদক্ষিণায় পুষিয়ে দিয়েছি। যখন স্বদেশীর জোর ধাক্কা লাগলো, তখন ওর তিরিশ হাজার টাকার Condensed Milk মজুদ্। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এই শর্ম্মাই লেবলের—জোরে তাকে স্বদেশী বানিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার দিইয়ে দেয়। অবশ্য তার বিশ হাজার আমার ঘরে আসে। প্রতুল সেই থেকেই ওর কাছে অতুল। যা দেখচো—এসব প্যাকিং এসব লেবেল আর কার ? এই ডেভিলেরই।"

সবিস্ময়ে বল্‌লুম—"তবে কি এ সব······?"

"আবার কি ? একদম তাই—একেবারে অবিমিশ্র ! তুমি দেখ্‌ছি সেই 'তুমিই' থেকে গেছ, আপনি আর হ'লে না। আমাকে বুড়ো তিনকড়ি মাষ্টার এখন নমস্কার করে, 'আপনি' ব'লে কথা কয়,—আমি তাকে 'তুমি' বলি। আত্মসম্মান সৃষ্টি ক'রতে হয়, রাখ্‌তে জানতে হয়।"

আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। নিবের (Nib এর) কথা মনের মধ্যেই নিবে গেল।"

কয়েকটি কথায় স্বাদেশিকতার সুযোগে ধাপ্পাবাজির এমন সকরুণ ও সরস চিত্র বিরল। অপরদিকে কেন বা কেমন করিয়া এই ধাপ্পাবাজি সফল হয় তাহার কারণও পরের অনুরূপ কয়েকটি কথায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

···"আচ্ছা প্রতুল—জিনিষগুলো বিলিতি বল্‌লে কি বিক্রি হয় না,—মিছে দেশী বলা কেনো ?"

To help you,—to help my countrymen. তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে। দিন কাবার ক'রে দিলে, এখনও না চিন্‌লে দেশটাকে, না চিন্‌লে দেশের মানুষকে ;—তা'দের প্রাণ যে বিলিতি খোঁজে ! বুঝ্‌ছ না—হুজুকে কেবল দিশি চাওয়াচ্ছে বইতো নয়। মনকে চোখ ঠেরে মুখে দিশী বল্‌বার পাস্‌টা (Passটা) কেবল তা'দের চাই,—মালে কিন্তু বিলিতি হওয়া চাই। তা হলেই মনঃপূত হয়—পড়তেও পায় না। আমরা সেই সাহায্যই করছি, যাতে কারুর মন খুঁৎ খুঁৎ না করে। বন্ধুর কাজ নয় কি ? জার্ম্মাণীর মকরধ্বজ পেলে শিখিধ্বজেরা কি আমাদের ঘুঁটে পোড়ানো মকরধ্বজ ছোঁবেন মনে করো ? কেবল পেব্‌ল্ (Pebble) পেপারের লেবেলে লেখাটি চাই—"মহারাষ্ট্রীয় মহাতপা ভীষকাচার্য্য শ্রীনিবার চৌপাঠির স্বকৃতামৃত ;—শ্রীমৎ নেপালাধিপতির জন্য পবিত্র হোমানলে প্রস্তুত সুবর্ণরেণু মকরধ্বজ"। ব্যস্।"

* * * *

বাঙ্গলার যে কয়জন অন্যান্য রস-সাহিত্যিকদের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের সহিত দু'চার কথায় কেদারনাথের পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করিব। ইন্দ্রনাথ

* আই হ্যাজ শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স মূল্য দুই টাকা।

"পঞ্চানন্দ" মারফত চাবুক হাতে বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমাজনীতি এবং বিশেষ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রের যে গলদ তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহার উপর তিনি নির্ম্মমভাবে চাবুক চালাইয়াছেন। তবে তাঁহার চাবুক ছিল মাখম-মাখানো, সেইজন্য বোধ হয় পরে জ্বালাটাও ধরিত বেশি। রসরাজ অমৃতলাল হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন প্রধানতঃ তাঁহার প্রহসনগুলির সাহায্যে এবং ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টিই ছিল তাঁহার বিদ্রূপবাণের প্রধান লক্ষ্য। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধানতঃ ভাষার মারপ্যাঁচ ও বিচিত্র ঘটনা সংস্থানের মধ্য দিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন। পরশুরামের অতি সূক্ষ্ম ও অপরূপ Humour কতকগুলি Type লইয়া। একদল লোক আছে মুদ্রাদোষ ও স্বভাবের আতিশয্যের ফলে যাহারা সাধারণ হইতে পৃথক। পরশুরামের বেশিরভাগ কারবার তাঁহাদের লইয়া। তাঁহার সূক্ষ্ম রসসৃষ্টির সহিত পাশ্চাত্যের Jerome K. Jeromeএর কতকটা সাদৃশ্য আছে। দিবাকর শর্ম্মা তথা রবি মৈত্রের সাধারণতঃ satire—এবং তাহা পদ্যে। দধিকর্দ্দম নামে তিনি যে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সংবাদ-সাহিত্যের অন্তর্গত—রচনার গুণে ও ভাষার ওজস্বিতায় তাহার যেটুকু স্থায়িত্ব আছে তাহা উপেন্দ্রনাথের উনপঞ্চাশীর সহিত তুলনীয়। কিন্তু কেদারনাথের রসসৃষ্টি কোন বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ জাতি, বিশেষ Type অথবা বিশেষ সমস্যা লইয়া নহে। তাঁহার চিত্রপট বিরাট, এবং তাহাতে সৃষ্ট লিপিচিত্রও অগণিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যতরকম লোকের সহিত সংস্পর্শে আসিতে হয়, কেহই তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় নাই। সকলকার চরিত্রের দুর্ব্বল দিক ও আতিশয্য তিনি পরিহাসের মধুর রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া গভীর দরদের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। Addision সম্বন্ধে যে কথা প্রচলিত ছিল, তাঁহার সম্বন্ধেও নির্ভয়ে সে কথা বলিতে পারা যায় যে, যাহাকে তিনি ঠাট্টা করেন, সে সেই পরিহাস শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে নিজেই হাসিয়া উঠে। তাহার প্রধান কারণ তিনি নিজে ইহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, নিজেকে বড় মনে করিয়া, তফাৎ হইতে উপদেশচ্ছলে ভিড়ের উপর চাবুক চালান নাই, নিজেকেও তিনি এই দুর্ব্বল অসহায় আতিশয্যদোষদুষ্ট জনগণের একজন মনে করেন —একথা তাঁহার রচনা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এই গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতাই তাঁহার রচনাকে অপরূপ মাধুর্য্য ও সরসতা দান করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন "আমরা কি ও কে"। "তোমরা কি ও কে" —এ কথা তিনি কখনই বলেন না।

যমকে ও অনুপ্রাসে তাঁহার হাতে ভাষা হইয়াছে একান্ত বেগবান ও স্থানে স্থানে চিত্তচমকপ্রদ, উপমাগুলিও অনুপম। যথা :—

"অষ্টসিদ্ধির পৃষ্ট মূর্ত্তি। এতবড় সিদ্ধ মহাপুরুষ যে মহাভারতে মেলে না। দর্শনে অঘমর্ষণ,—ধন্য হলুম। ভেতরটা সুড় সুড় ক'রে উঠলো। কাশীর অঙ্কুর বোধ হয় সাড়া দিলে……"

• • •

"শুনেছি পাপীরা কাশীতে ঢুঁকতে পারে না। কি করবো—পুণ্যের কোন দাবীই ছিল না।"

বাস্, বাসন, বেডিং বাসা—নিশ্চয়ই তাঁরা পুণ্যাত্মা হবেন। তাঁরাই রইলেন। পাপ Plus আমি প্রাতেই বেরিয়ে পড়লুম।…

• • •

"আই হাজ"এর গল্পেরও একটু অভিনবত্ব আছে। একদিকে দেশের সহৃদয় তরুণদের কথা, অপরদিকে নিরীহ মানুষকে বৃথা সন্দেহে Agent Provocatlur ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিরূপ নাস্তানাবুদ করিয়া তুলে, 'আই হাজ'এ তাহারই অপরূপ চিত্র দেওয়া আছে। এই নিরীহ ব্যক্তিটি অতিষ্ঠ হইয়া যখন দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন পথে ও ঘরে যে সকল লেখকের চরিত্রের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন —উকীল, ডাক্তার, পুলিশ, গুপ্তচর, ক্যান্‌ভাসার, জ্যোতিষী……প্রভৃতি—তাহাদের চরিত্রের বৈচিত্র্য ও

বৈশিষ্ট্য কেদারনাথের অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে কেদারনাথ চিরদিনই আত্মবিলুপ্তির পক্ষপাতী। সেইজন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের তরফ হইতে যখন তাঁহার ৭০ বৎসর পূর্ত্তিতে জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা হয় তখন তিনি তাহাতে আপত্তি করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সপ্রশংস পত্র লেখায় তিনি তাহার উত্তরে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও মাধুর্য্যের সঙ্গে এই সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা লিখেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব :—

"আমি ভাই ইচ্ছে করেই এ লাইন নিয়েছিলুম তাতে নিজের (পূর্ব্বের) ভাষাকে Sacrifice কোরে উদ্ভট ভাষা ও ষ্টাইল বরণ করতে হয়েছে। সাধু ভাষায় সার্মন শোনাতে গেলে কেউ হাতেও করবে না বোলে। বেদনাগুলোকে তাই এই পোষাক পরিয়ে বার করতে হয়েছে। তা না হ'লে যাঁরা দয়া ক'রে পড়ছেন, তাঁদেরও পেতুম কি না সন্দেহ। Social criticism উপদেশ, সার্মন কে শুনতে চায়? তাই বক্তব্যগুলিকে যথাসম্ভব সরস বা আনন্দপ্রদ বা সহজপাঠ্য করবার চেষ্টা পাই মাত্র। সে কাজ সহজ নয়, আমার প্রয়াস পাওয়া। উপযুক্ত লেখক আসরে নেই, যিনি ফোটাবেন। তাঁর জন্যই এই আহ্বান রইল।"…

শুনিয়াছি শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব, তাঁহার এই আন্তরিক আহ্বানে যদি তাঁহার চেয়ে শক্তিশালী লেখক বাঙ্গলা রসসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হ'ন, সেতো আনন্দেরই কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা কেদারনাথকে জানাইতে চাই যে, তাঁহাকে পাইয়াই আমরা খুসী। এবং তিনি চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিকট উদ্ভট ঠেকিলেও, বাঙ্গলার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তাহা সাতিশয় উপাদেয় হইয়া আছে ও থাকিবে।

শ্রীপ্রমোদ সেন

ইটালীর ঝড় দাঁও গেল ফস্কে

ইটালী-আবিসিনীয় যুদ্ধে গোড়া থেকে অনেকেরই সন্দেহ ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত একটা জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ইয়ুরোপীয় শক্তিবর্গ আবিসিনিয়ার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করবে। যুদ্ধ সুরু হবার পরেই প্যারীতে একটা বৈঠক হয় এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ভাল রকম ক'রেই কালনেমির লঙ্কাভাগের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইটালীর বড় কর্ত্তা এবার একটা জোর দাঁও না মেরে ক্ষান্ত হবেন না, এই জন্যে গেলেন তিনি বিগ্‌ড়ে এবং বল্‌লেন রফা টফা কিছু নয়, আবিসিনিয়াকে চাই ইটালীর মুঠোর মধ্যে। কাজেই সেবার সন্ধি-চেষ্টা গেল ফেঁসে।

তারপর জাতিসঙ্ঘ ইটালীকে একটু আধটু মোচড় দিতে আরম্ভ করলে, তাতে ইটালী উঠ্‌লো আরও ক্ষেপে। আর্থিক সাহায্য বন্ধ হওয়ায় এবং বাণিজ্য বয়কটের ফলে ইটালীর অবস্থাও বেশ টলমলে হয়ে উঠ্‌ল। এমন সময়ে কথা উঠ্‌লো যে জাতিসঙ্ঘ যদি ইটালীতে পেট্রোল পাঠান বন্ধ করবার ব্যবস্থা করতে পারে তা হ'লেই ইটালী আর যুদ্ধ চালাতে পারবে না। পেট্রোল না পেলে ইটালী বোমাবর্ষী এরোপ্লেন, সৈন্যবাহী লরী বা অগ্নিবর্ষী ট্যাঙ্ক কিছুই রণক্ষেত্রে চালাতে

পারবে না। হাব্‌সীদের ঐ সব যন্ত্র নেই, কিন্তু তাদের যা সামান্য কিছু কামান বন্দুক আছে তা'তেই ইটালীয়দের ঘোল খাইয়ে দিতে পারবে।

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী লাভাল ও মুসোলিনি। লাভাল আজকাল ইটালীর প্রতি খুব দরদী হয়েছেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থার সম্ভাবনা জেনে ইটালী উঠ্‌ল মরিয়া হ'য়ে, আর ফ্রান্সের বুক ইটালীর দুঃখ ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল। মুসোলিনি অনেকদিন থেকেই হুঙ্কার দিচ্ছিলেন, সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি করো না; বেগতিক দেখ্‌লে ইয়ুরোপে আগুন জ্বালাব।' পেট্রোল বন্ধ হবার কথা শুনেই মুসোলিনি ফ্রান্সের সীমান্তে সৈন্য চালাতে আরম্ভ করল—বলা বাহুল্য, ফ্রান্সকে ভয় দেখাবার জন্যে। ইটালী একা ফ্রান্স বা বৃটেন কা'র সঙ্গে টক্কর দিতে পারে না, কিন্তু—ইটালী জানে ফ্রান্স দুর্ব্বল কোথায়। তাই মুসোলিনি ইঙ্গিত করলেন যে, জার্ম্মানীর সঙ্গে ইটালী একেযোগে ফ্রান্সকে বিব্রত করতে পারে। একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর, কাজেই ফ্রান্স এই ইঙ্গিত পেয়েই একেবারে মুস্‌ড়ে গেল।

আসলে ফ্রান্স ইদানীং আভাষ পেয়েছিল যে, বৃটেন আর ইয়ুরোপের ব্যাপারে তত মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়, আর গত যুদ্ধের সময়কার মত বৃটেন ও ফ্রান্সে গলাগলি ভাব নেই। পরন্তু জার্ম্মানীকে তোয়াজ করাই হয়েছে আধুনিক বৃটিশ নীতি। জার্ম্মানী ভাসাই সন্ধি ছিঁড়ে বেপরোয়া শক্রবৃদ্ধি সুরু করলে। বৃটেন তা'রত' প্রতিকার করলেই না জার্ম্মানীর পিঠে হাত বুলিয়ে তা'কে রণতরীবহর গড়্‌তে বল্‌লে। কাজেই ফ্রান্স দেখ্‌লে আত্মানং সততং রক্ষেৎ নীতি মান্‌তেই হবে, এবং আত্মরক্ষার জন্যে পড়্‌ল ঝুঁকে ইটালীর দিকে। এ অবশ্য আর বছরকার কথা।

এদিকে সেই ইটালী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলে, বৃটেন ভাব্‌লে যে গতিক বড় সুবিধে নয়। রণোন্মাদনায় যদি ইটালী বৃটেনের সাম্রাজ্যের কোন অংশে দাঁত বসায়! মাল্টার ওপর ত' ইটালীর অনেকদিন থেকেই নজর আছে; মিশরের দিকেও ইটালী মাঝে মাঝে আড়ে আড়ে চায়। কাজেই বৃটিশ রণতরী-বহর ভোঁ ভোঁ করে উঠ্‌ল ও ভূমধ্যসাগরের

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে বৃটিশ নৌসৈন্যের কুচ কাওয়াজ। এই সৈন্যদলের অবস্থানের জন্যে মিশরীরা খুব উত্তেজিত হয়েছিল, বৃটিশদের বিরুদ্ধে কায়রোয় খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল, এবং শেষে সব দল মিলে দেশে পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করবে ঠিক করেছে।

কূলে কূলে আড্ডা নিলে। এতে ইটালী খুব বিরক্ত হ'ল, আর ফ্রান্সের কাছে করলে নালিশ। ফ্রান্স অনেক

বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাস কয়েক পরে বৃটেনকে রাজি করলে যে সে নৌবহরের খানিকটা সরিয়ে নেবে—প্রবল পরাক্রান্ত ইটালীর সম্মানরক্ষার্থ!

হোর সাহেবের কীর্ত্তি

সাধারণ লোকে প্রথমটা এর রহস্য বুঝতে পারে নি। কিন্তু যখন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বলডুইন সাহেব পার্লামেন্টে বল্লেন যে বৃটিশ রণপোত বহর শুধু বেড়িয়ে বেড়ানর জন্যে ভূমধ্যসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তখন সবাই রইল হাঁ করে। মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন, কি? রসিকতা নাকি? রয়টার বল্লে, হাঁ, রসিকতা বটেই। রসিকতা করার অবশ্য প্রয়োজন ছিল, কারণ তা'র কয়েকদিন আগেই মিশরীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বৃটেনকে মেনে নিতে হয়েছিল। সেটা বড় প্রীতিকর ব্যাপার নয়, এবং তার আগে মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায় বৃটিশ রণতরী-বহর

স্যার স্যমুয়েল হোর, লেডী হোর ও পরাজিত শ্রমিক নির্ব্বাচন প্রার্থী স্যান্ডিল্যাণ্ডস্। এই ছবিখানি বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় তোলা হয়েছিল।

আড্ডা নেবার জন্যেই কাইরোয় বৃটিশদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছিল। কাজেই ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে মিশরীদের দাবী বৃটেন মেনে নিলে।

কিন্তু এ রহস্যের পর যখন আর একটা বিরাট রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল তখন পৃথিবীর সবাই উঠল ক্ষেপে। সে রহস্যের নায়ক ছিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্বনামধন্য স্যার স্যামুয়েল হোর—যাঁর ভারতকীর্ত্তিতে এখনও জগৎ মুখরিত—এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী, বর্ণ-চোরা আম মসিয়ে লাভাল। এই দুই ধুরন্ধর সলা পরামর্শ করে একেবারে ঠিক করেছিলেন যে, আবিসিনিয়াকে ইটালীর কাছে জবাই হ'তেই হবে। আর বর্ত্তমান রণদেবতা সিনর মুসোলিনি তুষ্ট হলে ইয়ুরোপ যুদ্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। এঁদের এই শান্তিসর্ত্ত শুনে বিলেতের লোকেই উঠল হৈ হৈ ক'রে। সবাই বলতে লাগল 'ন্যায় ধর্ম্ম কি সত্যিই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছে?' বাস্তবিক এক-খানা আমেরিকার সংবাদপত্র বল্‌লে যে, এবার পৃথিবীর বিবেক-বুদ্ধি জেগেছে।

বেগতিক দেখে হোরের মুরুব্বি বল্‌ডুইন সাহেব বল্লেন, "না, না, শান্তির প্রচেষ্টা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।" এমন অভিনব জন্ম ও অভিনব মৃত্যু আর কখনও দেখা যায় নি। অবশ্য বল্‌ডুইন সাহেব বিলাতের লোকের দারুণ বিরুদ্ধতা বুঝেই এক কথায় হোরের এই অপূর্ব্ব প্রস্তাব খতম ক'রে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হোর সাহেবও চাকুরিতে দিলেন ইস্তফা। আবিসিনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যানলী বল্‌ডুইন

ছাড়ল, আর ইটালী ছাড়ল মর্ম্মবেদনার দীর্ঘশ্বাস। হোর সাহেব গেলেন সুইজার্ল্যাণ্ডে ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে—বল্‌ডুইন তাঁর কলঙ্ক-কালিমা কোন রকমে দিলেন মুছে।

কিন্তু হোর সাহেবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বল্‌ডুইন সাহেব যে কাঁদুনি গেয়েছেন তা'তে সবাই হেসেছে। তিনি নাকি প্যারীর সলাপরামর্শের কথা কিছুই জান্‌তেন না, হোর সাহেব যখন তাঁকে চিঠি লিখে সব জানালেন তখন তিনি বুঝলেন কি ব্যাপার হচ্ছে। হোর সাহেবের চিঠি লিখে জানাতে হ'ল, বোধ করি ছুইদিন যাবৎ লণ্ডন প্যারীর টেলিফোন সংযোগ গিয়েছিল বিগড়ে। আর সত্যিই যদি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ না নিয়ে হোর সাহেব এই কীর্ত্তি করে থাকেন, তাহ'লে বলতে হবে, হাঁ, পররাষ্ট্রসচিবের বুকের পাটা বটে! ভারতসচিবগিরি করে তিনি মনে করেছিলেন বোধহয় পৃথিবীটাই ভারতবর্ষ—বেপরোয়া ভাবে চল্‌লেও তা'র কোন কৈফিয়ৎ নেই!

বল্‌ডুইন প্রথমে হোরের প্রস্তাবে রাজি হ'তে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন এই ব্যাপার নিয়ে দলে ভাঙ্গন ধরে তখন 'চাচা আপনা বাঁচা'! এই হ'ল রাজনীতিক লীলা খেলার এক পর্ব্ব।

এখন হবে কি?

এ সব কীর্ত্তি-কেলেঙ্কারীর পরে আবিসিনিয়া খুব জোরে যুদ্ধ চালাচ্ছে, আর ইটালীদের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় রণক্ষেত্রে পিছু হঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকাল আবিসিনীয়দের বীরত্বের কাহিনী রোম থেকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। এর ওপর যদি ইটালী আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থায় পেট্রোল না পায় তা হ'লে ওখান থেকে একেবারে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে আস্‌তে হবে। লয়েড জর্জ্জ বলেন যে, পেট্রোলই এই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় কর্‌বে। কারণ ইটালীর এরোপ্লেন গুলোই আবিসিনীয়দের বেশী ক্ষতি কর্‌ছে।

আবিসিনীয় সম্রাট যুবরাজদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছেন। হোর-লাভালের শান্তির সর্ত্ত শ্রবণমাত্রই তা' তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও হোর তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে ওটাকে

আবিসিনীয়ার উত্তর রণক্ষেত্রে মুশোলিনীর বিরাট চিত্র। অধিকৃত অঞ্চলে ক্যানাভাসে আঁকা ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে যা'তে সৈন্যগণের প্রাণে ঐ মূর্ত্তি দেখে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়।

বিবেচনা কর্‌তেই হবে। প্রত্যুত্তরে তিনি যে শান্তির সর্ত্ত জানিয়েছেন তা'তে ইটালী একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌বে সন্দেহ নেই। ইটালীও যুদ্ধ চালাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছে। মেয়েরা বিবাহের **আঙ্গটী**-গুলা গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করেছে।

এখন সব নির্ভর কর্‌ছে জাতিসঙ্ঘের ওপর। সঙ্ঘ যদি ইটালীতে পেট্রোল বন্ধ কর্‌তে পারে তা হ'লে ইটালী হবে জব্দ। কিন্তু সঙ্ঘ তা কর্‌তে সাহসী হবে বলে বোধ হয় না। ফ্রান্স এতে কিছুতেই রাজি হবে না। ইটালী য়ুরোপে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাজ হাঁসিল কর্‌বে। কারণ আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট হ্যালিফ্যাক্স (লর্ড আরউইন) বলেছেন যে, আফ্রিকার যুদ্ধ থামাবার জন্যে ইয়ুরোপে যুদ্ধ বাধান হতেই পারে না। সুতরাং সঙ্ঘের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত, এবং যুদ্ধ ধিকি ধিকি চল্‌বে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে।

গণেশ-মার্কা

(নক্সা)

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

(১)

ইডেন হিন্দু হষ্টেলে তখন প্রায় আড়াইশো ছেলে। সেই জনারণ্যে নীরেন সেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। চিকন্দি-স্কুলের পনর টাকা বৃত্তিভোগী সদ্য পল্লী-আগত ষোলো বছরের নীরেন। মৌমাছির পালকের মতো সবে গুম্ফরেখা গজাইতেছে। পাতলা রোগা, কণ্ঠস্বর অতিক্ষীণ। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো কোন দিকেই তার খুঁটি নাই। অতএব অষ্টবাস (eight-seater) কক্ষের এক কোণে আড়ালে বসিয়া সে আপন মনেই ত্রিকোণ-মিতি কষিতে থাকে।

কিন্তু গোলোক বসু জানে যে, এই আপাত-নিরীহ গোবেচারীর দল-ই পরিণামে বেশ যণ্ডামার্ক টেরারিষ্ট (ভীষণ বাদী?) হইয়া উঠে। এবং সেই কারণেই সে নীরেনকে আবিষ্কার করিল। 'তুমি' দিয়াই আলাপ আরম্ভ। নীরেন একটু চমকাইল, কারণ এখানে সকলেই তার অপরিচিত এবং সকলেই তাহাকে 'আপনি' বলে। আজ প্রথম ব্যতিক্রম। 'গিফ্‌ট্-অব-দি-গ্যাব্ ফ্রেজ্'টি নীরেন শিখিয়াছিল, আজ তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিল গোলোক বসুতে। প্রথমেই মনে হইল এ ছেলেটি 'জিনিয়স্', পরমুহূর্ত্তেই ভাবিল বড় বাচাল। দুইটি বিপরীত ধারণা তুল-দাঁড়ির দণ্ডে দুলিতে লাগিল! নীরেন অবাক্ হইয়া গোলোকের মুখের পানে তাকায়। সহসা আলাপের মাঝখানে গোলোক বলে,

—বিবেকানন্দকে কেমন লাগে তোমার?

—কে বিবেকানন্দ?

—বিবেকানন্দ স্বামী, বিবেকানন্দ স্বামী, পরমহংসের শ্রেষ্ঠ শিষ্য, কর্ম্মযোগের সন্ন্যাসী। বলিয়া গোলোক —আঠারো বছরের গোলোক—মুখে একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করিল।

বিবেকানন্দ স্বামীর নাম নীরেন শুনিয়াছিল। কিন্তু তিনি আছেন কি নেই, অথবা কর্ম্মযোগ-টি আবার কি পদার্থ, তাহা নিয়া সে কোনকালেই মাথা ঘামায় নাই। আজও তেম্নি না ঘামাইয়া বলিল,—আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

হুঁ! বলিয়া গোলোক যেন একটা গোলোক-ধাঁধায় পড়িয়াছে, এমন ভাব দেখাইল। আর যাইবার সময় বলিয়া গেল,—আচ্ছা, বেলুড় মঠে নিয়ে যাবো একদিন। নীরেন হাঁপ ছাড়িয়া লজিক খুলিল।

গোলোক ভোলে নাই। সেদিন দোল-পূর্ণিমা। ছেলেরা রঙ্‌মাখা পর্ব্ব শেষ করিয়া সাবান মাখিতেছে। নীরেন কক্ষের চেয়ারে বসিয়া বারান্দায় পরিত্যক্ত সুরঞ্জিত বসনের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া একবার অন্যমনস্কভাবেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। গোলোক কখন আসিয়া পাশের খাটে বসিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দোলের থিওরী জানো?

চমকিয়া নীরেন ফিরিয়া তাকাইল। দোলের যে একটা থিওরী আছে, সে আজ এই প্রথম শুনিল। আবাল্য রঙ ও ফাগ নিয়া ফাগুন মাসে সে দোল খেলিয়াছে, থিওরী না জানিয়াই বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

সহসা আজ এই 'গার্ডেন্-অব-ইডেনে' তাহার সাম্নে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। গোলোকের সপিল চাহনিতে সে যেন কিঞ্চিৎ ভড়কাইয়া গেল। ধীরে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

গোলোক এক পা দুলাইয়া আরেক পা চুলকাইতেছিল। এইবার উঠিয়া বাবু হইয়া বসিল। ঘরে তখন আর কেহ নাই। অতএব নির্দ্বিঘ্নে বলিতে লাগিল,—

—দোল খেলে সারা ঘর লাল করে ফেলেছো, অথচ এর ইতিহাস জানো না, আশ্চর্য্য! সুরাট বন্দরের নাম শুনেছো ত? প্রাচীন যুগে সুরাটের নাম ছিল সৌরাষ্ট্র, অর্থাৎ সৌরাষ্ট্র—এখন সেখানে গুজরাট,—পরে গুর্জ্জর আর সৌরাট এক হয়ে গেছলো। পারসীকগণ এই সৌরাট আক্রমণ করে, কিন্তু হেরে হটে গিয়ে দক্ষিণে বোম্বাই-উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে…

নীরেন বিস্ময়ে শুনিতেছিল। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বলিল,—কিন্তু ইতিহাসে যে লেখে পারসীকগণ মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলো।

—হুঁ! বলিয়া গোলোক নীরেনের দিকে তাচ্ছিল্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে-চাহনির অর্থ, মূর্খ। তারপর বলিতে লাগিল—ও ইতিহাস লিখেছে কে? বিদেশী। স্রেফ্ মিথ্যে কথা—মুসলমানদের ভীষণতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা শুধু। যাক্। সেই যুদ্ধে সৌরাটবাসী বিজয়গর্ব্বে শত্রুর রক্ত গায়ে মেখে উৎসব করেছিল। হোলী তোমার ফূর্ত্তি করবার পর্ব্ব নয়; এদেশের কতকগুলো অপোগণ্ড রাজা একে মাতা-মাতির বসন্তোৎসব করে তুলেছিলো—কিন্তু তাই বলে সত্যের অবমাননা করা চলে না ত! হোলী বীরত্বের উৎসব, যৌবনের বীর্য্যের উৎসব……

বলিয়া গোলোক প্রচণ্ড গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিল।

বালক নীরেনের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতেছিল। ভাবিল, গোলোক কত জানে, আর সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে—পাঠ্য বই ছাড়া আর কিছুই পড়েনি, কিছুই জানে না। আজ গোলোকের প্রতি সম্ভ্রমে মন ভারী হইয়া উঠিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে শুধাইল,—আপনি এসব কোন্ বইয়ে পড়লেন?

গোলোক মুখ বাঁকাইয়া উত্তর দেয়—বই এখনো বেরোয় নি, বেরুলে সিডিশান্ হবে যে! গণেশ দা' এ বিষয়ে রিসার্চ করেছেন,—তিনি হিষ্ট্রিতে এম্-এ পড়েন, সোসিওলজি স্পেশ্যাল্ পেপার।…

—ওঃ বলিয়া নীরেন যেন বেশ তৃপ্তি পাইয়াছে, দেখাইল।

গোলোক স্মিত মুখে বলে,—গণেশদা'র কাছে যাবে? তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে একটা মস্ত আদর্শ পাবে। আজ সন্ধ্যেয় নিয়ে যাবো, কেমন?

—আজই?

—হাঁ, নইলে তাঁকে সব সময় পাওয়া যায় না।

(২)

নিমু গোস্বামীর গলিতে থাকেন শ্রীগণেশলাল চক্রবর্ত্তী ও তস্য ভ্রাতা কার্ত্তিক। বাসায় মেয়ে মানুষ আছে—খুড়ীমা ও কন্যা প্রভা। প্রভা বেথুন ইস্কুলে পড়ে।

দোল-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। কলিকাতা নগরীর ধূম-ধূসর আকাশে পৌর্ণমাসীর শোভা তেমন বিকশিত হয় নাই। গোলোক পথে যাইতে যাইতে নীরেনকে বলিল,—এই যে সহরের বুকের ওপর মলিনতা, এ যেন আমাদের পরাধীনতার গ্লানি। সুন্দর উপমা, নীরেনের ভাল লাগিল। একটি ছোট দোতলা বাড়ীর দরজায় আসিয়া গোলোক প্রথমে অধর কুঞ্চিত করিয়া এক তীব্র-ধ্বনি শিস্ দিল, তারপর দরজার শিকলটি ধরিয়া সাড়ে তিনবার নাড়া দিল। কে একজন ভিতর হইতে শুধাইল, কে? গোলোক উত্তর দিল—তিরানব্বই। ইহাই সাঙ্কেতিক নম্বর। অগ্নি দরজা খুলিয়া গেল। একটি পনর বছরের মেয়ে,—যার মুখে গলির গ্যাসের আলো পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছিল—জিজ্ঞাসা করিল, এ ছেলেটি কে নিতাই দা'?

নানা প্রকার সাঙ্কেতিক ব্যাপারে নীরেনের কিশোর মনে তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। এইবার আরও আশ্চর্য্য লাগিল, যখন বুঝিল, গোলোক এখানে নিতাই,—এবং এখানে বেশ একটা লুকোচুরি ব্যাপার চলিতেছে। এ সকলের প্রবল আকর্ষণ আছে। নীরেনের হৃদয় ক্রমেই একটা আদর্শের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

গোলোক সংক্ষেপে উত্তর দিল, এন্। অর্থাৎ 'নিউ', মানে নূতন।

মেয়েটি ঝুঁকিয়া শ্যেন-দৃষ্টিতে নীরেনের মুখের পানে চাহিল। তারপর অকারণ বুকের আঁচল টানিয়া টাইট্ (দৃঢ়) করিয়া, মাথার খোঁপায় একটা থাপড় মারিয়া, ডান হাতে চিবুক চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,—বড়দা' ছাদে আছেন।

গণেশদা'র সঙ্গে নীরেনের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া গোলোক সরিয়া পড়িয়াছে। হয়ত ততক্ষণ নীচের প্রভাকে একটা প্রাণায়াম শিখাইতেছে।

গণেশদা'র কোন ভূমিকা নাই, একেবারেই কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। নীরনকে একটা মাদুরে বসিতে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, সঙ্ঘ মানে জানো?

নীরেনের বুক দুর-দুর করিতেছে। অতি কষ্টে উত্তর দিল,—আজ্ঞে, দল।

—দল ত বুঝলাম। প্রিন্সিপল্ কি?

নীরেন প্রিন্সিপল্ শব্দের মানেটাই তেমন আয়ত্ত করে নাই। ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল।

গণেশদা' অতঃপর তাহার পিঠে স্নেহভরে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সমস্ত বিষয় জলের মতো সহজ করিয়া দিলেন:

সঙ্ঘের মূলসূত্র (প্রিন্সিপল্) আইন ও শৃঙ্খলা। নেতার আদেশ মানিতে হইবে, প্রাণ যাক্ আর থাকুক। না জানিলেও প্রাণ যাইতে পারে,—ইহাই সামরিক নিয়ম। জার্ম্মানী ও জাপানী ডিসিপ্লিন্ (নিয়মানুবর্ত্তিতা) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাপানী যুবক নিয়ম ভাঙ্গিলে 'হারিকিরি' (আত্মহত্যা) করে—বাঙ্গালী জাতির সহিত ইমোশান্যাল্ মিল আছে। নেতা যে কাজের ভার দিবেন তাহাই করিতে হইবে, বিনা প্রশ্নে, বিনা সংকোচে। একটা ছদ্মনামে চলিতে হইবে। গণেশদা-পরিচালিত গুপ্ত সমিতিটি ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ, ইহার প্রোগ্রাম অভিনব। নীরেন আজ হইতে এ সঙ্ঘের সভ্য হইল, তার নাম হইল 'ছোটকা'।

নীরেনের জিভ শুকাইয়া জড়াইয়া আসিতেছিল। অথচ বেশ কৌতূহল হইতেছিল, ধমনীর শোণিত যেন দ্রুততর বহিতেছিল।

শুষ্ককণ্ঠে শুধাইল,—প্রোগ্রাম কী?

গণেশদা' কঠিন দৃষ্টিতে বারেক চাহিলেন। তারপর বলিলেন,—যে কথা শুনবে, খবরদার যেন কাউকে প্রকাশ কোরোনা। আমরা নিজেরা স্বাধীনতার জন্যে কিছুই চেষ্টা করবো না, কারণ করা বোকামি ও শক্তির অপব্যয়। দেখো, মানুষের চরিত্র পৃথিবীব্যাপী এক—প্রত্যেকেই কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তির সমষ্টি। অতএব বড়লাটের সঙ্গে আমরা একটা গুপ্তসন্ধি করবো। জানতো—ছলে, বলে, কৌশলে কাজ উদ্ধার করা। আমরা আশ্রয় নেব ছল্ ও কৌশলের। তারপর? তারপর, কাজ উদ্ধার হ'লে সন্ধিপত্রকে Scrap of paper ব'লতে কতক্ষণ!

নীরেন স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা যুগে যুগে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যাওয়া কী পরম সৌভাগ্য! অধর মুখার্জ্জীর ইতিহাস নীরেনের কণ্ঠস্থ ছিল। সমস্ত ঘটনা আবার যেন সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

নীরেন গদগদ কণ্ঠে কহিল,—এক গেলাস জল।

—তেষ্টা পেয়েছে? আচ্ছা,—এই পরী—একে জল খাওয়াও।

গণেশদা' প্রভাকে ডাকেন পরী। সে ধীরে ধীরে আসিয়া অঙ্গুলি-ইসারায় নীরেনকে নীচে নিয়া গেল। গোলোক আসিল উপরে, জরুরী কথা-বার্ত্তার জন্য।

ছোটখাটো সাজানো ঝরঝরে ঘরখানি। টেবিলে

সাজানো বই, খাতায় পরিষ্কার হাতে লেখা 'মুকুলিকা মুখার্জ্জী'। ইহা প্রভার ইস্কুলের নাম। নীরেন চুপ করিয়া ঘড়ির কাঁটার গতি পরীক্ষা করিতেছে। এমন সময় প্রভা আসিল ধীর নম্র কম্প্র পাদক্ষেপে, তার হাতে রেকাবী। মেয়েরা লাঠি খেলিবার সময় যেমন ধারা কাপড় পরে, তেম্নি কাপড় পরা। মাথার কেশ চূড়াকারে জড়ানো। মুখ প্রশান্ত। ধীরে রেকাবিস্থ ছোট বাটি হইতে রক্ত চন্দন নিয়া প্রভা প্রথমে নীরেনের ললাটে তিলক আঁকিল। তারপর একগাছি গোড়ের মালা তুলিয়া, বাঁ হাতে নীরেনের চিবুক ধরিয়া তাহার গলায় টপ্ করিয়া পরাইয়া দিল।

নীরেনের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়াছে। এ যেন "য়্যালিস্-ইন্-ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড্"—কুহকের রাজ্য। সে ভাবিতেছিল, এই মেয়েটিকে একটি প্রণাম করা উচিত কি না। এমন সময় মুকুলিকা-ই তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—তোমাকে ছোড়-দা বলবো, কেমন ?—এইবার জল খাও।

রেকাবীতে তিনখানি সন্দেশ ছিল। নীরেন এক খানি মুখে ফেলিল। গিলিতে গিলিতে গলায় আটকাইয়া যায়। প্রভা টেবিলের উপর বসিয়া বলিতে লাগিল,—আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য একজন মাত্র সভ্য সংগ্রহ (রিক্রুট্) করা। কারণ, প্রত্যেক ছেলে মেয়ের মাত্র একজন বন্ধুই থাকে, যা-কে সে তার প্রাণের সব চেয়ে গোপন কথা বল্‌তে পারে। বেশি বেশি রিক্রুট্ করতে গেলেই বাজে লোক দলে ঢোকে, এবং পরে এপ্রুভার হয়।

নীরেন এ সব বচনের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিল কি না জানি না, শুধু চাহিয়া দেখিল মুকুলিকার চোখে অদ্ভুত চাহনি, আর টেবিবের তলায় সে তার পায়ের আঙ্গুল নিয়া খেলা করিতেছে। নীরেন বিরক্তিতে অথবা সুখে চোখ মুদ্রিত করিল।

ততক্ষণ গলায় সন্দেশ লাগিয়া কণ্ঠরোধ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া জলের গেলাস তুলিয়া নিল। আর দেখিল মুকুলিকা একখানি সন্দেশ খাই-তেছে। তাহার মুখে যেন চাপা হাসি। সে-হাসি পতঙ্গের সম্মুখে বহ্নিশিখার ন্যায় বুঝি লেলিহানরূপে জ্বলিয়া ওঠে!

(৩)

গোলোক বলিল,—একটা প্রকাণ্ড আয়োজন চলছে। শীঘ্রি আমাদের ডাক পড়বে; এবং বহু টাকার দরকার……

—কোথকে আসবে এত টাকা? শুধাইয়া নীরেন বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। তাহার টেবিলে প্লেটের উপর অর্দ্ধভুক্ত কাটলেট। আগে সে ডিম-মাংস কিছুই খাইত না, এখন খায়। যে-হেতু গোলোক বলিয়াছে, দেশ স্বাধীন করিতে হইলে চাই আমিষ-ভোজন দ্বারা রজোগুণের বিকাশ।

গোলোক বলিল,—তার জোগাড় কি আর না হচ্ছে। আমরা স্বদেশী ডাকাতি ঘৃণা করি, ওতে জনসাধারণের সহানুভূতি হারায়। অর্থের সংস্থান করতে হবে ব্যক্তিগত উপার্জ্জন ও ত্যাগের দ্বারা। গণেশদা' তিনটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, একটির নাম 'গণেশ-সিদ্ধি ভাঙ্', একটি 'গণেশদন্ত-মঞ্জন', আর একটি 'গণেশ-গদা সালসা'। আমরাই এ সকল ওষুধ ক্যানভ্যাস্ ক'রে বিক্রি করি…হ্যাঁ!… এটুকু সাহায্য যদি আমরা সঙ্ঘকে না করবো ত দেশের কাজ চলবে কি ক'রে?

নীরেন দেশপ্রেম-গদগদ কণ্ঠে কহিল,—তাত বটেই। গোলোক বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়িয়া, আবার বলিল,—তোমাকে সপ্তাহে শুধু একদিন ই-আই-আর লোক্যাল ট্রেনে একটা ওষুধ বেচে আসতে হবে… এতে মনের দ্বিধা (প্রেজুডিস্) থাকলে চলবে না, কারণ লাইফ-ইন্সিওর্যান্স্ পলিসি বেচাও যা, ওষুধ বেচাও তাই…মাসে যদি তুমি চারদিন দশটাকা করে বেচতে পারো ত জানবে সঙ্ঘকে চল্লিশ টাকা সাহায্য করা হলো। হ্যাঁ, ভালো কথা—কাল গণেশদা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। ঠিক সন্ধ্যে

সাড়ে ছটার সময় শ্যামবাজার পার্কের উত্তর দক্ষিণ কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে…যে এসে বলবে তিরানব্বুই তার সঙ্গে যেও।

নীরেন বেশ মাতিয়া উঠিয়াছে। শিশু প্রথম কথা বলিতে শিখিলে যেমন কথার চোটে মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, সেও তেমনি নিজের ভিতর অতিষ্ঠ হইয়াছে। এই সকল কাণাকাণি লুকোচুরিতে উন্মাদনা আছে। নীরেন একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত। তার উপর সেই মেয়েটি মুকুলিকা! তার একটি মনোরম আকর্ষণ আছে! বড় চটুল তার চোখ, বড় তীব্র চাহনি, বড় নরম হাতদুখানি, বড় ফাজিল মুখ। তবু যেন নেশা লাগে। যেদিন গণেশদা'র বাসায় জরুরী কাজের জন্য ডাক পড়ে, সে দিন যেন নীরেন কৃতার্থ হইয়া যায়। মেয়েটি গেলেই তাহাকে নিভৃত কক্ষে বসাইয়া সন্দেশ খাও য়ায়। গণেশদা'র জরুরী কাজ যে কী, নীরেন এখনো উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অন্ধকার কক্ষে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, দুয়েকজন যাতায়াত করে, একটা প্রকাণ্ড সঙ্গোপন ষড়যন্ত্র……নীরেনের বুক দুরু দুরু কাঁপিয়াছে, অথচ কৌতূহল বাড়িয়াছে—উড়ের দোকানের ঝালবড়ার মতো, তার আস্বাদ যত ঝাল, তত খাইতে ইচ্ছা করে।

নীরেন ঠিক সময় মতো শ্যামবাজার পার্কে পৌঁছিল। একটি ছেলে শিস্ দিতে দিতে আসিয়া বলিল তিরানব্বুই। অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না। নীরেন অনুসরণ করিল, নিদ্রাঘোরে হাঁটার মতো। মনে কি অদ্ভুত কল্পনা, আজগুবি ছবি। যখন একটি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, তখন দেখে সেই পুরাতন গণেশদা'রই বাসা, আর সঙ্গের ব্যক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

মুকুলিকা হাসিয়া বলিল,—ছোড়দা' যে! অনেক দিন পরে আবার তোমায় দেখছি। যাও, ছাদে বড়দা' আছেন।

নীরেন বরাবর ছাদে উঠিল। বিনা ছুটিতে বেশিক্ষণ কথা বলা ডিসিপ্লিন্-বিরুদ্ধ।

গণেশদা' একখানি সিঙ্গাপুরী মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছেন। আরও গোটা চারি ছেলে অন্ধকারে ভূতের মতন উপবিষ্ট। মাথার উপর একাদশীর চাঁদ, নগরীর ধোঁয়ায় কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন। চারিদিকে জুগুপ্সার আবেশ।

নীরেন নীরবে আসন গ্রহণ করিল। কতক্ষণ সকলেই চুপ্ চাপ্। অতঃপর গণেশদা' অতি প্রশান্ত গাঢ় স্বরে কহিতে লাগিলেন;—আমাদের শীঘ্রি একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা করতে হবে…রাজা প্রতাপরুদ্রের নাম শুনেছো ত! তিনি এখন আমাদের পার্টির তরফ হতে ইংলণ্ডে প্রপাগাণ্ডা করছেন। লেবার পার্টির সঙ্গে একটা গুপ্ত সন্ধি হয়ে গেছে;……যাক তুমি পলিটিক্স্ পড়নি, ব্যাপারটা হয়ত তেমন ধরতে পারছো না! মোট কথা সন্ধির সর্ত্তসমেত একটা খসড়া নিয়ে প্রতাপরুদ্র চাইনিজ ফ্রন্টিয়ার্সে (সীমান্তে) আসছেন। তাঁর কাছ থেকে জিনিষটা ভেতরে আনবার জন্যে একটা এক্সপিডিশান্ (অভিযান) পাঠাতে হবে।…তার জন্যে টাকা চাই। অতএব আজ আমি তোমার স্কলার্শিপের সমস্ত টাকা 'য়্যাটাচ্' করলাম, অর্থাৎ, তোমার অতিসংক্ষিপ্ত ব্যয় ছাড়া আর সবই আমার হাতে দিতে হবে। সাত দিনের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা চাই…

নীরেন বিস্ময়ে, পুলকে শিহরিয়া উঠিল। এই নিভৃত কক্ষচারী গোবেচারী গণেশদা' এখানে বসিয়া কী সব আশ্চর্য্যকর অভিসন্ধি করিয়াছেন—ভিতরে ভিতরে কী বিরাট্ কাণ্ড কারখানা!

তারপর একে একে চারটি বালক চলিয়া গেল। নীরেন সবশেষে নামিল। সিঁড়ির পাশ হইতে প্রভা তাহাকে ডাকিয়া আপন কক্ষে নিয়া বসাইল। নীরেন চমকিত হইল। প্রভার পরণে আজ রক্তাম্বর, লাল ক্রেপ্ সিল্ক্। আলুলায়িত কেশ, ললাটে এক ইঞ্চি ব্যাসের একটা অত্যুজ্জ্বল সিঁদুর ফোঁটা,—কবি

কৃষ্ণচন্দ্র বর্ণিত ঊষার ভালে বালার্ক সিন্দুর-বিন্দুর সমান।

নীরেন মোহাবিষ্টের ন্যায় বসিল। টেবিলের উপর চোখ পড়িতে শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল—দেখিল, সিন্দুর-রঞ্জিত একখানি খড়্গা—আসল কি নকল তাহা বোঝা গেল না। প্রভা সেইখানি তুলিয়া কাত করিয়া একটিবার নীরেনের মাথায় স্পর্শ করিল। তারপর দীর্ঘ-রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র রেখা তাহার ললাটে আঁকিয়া দিল। বিমূঢ় নীরেনের প্রতি কহিল,—আজ আমাদের সঙ্ঘের জন্মতিথি, বড় উৎসবের দিন; আমরা এইভাবে উৎসব করি।

তারপর সহসা প্রভা বসন সরাইয়া রক্তচন্দনের পত্রলেখাময় আপন বক্ষস্থল উন্মোচিত করিল। একি! বক্ষের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা বিলম্বিত। এক হাতে সেই খড়্গা তুলিয়া নিয়া প্রভা অবিকল শ্মশান-কালীর মতো দাঁড়াইল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে নীরেনের দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া বুকের উপর স্থাপিত করিল, এবং বলিল,—ছোড়্দা' আজ আমার বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, যে তুমি আজীবন মাতৃসেবা করবে···

নীরেন অস্ফুট স্বরে কি বলিল। প্রভা আবার বলিল,—বল, বন্দে মাতরম্। নীরেন তাহাই বলিল।

এতক্ষণ প্রভা নীরেনের হাতখানি আপনার বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ছিল। এইবার ছাড়িয়া দিল।

এক মিনিটের মধ্যে খড়্গের স্থানে আবার আসিল সেই সন্দেশ ও একগ্লাশ শীতল জল। নীরেন বড় পিপাসিত!

(৪)

ব্যাণ্ডেল লোক্যাল্ চলিতেছে ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে—ঝকাঝকি ঝকাঝকি ঝক্। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। অধিকাংশই আশেপাশের প্রত্যহ-যাত্রী। বেশ ভীড়।

তরুণ ক্যানভাসার নীরেন সেন হাঁকিল,—আমার কাছে তিনটি অতি উৎকৃষ্ট স্বদেশী ওষুধ আছে। আপনারা ত বিদেশী ওষুধ অনেক ব্যবহার করেছেন, একবার দেশের এই দুর্দ্দিনে আমাদের এই গণেশমার্কা ওষুধ তিনটী ব্যবহার করলেই আর বিদেশীকে পয়সা দিতে হবে না। এই "গণেশ সিদ্ধি ভাঙ"—খেতে ঠিক রাবড়ির মত আস্বাদ, সুন্দর হজমী, অজীর্ণ ও পেট ফাঁপার অব্যর্থ মহৌষধ, অথচ বিলাসীর পক্ষে একটি চমৎকার মোদক। আর এই "গণেশ দন্ত মঞ্জন"—হস্তিদন্তের মতো সুদৃঢ় দাঁত চান ত আজই একশিশি কিনুন। আর এই "গণেশ গদা সালসা", ইহা রক্ত-শোধক, চর্ম্মরোগ-নাশক, বল-বর্দ্ধক, শক্তিশালী জাতি গঠনের ট্যালিস্ম্যান্ স্বরূপ। কাহারো আবশ্যক হয়ত বলবেন······

হাঁকিতে হাঁকিতে নীরেন কামরার ভীড় ঠেলিয়া একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের পানে অগ্রসর হইল। প্রথম প্রথম বড় সঙ্কোচ হইত, এখন আর জড়তা নাই, বেশ গলা খুলিয়া সে চীৎকার করিতে পারে। দেশ-সেবার জন্য নেতারা কত সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারে, আর সে ওষুধ ক্যানভাস্ করিতে পারিবে না! ইহাতে লজ্জাই বা কি? সঙ্কোচই বা কিসের? এ কাজ কখনই হীন নয়! গণেশ দা' তাহাকে এ তত্ত্ব বিশদ ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামপুরে নামিয়া সে আর একটা গাড়ী ধরিবে। তাই প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িল। সে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নীরেনের মুখে এক ঝাপটা ধোঁয়া আসিয়া লাগিল। সে ফিরিয়া দেখিল, গণেশদা'র ভাই কার্ত্তিক একটা ইণ্টার-ক্লাস্ কামরায় বসিয়া অতি মস্‌গুলভাবে সিগারেট খাইতেছে! কোথায় জানি যাইবে। তার পাশে বসিয়া এক তরুণী সুন্দরী, কোন লেডী ফ্রেণ্ড হয়ত। কার্ত্তিক চলন্ত গাড়ী হইতে আর এক ঝলক ধোঁয়া নীরেনের মুখে ধীরে বুলাইয়া দিতে দিতে দূরে মিলাইয়া গেল।

তখন রাত্রি পৌনে দশটা, নীরেন সেদিনের মতো কাজ শেষ করিয়া হাওড়ায় পৌছিল। গেটের বাহিরে আসিতেই দেখে গোলক দাঁড়াইয়া। তার চোখে মুখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টির প্রকাশ। সঙ্কেতে নীরনকে ডাকিয়া গোলোক

বলে,—আজকের কালেক্শান দাও আমার হাতে, ভয়ানক বিপদ। আজকেই ভোর রাত্রিতে বাড়ী সার্চ্চ হবে, গণেশ দা' আজকেই লক্ষ্ণৌ যাত্রা করছেন, সেখান থেকে কুমায়ুনের পথে সিম্‌কি পাশ দিয়ে তিব্বত চলে যাবেন, প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন···দেরী কোরো না, শীঘ্রি দাও···নট্ এ মোমেণ্ট টু লুস্···

নীরেন অসঙ্কোচে সাড়ে সতের টাকা গণিয়া গোলোকের হাতে দিল। একবার প্রাণ ভরিয়া গঙ্গার বায়ু নিঃশ্বাস লইয়া যখন ফিরিয়া চাহিল, তখন গোলোক অদৃশ্য হইয়াছে।

সাড়ে দশটায় হাঁটিয়া নীরেন তাহার মেসে পৌছিল। হ্যাঁ, মেসে, হিন্দু হোষ্টেলে নয়।

গোলোকের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর আড়াই বছরের জল গঙ্গার স্রোত দিয়া বহিয়া গেছে। নীরেন আই, এ, পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। ফেলের সংবাদে যে দিন সে ছল ছল চক্ষে গণেশদা'র বাড়ীতে না ডাকিতেই উপস্থিত, দাদা বলিলেন—ওতে দুঃখ নেই ছোট্কা, দেশের জন্য ও স্যাক্রিফাইস্ (ত্যাগ) করতেই হবে···এই দ্যাখো কার্ত্তিক তিনবার বি, এস্, সি ফেল্ ক'রে আবার বি, এ, থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হয়েছে। এর একটা ব্রাইট্ সাইড আছে—যতদিন ছাত্র থাকবে তত-দিনই এই দলের সঙ্গে সংযোগ থাকবে, জীবনে সেটলড হ'লেই ত ছাড়াছাড়ি হয়, তখন ইণ্টারেষ্ট থাকে না···

অতএব নীরেন হষ্টেল ছাড়িয়া মেসে আশ্রয় লইল, আর একবার পরীক্ষা দিবার জন্য। বাড়ী হইতে মাসে এখন মাত্র কুড়ি টাকা খরচ পায়, আর গণেশ দা' দেন তার কলেজের বেতন।

সাতদিন পরের কথা। নীরেন সন্ধ্যার আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়া একবার নিমুগোস্বামীর লেনে ঘুরিয়া আসিল। দেখে, গণেশদা'র বাসায় সাইন-বোর্ডে লেখা আছে,—এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে। আপনার অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বাহির হইয়া নগরীর ধূম্ররাশিতে মিলাইয়া গেল।

নীরেনের মনে পড়িল, অনেক কথা। বিশেষ করিয়া মুকুলিকার ওরফে প্রভার ওরফে পরীর কথা! রহস্যময়ী বালিকা। বড় স্নেহে—বড় প্রগাঢ় প্রণয়ে সে তাহাকে সন্দেশ খাওয়াইত। আর, সেই আর একদিনের কথা, যেদিন গণেশদা'র আদেশে সে প্রভাকে নিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেই মনোরম তালীকুঞ্জ,—সেই যাহার ঘন ছায়ায় দুইজনে সবুজ ঘাসের উপর দেহ এলাইয়া বসিয়া পড়িল,—সেই তাহার করাঙ্গুলিতে প্রভার পেলব অঙ্গুলির ক্রীড়া, তারপর···

নীরেন শিহরিয়া উঠে, আর ভাবিতে পারে না, একটি সুখ-মুহূর্ত্ত যেন আপনার অন্তরে গোপনে শাশ্বত করিয়া রাখিতে চায়। সেই প্রভা চলিয়া গিয়াছে, মরীচিকার মতো স্পর্শের বাহিরে, চিরদিনের জন্য।

নীরেন একদিন শুধু তার প্রিয়তম বন্ধু নরেশকে বলিয়াছিল,—আমি প্রভাকে ভালবাসি। বলিয়াছিল, আমাদের এ ভালবাসা তাপস তাপসীর প্রেম, আমরা 'আনন্দমঠের' জীবানন্দ ও শান্তি। হবে তুমি, নরেশ, আমাদের আনন্দমঠের সন্ন্যাসী? নরেশ শুধু বলিয়াছিল,—থাক্, এখন না, পরীক্ষার পর।

মেসে ফিরিয়া আসিয়া নীরেন বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। আই, এ পরীক্ষা আর তার দেওয়া হইবে না, কি করিয়া খরচ চালাইবে? গণেশদা' হয়ত এতদিন তিব্বতে, গোলোক হয়ত জেলে। প্রভা কোথায়? কে জানে তাহার সহিত কোনোকালে দেখা হইবে কি না। তাহার দেশ কোথায় তাহাও সে জানে না। খোঁজ করিলেও বিপদের সম্ভাবনা। আপাততঃ তাহাকে একটা দশটাকার প্রাইভেট ট্যুশান্ জোগাড় করিতেই হবে।

কিন্তু মাস দুই হাঁটিহাঁটি করিয়াও যখন বিশেষ কোন ফল ফলিল না, তখন একদা সহসা নীরেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, আর কলেজে পড়িবার কোনই আবশ্যক নাই, সে কেবলি টাকা রোজগার করিবে।

বাক্স খুলিয়া বাহির করিল, গণেশদা'র দেওয়া অসংখ্য ওষুধের লেবেল। এইগুলি সে নিজেই শিশিতে লাগাইয়া প্যাক্ করিত। এতদিন এ বুদ্ধি তার হয় নাই কেন, তাই আশ্চর্য্য লাগে! মেসের ছাদে বসিয়া দুইতিন দিন ধরিয়া নীরেন নানাপ্রকার শিশিতে নানা প্রকার অকথ্য দ্রব্যাদি পুরিয়া লেবেল্ আঁটিয়া সুন্দর পরিপাটি পেটেণ্ট ওষুধ প্রস্তুত করিল। তাহাকে বাঁচিতে হইবে। তাই আবার সে বাহির হইল পথে, হাতে টীনের সুটকেস্, পকেটে রেলের মন্থলি টিকিট, আর গন্তব্য স্থল হাওড়া ষ্টেশন। যাইবার সময় চোখ তুলিয়া দেখে,—আসেপাশের গৃহের দেওয়ালে বড় বড় টাটকা পোষ্টার মারা, তাহাতে লেখা,—

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ মহেশবাবুর গণেশ ঔষধালয়। 'গণেশ গদা সালসা' দেশে নবযুগ আনিয়াছে। সাবধান! গণেশমার্কা দেখিয়া লইবেন! জাল হইতেছে !!!

নীরেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখের বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে ভাবিল,—এই অধ্যক্ষ মহেশবাবু কে?

—•—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

(১)

রাধা-প্রেমে বাঁধা ব্রজে যে কথা বলেছি আমি
প্রণয়-অরুণ রাগে সেকথা হৃদয়ে জাগে,
সে ত নহে ভুলিবার—জীবনের সহগামী।
পীরিতি-যমুনা-কূলে ভক্তি-বংশীবট মূলে
গোপী-হৃদি-বৃন্দাবনে আমি বৃন্দাবন-স্বামী।
এই বৃন্দাবনমাঝে মূর্ত্ত-মুক্তি রাধা রাজে,
'রাধা' 'রাধা' বাজে বাঁশী আপনি দিবসযামী।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

(২)

সখ্য-রস-লীলাভূমি এইখানে বৃন্দাবন;
স্থাবর জঙ্গমে হেথা সখ্য-সূত্রে কি মিলন!
ধবলী শ্যামলী ধেনু উৎকর্ণ শুনিতে বেনু,
শ্যাম শষ্পাস্তৃত গোষ্ঠে করে সুখে বিচরণ।
কালিন্দীর জলধারা বংশীরবে মাতোয়ারা;
বংশীরবে নাচে শিখী উজলি' তমাল বন।
কি মধুর সখ্য-ডোরে বাঁধিয়াছে হেথা মোরে
শ্রীদাম সুদাম দাম বলদাম সখাগণ!
কেমনে সে ডোর ছিঁড়ি যাব' ত্যজি' বৃন্দাবন?

(৩)

বাৎসল্যের লীলাক্ষেত্র কোথা হেন আছে আর?
জননী যশোদাবক্ষে পবিত্র পীযূষধার।
স্নেহে গবী বৎস চাটে, দুগ্ধ শ্রবি' পড়ে বাঁটে,
ধরা পুণ্যপূত হয় লভিয়া পরশ তাঁর।
গোপীকরস্পর্শ আশে গবী আসে তা'র পাশে,
স্নেহে অঙ্গে অঙ্গ দিয়া ডাকে তা'রে বার বার।
পিতৃমাতৃবক্ষহারা স্নেহে লভে শান্তিধারা,
মুগ্ধ করি' রাখে স্নেহ রোধিয়া স্মৃতির দ্বার।
বৃন্দাবন বিনা কোথা এ স্নেহ মিলিবে আর?

(৪)

মাধুর্য্য-মাধুরীভরা বৃন্দাবন পরিহরি'
কোথা যা'ব—রাধা যেথা বিরাজিতা ব্রজেশ্বরী?
কিশোরীর আত্মরক্তি সে যে দিব্য পরাভক্তি—
তরঙ্গিত ভবার্ণবে জীবের মুক্তির তরী।
কুল, মান, লাজ, ভয়, গোপীপ্রেমে পায় লয়—
সে প্রেম অকূল সিন্ধু জীবন-মরণ ভরি'।
চিদাকাশ ভরি' তা'র প্রেম-জ্যোৎস্না পূর্ণিমার
উজল কিরণ-সুধা বৃন্দাবনে পড়ে ঝরি'।
পাদমেকং ন গচ্ছামি বৃন্দাবন পরিহরি'।

শিশু-সাহিত্যের একদিক

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

'শিশু' কথাটার অর্থ আট বছরের অনধিক বালক-বালিকা, মতান্তরে ষোল বছরের অনধিক। প্রথম অর্থানুসারে পাঠশালার বালক-বালিকা এবং দ্বিতীয় অর্থানুসারে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত শৈশবের সীমানার মধ্যে এসে পড়ে।

ষোল বৎসর পর্য্যন্ত যদি শৈশবের সীমা ধরা যায়, তা হ'লে বাংলা সাহিত্যের খুব বেশীর ভাগই শিশু-সাহিত্যের শ্রেণীতে গিয়ে পড়ে। শিশু-সাহিত্য কথাটার অর্থ নিশ্চয়ই এই,—যে সাহিত্য শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত, যা শিশুদের সহজ বোধগম্য এবং যার রসোপলব্ধি তারা নিজেরাই করতে পারে। যে রচনার অর্থ বুঝ্‌তে, রসোপলব্ধি করতে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তা শিশু-সাহিত্যের গণ্ডীর ভেতরে আনা সমীচীন নয় নিশ্চয়ই।

এগারো বারো বছর থেকে পনেরো ষোল বছর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ের ওপরের চার শ্রেণীতে বালক-বালিকারা যে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, তা মোটেই শিশু-সাহিত্য নয়; কারণ, সে সাহিত্য পড়্‌তে বুঝ্‌তে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, এবং এই জন্যই বালক-বালিকারা স্বেচ্ছায় তা বড় একটা পড়্‌তে চায় না। বিদ্যালয়ের তরুণ পাঠার্থীদের সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা একথা স্বীকার করবেন বোধ হয়।

মোটামুটি ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, সাত-আট বছর থেকে বারো বছর অবধি বয়সের ছেলে মেয়েরা অপরের সাহায্য না নিয়েও স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে এবং আনন্দ পায়, এমন যে সাহিত্য, তাই সাত্যিকার শিশু-সাহিত্য। যে কোনও বিষয়-বস্তু শিশু-চিত্তকে আকর্ষণ করে তখন, যখন শিশু বিনা আয়াসে মনের আনন্দে পড়্‌তে পারে এবং তার রসভোগ করতে পারে। শিশুর মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা, সাহিত্য-রচনার শক্তিদ্বারাই শিশু-সাহিত্য রচনা করা যায় না; শিশুদের উদ্দেশ ক'রে বই লেখা যায়, এই পর্য্যন্ত।

বাংলার শিশু-সাহিত্য প্রাচীন নয়, খুবই আধুনিক বলা চলে। কিন্তু আধুনিক হ'লেও গত দশ বারো বছরের মধ্যে যতটা পুষ্টি ও উন্নতি হয়েছে, তাতে আশা করা যায় যে, বাংলার শিশু-সাহিত্য যে কোন দেশের শিশু-সাহিত্যের সমকক্ষ হ'তে না পারলেও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে কয়েক বছরের মধ্যেই।

এত উন্নতি সত্ত্বেও বাংলার শিশু-সাহিত্যে মারাত্মক গলদ ঢুক্‌তে সুরু করেছে। কাঁচা বাঁশেই ঘুণ ধ'রে ব'সে আছে। বাংলার অতি-আধুনিক সাহিত্যের আবহাওয়া শিশু-সাহিত্যকেও এরই মধ্যে কলুষিত করতে চাইছে। শিশুদের পক্ষে এ খুব কম বিপদ নয়।

শৈশবে মনের ওপরে শিক্ষার যে ছাপ পড়ে পরিণত বয়সেও তা একেবারে মুছে যায় না, সুতরাং শিশু-সাহিত্য রচনায় চিন্তাশীলতা ও সাবধানতার যথেষ্ট প্রয়োজন; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকেই সস্তায় সাহিত্যিক হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই সাহিত্য-ক্ষেত্রেই প্রবেশ লাভ করেন। ফলে রং চংএর বাহার দেওয়া বইয়ের সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি হয়, সত্যিকার কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা বোধ হয় স্পষ্ট হবে। শিশু-সাহিত্যে Adventureএর গল্প পূর্ব্বে বড় একটা দেখা যেত না। এ যুগে অসম সাহসিক বীরত্বের কাহিনী শুনিয়ে মনে বীর হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাবার

উদ্দেশ্যে অনেকেই Adventureএর গল্প-রচনায় মন দিলেন। উদ্দেশ্য যে খুবই ভাল তাতে সন্দেহ নেই। সত্যই, এই জাতীয় সাহিত্য শিশুদের জন্য রচিত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। শিশুমনের এত বড় পুষ্টিকর খাদ্য খুব কমই আছে; কিন্তু এই খাদ্যে ভেজাল থাকলে পুষ্টি হ'তে পারে কতটুকু? দেশের ইতিহাস থেকে এই সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে, কল্পনা দ্বারাও স্বদেশ ও স্বজাতির বীরত্ব কাহিনী সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিংবা বিদেশী সাহিত্যের সরল সহজ স্বচ্ছন্দ অনুবাদও এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে! কিন্তু বিদেশী বস্তুকে স্বদেশী ছাপ মেরে বাজারে বের ক'রে ধাপ্পা মারতে হবে, এর কোন যুক্তি নেই। বিদেশের কাহিনী পড়ায় তো কোনই ক্ষতি নেই। বাংলা ভাষায়ই বাংলার ছেলেমেয়েরা বিদেশী কাহিনী পড়ুক। কিন্তু লেখক মনে করেন যে মৌলিকতার অভাব অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, অনুবাদেও বড় একটা খাতির পাওয়া যায় না, কাজেই তিনি চেষ্টা করেন বিদেশী সাহিত্যকে স্বদেশী মার্কা দিয়ে চালাতে।

শিশু-সাহিত্যের একখানা Adventureএর বইয়ের একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যাক। একখানি ইংরাজি বই থেকে এই বাংলা বইটির প্লট নেওয়া হয়েছে। ইংরাজি বইখানিতে আছে,—গল্পের নায়ক মধ্য আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন; ভীষণ হিংস্র জন্তু এবং ভীষণতর হিংস্র মানুষ তাঁকে আক্রমণ করেছে; কিছুতেই তাঁর আর পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই; কিন্তু এক অভাবনীয় ও অতি অদ্ভুত উপায়ে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন। নায়কের বার বার বিপদে পড়া ও উদ্ধার হওয়ার লোমহর্ষণ বর্ণনায় পুস্তকখানি পরিপূর্ণ।

আসামেও ভীষণ জঙ্গল আছে, হিংস্র জন্তুরও কিছুমাত্র অভাব নেই। লেখক পুস্তক রচনা ও শিশুদের মঙ্গল-সাধনের আগ্রহাতিশয্যে অমনি আফ্রিকাকে এনে ফেল্‌লেন আসামের মাঝখানে, আর নায়কের ইংরাজী নাম বদলে দিয়ে একটি মনের মত বাংলা নাম বসিয়ে দিলেন।

এই বই প'ড়ে ছেলে মেয়েরা এমন কতকগুলো জিনিষ, জন্তু ও লোকের কথা জান্‌তে পার্‌লে যা শুধু আফ্রিকাতেই আছে; আসামে কোনকালে ছিল না, নেই, এবং কখনো থাকবে কিনা এক ভগবান ছাড়া আর কেহই বলতে পারেন না। ছেলে বেলায় এসব রোমাঞ্চকর বর্ণনায় মন খুবই আকৃষ্ট হয়, আর শিশু-চিত্তে এর যে ছাপ পড়ে তা বেশী বয়সেও যায় না। দৃষ্টান্তের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

শিশুর মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার। বয়স্ক ব্যক্তির যা অতি আদরের, শিশুর কাছে তা অনেক সময়েই আদরের নয়। বিবেচক পাঠককে যে আর্ট মুগ্ধ করে শিশুর কাছে সে আর্ট ব্যর্থ। শিশুচিত্ত জয় করার আর্টই আলাদা। শিশু খেয়ালী, চিত্ত তার সদাই চঞ্চল সুতরাং ভাব-গাম্ভীর্য্য তার থাক্‌তে পারে না। এই জন্যই শিশু-সাহিত্য রচনা খুব সহজ নয়। শিশু গল্প পড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতের ক্ষুধা নিয়ে, এই জন্যই সকল দেশের শিশু-সাহিত্যেই বেশীর ভাগ গল্পে ভরা। কিন্তু এই গল্পগুলির এক একটা ধারা আছে, এক একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ভবিষ্যৎ কল্যাণ। বাংলার শিশু-সাহিত্যের খুবই পুষ্টি হচ্ছে বটে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এই যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক বইই লেখা হয় নি। সস্তায় সাহিত্য-রচনা ক'রে ছাপার হরফে নাম দেখবার জন্য লালায়িত লেখকদ্বারা সত্যিকার কল্যাণ শিশুদের হবে, এ আশা করা বড়ই শক্ত।

শিশুদের মঙ্গলের জন্য, তাদের জ্ঞান দান করবার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য আজকাল রঙ বেরঙের মাসিক-পত্র বেরুচ্ছে। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। শিশুদের একখানি চল্‌তি মাসিকপত্রের (মোহন সেন্দু) কিঞ্চিৎ পাঠ কর্‌লেই লেখকের 'মহদুদ্দেশ্য' সকলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম কর্‌বেন আশা করি।

"সাবিত্রী। তোমরা মেয়ে, তোমরা এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারো ঠিক পুরুষের মতন!

চিত্রলেখা। পারি। মেয়ে হলেও আমরা মানুষ—

ঠিক পুরুষের সমকক্ষ, তাদের দাসীবাঁদী মোটেই নই একথাটা ভুলে যাও কেন সাবিত্রী!

সা। ভুলিনে, কিন্তু আমরা ও রকম করেও নিজেদের ভাবিনে চিত্রা। মেয়েরা হবে পুরুষের সহধর্ম্মিনী, Better half নয়।"

"শনিবারের চিঠি" এই লেখার ওপর টিপ্পনী করেছেন God save the children! সত্যিই এমন শিশু-সাহিত্যের কবল থেকে ভগবান বাংলার ছেলে-মেয়েদের রক্ষা করুন।

আর একটি চমৎকার নমুনা থেকে বেশ বুঝতে পারা যাবে যে, শিশুদের নামে কি সাহিত্যই সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাজারেও বিজ্ঞাপনের তূর্য্য-নিনাদের জোরে কি ক'রে চল্‌ছে!

"এলোমেলো হাওয়ার হাল্কা খেয়ালের ভিতর হইতে কালো কেশর দোলাইয়া আষাঢ়ের মেঘ যেমন হঠাৎ আসিয়া সারা আকাশে বিদ্যুতের তরবারী ঘন ঘন নাচাইয়া বেড়ায়, তেমনি শিবেশর প্রাণের ভিতর একটা প্রবল উদ্দীপনা দেখা দিল।.....কি অজানার আকর্ষণে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চক্ষু দুইটি ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া বেগবান ইচ্ছার বিদ্যুৎ শিখা ছড়াইতে ছিল।"

এ সম্বন্ধে "শনিবারের চিঠি"র সঙ্গে সমস্বরে আমরাও বলি, ".....বাংলা দেশে ছেলে মেয়ে নামে যাহারা পরিচিত তাহারা কেহ বা ছেলে মেয়ের পিতা কেহ বা ছেলে মেয়ের মাতা। ছদ্মবেশে থাকে, সস্তায় মাসিক পত্র কিনিয়া পড়ে, আধা মাস্তুলে ট্রেণে ভ্রমণ করে! .....চক্ষু কিভাবে ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া বেগবান ইচ্ছায় বিদ্যুৎ শিখা ছড়াইতেছিল—লেখক একদিন এক আনা কি দুই আনার টিকিট করিয়া ছেলে মেয়েদিগকে দেখাইয়া দিলে তাহারা পরম উপকৃত হইবে।"

এ রকম নমুনা শিশু-সাহিত্যের গল্পে, নাটকে কবিতায় বিস্তর পাওয়া যাচ্ছে, সুতরাং একাধিক নমুনা নিতান্তই বাহুল্য।

এবারকার পূজার বাজারে শিশুদের "মনের খোরাক" জোগাবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ছবি-বহুল বিশালকায় পুস্তকগুলির একখানি থেকে কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকের সামনে ধর্‌লেই তিনি অনায়াসে বুঝ্‌তে পারবেন যে, 'শিশু' অর্থে তিনি এতদিন যা বুঝে' এসেছেন সম্পাদক মহাশয় তা নিতান্তই ভুল মনে করেন; অর্থাৎ 'শিশু' বল্‌লে আমরা 'শিশু'ই বুঝি, তার বাপ মাকে বুঝি না, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় তা-ইবোঝেন।

তিনি ভূমিকায় বল্‌ছেন যে, বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের রচিত গল্প-পূর্ণ এই পুস্তকখানি "শিশুদের মনের খোরাক। চেষ্টা করা হয়েছে এতে আমাদের ঘর বাহির, বা বোন ভাই বন্ধু ও সমাজ, আর আমাদের বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ক'রে চিনিয়ে দিতে ছেলে মেয়েদের।"

খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু মাত্র দু' একটি নমুনা থেকেই পাঠক বুঝ্‌তে পারবেন যে, এমন খোরাক যে শিশু হজম কর্‌তে পারে সে কেমন শিশু! আর সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা হ'চ্ছে এই যে, এই লেখা বেরিয়েছে বাঙলার প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কলম থেকে।

"সখে! দ্রষ্টব্য চ'লে গেলেও কি দৃষ্টি তার সঙ্গী হ'য়ে চক্ষু ছেড়ে চ'লে যায়? তোমার অবস্থাটা এখন 'ইন্দুমতী' স্বয়ম্বরের রাজাদের মত "সঞ্চারিনী দীপশিখেব রাত্রৌ"—গোছ হ'য়ে পড়েছে দেখ্‌ছি।"

(ছোটদের আহরিকা ২১৪ পৃষ্ঠা)

"অর্জ্জুনের মত এই দুর্ব্বল-জনোচিত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে শ্রীভগবান না হ'লেও আমি জোর গলায় হেঁকে বল্‌ছি—"ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।"

(ছোটদের আহরিকা ২১৯ পৃষ্ঠ)

নমুনার সংখ্যা বৃদ্ধি বাহুল্য মাত্র।

ছেলে মেয়েদের ব্যাকরণের দুর্জ্জয় ব্যূহ ভেদ করতে যে কী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা এখনও আমরা সশঙ্কচিত্তে স্মরণ করি। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের এই যন্ত্রণা লাঘব করবার উদ্দেশ্যে সন্ধি ও সমাস

ইত্যাদির কস্‌রতের ভেতর দিয়ে "শিশুমনের খোরাক" জোগাবার চেষ্টা হ'য়ে থাকেতো আলাদা কথা; নইলে কেবল বড় বড় লেখক-লেখিকার নাম দিয়ে বিজ্ঞাপনের জোরে বইয়ের কাটতিই বাড়ানো হয়, আর বিশেষ কিছুই হয় না। বীরবলের ভাষায় সত্যিই এই সকল সম্পাদকের "Inspiration মাথায় নয়, পেটে।"

শিশুদের চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে, তাদের সরল বিশুদ্ধমন কোন বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, এমন জীবন-কাহিনী "শিশুমনের খোরাক" জোগাবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত রঙ বেরঙের বিশালকায় বার্ষিকগুলোর ভেতরে খুঁজে পাওয়া যায় কি?

শিশু-সাহিত্যের নামে এই যে আবর্জ্জনার স্তূপ সৃষ্টি হয় তার মূলে রয়েছে সহজ-প্রতিষ্ঠা ও অর্থাগমের অত্যধিক স্পৃহা, বিদেশী শিশু-সাহিত্যের অতি সরল সুন্দর অনুবাদে তাচ্ছিল্য, শিশুর মনস্তত্ত্বে অজ্ঞতা, যে কোন রকমেই হোক মৌলিকতা প্রকাশ এবং পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্বজ্ঞানের মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অভাব।

এটা কম দুঃখের বিষয় নয় যে, যাঁদের মতামত জনসাধারণ বিশ্বাস করে, সেই পত্রিকা সম্পাদকগণ সব সময় ঠিক সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির সহায়তা করেন, সাহিত্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজার আয়োজন যেমনি করেন, আবার তাঁরা ইচ্ছা করলে অসত্য অশিব ও অসুন্দরের আরতি-ঘণ্টাও সজোরে বাজাতে পারেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে থেকে আবর্জ্জনা দূর করতে তাঁরাই সহায়তা করতে পারেন সব চেয়ে বেশী। অত্যন্ত জঘন্য বইয়েরও অতি উচ্চ প্রশংসা দু'চারখানা বাদে সব কাগজেই বেরুতে দেখা যায়। বইয়ের রূপের বাহার আর লেখকের ডিগ্রির বহরই যদি প্রশংসার মূল হয়, তবে যুক্তি ব'লে কোন বস্তু থাকে না।

যদি কেউ মনে করেন যে, আমার এই আলোচনায় ব্যক্তিগত আক্রমণ আছে, কিংবা আধুনিক শিশু-সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিকে অস্বীকার করা হয়েছে, তবে সত্যিই অবিচার করা হবে। শিশুর মনের খোরাকির যে ফিরি চলছে, তার সবগুলোই বিশুদ্ধ নয়, অনেক গুলোতেই প্রচুর ভেজাল আছে। সেই ভেজালের দিকটাই একটু দেখাবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

—:০:—

হলাহল

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব ও দানব মিলি' অমৃতের লাগি'
মথিল সাগর যবে, কত রত্নরাজি
অমূল্য, অপূর্ব্ব-প্রভা হেরিল আলোক
সবিস্ময় বিশ্ববাসি-নয়ন-সম্মুখে।
উচ্চৈঃশ্রবা নিল ইন্দ্র জীমূতবাহন;
কমলা-কৌস্তুভ নিল বিষ্ণু লোকপাল;
মোহিনী মূরতি ধরি' অমৃত-কলস
স্বয়ং কেশব লয়ে দিলেন বাঁটিয়া।
কিন্তু হায়, ছল করি' বঞ্চি' দানবেরে
অমৃতের ভাণ্ড দিলে উজাড়ি' দেবেরে
হে কমলাপতি; মিথ্যা সেই ছলনায়
হলাহলে নীলকণ্ঠ শম্ভু শূলপাণি।
মুক্তরোধ মিথ্যা-রূপী সেই কালকূট
সিক্ত করিয়াছে দেখ এই ধরাভূমি!

—:০:—

বিসর্জ্জন

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি

ক্যানিং ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে স্বামী অনিমানন্দ আগাইয়া গেল—দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ দেহ, আয়ত চক্ষু; প্রশান্ত কপাল, মুণ্ডিত মস্তকটী ঠিক কদম ফুলের মত, তাহাতে অল্প অল্প চুল গজাইয়াছে—হয়ত অনেকদিন কামানো হয় নাই, গৌপদাড়ী স্বচালো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরণে গেরুয়া রঙের ছোপানো কাপড়, গায়ে গেরুয়া রঙের হাত ঢিলা পাঞ্জাবী, মাথায় ঐ রঙেরই পাগড়ী, খালি পা। পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা শুকাইয়া সাদা হইয়া লাগিয়া আছে। বয়স অনুমান করা শক্ত, বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি।

স্বামীজির চোখে মুখে একটা অধীর আগ্রহ। নমিতার দল এই গাড়ীতেই আসিবার কথা। বন্যাবিধ্বস্ত মধুখালির প্রপীড়িত নরনারীগণের সাহায্যের জন্য তাহারা আসিয়াছে। কয়জন আসিবে? বোধ হয় চার পাঁচ জনের বেশী হইবে না। তাহাই যথেষ্ট, মেয়েদের সাহায্যের বড় প্রয়োজন, তাঁহার আবেদনের ফল ফলিয়াছে। শ্রীমতী নমিতা দেবী কয়েকজন মহিলা কর্ম্মী লইয়া এই গাড়ীতেই আসিবেন লিখিয়াছেন। স্বামীজি নমিতা বা নমিতার দলের কাহাকেও চিনেন না। বোধ হয় কলেজের মেয়ের দল। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা সত্যি সত্যিই এক স্বতন্ত্র জীব, তাহাদের পৃথিবী স্বতন্ত্র—মাধুর্য্যে দরদে প্রেমে ঔদার্য্যে……

স্বামীজি চাহিয়া দেখেন চারিটী মেয়ে প্ল্যাটফরমের উপর নামিয়াছে। স্বামীজি আগাইয়া গিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমি বোধ হয় নমিতা দেবীর সঙ্গে কথা বল্‌ছি।

নমিতাও প্রতি-নমস্কার করিয়া জবাব দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম নমিতা দেবী।

তারপর সঙ্গিনীদের দিকে চাহিয়া বলিল—ইনি লীলা নন্দী, বিনতা ঘোষ আর ইনি সবিতা দেবী।

পরিচয়ের পালা শেষ হইয়া গেল। এবার স্বামীজি বলিলেন—চলুন, আমরা এগোই।

চলুন—বলিয়া সকলে অগ্রসর হইল।

ষ্টেশনের পরেই মাতলা নদী। বর্ষার নদী কানায় কানায় জল, অবিরাম ঢেউয়ের নাচন। এপার হইতে ওপারে দৃষ্টি চলে না, ওপারের তটরেখা আকাশের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নদীর মাঝে দুইটি একখানা নৌকা সাদা পাল তুলিয়া দিয়াছে। দুই গাঙচিল উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে—নদীর ধারে ধারে ঢেউয়ের আঘাত, ছলাৎ ছলাৎ।

স্বামীজি নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই বাঁধের উপর দিয়ে আমাদের যেতে হ'বে।

নমিতা জবাব দিল—আপনি এগিয়ে যান; পথ দেখিয়ে দেবেন।

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, পথ আর নেই নমিতা দেবী। সরই বিপথ, কেবল কাদা আর জল।

সবাই আসিয়া বাঁধের উপর উঠিল। অগ্রে স্বামী অনিমানন্দ, পরে নমিতা, তার পরে লীলা, সবিতা, বিনতা।

পাশাপাশি চলিবার উপায় নাই, সকলেই অতি সাবধানে চলিয়াছে—রাস্তা পিছল। বাঁধের পাশে পাশে ছোট ছোট বন ঝাউ, তেরোর বন, বন-ঝাড়ার ঝাড়। বাঁদিকে নদী, ডানদিকে ধানের ক্ষেত, জলের মধ্য হইতে ধানগাছগুলি কোন মতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নমিতা জিজ্ঞাসা করিল—আমাদের আর কদ্দুর যেতে হবে? স্বামীজি যাইতে যাইতে উত্তর দিলেন—এগনো প্রায় এক মাইল।

তারপর নমিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—কষ্ট হচ্ছে ?

পিছন হইতে লীলা জবাব দিল—না, কিছুমাত্র না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাস্তা কি বরাবরই এই রকম ?

স্বামীজি হাসিয়া ফেলিলেন—বরাবর। আর একটু এগিয়ে গেলে চলা যাবে কি না সন্দেহ। আবাদের কাদার আবার ভক্তি অসাধারণ, পা থেকে ছাড়ানো দায়।

স্বামীজির কথার ভঙ্গিতে সবাই হাসিয়া উঠিল। বিনতার দিকে চাহিয়া সবিতা বলিল—দেখচিস বিনি, পাঁড়াগার ছিরি—জল আর কাদা। কি করে যে লোক এখানে বাস করে তাই ভাবি।

কথাটা স্বামীজির কান এড়াইল না, চলিতে চলিতে তিনি জবাব দিলেন—সত্যিই ভাবা শক্ত। তবে বাস করার মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নেই, এর মধ্যে বাস করে বাঁচাটাই আশ্চর্য্যি। অথচ এরাও বেঁচে আছে। আর বাঁচবার জন্যই বা এদের কি প্রাণান্ত প্রয়াস !

কেহ কোন জবাব দিল না। সকলেই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে নমিতা প্রশ্ন করিল—আচ্ছা স্বামীজি গ্রামটা কি একেবারে ভেসে গেছে ?

না—ভেসে গেলেত হতভাগারা বাঁচত। ডুবে গেছল—আবার ভেসে উঠেছে।

দলের মধ্যে লীলাই সব চাইতে ছোট। বয়সে পনের ষোলর বেশী হইবে না। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—ডুবে গেছল ? একেবারে ডুবে—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া স্বামীজি বলিলেন—হ্যাঁ, একেবারে ডুবে গেছল। প্রায় রাত দুটোর সময় হঠাৎ বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বাঁধের নীচেই গ্রাম—হুহু করে জল ঢুকে যায় গ্রামের ভিতর। কেউ সাবধান হবার সময় পায় নি। আর খানিকটা এগোলেই ভাঙ্গা বাঁধটা দেখতে পাবেন।

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল, মনের চাঞ্চল্য নয়নে ভাসিয়া উঠিল—কতক্ষণে ভাঙ্গা বাঁধটা দেখিতে পাওয়া যায় ! গ্রামের কথা, গ্রাম্য দুর্দ্দশার কথা, বন্যার কথা, বন্যা বিধ্বস্ত নরনারীর কথা তাহাদের মন হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। যেন এই ভাঙ্গা বাঁধটা দেখিবার জন্য তাহাদের কলিকাতা হইতে এত দূরে আসা। জল, কাদা, পিচ্ছিল পথ তাহারা ভুলিয়া গেল, ভাঙ্গা বাঁধটার কাল্পনিক সর্ব্বনাশা মূর্ত্তি আলেয়ার আলোর মত তাহাদিগকে যেন সুমুখের দিকে অনবরত টানিতে লাগিল। দ্বিগুণ উৎসাহে তাহারা পথ চলিতে সুরু করিয়া দিল।

হঠাৎ সকলকে থামিতে হইল। বাঁধের উপর দিয়া আর অগ্রসর হওয়া চলে না। জল আর কাদা এক সঙ্গে মিশিয়া একটা গভীর পঙ্কিল হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া যাওয়া অসম্ভব।

স্বামীজি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, স্বর্গের সিঁড়ি ছেড়ে এবার আমাদের নীচে নামতে হবে।

সবাই বাঁধের নীচে চাহিয়া দেখে রাস্তা নাই, জলে জলময়। পাশে ধানের ক্ষেত। ধানের ডগাগুলি হেলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ঘাসগুলি ডুবু ডুবু। দুই একটা কালো কালো জোঁক ভাসিয়া বেড়াইতেছে একটা সাপ মাথা উঁচু করিয়া সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—বোধ হয় ভয়ে। দেখিতে সাঁতৎস। নমিতা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সঙ্গিনীদের দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া বুকের বিলীয়মান সাহস সঞ্চয় করিয়া নমিতা বলিল—চলুন।

নমিতা নামিবার জন্য পা বাড়াইল।

পিছন হইতে লীলা স্বামীজিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, এখানে নৌকো নেই স্বামীজি ?

আছে, তবে এখন পাওয়া শক্ত। আমাদের রিলিফের দু'খানা নৌকো আছে, একখানা পাঠাতে বলে এসেছি, এখনো এসে পৌঁছায়নি দেখছি।

সকলেই আকুল নয়নে একবার ধান ক্ষেতের দিকে চাহিয়া দেখে। নৌকার কোন চিহ্ন নাই। ধানক্ষেতের উপর দিয়া সর সর করিয়া বাতাস বহিতেছে, ধানগাছের মাথাগুলি নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, নমিতা হাত-

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখে সাড়ে এগারোটা বাজে। সকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন আকাশে মেঘ নাই, ঘন নীল আকাশ মাঝে মাঝে সাদা মেঘ। রৌদ্রের তেজ ক্রমশঃ প্রখর হইতে প্রখরতর হইতেছে। নৌকার জন্য আর অপেক্ষা করা চলে না।

নমিতা জলের মধ্যে পা দিল। স্বামীজি খানিকটা আগাইয়া গিয়াছেন।

জল নাড়া পাইতেই কালো কালো জোঁকগুলি নমিতার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল।

মা—গো—বলিয়া নমিতা পা তুলিয়া লইল। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

স্বামীজি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন, কি, ভয় পাচ্ছেন ? ভয়েরই কথা বটে। আচ্ছা থাক। না হয় একটু দাঁড়ান। নৌকোটা বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বে।

স্বামীজি চারদিক আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন কিন্তু আশ্বস্ত হইবার কোন কারণ তাঁর নজরে পড়ে না।

নমিতা মনে মনে একটু লজ্জিত হয়। যে কাজের ভার সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাতে এ দুর্ব্বলতা তাহার সাজে না। সে আবার সাহসে ভর করিয়া পা বাড়ায়। হয়ত জলই বা কতখানি হইবে কে জানে ?

স্বামীজির কুণ্ঠার অবধি নাই—তিনি এতটা ভাবেন নাই ; পথের দুর্গমতা যে ইহাদিগকে এতখানি ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। নতুবা তিনি ষ্টেশন অবধি নৌকা আনিতে পারিতেন। এইটুকু পার করিয়া দিবার জন্যই নৌকার বন্দোবস্ত আছে, আর সে নৌকা এখনো আসে নাই। উপায় কি ? তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না !

লীলা, সবিতা, বিনতা, এখনো বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া আছে, নমিতার অবস্থা দেখিয়া তাহারা মুখ টিপিয়া হাসে। অবস্থাটা পরম উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীজি আর থাকিতে পারেন না, তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া নমিতাকে বলিলেন—মাপ কর্ব্বেন, একটা কথা বলব যদি মনে কিছু না করেন।

—বলুন, মনে করেই বা কি কচ্ছি বলুন।

—আমি যদি আপনাদের একে একে পার করে দিই !

নমিতা হাসিয়া উঠিল, নমিতার হাসি স্বামীজির কানে মধু ঢালিয়া দিল।

—না, হাসবার কথা নয় ; এ ছাড়া আপাততঃ আমি ত কোন সদুপায় দেখছিনে।

নমিতা কলিকাতায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছে স্বদলবলে দোকানে দোকানে পিকেটিং করিয়াছে ; পুলিশের লাঠির তাড়া, কৌতূহলী জনতার ঠেলা সহ্য করিয়াছে কিন্তু এমন দুর্ব্বিপাকে কখনো পড়িয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল জল ; জল আর ধানের শীষ ; দূরে বহুদূরে লোকালয়, খড়ের ঘর মাটীর দেওয়াল লইয়া যেন একটি দ্বীপ। বাঁশের সাঁকো দুই একটা চোখে পড়ে। দুই একখানা শালতি, বোধ হয় একটা ডোঙ্গা। মাঝে মাঝে ঝপাৎ ছলাৎ শব্দ—সাপ কিংবা ব্যাঙ জলে ঝাপাইয়া পড়িতেছে।

একটা অজ্ঞাত ভয়ে নমিতার দেহ শীর্ শীর্ করিয়া উঠে। অথচ এই সুমুখের চার পাঁচ হাত পরিমিত বৈতরণী যে ভাবেই হউক উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

নমিতা বলিল যখন কোন উপায় দেখছিনে, তখন আর দেরী করে লাভ নেই। কি করে বোঝাগুলি নেবেন শুনি ? কাঁধে, না—?

স্বামীজি হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন বোঝা ? হ'লই বা। জানেন নমিতা দেবী, বাহনের চাইতে বোঝার দাম ঢের বেশী।

বাঁধের উপর মেয়েরা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

স্বামীজি নমিতাকে দুই হাতে অবলীলাক্রমে

তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সবল বাহু দুইটী কাঁপিয়া উঠিল। বুকটা একবার ধ্বক করিয়া উঠিল। নমিতার মুখ তাঁহার মুখের কাছাকাছি, নমিতার নিঃশ্বাস তাঁহার মুখে আসিয়া লাগিতেছে, হাতের উপর নমিতার নরম তুলতুলে দেহ, সুন্দর সুডৌল ললিত বাহু তাঁহার কণ্ঠলগ্ন। উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীর এই একান্ত সান্নিধ্যে যৌবন-লাবণ্যের এই প্রথম মায়াস্পর্শে চিরকুমার ব্রহ্মচারী স্বামী অণিমানন্দের মনে মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। তাঁহার দেহের প্রতি শোণিত বিন্দু দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল। শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত প্রবাহ বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। হাতে পায়ে যেন বল নাই, সর্ব্বশরীর অবশ হয়ত বুঝি নমিতার লঘুভারও তিনি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। দরবিগলিত স্বেদধারায় তিনি যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক শিহরণে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত।

জলের মধ্যে দ্রুত পা ফেলিয়া অণিমানন্দ শুক্‌নো ডাঙ্গায় আনিয়া নমিতাকে নামাইয়া দিলেন। আর তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন না, কে যেন স্ক্রু দিয়া তাঁহার পায়ের পাতা মাটির সঙ্গে আঁটিয়া দিয়াছে। চরণের চলচ্ছক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে, দেহ দুর্ব্বল, মন অবসন্ন।

নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ভয় হয়। নমিতাই প্রথমে কথা কহিল—আমি ত আগেই বলেছি, আপনার কষ্ট হবে। উত্তরে অণিমানন্দের হয়ত কিছু বলিবার ছিল, কিছু বলা হইল না। রসনা শুষ্ক, আকণ্ঠ তৃষ্ণা।

এমন সময় দেখা গেল অদূরে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া একটা নৌকা অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে, বাঁশের লগি অনবরত উঠিতেছে, পড়িতেছে।

উপর হইতে বিনতা বলিল ওই দেখুন স্বামীজি, বোধ হয় আপনার তরণী এল।

স্বামীজি চাহিয়া দেখিলেন সত্যই তাই। ছোট্ট একটু হাঁ বলিয়া অণিমানন্দ একদৃষ্টে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি না পারিলেন ভাল করিয়া উত্তর দিতে, না পারিলেন সম্মুখবর্ত্তিনী নমিতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে।

নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লাগিল।

নৌকায় উঠিয়া সবিতা নমিতার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা বেহায়া মেয়ে তুই? কি করে তুই কোলে উঠে গেলি?

চুপ্—চোখের ইঙ্গিতে নমিতা সবিতাকে থামাইয়া দিল।

নৌকা ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়া আবার ফিরিয়া চলিল।

• • • •

বন্যার ধ্বংশস্তূপের মধ্যে নমিতা, সবিতা, লীলা, বিনতা আর স্বামী অণিমানন্দের দল প্রাণপণে যাইতেছে। গ্রামের একখানাও ঘর দাঁড়াইয়া নাই, মাটীর দেওয়াল গলিয়া গলিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, অনেক গৃহের চিহ্নমাত্রও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, মাত্র ভিটাটুকু কোনমতে টিকিয়া আছে। গরু বাছুর অনেক ভাসিয়া গিয়াছে, যে গুলি বাঁচিয়া আছে সেগুলি মৃতপ্রায়, কোন মতে ধুঁকিতেছে। এক মুঠো ধান বা চাউল কাহারো ঘরে নাই, বাসন কোসন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। অনাহারী অর্দ্ধাহারী সর্ব্বহারা নরনারী উলঙ্গপ্রায়, শিশুর আকুল ক্রন্দনে পাষাণও গলিয়া যায়।

আজ তিন চার দিন অণিমানন্দের যেন কি হইয়াছে। যে উৎসাহ উদ্দীপনা লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন তাহা যেন কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। যে কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের গভীরতম যোগ ছিল, সে যোগ-বন্ধন যেন কোথায় শিথিল হইয়া গিয়াছে, কোথায় যেন বন্ধনগ্রন্থি খুলিয়া পড়িয়াছে।

অণিমানন্দ ইহার কারণ বোঝেন, তাই তিনি স্বস্তি পান না, শান্তি পান না। জীবনের সমস্তই ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। সেই যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। অতীত ভবিষ্যৎ আজ তাঁহার কাছে লুপ্ত নিশ্চিহ্ন।

বর্ত্তমানের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি দণ্ড প্রতি পল—তাঁহার কাছে নব নব রসে রূপে গন্ধে শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিতেছে; দিনে দিনে তার রূপান্তর, বর্ণের বৈচিত্র্য; সুরভির উৎসব। মানুষের অন্তরে এত মাধুর্য্যও সঞ্চিত থাকে! অণিমানন্দ তাহার এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের জীবনে ইহার সন্ধান পান নাই। অণিমানন্দের দুই চোখ নিমীলিত হইয়া যায়—এই কামনা তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করেন—নমিতার দেহের স্পর্শ যেন তাঁর দেহে এখনো জড়িত রহিয়াছে, তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস যেন এখনো অণিমানন্দের গালে আসিয়া লাগে, তাহার চুলের গন্ধের উগ্র মাদকতা যেন এখনো তাহাকে অভিভূত করিয়া তোলে—অণিমানন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যান; সমস্ত জীবনের উদগ্র ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা যেন তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তমধ্যে কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছে।

দুপুর বেলা রৌদ্র নিষ্প্রভ, সমস্ত আকাশ মেঘে ছাওয়া। অণিমানন্দ সাহায্য সমিতির ক্যাম্পে বসিয়া আছেন। ক্যাম্প বলিতে তিনখানা দরমাঘেরা কুটীর,—একখানায় সাহায্যের জিনিষপত্র, মাঝখানাতে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকের দল থাকে, দ্বিতীয়খানাতে মেয়েরা থাকে; প্রত্যেক ঘরেই তিন চারখানা খাটিয়া।

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অদূরে নমিতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া মেয়েরাও আসিতেছে।

অণিমানন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

যতীন বলিল—স্বামীজি আরত চলে না। প্রয়োজন অধিক, আয়োজন কম। এভাবে আর কদ্দিন চল্‌বে।

যতীনের দিকে চাহিয়া অণিমানন্দ উত্তর করিলেন—বুঝি, কি করি বল?

রমেশ—অন্য ব্যবস্থা……

কি ব্যবস্থা করবে? আমাদের যা সাধ্য তাই আমরা কচ্ছি—অণিমানন্দের এই উদাসীনতায় সকলেই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু কেহ কোন জবাব দিল না।

ততক্ষণে নমিতারা আসিয়া পড়িয়াছে। অণিমানন্দের শেষ কয়টী কথা নমিতার কানে গেল।

নমিতা, অণিমানন্দের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর করিল করবার ঢের আছে স্বামীজি। কর্ত্তব্যের অবহেলার সান্ত্বনা এ নয়। মনে রাখবেন এ অগণ্য দুঃস্থ নরনারী আমাদের মুখ চেয়ে বসে আছে। সাহায্যের নামে বঞ্চনা আর কদ্দিন চলবে?

অণিমানন্দ নমিতার মুখের দিকে চাইতে পারেন না, মুখ নীচু করিয়া আহত ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন—বঞ্চনা? আপনি জানেন নমিতা দেবী আমি কাকেও বঞ্চনা করিনি। আমি স্বেচ্ছায়—

অণিমানন্দের কথা শেষ হইল না। নমিতা জবাব দিল—মানি, আপনারা স্বেচ্ছায় সেবার ভার নিয়েছেন, কিন্তু তা ব'লে স্বেচ্ছায় এভার ত্যাগ করাও ত চলে না।

সকলেই চুপ্ চাপ।

নমিতা বলিয়া চলিল—শুনুন, শুধু আবেদনেই সাহায্য পাওয়া যায় না, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরুতে হ'বে, দুয়ারে দুয়ারে যেতে হ'বে। দিন আজকেই ছেলেদের কলকাতায় পাঠিয়ে। আমিও মেয়েদের সঙ্গে দিচ্ছি। দুই ঘণ্টার মধ্যে তারা কলকাতায় পৌঁছে যাবে। ইচ্ছা করেন ত আপনি এদের সঙ্গে যেতে পারেন।

অণিমানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন।

অবশেষে নমিতার কথাই কার্য্যে পরিণত হইল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ছেলে মেয়েরা সকলেই বাহির হইল। কেবল রহিল নমিতা আর অণিমানন্দ।

খানিকক্ষণ পরেই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। মেঘের গুরুগর্জ্জনে আকাশ কম্পিত। থলের চট্ বিছানো দরমার চাল বৃষ্টিরধারা ধরিয়া রাখিতে পারে না। বাহিরের ধারা অজস্র ধারে ভিতরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নমিতাকে উদ্দেশ করিয়া অণিমানন্দ বলিলেন—চলুন, ওঘরে যাই। চালে ত্রিপল দেওয়া আছে, বোধ হয় ভিজ্‌তে হ'বে না।

৫

চলুন—বলিয়া নমিতা অগ্রসর হইল।

ত্রিপলের ঘরে ঢুকিয়া দুইজনেই চুপ্ চাপ। মুখরা নমিতা যেন অকস্মাৎ বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে অবিরাম বৃষ্টিপতনের শব্দ, বাতাসের আকুল উচ্ছ্বাস, দিনের আলো মেঘের মায়ায় আচ্ছন্ন। এই বর্ষণমুখর প্রায়ান্ধকার একান্ত নির্জ্জন গৃহে অণিমানন্দ আর নমিতা।

অণিমানন্দ কি যেন বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। বুকটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। নিঃশ্বাস গভীর। নমিতার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সে যেন মুখের কথা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বাহিরে এখনো তেমনি বৃষ্টি ও বাতাসের মাতামাতি। খানিকক্ষণ পরে আবেগকম্পিত মুগ্ধকণ্ঠে অণিমানন্দ ডাকিল—নমিতা—

নমিতার কাণে যেন এ ডাক মধুবর্ষণ করিল। নিজের নাম সে অপরের মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া বুঝি শোনে নাই। সুমুখে নদী, নদীতে ঢেউয়ের নাচন, অপর পারের গাছপালা সব ঝপ্‌সা, বর্ষণমুখর মেঘকজ্জল আকাশ, বাঁধনহারা সজল বাতাসের ব্যাকুল নিঃশ্বাস—এই পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজের নাম যেন বড় মধুরে বাজিয়া উঠিল। নমিতা বিহ্বল হইয়া পড়িল, উত্তর দিতে পারিল না।

অণিমানন্দ পুনরায় ডাকিল—নমিতা

বলুন—কম্পিতকণ্ঠে নমিতা জবাব দিল।

নমিতা যথাসাধ্য এ কয়দিন নিজেকে গোপন করিয়া চলিয়াছে। প্রথম পুরুষস্পর্শে সদ্যজাগ্রত বাসনা কামনাকে জোর করিয়াই একরকম অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ এই নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—মিনতি-ভরা করুণ সজল দৃষ্টিতে অণিমানন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। বুকের নিঃশ্বাস গভীর, ভয়ে লজ্জায় আনন্দে বুক দুরু দুরু—শব্দ যেন শুনিতে পাওয়া যায়! ধীরে ধীরে অণিমানন্দ নমিতার ডান হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—নমিতা, আমি তোমায় ভালবাসি—

নমিতার বুকে তখন শিরায় শিরায় আগুনের ঝলক। বুকটা তাহার দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে—এ কয়দিনের অবিরাম যুদ্ধের পর এখনই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে!

নমিতা কোন জবাব দিল না। যেমন-দাঁড়াইয়া ছিল তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল।

অণিমানন্দ কম্পিতকণ্ঠে আবার বলিল নমিতা—নমিতা, তোমাকে পাওয়া কি একান্তই দুরাশা?

নমিতা আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। সে জবাব দিল—আপনার সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য—

অণিমানন্দ নমিতাকে শেষ করিতে দিল না, অন্তরের আবেগ কণ্ঠে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া উত্তর করিল—তুচ্ছ, নমিতা তুচ্ছ। এ শুষ্ক কঠোর ব্যর্থ জীবনের মূল্য কি আমায় বলতে পারো?

অণিমানন্দের চোখ দুইটা অস্বাভাবিক লাল, দেহের সমস্ত শোণিত বোধ হয় মুখে উঠিয়া আসিয়াছে।

বল নমিতা, উত্তর দাও—বলিয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে অণিমানন্দ নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টিতে ব্রহ্মচারীর অন্তরের কামনার কি বুভুক্ষু উগ্র ছবি? দলিত পিষ্ট নিপীড়িত বাসনার কি করুণ হাহাকার? নমিতা ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল। সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

খানিকক্ষণ পরে নমিতা জবাব দিল—জানি না, তবে আপনার আদর্শকে আমি ভক্তি···

থামো—নমিতা—থামো, আমি তোমার শ্রদ্ধা চাই না, ভক্তি চাই না, আমার আদর্শ অতলে ডুবে যাক্—তাতে কোনো ক্ষতি নেই—আমি চাই তোমাকে, আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে আমি তোমাকে শুধু চাই। এ শুষ্ক তপ্ত মরু-জীবনে যে রসের ধারা বইয়ে দিয়েছ, আমি চাই তা প্রাণভরে আকণ্ঠ পান কর্ত্তে।—ভগ্ন দীর্ণ কণ্ঠে এই কথা বলিয়া অণিমানন্দ থামিয়া গেল।

নমিতা আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছে, মন কতকটা শান্ত, স্থির—নিস্তব্ধ নদীর মত। ব্রহ্মচারীর

এই আকস্মিক পতন তাহাকে বড় ব্যথিত ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

নমিতা এবার অবিকম্পিত স্বরে বলিল—না—না—সম্ভাসী তা হয় না। আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমার শ্রদ্ধা ভক্তি—এর চাইতে তুমি বেশী দাবী করো না।

নমিতার কণ্ঠস্বর ক্রন্দনের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিল—, বড় করুণ, বড় ব্যথাতুর।

নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া নমিতা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত অণিমানন্দ স্থির অচঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

এখানে আর নমিতার থাকা চলে না। আজই তাহাকে যাইতে হইবে। হৃদয়কে বিশ্বাস করা চলে না, বড় সহজে নুইয়া পড়ে, অণিমানন্দের সান্নিধ্য হইতে তাহাকে সরিয়া যাইতে হইবে।

নমিতা বাহির হইয়া পড়িল। বৃষ্টিধারার বিরাম নাই, বাতাস সমান জোরেই বহিতেছে, নদীর নৃত্যোচ্ছ্বাস সমান তালেই চলিয়াছে।

অণিমানন্দ হয়ত এখনো বসিয়াই আছে। নমিতা ভাবে একবার শেষ দেখা করিয়া যাই। না—থাক।

যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া এই স্বল্প দিনের পরিচিত ঘরখানিকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নমিতা এই ঘন দুর্য্যোগে ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। ফিরিয়া তাকাইতেও তাহার সাহস হইল না।

চলিতে চলিতে নমিতা যেন শুনিতে পায়—কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—নমিতা—নমিতা

নমিতা আরও দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করে। নমিতা—নমিতা—

আকাশে বজ্র বিদ্যুৎ গুরু গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠে। আর্দ্র বাতাসের উগ্র উচ্ছ্বাস—আর কিছু শোনা যায় না। নমিতা থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়। আবার পথ চলা সুরু হয়।

মানুষের বুকে জাগাও তাদের বেদনার দাব-দাহ

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

গাহ কবি আজি ঝঞ্ঝত-বীণে তাহাদের গান গাহ—
যাহাদের লাগি ও-বুকে আজিও জাগিছে বেদনা-দাহ;
নিভৃতে যাহারা র'য়ে গেল আজো ব্যথার পশরা বহি'
আলোর আড়ালে ওমরিছে যারা নিন্দা ও গ্লানি সহি'—
কেবলি জ্বলিছে বুক—
ভাগ্য যাদের হ'য়েছে প্রথম পরম পরাঙ্মুখ,
আশা-অঙ্কুর যাহাদের বুকে হ'তেছে আমূল নাশ,
হাজারো অভাব নাড়ী ছিঁড়ে যেথা আনিল দীঘল-শ্বাস,
পরম দুঃখে শুধাল না নর বারেক যাদেরে ডাকি,
ধনীর দুয়ারে দেউলিয়া-সম যাদের আসলই ফাঁকি;
ব্যথাই যাদের করিল কোমল, কঠিন করিল ফের,
শূন্যের ঘরে গোঁজা দিয়ে যারা আজিও টানিছে জের—
আঘাতে আঘাতে যারা হ'ল মূক, মুখর হইল পুনঃ
বচনের বিষে হ'ল জর-জর—বুকের আঘাতে শুন—
গর্জ্জিতে চাহে শত ফণা তুলি, কিন্তু নাহি যে বল!
তখনি আবার সুয়ে পড়ে আঁখি বেদনায় ছল-ছল।—
যাহাদের বুকে জ্বলিতেছে ধূ ধূ সাহারা মরুর চিতা
হারাল যাহারা নয়নের জলে আপন ভাগ্য-সীতা—
তাহাদের গান গাহ আজি কবি, তাহাদেরই গান গাহ—
মানুষের বুকে জাগাও তাদের বেদনার দাব-দাহ।
গদীর উপরে ধনী হ'য়ে বসি' যাদের ইতর বলি'
শত ঘৃণাভরে চলিতেছি পুনঃ যাদের বক্ষ দলি'।
যাদের দেখে না কেহ,
শতলাঞ্ছনা-জগদ্দলনে যাহারা সবার হেয়—
দিল যারা সবই, পেলনা কিছুই, চাহিতে নারিল মুখে,
চাওয়ার বাণীটি ধ্বনিয়া তুলহ তাদেরি তৃষিত বুকে,
তাহাদের গান গাহ,
মানুষের বুকে জাগাও তাদের বেদনার দাহ-দাহ।

দুঃখের বরষায়

উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২২)

ফিরিয়া গিয়া শ্যামাঙ্গিনী হরেন্দ্রনারায়ণের হাতে হাত দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাওয়া গেল না, না?

শ্যামাঙ্গিনী মৃদু-স্পর্শে জানাইলেন, পাওয়া যায় নাই।

হুঁ, বলিয়া হরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, পাওয়া যে যাবে না, তা' আমি যেন অনুমান করতে পারছিলুম, শ্যামা! ওটি ছিল আমার বহুদিনের সঙ্গী; যে গৌরবের দিনের চিহ্ন ছিল, সেদিন আমার আর নেই, তাই বোধহয় ভগবান নিয়ে নিলেন। তোমাকে হয়ত বলেছি ওটির ইতিহাস; মনে আছে কি?

শ্যামাঙ্গিনী জানাইলেন, না।

ওটি ছিল আমার যৌবনের উদ্দামতার একদিনের প্রিয় নিদর্শন। সেদিন ঘোড়ায় চ'ড়ে যোধপুরের বলবন্ত আর আমি গিয়েছিলুম বুনো-শূয়োর শিকার করতে। বলবন্ত ছিল আমার চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; শিকার করতে আমি তার কাছেই শিখি; কিন্তু সেদিন সে কেমন বে-তাগে হঠাৎ ঘোড়া থেকে প'ড়ে যেতেই জঙ্গল থেকে একটা বাঘ এসে পড়ে আর কি, তার উপর। হাতে আমার বল্লম ছাড়া আর কিছু নেই। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে, বাঘ আর বলবন্তের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই বাঘটা গর্জ্জন ক'রে লাফিয়ে প'ড়লো আমার গায়ে, আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বল্লমখানা এমন বাগিয়ে ধ'রলুম যে বাঘের দেহটা ভেদ ক'রে সেটা ফুঁড়ে বার হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ম'রে গেল।

বলবন্তের তেমন কিছু আঘাত লাগে নি। সে উঠে প'ড়ে আমার হাতে, কোন কথা না ব'লে ওই আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গ নিয়ে ফেরার পথে কোন কথাই হ'লো না দু'জনে। পরের দিন শুনলুম সে বাড়ি চলে গেছে। আর জীবনে তার সঙ্গে দেখা হয় নি। রাজপুত বীরেরা নিজের লজ্জার কথা কোনদিন প্রকাশ করে না। আমিও তাই, সে-গল্প কোনদিন কারুর কাছে করিনি। জানিনে বলবন্ত বেঁচে আছে কি না। হয়ত সে আর নেই; আমার সে বীর্য্যও নেই—তাই, তার নিদর্শনটিও নিঃশব্দে লুপ্ত হ'য়ে গেল। তোমরা আর এ নিয়ে গোল ক'রো না। যেতে দাও……

হরেন্দ্রনারায়ণের বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব পরিচয়ে শ্যামাঙ্গিনী মনে মনে অপরিসীম বিস্ময় মানিলেন। তাঁহার স্বভাব তিনি জানিতেন, এমন একটা ব্যাপার, অথচ সহজে যাইতে দিবার, কথা নয়; কিন্তু এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সবই সম্ভব এই জগতে!

শ্যামাঙ্গিনী লিখিলেন, মা মোহিনীকে সন্দেহ ক'রছেন তাকে ধ'রতে পাঠিয়েছেন, থানায়ও খবর গেছে…

মোহিনী?

হাঁ, সেই।

খানিক চিন্তা করিয়া হরেন্দ্র বলিলেন, সম্ভবপর বটে; মা ওর উপর খুসী নন, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, শ্যামা। কিন্তু,…আচ্ছা মাকে একবার ডাকবে?

রাণীমা আসিয়া হাতে হাত দিলেন, কে, মা?

রাণীমা কাঁদিতে লাগিলেন, হরুর আমার এই দশা হবে স্বপ্নে জানতুম না।

তাঁহাকে শান্ত করিয়া হরেন্দ্র বলিলেন, মা, ও আংটির উপর আমার আর মমতা নেই, ওর জন্যে তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না…যেতে দাও…

সেকি হয় বাবা! চোরকে আস্কারা দিলে, আর রক্ষে থাকে!

রাণীমার কথায় অকাট্য যুক্তি ছিল, তাই হরেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। আংটি তাঁহার, তিনি ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু অপরে করিবে কেন?

রাণীমা বলিলেন, লোকে বলে ভূতকে মাছ দিলে, যে দেয় তার ঘাড় ভেঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত সে রক্ত চোষে।

হরেন্দ্র হাসিলেন, বলিলেন খুব সত্যি কথা মা; আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনে; কিন্তু এর জন্যে আমাদের আটকে, একমাস ব'সে থাকতে না হয়; তাই ভাবছিলুম।

রাণীমা বলিলেন, দরকার হয়, বগলা ফিরে এসে যা' হয় বিহিত করবে। পরশু আমরা যাবই।

তুমিও যাবে? প্রসন্ন হইয়া হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

যাব না? তোমাকে সারিয়ে তুলতে, রাজার রাজ্য দিতে হয় দেব; রামের মত চোদ্দ বছর বনে বাস করতে হয় করবো…সঙ্গে যাওয়া? সে তো তুচ্ছ কথা, হরু!

হরেন্দ্রনারায়ণের চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তা'হলে আমি সেরে উঠবো, তোমার যা' ইচ্ছে তাই কর মা, আমার বলার আর কিছু নেই।

পীতাম্বর সংবাদ দিল, থানা হইতে জমাদার সাহেব আসিয়াছেন। রাণীমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রঘুবীর বাবু রাণীমার সকল কথা মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, রাণীজী, সন্দেহের উপর এতটা করা চ'লবে না। সুধীর বাবু লড়্‌কা আদমি, পিছে বহুত মুস্কিল করেগা।

রাণীমা রাগ করিয়া বলিলেন, তাতো আমি সুরু থেকেই জানি…সুধীর পুলিশকে হাত ক'রে রেখেচে…

ইয়ে আপ্‌ কেয়া বোল্‌তেহেঁ… বলিয়া রঘুবীর লজ্জিত হইল। আপ্‌কো ওয়াস্তে সব কুছ কর শকতে হেঁ; বোলিয়ে দোনো কো হাজির কর দেঁতেহে।

তার চেয়ে আমি কিছু চাইনে, তাই দেও বাবা। আমি চালপড়ার ব্যবস্থা করচি, যে চোর সে ধরা প'ড়বেই।

রঘুবীর হাসিল, উয়ঃ সব ঝুট হায়!

ঝুট কি সত্যি, সে আমি বুঝব। তাদের হাজির ক'রে দাও—এতে তোমার কি মুস্কিল হ'তে পারে? বলিয়া রাণীমা চলিয়া গেলেন।

জমাদার খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া পীতাম্বরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

রাণীমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অনুমানের অসম্ভব শক্তি দেখিয়া নায়েব মশাই অবাক্ হইলেন। সুধীরের দোকানের দোরের বাহিরে তালা ঝুলিতেছে এবং ঘরের মধ্যে, দুইজনের চুপি-চুপি কথা কহিবার ফিস্‌ফাস্ শব্দ! ভিতরে যে একটা অন্যায় কিছু চলিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না!

বগলাচরণের শব্দ করিতে সাহস হইল না। তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দোকানের অপূর্ব্ব বিধি-নিষেধের বিজ্ঞাপনখানি পাঠ করিতে করিতে প্রায় তাহা মুখস্থ হইয়া গেল। তবুও কেহই আসে না। একবার মনে হইল, ছুটিয়া বাড়ী গিয়া এই সংবাদ দিয়া আসেন; কিন্তু সে বিষয়ে রাণীমার মানা মনে পড়িল। ইহারা জানিয়াছে, এখন একবার ফাঁক্ পাইলে আর হদিস্ মেলা দুষ্কর হইবে। ঘরের ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ শুনা যায়: যেন ঘড়িও বলিতেছে, চ'লে যাসনে, চ'লে যাসনে!

নীচে লোহার নাল দেওয়া জুতার শব্দে বগলাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। পীতাম্বরকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন রাণীমার ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে।

রঘুবীর উপরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল এই কেবাড় খোলো, নেহিতে তোড় দেঙ্গে।

বলা সহজ; কিন্তু সেই দোর ভাঙ্গিয়া ফেলা সহজ

নয় : তবুও আস্ফালন করিতে ক্ষতি কি? তাহাতে তো পয়সা খরচ হয় না।

কিছুক্ষণ চারিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

ভারি গলায় রঘুবীর বলিল, আচ্ছা, তোড়ো কেবাড়্…

ভিতর হইতে খিল্ খুলিয়া গেল, সুধীর আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কেয়া হ্যায়, জমাদার সা'ব?

তালাটা ভিতর হইতে টিপিয়া দেওয়া ছিল মাত্র : বন্ধ দেখাইবার ঠাট মাত্র।

জমাদার রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আওর কোই হ্যায় ভিতর মে?

জনানী, হামারা আপনা আদ্‌মি।

রঘুবীরের রূঢ় হাস্তের কঠোর শব্দে চতুর্দ্দিকে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, দিন্-দোপহর কো ভি ফুরসৎ নেহি দেতা? আচ্ছা, বাৎলাও তো ভাই, মোহিনী কাঁহা গেয়ী?

শুক্‌নো ঠোঁট চাটিয়া, ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া সুধীর উত্তরে বলিল, মোহিনীর খবর আমি কোথেকে জান্‌ব? এ প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দেব না, জমাদার সা'ব্!

জমাদার দৃঢ়ভাবে বলিল, লেকিন্ পুলিশ নেহি ছোড়েগা……ভিত্তর যায়েগা, আপনা শুব্‌ভা কো সাফ করেগা……ভাইয়া সমঝ-বুঝ কর কাম কর না।

সুধীর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, চলিয়ে উস্‌কি মকান্….. ওঃ, তুম হাম্‌কো বাচ্চা পায়া? আগে, ইস্ দুকান্ দেখেঙ্গে, পিছে দুসরা কাম……

সুধীর জানিত জমাদার রঘুবীর ছাড়িবার পাত্র নহে; তবুও সে বাধা দিতেছিল, অশুভস্য কাল হরণম্—মনে করিয়া। যদি কোন উপায় হয়, যদি…. .

সে সি ড়িতে নামিয়া জমাদারের হাত ধরিয়া বলিল, আচ্ছা জমাদার সা'ব, আমি কথা দিচ্চি, কাল সকালের মধ্যে মোহিনীকে খুঁজে দেব…আমার কথা বিশ্বাস কর।

রঘুবীর বলিল, তোমার কাছে এই সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ; কিন্তু কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার আমার সময়ও নেই, আর ধৈর্য্যও নেই—ভাল চাওত'

সু। আমি কি ভাই, তোমাদের সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া করেছি?

জ। ফজল বাৎ মৎ বোলো…

এইবার সুধীর জমাদারের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, দাদা ফজুল কথা ব'লে তোমাকে ভুলিয়ে দিতে পারে, এত বুদ্ধিমান সুধীর নয়, আর তত বোকা তুমিও নয়; কিন্তু অযথা বে-ইজ্জৎ করায় লাভ কি দাদা?

রঘুবীর হাসিল। সে বুঝিল, সুধীর একটা রফা করিতে চাহে। কিন্তু সে হুঁসিয়ার লোক, বলিল, কৈ আংটিটা দাও, তাহ'লে এখনও ইজ্জৎ রক্ষা হ'তে পারে।

সুধীর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঘুবীর সময় বুঝিয়া পীতাম্বর সিং এবং নায়েব মশাইকে নিচে গিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল।

তাহারা নামিয়া গেলে সে বলিল, মোহিনী আংটি আমায় দেয় নাই।

তবে সে কি করতে তোমার কাছে এই অসময়ে এসেছে? রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিল।

উত্তরে সুধীর বলিল, অন্য একটা কাজে, আংটির কথা আমি কিছুই জানিনে।

রঘুবীর হাসিল, বলিল, বাবুজি, ঝুট্ বড়া খারাব চিজ্……

মোহিনী ঘরের মধ্যে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিল; হঠাৎ সে অগ্রসর হইয়া বলিল, আংটি আমি সুধীরদাকে দিইনি…

তব্? রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিল, কিস্‌কো দিয়া?

পানওয়ালার কাছে রাখ্‌তে দিয়েছিলুম, সে দোকান বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে, সেই কথা আমি সুধীর দাদাকে ব'লতে এসেছিলুম।

সুধীরের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, কৈ, ও কথাও ত' আমাকে বলিস্‌নি, মোহিনী?

না, বলিয়া মোহিনী নখ খুঁটিতে লাগিল।

কেন?

ব'লতেই এসেছিলুম; কিন্তু সাহস হয়নি।

কোন্ পানওয়ালা?

মোতি পানওয়ালা। মোহিনী বলিল।

রঘুবীর প্রশ্ন করিল, উস্‌সে দোস্তি হ্যায়?

ওর বৌএর সঙ্গে…কিন্তু তখন তার বৌ দোকানে ছিল না; তাই মোতির হাতে রাখ্‌তে দিয়ে গিয়েছিলুম, বলেছিলুম সন্ধ্যার সময় নেব।

তারপর? সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

ফিরে এসে, মোহিনী বলিল, দেখি দোকান-পাট বন্ধ, মোতি স'রে প'ড়েছে। সে যে এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রবে, জান্‌তুম না……তোমাকে ব'লতেই এসেছিলুম; কিন্তু তুমি ব'কবে, ভয়ে ব'লতে পারিনি।

সুধীর রাগ করিয়া বলিল, কচি খুকি কিনা!…তুই যেম্‌নি বোকা, তেমনি পাজি হয়েছিস্ মোহিনী…আংটি চুরি করলি কেন?

মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চুরি করিনি, কুড়িয়ে পেয়েছি…

যাদের জিনিষ, তাদের ফিরিয়ে দিলিনে কেন? লেঠাতো সেইখেনেই চুকে যেত?

মোহিনী কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রঘুবীর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আওর বাৎ হেয়্, মোহিনী ছিপাতি…

সুধীর ধমক দিয়া বলিল, কথা লুকোচ্ছিস্? বল, আগাগোড়া সব কথা…মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আর কিছু জানিনে।

রঘুবীর অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, সুধীরবাবু, দোনো কো থানা যানে হোগা…ইস্‌মে আওর বাৎ হেয়্……

আমার কি দোষ জমাদার সায়েব? সুধীর বলিল।

পিছে গৌর কিয়া যায়ে গা। মোতি আনে সে পূরা হাল মালুম হোগা…তব্ তক্ থানামে কোতল্… বলিয়া রঘুবীর হাসিল।

সুধীর বলিল থানায় নয়, রাণীজির বাড়িতে নিয়ে চল্ দাদা!

উয়্ ভী হো শকতা হেয়্; চলো, দেরি মৎ করো।

সুধীর কপাট বন্ধ করিয়া নামিয়া আসিল, মোহিনী তাহার সঙ্গে।

নিচে নামিয়া রঘুবীর পীতাম্বরকে বলিল, লে যাও; বাহার কা ঘর মে নজরবন্দ মে রাখ্‌না; মেয়ঁ তুরন্ত আবেঙ্গে। দেখো বহুত হুঁসিয়ারি সে রহনা। মোহিনী কো ভিতর যানে নেহি দেও; বুঝা ভাইয়া?

বাইকে চড়িয়া রঘুবীর নিমেষে দৃষ্টির অগোচর হইল।

(২৩)

মোতি ঘরেই ছিল; কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া। সন্ধ্যার পরই সে সহর ছাড়িয়া প্রয়াগ যাইবার সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিল। আংটির সম্বন্ধে মোহিনী তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা সে মোটেই বিশ্বাস করে নাই। প্রকাণ্ড হীরা-বসান জিনিষটা কোন রাজা-রাজড়ার হওয়াই সম্ভব। মোহিনীর স্বামীর হইতেই পারে না; হইলে, মোহিনী তাহার প্রকৃত দাম নিশ্চয় জানিত এবং মাত্র পঞ্চাশ টাকা লইয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দিত না। মোতি প্রয়াগ চলিয়াছিল, দাঁও-এ আংটিটা বেচিয়া ফেলিয়া অধিক টাকা মারিবার জন্য।

সে বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর নিকট আংটির উল্লেখ পর্য্যন্ত করে নাই। সকাল সকাল ফিরিতে দেখিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, এমন অসময়ে যে?

উত্তরে মোতি গম্ভীর হইয়া বলিল, মন ভাল নেই, খবর পেলাম, কমলার অসুখ।

কমলা তাহাদের একমাত্র কন্যা। তাহার অসুখের সংবাদে মোতির স্ত্রী যারপরনাই বিচলিত হইয়া উঠিল, বলিল, কি অসুখ, কবে থেকে হয়েছে?

মোতি বলিল, লোকটা সে সব কিছুই বলতে পারে না, বলে মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন মোহিত ছুটছে ডাক্তার ডাক্‌তে, বলেছে কমলার ভারি অসুখ…

এই কথা শুনিয়া মোতির স্ত্রী পা ছড়াইয়া বসিয়া কান্না জুড়িয়া দিল, ওগো আমাদের কি হলো…

মোতি তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল, বলিল,

আমি তো যাচ্ছি এই সন্ধ্যের গাড়িতে, তেমন-তেমন বুঝি, তোকে তার ক'রে দেব, কেঁদে একটা হৈ চৈ বাধাস্ নে, ব'লচি।

মোতির স্ত্রী সঙ্গে যাইতে চাহে।

স্ত্রীজাতিকে মোতি মোটেই বিশ্বাস করিত না; বিশেষ করিয়া তাহার স্ত্রী। ভালমানুষের এক-শেষ; এক-কথায় পাঁচ কথা কহে। পেটে কোন কথা রাখিতে পারে না। প্রয়াগ যাইবার আসল কারণ বলিলে, আর রক্ষা আছে? হাউ মাউ করিয়া কলহে বাড়ী মাথায় করিবে।

সে নিজেই গিয়া উনানে আগুন দিল, বলিল, তুই ব'সে কাঁদ, এক মুঠো খেয়ে যেতে হবে তো? ব্যস্ত হ'য়ে লাভ? তাতে কি মেয়ে সেরে উঠবে? আর চিনিস্ তো মোহিতের মা-মাগীকে; দুজনে এক সঙ্গে হ'লে খেও-খেই করবি বৈ তো নয়। হয়ত সামান্য কি অসুখ, সেরে গেছে আজ।

মোতির স্ত্রী মোহিতের মাকে ভয় করিত। তাহার নাম করিতে সে কতকটা নিরস্ত হইয়া ভাত চড়াইয়া পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মোতি এ-ঘর ও-ঘর করে আর মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া যায়।

ভাতে-ভাত খাইয়া মোতি আসন হইতে উঠিয়াছে, এমন সময় বাহিরে ভারি গলায় শব্দ উঠিল, মোতি, মোতি, মোতি হ্যায়!

সহসা মোতির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সে স্ত্রীর সম্মুখে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করিয়া বলিল, ও কেউ পাওনাদার হবে, টাকার তাগিদে এসেছে; এখন কথা কইতে গেলে দেরি হ'য়ে যাবে। তুই ব'লেদে, তাগিদে বেরিয়েছে, আস্‌তে রাত হবে।

মোতিও আন্দাজ করিতে পারে নাই যে রঘুবীর। কারণ, এত শীঘ্র ব্যাপারটা থানা পর্য্যন্ত যাইতে পারে—অনুমান করা শক্ত।

রঘুবীরও দ্বিধার সহিত আসিয়াছিল। পথে সে মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিল। বাড়ীতে ধরিলে আংটিটা লুকাইয়া ফেলিবার অনেক জায়গা আছে; কিন্তু ষ্টেশনে কি রেলে ধরিলে বামাল তাহার কাছেই থাকিবে; তবুও একবার বাড়ী হইয়া ষ্টেশনে সে যাইতেছিল। তাহার মত হুঁসিয়ার কর্ম্মচারী কোন দিকে ফাঁক রাখিয়া চলে না।

রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া রঘুবীর আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ষ্টেশনের পথে রওনা হইল। ষ্টেশনে আগে পৌছানই তাহার উচিত ছিল। মোতির গতিবিধি অলক্ষ্যে দেখিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইত বটে; কিন্তু মোতিও পাকা মাঝি, সে পুলিশের চোখে কি করিয়া ধুলো দিতে হয় জানে; আচ্ছা তবুও দেখা যাক্—কতদূরে গিয়া ব্যাপারটার হদিস্ মেলে। এই কথা মনে করিতে করিতে সে ইষ্টিশানের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

মোতি আর অধিক বিলম্ব করিল না; সে তাহার স্ত্রীকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

গলি ঘুঁজি আঁকা-বাকা পথ দিয়া যাইতে মোতির বিলম্ব হইল। সে তাহাই চাহিতেছিল। গাড়ি আসিবার বহু পূর্ব্বে গিয়া চেনা-শুনা পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার বিপদ অনেক; তাই সে ইষ্টিশানের সাম্‌নের একটা দোকানে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি করিয়া আংটিটা সহজে বিক্রয় করিতে পারিবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

টিকিটের ঘণ্টা পড়িতে সে অতি সন্তর্পণে গিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইল। ডান হাতে টিকিট কিনিবার টাকা কয়টি। ফতুয়ার বুকের পকেটে রুমালের খুঁটে আংটিটাকে বাঁ হাত দিয়া সজোরে ধরিয়া আছে। কাশীর গাঁট-কাটার কথা সকলেই জানে; তাই সকলেই পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, তাই সাবধানতার অবধি নাই!

দূরে রঘুবীর দাঁড়াইয়া মোসাফিরদের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছিল। পুলিশ এমন নিত্যই দাঁড়াইয়া থাকে। যাহাদের মনে পাপ নাই, তাহারা দেখিয়াও দেখিতে

শীতের রোদ

খেয়ালী প্রেস

পায় না। মোতির মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ নহে, তাই সে বহুপূর্ব্বেই রঘুবীরকে দেখিয়াছিল। টিকিট লইয়া রেলিংএর বাহিরে আসিতে রঘুবীরের সহিত চোখ-চোখি হইতে সে সেলাম করিল।

রঘুবীর মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাঁহা চলেও ?

প্রয়াগজি, জমাদার সাহেব। ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজন ছিল না, তবুও মোতি বলিল, লড়কি বহুৎ বেমার···

রঘুবীর একপা একপা করিয়া কথা কহিতে কহিতে তাহার সহিত চলিল।

মোতি জিজ্ঞাসা করিল, আপ কঁহি যাইয়ে গা ?

নেহি, রঘুবীর বলিল, দারোগাজি কো চড়া দেনে কো আয়ে।

দুইজনে কথা কহিতে কহিতে প্লাটফরমের একপ্রান্তে চলিয়া গেল। সেইখানে রেল পুলিশের আপিস।

রঘুবীর বলিল, গাড়ি কা দেরি হ্যায়, আও থোড়া আফিস মে বৈঠো মোতি।

পুলিশের সঙ্গ মোতির মোটেই ভাল লাগিতেছিল না; কিন্তু না বলিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না। মোতি ধীরে ধীরে গিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। রঘুবীর একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া ছোট দারোগার সহিত অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে গল্প জুড়িয়া দিল।

কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া অবশেষে মোতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আব্ বখ্‌ৎ হুয়া, হাম চলে জমাদার সাহেব।

আরে, হড়বড় কেঁও করতে হো, হম্‌ভি তো যায়েগা। গাড়ি বহুৎ দের ঠহরেগে।

মোতি নিরুপায় হইয়া আবার বসিল।

সশব্দে গাড়ি আসিয়া পড়াতে মোতি আবার উঠিতে যাইতেছিল; কিন্তু রঘুবীর বজ্রহস্তে তাহার দুই হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুমকো হম্ গিরিবদার কিয়া।

নিকালো আংগুঠি···বেইমান্ কো বাচ্চা!

মোতি হাত ছিনাইয়া পলাইবার চেষ্টা করাতে, রঘুবীরের হেঁচ্‌কা টানে মেজের উপর পড়িয়া গিয়া মাথায় চোট পাইল।

পলায়ন মোটেই সম্ভবপর নয় বুঝিয়া সে রঘুবীরের হস্তে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিল।

মোহিনীর দেওয়া আংটি চাহিলে মোতি অবাক হইয়া কিছুক্ষণ রঘুবীরের দিকে চাহিয়া বলিল, আংটি মোহিনী তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে।

কত দামে ?

পঞ্চাশ টাকায়।

দেখি সে-আংটি ?

মোতি একটু ইতস্তত: করিয়া রুমাল বাহির করিয়া বলিল, আমার টাকা পেলে আংটি আমি ফিরিয়ে দিতে রাজি আজি।

আর না পেলে ? রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিল।

এ জিনিষ আমার!

রঘুবীর হাসিয়া বলিল, সে বিচার আদালত করবে। আমাদের কাজ চোর ধরে তার সাক্ষী-সাবুদ ঠিক ক'রে দেওয়া। ওটা যে চোরাই-মাল তার সাবুতের অভাব হবে না। কমসে কম ওটার দাম হবে পাঁচশো কি হাজার টাকা; পঞ্চাশ টাকায় কেনা আর বেচা দুটোই সন্দেহ-জনক, এ কথা ছোট ছেলেও বোঝে···

পথে চলিতে চলিতে মোতি বলিল, পঞ্চাশ টাকা তোমায় দেব জমাদার সাহেব, আমাকে ছেড়ে দেও।

ছেড়ে দেবার মালিক আমি নই।

ইচ্ছে করলে তুমি সব পার···

হুঁ, বলিয়া রঘুবীর বড় বড় পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। মোতি তাহার সহিত চলিয়া উঠিতে পারে না; পিছাইয়া পড়িলে কনেষ্টবলের গুঁতা খায়।

রঘুবীর থানায় না গিয়া সরাসরি রাণীজির বাড়ীতে চলিল। সে মোতি এবং মোহিনীর সম্পর্ক বুঝিয়াছিল; কিন্তু এই ব্যাপারে সুধীর কিভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা তখনো ধরিতে পারে নাই। সেই দিকের তাড়া এবং তাগিদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল।

রঘুবীরের রাণীজির বাড়ী ফিরিতে ঠিক নটা বাজিল।

বলির পাঁঠার মত মোতিকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে আর একটা লোক না থাকিলে হয়ত বা সেইটুকু পথ আসিতে রাত কাটিয়া যাইত।

সুধীর একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া নিয়তির বিধানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে কাহারো সহিত কথা পর্য্যন্ত কহে নাই।

কিন্তু মোহিনীর অধীরতার শেষ ছিল না। সে রাণীমার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া যখন বুঝিল যে সেখান হইতে কোন সুবিধা হইবে না, তখন কি করিয়া ফস্‌কাইয়া একেবারে সরাসরি শ্যামাঙ্গিনীর কাছে উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

বৌদি' আমার যা হবার হোক্‌গে, কিন্তু সুধীরদাদা একেবারে নির্দ্দোষী, তাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও। সে কিছু জানে না।

শ্যামাঙ্গিনী শান্ত হইয়া উত্তর দিলেন, তবে তুই ওকে এতে জড়ালি কেন?

আমার বুদ্ধির দোষ! বলিয়া সে শ্যামাঙ্গিনীর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল।

ব্যস্ত হোস্‌নে, উপায় একটা কিছু হবে; তুই আংটিটা কি করলি?

কথার উত্তর না দিয়া মোহিনী কাঁদিতে লাগিল।

বগলাচরণ বাহির হইতে বলিলেন, মা, ওকে আপনি ঘর থেকে বার ক'রে দিন; পুলিশ এসে আবার কি একটা নূতন হাঙ্গাম বাধাবে। সম্ভবত আংটিটা ওর কাছেই আছে···

মোহিনী বলিল, না আংটি আমার কাছে নেই!

তবে কি হ'লো সেটা, মোহিনী?

মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে পেট-কোঁচড় হইতে একখান কাগজ বাহির করিয়া শ্যামাঙ্গিনীর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, মোতি দিয়েছে!

মোতি আবার কে লা? শ্যামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন।

পানওলা, তাকে সবাই চেনে।

শ্যামাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ও তুই তোর কাছে রাখ এখন, আমাদের আর জড়াস্‌নে এর মধ্যে, মোহিনী!

মোহিনী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, যা হয় আমার হোক, তুমি দেখো বৌদি' সুধীরদা যাতে রক্ষে পায়, ও বেচারি নির্দ্দোষ.....বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বগলাচরণ বলিলেন, নোটখানা আপনি রাখ্‌বেন না, মা। আমায় দিন্, আমি ওকে ফিরিয়ে দি; এসব ভারি বিশ্রী জিনিষ; এর ছন্দ অংশেও থাকতে নেই। কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

নোটখানা হাতে লইয়া বাহিরে গিয়া তিনি মোহিনীকে বলিলেন, তুমি এক যায়গায় শান্ত হ'য়ে ব'সো আর আঁচলে এটা বেঁধে রাখ। যত পাক জড়াবে ততই তোমাদের বিপদ। যা' হয়েছে সত্যি ক'রে বল্লে, বোধ হয় হাঙ্গাম আদালত পর্য্যন্ত না গড়াতেও পারে!

আশায় মোহিনীর চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

রঘুবীর আসিয়া রাণীমার হাতে আংটি দিয়া বলিল, আপ দেখিয়ে আসল চীজ্ হ্যায়?

রাণীমা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, আমি কি ছাই ঠিক ক'রে দেখ্‌তে পাই? বৌমাকে দেখাইতো···

শ্যামাঙ্গিনী দেখিয়া বলিলেন, সেই জিনিষই বটে!

হরুর হাতে পরিয়ে দিয়ে দেখ, তা হলেই আর সন্দেহ থাকবে না।

হরেন্দ্রনারায়ণ আংটিটা আঙ্গুলে পরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, সেইটেই বটে! তা'হলে হারাণ জিনিষ ফের পাওয়া যায়? বিধাতা আমাকে একেবারে ভুলে যান্‌নি, দেখ্‌চি।

রাণীমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আবার সব ফিরে পাব আমরা, বৌমা—এ সবই গ্রহের ফের।

হরেন্দ্র ডাকিলেন মা, মা,···

রাণীমা হাতে হাত দিয়া বলিলেন, কি ব'লছো বাবা?

যে লোক এটা খুঁজে উদ্ধার ক'রেছে তাকে একশো টাকা বকশিস্ দিতে হবে; আর এর জন্য কেউ যেন না শাস্তি পায়। দোষ তো গোড়াতে আমারই। আমি অসাবধান না হ'লে—কিছুই ঘ'টত না!

বৌমা, তুমি ব'লে দাও, তাই হবে। মনে মনে অশান্ত না হয়।

শ্যামাঙ্গিনী লিখিয়া জানাইলে, হরেন্দ্রনারায়ণ পাশ ফিরিয়া শুইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

আকাশ ও মাটী

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

কভু কি দেখেছো তুমি তারা-ভরা রাতের আকাশ,
মনের মুকুর 'পরে চাঁদহীন কালো আকাশেরে?
প্রান্তরের ছোটঘাসে মিশায়েছো বুকের কাঁপন,
শুনেছো—বুঝেছো কভু ধরণীর বেদনার্ত্ত বাণী?
প্রাণের দরদ ঢেলে অনুভব কভু
করেছো কি তারাদের অস্ফুট ক্রন্দন?
নীরব ও আকাশের আর্ত্ত হাহাকার
বেজেছে কি কভু তব বুকে?
নীচের এ পৃথিবীর মূক ব্যথাঘাত
আন্দোলন তুলেছে কি অন্তরে তোমার?
সেই খনে মনে মনে ভেবেছো কি তুমি
কতো অসহায় এই আকাশ ও মাটী:
অজস্র ব্যথার ভারে অবিরাম দুলে দুলে ওঠা,
বাতাসে কাঁপিয়া ওঠে তারি ক্ষীণ ধ্বনি।
কিন্তু হায় কি দুঃসহ এ যাতনা ভাবো,—
অসহ ব্যথারে কভু ভাষা দিতে নারে এ ধরণী;
আকাশের ব্যথা শুধু তারাদের ক্ষীণ চোখে কাঁপে,
অভিযোগ জানাবারে নাহি পারে অসহ ব্যথায়।
আকাশ ধরণী শুধু কেঁপে কেঁদে ক্ষয়ে মুছে যায়,—
অজানা ব্যথার ধারা আঁধার পাহাড়ে মুখ ঠোকে।.....
আরো কি ভেবেছো কভু দরদীয়া কবি
সে নির্জ্জনে তব মনে ধরণী ও আকাশের নিবিড় আকুতি;
তোমার মনের পায়ে কতো অনুনয়—
তাহাদের এ ব্যথারে ভাষা দিতে তোমার বাণীতে।
ব্যর্থতার অভিযোগ জানাবারে কালের সভায়
আকাশ ধরণী চায় মানুষের প্রাণের দরদ।···

এ বিশ্ব সমাপ্ত নয় আপনাতে আপনি তো কভু;
নিজে সে তো জড় পিণ্ড ভাষাহীন প্রাণ-আলো-হারা;
তাহারে প্রকাশ করে, ভাষা দেয়, দান করে আলো
মানুষের প্রাণের সবিতা:
জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিয়া দর্শনের দিয়া অনুভূতি,
সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোর পরশে
ধরণী ও আকাশেরে করে সঞ্জীবিত,
অপ্রকাশ অজ্ঞ মূক এ বিশ্বেরে করে বাণীময়:
মানুষের হাতে-গড়া এ বিশ্বের রহস্য-মন্দির।···

সেইক্ষণে ওগো কবি, অসীম এ আকাশের তলে,
বিছাইয়া দেহলতা অনন্ত এ ধরণীর বুকে,
আত্মার প্রশস্তি-গানে প্রাণ তব ওঠে গান গেয়ে:
মানুষ সঙ্কীর্ণ নয়, অনন্ত সে, বিশ্বকর্ম্মা বিপুল বিশ্বের।
মৃত্তেরে দানিয়া প্রাণ আলোকের উজ্জীবন গানে,
মানুষ সৃজিলো নিজে প্রাণময় অমর দেবতা।.....

স্পেনের কথা — কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

(২)

সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁর সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা হ'ল! তাতে বোঝা গেল তিনি এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যাই হোক তারপর একদিন তাঁর কাছ থেকে আমার আলাদা নিমন্ত্রণ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেদিনও তিনি আমার কাছ থেকে এদেশ সম্বন্ধে নানা কথা জেনেছিলেন। তিনিও ইংরাজী জানেন না, স্পেনীয় ভাষায় আমাকে কোন রকমে কথা চালাতে হয়েছিল। ইংরাজী ভাষাটা ইংলণ্ডের বাহিরে য়ুরোপে কোথাও চলে না। কেহ শেখার দরকার মনে করে না। তবে ফরাশী ভাষাটা অন্যান্য দেশে শিক্ষিত লোকে কেহ কেহ শিখে থাকেন, তবে সবাই নয়। ফরাসী ভাষা জানা সব দেশেই দু দশজন লোক পাওয়া যায়, ইংরাজী মোটেই কাজে আসে না। স্পেনীয় ভাষাটা আয়ত্ব করা কষ্টকর—বিশেষ উচ্চারণ। তাদের মত উচ্চারণ না করতে পারলে তারা সহজে কথাটা বুঝতে পারে না, আবশ্যক হলে লিখে দেখাতে হয়। স্পেনীয় ভাষার কয়েকটা সাধারণ কথার নমুনা এখানে দিচ্ছি :—

সংখ্যাবাচক যেমন :—এক = Oono ; দুই = Dos ; তিন = Trace ; চার = Koo-ah-tro ; পাঁচ = Thin-Co ; ছয় = Say-is ; সাত = Se-ay-tay আট = O-cho ; নয় = noo-ay-vay ; দশ = De-eth ; এগার = On-they ; বার = Do-thay ; তের = Tray-thay ; চৌদ্দ = Ka-tor-thay ; পনর = Kin-thay ; ষোল = de-ethe-say-is ইত্যাদি।

কথা যেমন :—হাঁ = Si ; তুমি = Osted ; ভাল = Boo-ay-no ; ধন্যবাদ = Grah-the-ahs ; ঠাণ্ডা = Free-o ; শক্ত = Dee-fee-thil ; সময় = Veth ; বয়স = Ay-dahd ; সুন্দর = Air-mo-sah ; বালিকা = Moo-cha-cha ; ফরাসী = Fran-thers ; ইংরাজী = In-glass ; ভারি = Pay-sah-do ; দুধ = Lachey ; গরম = Callan-they ; জল = Agna ; মাথা = Cabaja ; চুল = Pels ; নাক = Naris ; মুখ = Boka ; গাল = Cara ; দাঁত = Tientis ; জিব = Lingua ; হাত = Abajo ; ঠোঁট = Lavios ; আঙ্গুল = Dados ; আজকে – Hoy ; কালকে = Mufianu ; আজরাত্রে = Esha-noche ; স্পর্শ করা = Tocar ; সহর = Cindad ; কুৎসিৎ = Feo ; ছাতি = Paraguas ; কাকা মামা পিশে = tio ; উপরকার ঘর = arriba ; দরকারী = util ; সপ্তাহ = Semana ; কথা = Pulabra ; কাজ = Trabajo ; বুঝতে পারা = Com-Prehender ; স্ত্রী = esposa ; সাদা = bianco ; লাল = rojo ; জুতা = rapato ; দোকান – Tienta ; উত্তর দেওয়া = respuesta ; ধনী – rico ; লবণ ; sal ; দেখা = visto ; প্রশ্ন = pregunta ; দাম = precio ; পকেট = bollillo ; বৃষ্টি হওয়া = Mover ; স্বামী = Esposo ; সকাল = mafiana ; নাম = Nombre ; প্রতিবেশী = vecino ; নূতন = nuevo ; চিনি = Azucar ; কেমন = Como ; কতটা = cuanto ; বন্ধু = amigo ; ভুলে যাওয়া = olvidor ; বিশ্বাসী = fiel ; খাওয়া = comar ; দরজা = puerta ; Dinner = Comida ইত্যাদি।

তারপর ৭ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় বৈদেশিক মন্ত্রী (Foreign Minister) তাঁর প্রাসাদে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। সেখানেও সেই একই রূপ ব্যবস্থা—মদের ছড়াছড়ি। তারপর দিন মেয়র City Hall এ সম্বর্দ্ধনা করেন। সেখানেও ঐ একই ব্যবস্থা। বিশ্ব বিদ্যালয় ও National Biblotecaয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা যে কয়দিন মাদ্রিদে ছিলাম প্রত্যহ Sectional meeting হত। একটু ফুরসৎ পেলেই আমরা মাদ্রিদের আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থান দেখে আসতাম : Escorial, San Lorenzoel Real নামক মঠ জগৎ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ এটিকে পৃথিবীর অষ্টম অদ্ভুত স্থান (eighth wonder of the world) বলে থাকেন। Alcazar প্রাচীন বাড়ীগুলি বহুপূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছে। Aranjuer-এর মনোহর নগরোদ্যানগুলি, Guadalajera-র বিখ্যাত প্রসাদ আর pantheon বস্তুতঃই কৌতুহলোদ্দীপক। টলেডো সহরে এত দেখবার জিনিষ আছে সেগুলি ভাল করে দেখা সময়সাপেক্ষ। টলেডোর গির্জ্জা মঠ প্রাসাদ প্রভৃতিতে শিল্পীকলার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে। গির্জ্জা-সংলগ্ন সুন্দর লাইব্রেরী আছে।

টলেডো গির্জ্জা

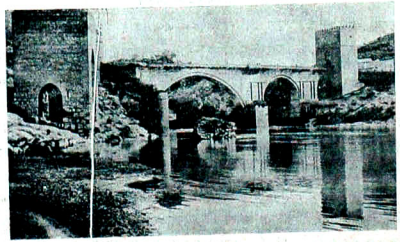

সেণ্ট মার্টিন সেতু—টলেডো (খৃঃ ১৪ শতাব্দী)

আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বাস যখন সেখান থেকে প্রথম সোনা আমদানী করেন সেই সোনায় বাঁধানো বই এখানে সযত্নে রাখা আছে। সেবিল সহরের গির্জ্জার লাইব্রেরীতেও আমেরিকা হতে আমদানী সোনা মোড়া বই দেখেছিলাম। আমরা মাদ্রিদ হতে স্থালামানকা গিছলাম—সেটাও খুব প্রাচীন সহর। সেখানকার রোম্যামানদের আমলের গির্জ্জাটী বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এত বড় উচ্চ গির্জ্জা সেবিল ছাড়া স্পেনে আর কোথাও দেখি নাই—এমন কি ফ্রান্সের সুবিখ্যাত নটার ডেম্ গির্জ্জাটী বড় হলেও এত বড় ও বিরাট নয়। স্থালামান্‌কার এক ধারে পুরাতন সহর, অপর দিকে আধুনিক সহর। এখানে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার প্রাসাদ আছে। সেখানেও সিটি হলে মেয়র আমাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়টী বহুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরীতেও আমরা সম্বর্দ্ধিত হই। এক রাত্রি আমরা কয়েকজন সেখানে ছিলাম। প্রাতে মাদ্রিদে ফিরে আসি। মাদ্রিদ য়ুরোপের অন্যান্য সহরের মত একটা বড় সহর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টা-লিকা, চওড়া রাস্তা ও ফুটপাত, সুসজ্জিত দোকান পাট, প্রতি রাস্তায় সিনেমা, থিয়েটার হোটেল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সবই আছে। মোটর, ট্রাম, বাস সর্ব্বদা চলাচল করচে। রাস্তা পার হওয়াই দায়—তাহা ছাড়া মাটীর নীচে (under ground) রেলে সহরের তলায় জাল বুনে রেখেছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেণ ছুটাছুটী করচে। তবে লণ্ডন ও প্যারিসে যেমন ইলেকট্রীক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওঠা নামা করতে হয় এখানে সে ব্যবস্থা নাই, সিঁড়ি দিয়েই ওঠা নামা করতে হয়। প্যারিসের মত এখানেও চওড়া ফুটপাথের খানিকটা জুড়ে সব স্থানেই কত সুসজ্জিত কাফে আছে। সেগুলি এত জন-প্রিয় যে সর্ব্বদাই লোকভর্ত্তি থাকে। মদ, কফি ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য এখানে সরবরাহ করা হয়।

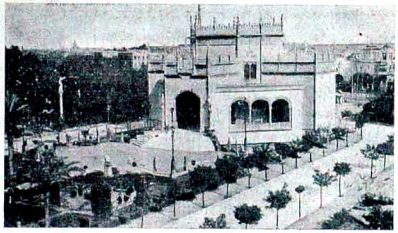

আমরা মাদ্রিদ হতে সেবিল সহরে যাই। সেটী অতি সুন্দর সহর। সেখানে এত দ্রষ্টব্য আছে যে কয়দিন ধরে সে সব দেখ্‌তে হয়েছে। এখানকার আলজাকার প্রাসাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানগুলি অতি মনোরম। এখানে আমরা ৫।৬ ঘণ্টা ঘুরেছি তবুও ভাল করে দেখা হয়নি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীটা নূতন করে তৈয়ার করা হয়েছে। সেখানে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে এবং সিটি হলে মেয়র আমাদের সম্বর্দ্ধিত করেন। সেবিল কলম্বসের জন্মস্থান। কলম্বসের পুত্র তাঁর পিতার ত্যক্ত লাইব্রেরীর সাত হাজার বই এখানকার কলম্বিয়া ন্যাশান্যাল বিবলোথেকাকে দান করেচেন। সেখানে কলম্বসের হাতে লেখা বই দেখলাম। সেবিলের গির্জ্জায় উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। এদেশের গির্জ্জাগুলি সবই স্বল্পালোক-বিশিষ্ট। প্রবেশ ও বহির্গমনের দ্বার ছাড়া অন্য দ্বার বা জানালা নাই। রঙিন আঁটা কাচের সার্সি দিয়ে যে আলো আসে তাতেই একরকম চলে। এখানে অনেক সাধু ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। সব স্থানেই বাতির আলো জ্বলছে। পুরোহিতেরা যখন সমস্বরে সুরতান-যোগে উপাসনা করেন ও উচ্চ গম্বুজে সে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তখন মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের

প্রাসাদ মণ্ডপ—সেবিল

উদয় হয়। শব্দ অনেকটা বেদ উচ্চারণের মতই মনে হয়। ঘণ্টাধ্বনি করে পুরোহিত যখন ভক্তবেষ্টিত হয়ে আরতি করেন ও ধূপ ধূনার সুগন্ধে দিক আমোদিত হয়, তখন মনে হয় যেন আমাদেরই কোন মন্দিরে এসে আরতি দেখ্‌ছি। এই গির্জ্জাসংলগ্ন গরাদে আঁটা ঘরের ভিতর ঘর আছে—তার ভিতরে আবার ঘর; সেখানে কাঁচের আলমারীতে সাজানো বহুমূল্য দ্রব্য আছে—সবই স্বর্ণ ও রৌপের। আবার কোনও কোনওটী মণিরত্ন-সংযুক্ত আছে। সেগুলি সাধারণকে দেখান হয় না—আমাদের জন্য খুলে রাখা হয়েছিল। তাতে বৈদ্যুতিক আলোরও বন্দোবস্ত ছিল। যুগ যুগ ধরে ভক্তের প্রদত্ত মানসিক উপহার এখানে সঞ্চিত আছে। এত সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যময় দ্রব্য এখানে স্থান পেয়েছে যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ ঝলসে যায়। আর এক অংশে মূল্যবান রাজপরিচ্ছদের উপহার। সে একটা প্রদর্শনী বললেও হয়। আর, আসল সোনা দিয়ে মোড়া হাতে লেখা গ্রন্থের সংগ্রহ এখানে নিতান্ত অল্প নয়।

সেবিল সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—রাস্তা ঘাট দোকানপাট সবই সুদৃশ্য। মোটর ট্রাম ও বাস সদা সর্ব্বদাই ছুটাছুটি করচে। নগরোদ্যানগুলি অতি চমৎকার, কত যে পার্ক তার ইয়ত্বা নাই। অট্টালিকাগুলি যেমন উঁচু, দেখতেও তেমনি সুন্দর। স্পেনের অন্য অন্য সহর চেয়ে এখানে দুপুরের সময় অল্প গরম বোধ হোত। রাত্রিতে ও প্রাতে বেশ শীত থাকতো। সেবিল হতে বারসিলোনা যাবার পূর্ব্বে আমরা গ্রেনেডা, আলহাম্ব্রা, কর্ডোবা (Granada, Alhambra, Cordova) প্রভৃতি কতকগুলি সহর ঘুরে যাই।

বারসিলোনাও খুব বড় সহর। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বন্দর থাকায় মাদ্রিদ অপেক্ষা এ সহরটী অধিক সমৃদ্ধিশালী। যেমন চওড়া রাস্তা, রাস্তার মাঝে পার্ক, ফোয়ারা, মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি, তেমনি আট দশতলা উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী আর মোটর, ট্রাম ও বাসের ছড়াছড়ি, মাটীর তলায়ও রেল চলে। এটী কাট্যালোনিয়া (Catalonia) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। স্পেনের মধ্যে ক্যাটালোনিয়া স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশ। একদল লোক আছে তাদের Separatist বলে। তারা autonomyতে তুষ্ট নয়, স্পেন

সহরের প্রধান রাস্তা—বারসিলোনা

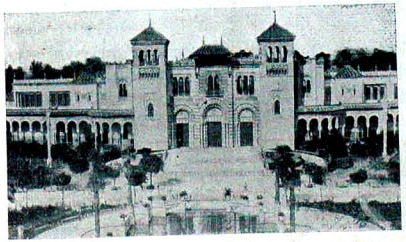

কলা ও শিল্প ভবন—সেবিল

হতে এটাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখতে চায়। তাদের মুখপত্র স্বরূপ রোজ আট দশখানি দৈনিক খবরের কাগজ বাহির হয়ে থাকে। তার মধ্যে La vanguarda

গ্রাণ্ড এভিনিউ—বারসিলোনা

উল্লেখ যোগ্য। এখানি দৈনিক ৫২ পৃষ্ঠার সচিত্র পত্র। দাম দশ সেন্টিম্। খবরের কাগজের দাম গভর্ণমেণ্ট ধার্য্য করে দেন। মাদ্রিদ সহর হতেও ২০।২২ খানা কাগজ দৈনিক বাহির হয়। তার মধ্যে আমি এ, বি, সি কাগজের উল্লেখ করেছি। সে দেশের লোকে লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ পড়ে না। লোকের হাতে হাতে কাগজ দেখতে পাওয়া যায়। কাট্তি খুব। বারসিলোনায় বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশান্যাল বিবলোথেকা প্রভৃতি আছে। এখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও সিটিহলে মেয়র আমাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। আয়োজন সব একই ধরণের।

আমাদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন হয় বারসিলোনায়। সেখানেও আমাকে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ বছর পরে আবার যে কংগ্রেস হবে সেটা যাতে এদেশে হয় আমি তার নিমন্ত্রণ জানাই। সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পরে স্থির হবে, তবে ব্যয়বাহুল্য ভয়ে অনেকেই পিছা'তে ছিলেন। বারসি লোনার আশে পাশে অনেকগুলি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে—সরকারী ব্যয়ে সেগুলি চালান হয়ে থাকে।

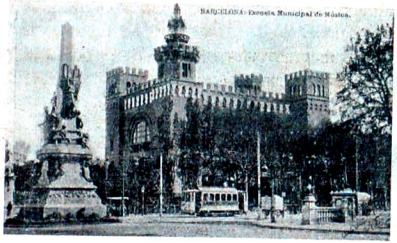

স্পেন দেশে প্রতি সহরে বড় বড় লাইব্রেরী আছে। স্পেনে এগারটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের লাইব্রেরী-গুলিও উল্লেখযোগ্য। স্পেনে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা পাঁচহাজার। মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী বাড়াবার চেষ্টা চলছে। তা ছাড়া অনেক স্থানে ছোটখাট অনেক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে। সেগুলির পুস্তক সংখ্যা বেশী না হলেও দরকারী পুস্তকে পূর্ণ। বাজে বই সে সব লাইব্রেরীতে ঠাঁই পায় না। প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার কংগ্রেস হয়েছিল রোম সহরে —পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। তার ফলে, ইটালীর লাইব্রেরীগুলির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। স্পেনের লাইব্রেরীগুলির কল্যাণ-কামনা করেই এবার এখানে কংগ্রেস আহূত হয়েছিল। যত বড় লাইব্রেরী ও বিশ্ববিদ্যালয় স্পেনে আছে, সবই রাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হ'তে জনসাধারণকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করবার চেষ্টা প্রবলভাবে চলেচে। সামরিক বিভাগের ব্যয়

সঙ্গীত বিদ্যালয়—বারসিলোনা

কমিয়ে দিয়ে সেই উদ্বৃত্ত টাকা লাইব্রেরীর উন্নতি করবার জন্য শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দের সঙ্গে যোগ দেওয়া হয়েছে। এই সব ব্যবস্থায় লাইব্রেরীর দ্রুত উন্নতি হবে—সে আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। এই যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা—এটা লাইব্রেরীর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ছাড়া আর কি হতে পারে ?

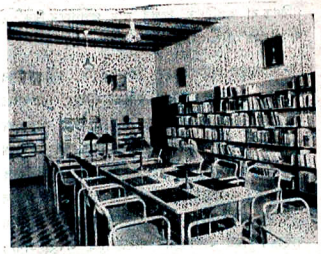

টর্টোসা (ক্যাটালোনিয়া) সাধারণ পাঠাগারের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

সে দেশের কথা অনেকটা বললাম এখনও অনেক কথা বাকী রইলো। এত দেখেছি ও শুনেছি—তা বলা বহু সময়সাপেক্ষ।

আমাদের দেশের লাইব্রেরী আন্দোলন সে সব স্বাধীন জাতির দেশের সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। আমাদের দেশে না আছে সরকারী সাহায্য, না আছে সাধরণের বড় রকম দান। আমাদের যে সব ছোট বড় লাইব্রেরী আছে, সেগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু ভাল করা যেতে পারে আমরা তারই চেষ্টা করচি। একেবারে যে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে তা বলতে পারিনে। সংশোধিত আইনের বলে বলে জেলাবোর্ড ও য়ুনিয়ান বোর্ড লাইব্রেরীর সাহায্যে কিছু কিছু বরাদ্দ করতে আরম্ভ করেচেন। মিউনিসিপ্যালিটীগুলির বরাদ্দও কোথাও কোথাও বাড়ানো হচ্ছে। আর একটা বিষয় আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট পল্লীর উন্নতি-কল্পে বাঙ্গলা সরকারের হাতে যে ষোল লক্ষ টাকা দিয়েচেন তা থেকে এবার একশোটী পল্লী লাইব্রেরী ও পল্লীগৃহ বা village hallএর ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা যাহোক একটা ভাল সূচনা বলতে হবে। মাদ্রাজ লাইব্রেরী সম্মেলনে আমি এই রকম প্রস্তাবই করেছিলাম। তার কিছু ফল হচ্ছে সেটা আশার কথা বলতে হবে। আমাদের অর্থ সামর্থ্য না থাকলেও যদি কাজে আন্তরিকতা থাকে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানের কৃপায় আমাদের দেশবাসীকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করবার প্রচেষ্টা কখনই বিফল হবে না।

বন্দেমাতরম্

রবীন্দ্রনাথের শা'জাহান কবিতা

শ্রীরামকানাই সামন্ত

কবি যে মুহূর্ত্তে কবিতা সৃষ্টি করেন অথবা রসিক যে মুহূর্ত্তে উহার রসাস্বাদন করেন, সে মুহূর্ত্তে ব্যাখ্যা বলিয়া কোনো জিনিষ নাই। কারণ জীবন বা জীবনের প্রতিমারূপিণী কবিতা প্রাণময়; তাহাতে একদিকে যেমন দেহ মন আত্মা বলিয়া একান্ত ভেদ কোথাও নাই, অন্য দিকে তেমনি ভাষা তত্ত্ব রস এই তিনের সমাবেশে বা যোগাযোগে যে কোনো একটি জিনিষ রচিত হইয়াছে এমন নয়। জীবনের তথা জীবনের প্রতিমারূপিণী কবিতার প্রকৃতিই হইল এই যে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না বা করিলে তাহাতে জীবন থাকে না; সুতরাং পুনরায় সেই খণ্ডগুলিকে যখন একত্র করি তখন সমগ্রকে লাভ করি না তবুও ব্যাখ্যা করা মানুষের মনোধর্ম্ম। এইটুকু আমাদের জানা থাকুক যে কবিরা রসিক যে অলোক-সামান্য চেতনা (বা inspired mood) হইতে কবিতা সৃষ্টি করেন বা উপভোগ করেন তাহার কয়েক সোপান নিম্নে অবতরণ না করিলে কবিতার ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ তাহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা ও ভাষার তারিফ করা সম্ভবপর নয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, রসই কাব্যের আত্মা। শাস্ত্র ইহাও বলেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
অমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্।

আত্মাকে অধ্যয়নে ভাবনায় বা বহু শ্রবণেও লাভ করা যায় না; পরন্তু আত্মা যাহাকে বরণ করেন সেই লাভ করে, তাহারই নিকটে আত্মা স্বরূপ প্রকাশ করেন। রস কাব্যের আত্মা; রস কেবল ধ্যানগম্য, অনুভবগম্য। অনুভূতি না থাকিলে কবিতা সৃষ্টি করা বা কবিতা আস্বাদ করা দুই-ই অসম্ভব; কপিল বা শঙ্করের তুল্য মনীষা থাকিলেও এ ক্ষেত্রে তাহা কোনো কাজের নয়। অনুভূতি থাকিলে তবেই কাব্যপাঠের পূর্ব্বে বা পরে তত্ত্বালোচনার অর্থ হয়—সে অনুভূতি পরিণত বা অপরিণত, বৃক্ষের ন্যায় পুষ্পপল্লবে বিকশিত বা বীজের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, যেমনই হউক না কেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় হইল রবীন্দ্রনাথের শা'জাহান কবিতা। এই কবিতা তাঁহার প্রতিভার এক অপূর্ব্ব দান। ইহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনবেদ অর্থাৎ জীবন মৃত্যু প্রেম ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার সমগ্র ধারণাটি রসে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব্ব এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথমেই দেখা যায় সংসারে সকল বিষয়ের অনিত্যতা। জীবনযৌবন কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে; দরিদ্র প্রজা আর শাহানশা'র একই ভাগ্য; রাজশক্তির বজ্রসুকঠিন মুষ্টিও শিথিল হইবে, তাহার ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব সন্ধ্যারক্তরাগের ন্যায়ই অচিরস্থায়ী। প্রয়োজনের বিষয় প্রয়োজন পূরণ করিয়াই লুপ্ত হয়; শক্তির গর্ব্ব পরাভব মানে,—তাহার order and efficiency সঙ্কীর্ণ দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করিলেই অর্থহীন, তাহার সুবিশাল বিজয়স্তম্ভ ধূলির আকর্ষণে ধূলি হইতে বাধ্য বা তাহাকে ঘিরিয়া যে বিস্মৃতির অমানিশা ঘনাইয়া আসে তাহাতে আর নব সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা নাই। ইহাতো মানিলাম; না মানিয়া উপায় নাই যে। তথাপি মানুষের প্রাণ—প্রেমিকের প্রাণ বলিতেছে, সম্রাট বা ভিক্ষুক কোন্ ছদ্মবেশে তাহার বাহ্য শরীর আবৃত সে কথা সে ভুলিয়াছে, বলিতেছে, আমার ঘরবাড়ী তৈজসপত্র ধনরত্ন যাক্, আমার শক্তির গর্ব্ব আমার ক্ষুদ্র অহংবোধ যাক্, কিন্তু আমার ভালোবাসার যে ক্ষুদ্রতম ক্ষণ—চকিততম অনুভব—এবং কখনো তাহারই আশায়, কখনো তাহারই স্মৃতিতে

আমার যে একবিন্দু চোখের জল, একটি ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস,—ইহাকে আমি চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাই। প্রাণের তথা প্রেমের এই আকুতি কি উন্মাদের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে হয় না? কারণ, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি—প্রেমের অনুভূতি, ইহাইতো সংসারের স্বভাবতঃ অনিত্য বস্তুসমূহের মেলায় অনিত্যতম, ইহার আশ্রয়স্বরূপ ক্ষণটির জ্যামিতিক বিন্দুর মত অস্তিত্ব আছে অথচ আয়তন নাই। কবিপ্রতিভা বলে, না তাহা নয়। বাহিরের দিকে খুঁজিলে অমরতা নাই; অমরতা যদি থাকে তাহা ভিতরেই আছে—তাহা অন্তরের অন্তরতম অনুভূতিতে, তীব্রতম বেদনায়, অহংবিস্মৃত সুখে, চকিততম নিমেষে। সৌন্দর্য্য অমর, প্রেম অমর; কারণ, জড় উপাদানে অলক্ষ্যসুন্দর চরণদু'টি রাখিলেও তাহারা জড়দেহের একান্ত অতীত। মানুষের প্রাণে প্রাণে সৌন্দর্য্যের বা প্রেমের অনুভবে নিমেষের মধ্যে কালের কী একটা রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া কে আমাদের কালের অতীতে লইয়া যায়; সেই অনুভূতির তীব্রতায় সেই নিমেষটির ভিতরে আমরা বুঝিতে পারি যে, যদিও দেশকালের মধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তবুও দেশকালের বাহিরে আমাদের একটা মুক্ত স্বপ্রকাশ আনন্দময় অস্তিত্ব আছে। কবি-প্রতিভা বলে, বাহ্যজগতে অমরতা নাই, কেবল জড় উপাদানে 'আনন্দরূপমমৃতম্' সৃষ্টি করা সম্ভব নয়; তবুও অন্তরে যদি একবার সৌন্দর্য্যের প্রেরণায় বা প্রেমের বেদনায় আনন্দময় অমৃত সত্ত্বাকে অনুভব করিয়া থাকো তবে তাহাই স্মরণ করিয়া, এমন ইন্দ্রজাল আমি জানি, জড়ের ভূমিকাতেও এমন কিছু আমি সৃষ্টি করিব—সকল লোকের মাঝাতে সেই আনন্দময়ং অমৃত সত্ত্বাকে মনে পড়িবে, যাহাকে সেই 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলিয়া বোধ হইবে। তাই, আর সকল জিনিষ যখন ধূলায় মিশাইবে বা যুগান্তের অন্ধকারে মিলাইবে, তখনও মানুষের আগ্রহ—মানুষের আকাঙ্ক্ষা ইহাকে ধূলা হইতে দিবে না এবং ইহার চারিদিকে ইহাকে ঘিরিয়া নিখিল মানবহৃদয়ের এমনই নিত্য দীপালি-উৎসব চলিবে যে, সে আর এক দিবা।

নশ্বর জীবনের হর্ষবেদনাময় ও প্রেমময় সৌন্দর্য্যমুহূর্ত্ত ও অহংবিস্মৃত ক্ষণগুলিকে কবি-প্রতিভা কী উপায়ে অনশ্বর করিয়া থাকে; ঋতুর পর ঋতুর পুষ্পমঞ্জরীতো ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া ঝরিয়া যায়, হাসিও ফুরায়, কোনো বিচ্ছেদ-ক্রন্দনও চিরদিনের নয়, তবুও কী উপায়ে প্রিয়-মুখের সেই অস্থির হাসি—প্রিয়চক্ষের সেই অস্থির মৌক্তিক বর্ষণ—জোৎস্না রাত্রে নিভৃত মন্দিরে প্রিয়জনের কানে কানে সেই প্রিয় নামে সম্বোধন—সেই প্রেমসুরে কথায় রেখায় রঙ্গে এমন কি পাষাণে, যে পাষাণ বাষ্পময়—যে পাষাণ পুষ্পিত—যে পাষাণের ভার নাই—সেইরূপ পাষাণে চিরদিনের ধন বলিয়া এই ভূতীর্থে জীবনমৃত্যুর সঙ্গমস্থলে উৎসর্গ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ শা'জাহান কবিতার প্রথমাংশে তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, চির-অনিত্যের প্রবাহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আনন্দ বা প্রেম শিল্পমূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যের ভাষায় আপনাকে আপনি অমর করিয়া যায়; বণিকের বাণিজ্য ব্যাপার ফুরায়, রাজার রাজপাট বন্ধীকে আচ্ছন্ন হয়; অগণ্য মানবের জীবনমৃত্যু বালু-লেখের ন্যায় মুছিয়া যায়, কিন্তু, ইহা যায় না। ইহা কালকে অতিক্রম করিয়া—জন্মমৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আপনার বাণী বহিয়া অভীষ্টের পানে অভিসার করে:—যেখানে সে মিশিয়া আছে প্রভাত-সন্ধ্যার প্রকাশে—রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়—সীমাহীন বিশ্বসংসারে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসগন্ধের ইসারায় ইঙ্গিতে প্রতিনিয়ত যে মায়া বা মরীচিকা সৃষ্টি করে তাহার পারে—দৃষ্টি ও শ্রুতির বাহিরে; সে বলে, আজিও যে ভালোবাসি, এখনও ভুলি নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনুভব—রবীন্দ্রনাথের কাব্যোচ্ছ্বাস এই পর্য্যন্ত আসিয়া ক্ষণকালের জন্য বিরত হইয়াছে। অন্য অনেক কবিই ইহার বেশী আর অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সামান্য কবি নহেন, তিনি যে মহাকবি। এ পর্য্যন্ত তিনি যাহা অনুভব করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব ভাষার ইন্দ্রজালে যে ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অলৌকিক; কিন্তু ইহারও পর তিনি যাহা অনুভব করিলেন ও প্রকাশ

করিলেন তাহা অলৌকিকতর। কালের কপোলে একবিন্দু নয়ন জলের ন্যায় তাজমহল বিরাজ করিতেছে, মর্ম্মর বিরচিত নব মেঘদূতের ন্যায় অবিস্মরণ প্রেমের গান গাহিতেছে; তাহার সেই শোভা দেখিতে দেখিতে ও সেই গান শুনিতে শুনিতে যে রাজকবির অন্তর হইতে তাহা বাহিরে আসিয়াছে আমাদের তাহাকেই মনে পড়ে, এবং ইহার বাণীতেই তাহার চিরদিনের বাণী রহিয়াছে এই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ইহা ভুল। মানবের আত্মা সংসারী নয়, সুতরাং সে জড় সামগ্রী সঞ্চয় করে না। তাহার কাছে গর্ব্ব-গরিমার কোনো অর্থ হয় না, সুতরাং তাহার অতীতের সংগ্রামেতিহাস? শক্তির সাক্ষ্য, সে সবও সে অবহেলে লুপ্ত হইতে দেয়। মানবাত্মা প্রেমিক বটে; সুতরাং এই মর্ত্ত্যসরণীতে সে যে কোনো ধূলি-কণাটিকে, কোনো ক্ষণটিকে স্বকীয় মধুসিঞ্চনে ধন্য করিয়া ভালোবাসিতে পারে। কিন্তু, মানবাত্মার চরম পরিচয় এই যে, সে পথিক, মুক্তিই তাহার স্বভাব। সংসারের ধূলা, সাম্রাজ্যের আবর্জ্জনা, সে সব তো সে দিনের শেষে সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঝাড়িয়াই ফেলিয়াছে; এমন কি পৃথিবীর যেখানে যেখানে সে তাহার প্রেমের স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়াছে সেখানেও ঘর বাঁধিয়া বসিয়া নাই। মানবাত্মার শেষ পরিচয় পথিক বলিয়াই যে-জীবনে তাহার প্রকাশ, সে-জীবন অস্থির; তাই প্রেমেরও শেষ পরিচয় মুক্তিতে। জীবনের ধারা—কালের ধারা ধরিয়া,……না, তাহাদের পথ দেখাইয়া নিত্যবহমান্ নিত্যবর্ত্তমানের সহিত এক হইয়া, এই প্রেম অনাদি হইতে অনন্তে চলিয়াছে। উপনিষৎ যেমন বলিয়াছেন, ত্যাগের দ্বারাই তাহার ভোগ, আপনাকে মোচন করিয়াই আপনার প্রকাশ; যখনই ইহার অন্যথা হয় তখনই প্রেম আর প্রেম থাকে না, তাহা হয় অন্য কিছু—বাসনা বা আসক্তি, জড়ত্ব বা অবসাদ। এই রুদ্ধ জীবন ও মুগ্ধ বাসনা হয় একই ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে; নয়-তো একই সহমরণে ভস্মে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। কিন্তু, যে-প্রেম মুক্তি পায় ও মুক্তি দেয়, যাহাতে অনুরাগ আছে—বাসনা বা আসক্তি নাই, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বুঝা যায় আত্মাই আত্মাকে ভালোবাসিতে পারে, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে নয়, সে-ই লোক-লোকান্তরে জীবন-জীবনান্তরে মানবাত্মার যাত্রাপথের এবং আত্মোৎস্বজনের সিদ্ধ মন্ত্র।

এখানে একটি সংশয়ের কথা এই মনে উদিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ভাবাবেগে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন পরে কি তাহারই প্রতিবাদ! ঠিক প্রতিবাদ বলা চলে না। পরে তাহার সংশোধন হইয়াছে! অথবা ঠিক তাহাও নয়; কুঁড়ি ফাটিয়া যেমন ফুল হাসিয়াছিল, ফুল ঝরিয়া তেমনি ফল দেখা গিয়াছে। অথবা বলিতে পারি, যমুনা প্রবাহে যেন গঙ্গা আসিয়া মিশিয়াছে—বহিয়া চলিয়াছে সাগরের অভিমুখে।

আমাদের আলোচনার সার মর্ম্ম হইল এই:—সংসারে সবই চলিয়া যায়, ভিক্ষুকও যায়, সম্রাটও যায়, রাজপাট যায়, বাণিজ্যপাট যায়, সকল সুখদুঃখ সলিল-লিখন মাত্র। এই নিত্যকালীন অনিত্যতার মাঝখানে মানুষ ভালোবাসে এবং তাহার ভালোবাসার চঞ্চল অশ্রু-হাসি হর্ষশোক আশান্বিতি অনুভব অর্থাৎ তাহার ভালোবাসাই অমর করিয়া রাখিতে চায়। শিল্পসৌন্দর্য্যের ভাষাতেই তাহা অমর হয়। কালের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেন বা কালের অতীতে এই বাণী বহন করে, ভুলি নাই ভুলি নাই। কিন্তু, তবুও ভুলিতে হয়। শিল্প-সৃষ্টিকে যেঅবিস্মরণ মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাই সে চিরদিন জপ করিতে থাকুক, বিচ্ছেদকে মৃত্যুকে অতি সুন্দর করিয়া ঢাকিয়া রাখুক;—আত্মা শুক পাখীর মত একই কথার পৌনঃপুনিক আবৃত্তি করিতে থাকে না; জীবন কবরের মাটীতে চাপা দেওয়া যায় না। মানবের আত্ম প্রেমিক ও পথিক। তাই মানবাত্মার যোগী যে-প্রেম তাহা মুক্তি হইতে পৃথক নয়। সে প্রেম বা সে মুক্তি দেশকালপাত্রের বন্ধন হইতে কেবলই আপন ও পরকে মুক্ত করে—কেবলই সম্মুখে চলে। অন্য 'প্রেম', অন্য 'প্রেমের বাণী,' অন্য 'প্রেমাস্পদ' পিছনে পড়িয়া থাকে।

মানবমন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যেমন বিরোধ কল্পনা করে, প্রেম ও মুক্তির মধ্যেও তেমনি সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে না। কিন্তু, কবি বা ঋষির দৃষ্টিতে মৃত্যুও যেমন নব নব জীবনের নূতন নূতন দ্বার বলিয়া প্রতিভাত হয়, সুতরাং বিরোধ থাকে না, প্রেমও তেমনি আনন্দের বলে বিশিষ্ট দেশকালপাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে প্রেম ও মুক্তি এক জিনিষ হইয়া উঠে। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে এই কথাই আছে যে পুত্র বলিয়া পুত্র কিছু প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই পুত্র প্রিয়; পত্নী বলিয়া পত্নী কিছু প্রিয় নয়, আত্মা বলিয়াই পত্নী প্রিয়; ইত্যাদি। আত্মা আত্মাকেই ভালোবাসে বিচিত্র লীলায়। লীলার জন্য প্রতিপদে বিশেষ দেশকাল, বিশেষ পাত্রপাত্রী আবশ্যক হয় বটে; কিন্তু, চরম উপলব্ধিতে জানা যায় যে তাহার মধ্যে আত্মা কখনই বন্দী নয়।

—:০:—

অধ্যাপকের উক্তি

(জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

পুঞ্জে পুঞ্জে ফোটে চেরিফুল সুমিদা নদীর তীরে,
হেরিবে সেথায় কাঞ্জল-নয়না অগণনা তরুণীরে।
দলে দলে তারা হাসিভরা মুখে সেথা আসি' জড় হয়,
চেরি মুকুলেরা হেরিয়া তাদেরে লাজে অধোমুখী রয়।
হও সাবধান যুবকবৃন্দ, নীল সুমিদার কূলে
যেওনা যেওনা যবে সে সিকতা ভরে যায় চেরিফুলে।

হেমন্ত সাঁঝে জোছনায় যবে ঢেউগুলি হয় সোণা,
সুমিদা-পুলিনে হেরিবে তখন রূপসীর আনাগোনা।
তুষারের চেয়ে চাঁদের চেয়েও সুকুমার মনলোভা
হেরিবে তাদের অমল ধবল অম্লান মুখশোভা।
শোন মোর কথা, পুঁথি হাতে নিয়ে ঘরে থিল্
দিয়া থাক',
জ্যোৎস্না নিশীথে সুমিদার কূলে কভু কেহ
যেওনা ক'।

বহু সংযমে না পড়িয়া ধরা মোহিনীর মায়াজালে
জ্ঞানী গুণী যত খ্যাতি ও বিদ্যা অর্জ্জিত পুরাকালে।
ভেবেছ কি মনে প্রচুর সময় আছে তোমাদের হাতে,
জোছনা ও ফুলে হ'তে মসগুল্ মধু পূর্ণিমা রাতে?
নয় কভু নয়! সাধুজনোচিত বন্ধুর পথ ধরি'
চল যদি তবে হবে কৃতার্থ জয়শ্রী লাভ করি।'

তিরিশ বছর ছাত্রগণের করেছি অধ্যাপনা,
ক্ষীণ হ'ল আঁখি পরখি' তাদের পাঠ ও গবেষণা।
রয়েছে নজরে জ্ঞানের আলোক পেল তারা কতখানি,
দুর্গম পথে কে চলিল কত, পড়িল কে, তাহা জানি।
তাদের প্রগতি উচ্চাভিলাষ মোর অগোচরে নয়,
দেখেছি চাঁদে ও চেরিতে তাদের কী যে দুর্গতি হয়!

আজুমি রাইও সাই

—অনুবাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

—:০:—

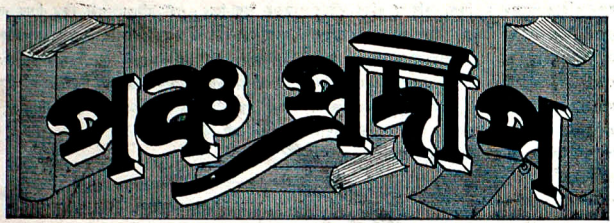

জনমত

এড্‌ওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগ

কিছুদিন হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় কলা ও শিল্পের (Arts and Crafts) পুনরুদ্বোধনের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। এই ধুয়া আমরা সকলেই শুনিয়াছি। কিন্তু এতদিন পরে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—সেই পুনরুজ্জীবিত কলা ও শিল্প কোথায়?

অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাই অত্যন্ত বিশ্রীভাবে, ভাল ও মন্দের অপরূপ সংমিশ্রণের মধ্যে এই কলা ও শিল্প ডুবিয়া আছে। যাঁহারা কলা ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টায় প্রকারান্তরে ধরণী ও ধরণীবাসী মানবের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফলই আজ উন্নতির পথে বিপুল বাধার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের লজ্জা দিতেছে।

এই অদ্ভুত পরিণতি কিরূপে হইল?

এই উন্নতিচেষ্টার ফলে মানব চরিত্রের যে তিলমাত্রও উন্নতি হইল না, তাহার কারণ কি?

একখানি পুস্তকের প্রচ্ছদপট হইতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি।

প্রচ্ছদপটের ছবিটি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটি মুখ। নিম্নে লিখিত আছে:—

"হে কৃষ্ণ তোমাকে আমরা খেলার সাথী মনে করিয়া আমাদের নিকট হইতে যে পূজা তোমার প্রাপ্য তাহা দিই নাই, সেই জন্যই কি তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছ?"

"কতদিন আমরা তোমার সহিত খেলা করিতে করিতে তোমার সহিত কলহ করিয়াছি এবং তোমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়াছি। সেইজন্যই কি অভিমানভরে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়াছ?"

"তোমাকে আমরা কাঁধে করিয়াছি, অনেক সময়ে তোমার স্কন্ধেও আমরা আরোহণ করিয়াছি, এমন কি তোমাকে মারিয়াছি। অনেক সময়ে তোমাকে সমজ্ঞান করিয়া নিজেরা আগে খাইয়া বাকী খাদ্যাংশ তোমাকে দিয়াছি। হে প্রিয়তম কৃষ্ণ, আমাদের সেই অপরাধের জন্যই কি তুমি আমাদের ত্যাগ করিলে?"

ভারতের একটি পুরাতন নাটকে গোপবালকদের খেদোক্তির ইহাই ধুয়া।

কৃষ্ণ হইতেছেন গোপবালক—নর-দেবতা। এই ক্ষিতি এবং আকাশও তিনি—অর্থাৎ তিনি পূর্ণাদর্শ।

কৃষ্ণের মূর্ত্তির অর্থাৎ আদর্শের এই ছবি হইতেই আমরা আমাদের উত্তর পাই। ছবিটি নিজে কিছু বলে না কিন্তু এই ছবি দেখিয়াই সরল বালকদের অন্তরের ভয় ও দুশ্চিন্তা সত্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

আদর্শের সহিত, ভগবানের সহিত বিরোধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

ভগবানকে সাথী মনে করা, প্রথমে তাঁহার ভোগ না দিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করা, অথবা "কি হে ভায়া কেমন আছ"—ইত্যাদি সমপর্য্যায়ের ভাষণ দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা নষ্ট করা—কোনো-মতেই উচিত নহে।

ইহা মূর্খতার চূড়ান্ত, ইহা অক্ষমণীয় অপরাধ।

ইউরোপ ও আমেরিকায় কলা ও শিল্পের পুনরুদ্বোধনের নাম করিয়া আমরা আমাদের কৃষ্ণকে মোটরে করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া গিয়াছি।

ইহার চেয়ে পাগলামী আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা জঘন্য স্বপ্ন কি মানুষ কল্পনাও করিতে পারে।

জামাকাপড়ের ন্যায় আমরা কলাকে গায়ে দেই, এবং আসবাব-পত্রের ন্যায় শিল্পকে ব্যবহার করি। তাহার পর তাহাদের দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে গিয়া জীবনের যত কিছু আদর্শ আছে সবেতেই আমাদের অবিশ্বাস ঘোষণা করি। আমাদের ভগবান কৃষ্ণে অবিশ্বাস (অবশ্য নামে কিছু আসে যায় না, আমাদের একমাত্র ভগবানের অন্য নামও দিতে পারি)।

যেহেতু আমরা নেতারা—অর্থাৎ শ্রেণী হিসাবে সমস্ত শিল্পীরা—এইরূপ আচরণ করি, যেহেতু আমাদের বড় বড় শিল্পীরা এবং বিখ্যাত লোকেরা এবং আমাদের মধ্যে অধিকাংশ জননায়কই ভগবান ও তাঁহার নিয়ম সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত, যেহেতু আমরা আমাদের দুর্ব্বলতায় নামিয়া আসিয়া রাস্তার লোকের (Mod) সহিত মাখামাখি করিয়াছি, সেই হেতুই রাস্তার লোকও দিনের পর দিন দেহে ও বুদ্ধিতে স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া এরূপ একটা জঘন্য ও ঘৃণ্য ঔদ্ধত্যলাভ করিয়াছে যে, সে আজ সকল বিষয়েই নিজের মতামত জানাইতে সাহস করে এবং তাহার নাম দিয়াছে—

জনমত।

এইরূপ জনমত এবং এই জনমতের প্রাধান্যকে ধিক্, শত ধিক!

কৃষ্ণের মুখে যে অভিজাত অহঙ্কারের দীপ্তি দেখিয়াছি, সমস্ত মহাপুরুষের মুখে যাহার আভা প্রতিফলিত এবং রাস্তার জনতা, থিয়েটারের জনতা, বৈঠকখানার জনতা, সু-বেশী ও কু-বেশী জনতা যে অহঙ্কারকে ঘৃণা করে—আমি সেই অভিজাত অহঙ্কারকে পুনরায় আবাহন করি।

সেই ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য—যাহা জানে যে, একজনের সত্য বিচার-বুদ্ধিকে বহুজনে মানিয়া চলিলে তাহা "বহুজন সুখায়" হয়,—সেই ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যের আমি পুনরাবাহন করি।

ভারতের সমস্ত শিল্পকলা এই শক্তিমান অভিজাত অন্তর হইতে নিঃসৃত সৌন্দর্য্য ও সঙ্গতির সাক্ষ্য দিতেছে।

ভারতের কলায়, ভারতের শিল্পে,—সে ব্রোন্‌জের মূর্ত্তি, কাঠের বাক্স, বা পশমের শালই হউক—প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সঙ্গতিপ্রীতি আসিয়াছিল শিল্পীদের গুরুর প্রতি একান্ত নিষ্ঠার ফলে এবং সেই গুরুরাও তাঁহাদের শিষ্যদের অন্তরে ইহা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন, আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার ফলে।

বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধূলি সমস্তই ব্যর্থ! লণ্ডন, ভিয়েনা, প্যারিস্, নিউইয়র্ক সর্ব্বত্রই দেখিবে এই দুর্ব্বল ও স্বার্থপর মূর্খের দল সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তর্ক করিয়া চলিয়াছে—

"জগতে গলদ্ কোথায়"?

জগতে কোথাও গলদ্ নাই, গলদ্ যাহা কিছু তাহা তাহাদের নিজেদের মধ্যেই।

যখন আমি ইহা লিখিতেছি, তখনও যেন গভীর রাত্রির নিযুপ্ত জ্যোৎস্নার মধ্য হইতে চাঁদের দিকে চাহিয়া কুকুরের ডাকের মত শুনিতেছি অনবরত যেন একটা ধ্বনি পৃথিবী হইতে উঠিতেছে:

"এই জগতের গলদ্ কোথায়, গলদ্ কোথায়?"

ইহার একমাত্র উত্তর—হে প্রশ্নকারী, গলদ্ আর কোথাও নাই, কেবল তোমার নিজের মধ্যে।

আদর্শ অনুসরণ কর, ভদ্রতা শিক্ষা কর, সব কিছুকেই মুখ-ভ্যাংচানির অভ্যাস ত্যাগ কর, নিজের ভাষা ঠিকরূপে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা কর, বানরের মত চারি হাত পায়ে না চলিয়া রাস্তা দিয়া সোজা হইয়া মানুষের মত হাঁটিতে চেষ্টা কর; এইরূপ যদি করিতে পার তাহা হইলে তখন জানিতে পারিবে যে, তুমি জন-সাধারণের একজন হইলেও তোমার মতই "জনমত" আখ্যা পাইবার যোগ্য নহে।

যখন এইভাবে সুসঙ্গত ভদ্রভাবে নিজেকে অভ্যস্ত করিতে পারিবে, এবং এই পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়বোধও তোমার মনে জাগিবে, একমাত্র তখনই কৃষ্ণের ভাব-গম্ভীর মুখ তোমার নয়নগোচর হইবে। সেইদিন তুমি উপলব্ধি করিবে তুমি কতই নগণ্য এবং তিনি কত শক্তিমান ও দুরধিগম্য।

যেদিন, তোমার অন্তরে এই উপলব্ধি জাগ্রত হইবে, সেইদিনই হইবে কলা ও শিল্পের সত্যকার পুনরভ্যুত্থান; রাজ্য ও ধর্ম্মসমূহ (States and Religions) সেদিন নবরূপ পরিগ্রহ করিবে, মানবসমাজ পুনরায় আনন্দরসে সঞ্জীবিত হইবে। সুখী হইতে হইলে অজ্ঞেয়কে সম্মান করিতে হইবে এবং জগতের তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা সকলেই যাঁহার গোচরীভূত তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

বিশ্বমাতৃকার অনেক বাহু—কিন্তু তাঁহার দুইটি কুসুম কোমল অথচ বজ্রকঠোর হস্তে তিনি তাঁহার লোকোত্তর সন্তানকে রক্ষা করেন—যাহার অন্তরে তিনি তাঁহার অগ্নিময়ী সত্ত্বার কিয়দংশ দান করিয়াছেন।

সেই লোকোত্তর শিল্পগুরুর মর্য্যাদা আমরা যেন চিরদিন রক্ষা করিতে পারি।*

---

* Edward Gordon Craigএর The Theatre Advancing পুস্তকের Public opinion পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ

—অনুবাদক শ্রীসুবোধ রায়

হস্তলিপি অনুশীলন ও চরিত্র নির্ণয়

শ্রীরণজিত সান্যাল

মনোবিজ্ঞান কি বলে জানি না, তবে মানুষের মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হস্তাক্ষর অনুশীলনপটু (spontaneous graphologist) একথা অস্বীকার করা যায় না; এবং মানবমনের এই সহজাত বৃত্তি মনোবিজ্ঞান রাজ্যে এক বিশেষ অধ্যায় অধিকার করতে সক্ষম। ইংরাজিতে Physiognomy নামক একটি বিষয় আছে, যা'র অর্থ মানুষের মুখের ভাবের সাহায্যে চরিত্র নির্ণয় বিদ্যা। এ'র সাথে 'গ্রাফোলজী' অর্থাৎ হস্তলিপি অনুশীলন পন্থার যোগাযোগ আছে,—অবশ্য হস্তাক্ষর অনুশীলন রীতি Physiognomy অপেক্ষাও দৃঢ় যুক্তি এবং মতবাদের উপর ভিত্তিবান বলে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর মূল্যবান।

মানুষের হাতের লেখার সাথে চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য রয়েছে। হস্তাক্ষর অনুশীলন মানুষের সহজাত বলেই অনেক সময়ে আমরা হাতের লেখা লক্ষ্য করে থাকি এবং সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির চরিত্র এবং স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণার আভাস করে নিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে 'গ্রাফোলজী' চর্চ্চার সাহায্যে মানুষের চরিত্রের এবং অন্তরের গূঢ় রহস্য পর্য্যন্ত আবরণমুক্ত হতে পারে। অভিনয়বৃত্তি মানুষেরই এক শক্তির পরিচয় দেয়, আন্তরিক ক্রিয়াশীল ক্ষণস্থায়ী বাক প্রণালী এবং হাবভাবের সাহায্যে অন্তরের রহস্যপ্রকাশ সহজসাধ্য কিন্তু হাতের লেখা কালির আঁচড়ের সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ হওয়া দুঃসাধ্য।

প্রবন্ধের বিষয়ের বিরুদ্ধেও কতকগুলি যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে,—প্রধানতম যুক্তি পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক এবং মনের সাথে মানুষের হাতের লেখারও পরিবর্ত্তন হয়! এই যুক্তিটি এই বিষয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র নির্দ্দোষ যুক্তি। হাতের লেখা কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের নির্দ্দেশের জন্য মূল্যবান-নয়, অনেকক্ষেত্রে লিঙ্গ, জাতীয়তা সম্বন্ধে একটা আভাস দিতে সক্ষম। এদিক দিয়ে বিচার করলেও 'গ্রাফোলজী' এবং 'ফিসিওনমী'র মধ্যে তুল্যতা আছে। 'গ্রাফোলজী'র সাহায্যে অনায়াসে বলা সম্ভবপর হয়েছে 'ফরাসীরা অতি মিতব্যয়ী এবং সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলাকামী। ইটালীয়ানরা অতি সূক্ষ্ম বিচার অনুভূতি সম্পন্ন এবং আমেরিকানরা বাস্তবের উপাসক; এদের সুখপাঠ্য মুক্তাক্ষর এবং অত্যধিক কালির আঁচড় এই পরিচয় প্রকাশ করতে চায়; ফরাসীদের পরিচয় ব্যক্ত হয় তাদের অতিরঞ্জিত ঢেউ খেলান লেখার সাহায্যে।

'গ্রাফোলজী'র উদ্ভব সম্বন্ধে নানাদেশে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। Your Signature নামক বইয়ের গ্রন্থকর্ত্তা Lt—Col, H. A. Newell, F. R. G. S. তাঁ'র এক গ্রন্থে 'গ্রাফোলজী'র উদ্ভব প্রসঙ্গে লিখেছেন—Astute as the ancient were, it did not, apparently, occur to them to trace the affinity, which undeniably exists between personality and handwriting. এ সম্বন্ধে মৌলিক এবং মূল্যবান তথ্যের নির্দ্দেশ দিয়াছেন—Goethe, Lavator, লর্ড বেকন প্রভৃতি। সম্ভবতঃ এই বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম যাঁর মনে কৌতূহল জাগে তাঁর নাম—Suetonius। তিনি সম্রাট অগাষ্টাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তাঁর বিষয় আমার সর্ব্বপ্রথম এইটাই চোখে পড়ে যে সম্রাটের লেখার অক্ষরগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং তিনি লেখা'র চারদিকে একটা রেখা টেনে দেন"—।

কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত—পৃথিবীতে ভাষা এবং সাহিত্য ও অক্ষর বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না; ইতিহাসেও এ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দেশ নেই। পরাক্রান্ত রোমান সম্রাট অগাষ্টাসে'র মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত অরাজকতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রাবল্যে কোনও ভাষা বা সাহিত্য স্থায়ী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়েছিল। গ্রাফোলজী'র ইতিহাসে যাঁর নাম চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে তিনি—"বাল্‌ডো"—। পঞ্চদশ শতাব্দীর এই ইটালীয়ানের থিয়োরী অনুগমন করে "প্রিট্রাস—ভিলিয়াস" নামক একজন প্রতিভাবান ছাত্র 'বাল্‌ডো' রচিত একটি মূল্যবান বই ল্যাটিন ভাষাতে রূপান্তরিত করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

হস্তলিপি অনুশীলন সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত আছে। 'লীবনিট্‌স' নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেন যে 'মানুষ সম্মুখস্থিত পাতা'র উপর কলমের প্রতিটি আঁচড়ের সাথে তা'র চরিত্র ব্যক্ত করতে প্রয়াস পায়'। 'ডকট্রিন্ অব্ মরিবাস' নামক বইয়ের লেখক লিখেছেন—'হস্তলিপিতে বিশেষ রকম কৃতকার্য্য এবং পারদর্শী না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ সর্ব্বদাই তা'র হাতের লেখায় যে কোনও উপায়ে মনোভাব ব্যক্ত করতে চায়।' ব্যবহারিক হস্তলিপিবিশারদ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম হার্‌হেন্‌স; এই জার্‌মান বিশেষজ্ঞের সর্ব্বাপেক্ষা সারবান মত—"brevity is the soul of wit"। এই বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে—Abbe Michon লিখিত The System of Graphology নামক গ্রন্থটি। হস্তাক্ষর অনুশীলনের পূর্ব্বে প্রথমে বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির হাতের সই নিয়ে অভ্যাস করলে শিক্ষাবিষয় সহজ হয়ে

আসে। এই বিষয় শিক্ষাকালে আমাদের সর্ব্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের সই এবং হস্তলিপি বিশেষ মূল্যবান।

মানুষের চরিত্র-নির্ণয়ের অবধারিত পন্থা হিসাবে গ্রাফোলজী'র চর্চ্চা ইয়ুরোপে বিশেষভাবে হচ্ছে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মনোবিজ্ঞান এবং ফিসিওনমী'র প্রদর্শক (Index) হিসাবে এবং পৃথকভাবে শিক্ষা করলে ফলবান হবে।*

* এই প্রবন্ধ রচনাকালে Lt—Col, H. A. Newell. F. R. G. S. (Indian Army) প্রণীত Your Signature নামক বই হতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছি। (লেখক)

—:০:—

মানস-স্বর্গ

শ্রীদীনেন্দু সুন্দর দাস

অন্য মেয়ের মতন সে-তো
দেখতে ভালো নয়।

আমার পানে চাইলে তবু
পরাণ ভ'রে রয়॥

রূপের ছটা নাইবা র'ল
রসের আভাস আছে।

পরশ-কাতর এ-মোর হিয়া
তারই মিলন যাচে॥

দৃষ্টি তাহার মিষ্টি-মধুর;
স্নিগ্ধ-সরল হাসি।

পরাণ-প্রদীপ জ্বাল্‌তে পারে
সকল কালো নাশি'॥

বুকের মধু উথ্‌লে উঠে
কপোল রাঙা হয়!

একটি কথাও না ক'য়ে সে
কত কথাই কয়!

গালের গোলাপ নাই বা র'ল
অপ্‌রাজিতাই ভালো!

অরূপ রূপে এ-মোর জগৎ
নিত্যুই হবে আলো॥

কুণ্ঠিতা সে অনিন্দিতা
বরণ যদি করে,

চটুল হাসির লহর-রাশি
রইবে দূরে প'ড়ে॥

রইবে প'ড়ে রূপের জগৎ
ভোগের মোহে ভরা।

ত্যাগের আলোয় উদ্ভাসিত
গড়ব নূতন ধরা॥

সাথী হবে ধরার মেয়ে
স্বর্গ-গড়ার কাজে।

বিশ্বাতীত রূপের আশিস্
পড়বে মোদের মাঝে॥

অনাহত গানের সুরে
উদার আকাশ ভরি'

হাওয়ার স্রোতে ভাসিয়ে দেব
মোদের জীবন-তরী॥

জগৎ-লীলার যে-পুলকে
মগ্ন পরম-পিতা

তারি কণা পা'ব না কি
আমরা দু'টি মিতা?

—:*:—

সাহিত্যিকা

(পুস্তক সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক প্রেরিতব্য)

মা—শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস্, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

এখানি শ্রীঅরবিন্দের "Mother" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের "Mother" পুস্তকখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন এই পুস্তকখানির মধ্যে জীবনকে ভাগবতমুখী করিবার অমূল্য নির্দ্দেশ আছে। এই পুস্তকখানিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের প্রথম ও প্রধান কথা বিশ্ব-জননী ভগবতীর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের পথে বাধা বিঘ্ন কি এবং কিরূপে এই আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইতে পারে, "Mother"এর প্রথম অংশে তাহারই নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এবং ইহার দ্বিতীয় অংশে আছে "মায়ের চারিটি শক্তি তাঁর চারিটি প্রধান ব্যক্তরূপ"—মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী—সম্বন্ধে সুগভীর ও অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ এবং তাঁহাদের স্বরূপবর্ণন।

যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, মাতৃভাষাই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহাদের জন্য এই অমূল্য "Mother" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত গুপ্ত বঙ্গভাষাভাষী ও বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় স্বয়ং পণ্ডিত এবং বহুদিন হইতে শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থানুসারী। সেই জন্য তাঁহার অনুবাদে মূল পুস্তকের সুর ও প্রতিভাস যতটা ধরা পড়িয়াছে, এরূপ আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। ভাষার মাধুর্য্য ও গভীর ব্যঞ্জনা কত তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যাইবে :—

"তোমার আন্তরিকতা, তোমার সমর্পণ হ'ক সত্যময় ও সম্পূর্ণ। আপনাকে যদি দিতে হয় তবে দিয়ে দাও নিঃশেষে কোন দাবী, কোন সর্ত্ত, কোন কুণ্ঠা না রেখে, যাতে তোমার মধ্যে সবই মায়ের জিনিষ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, অহঙ্কারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে।

তোমার শ্রদ্ধা, তোমার আন্তরিকতা, তোমার সমর্পণ যতই পূর্ণতর হ'য়ে উঠ্‌বে, মায়ের করুণা ও অভয় ততই তোমাকে ঘিরে রাখ্‌বে। আর মা ভগবতীর করুণা ও অভয়ের মধ্যে তুমি যখন, তখন কি এমন আছে যা' তোমাকে স্পর্শ ক'রতে পারে, আর কাকেই বা তুমি ভয় ক'রবে? ঐ পদার্থের স্বল্পও তোমাকে সকল বাধা বিপত্তি সঙ্কট পার ক'রে দেবে। তাঁর আশ্রয় যদি তোমাকে আবৃত ক'রে রাখে তবে নিরাপদে তুমি তোমার পথে চ'লে যেতে পারবে; কারণ সে পথ মায়েরই। এ জগতের হ'ক আর অদৃশ্য জগতের হ'ক, কোন বৈরিতা তোমাকে স্পর্শ ক'রতে পারবে না, কোন বিভীষিকাই তোমার কিছুমাত্র চিন্তার কারণ হ'তে পারে না। এ বস্তুটির স্পর্শে সঙ্কট সুযোগে পরিণত হয়, ব্যর্থতা সার্থকতায়, দুর্ব্বলতা অমোঘ সামর্থ্যে পরিবর্ত্তিত হয়। মা ভগবতীর অনুকম্পা হ'ল পরমেশ্বরের অনুমতি—এখন হ'ক আর পরে হ'ক, তার ফল নিশ্চিত—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট, অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য"

"মা" পুস্তকখানিকে বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশিষ্ট সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুস্তকখানির বহিরবয়ব কাগজ ছাপা ও বাঁধাই—অনবদ্য।

মহাভারতের রহস্য—(প্রথম ভাগ) শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল, আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত) প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ-মঠ পুরুলিয়া। মূল্য ॥০ আট আনা।

লেফ্‌টনেণ্ট কর্ণেল শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা ও মৌলিক চিন্তাশীলতার কথা বাঙ্গলার পাঠক সমাজে সুবিদিত। প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অচেতন বাঙ্গালীজাতিকে সচেতন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ"? তখন তাঁহাকে Alarmist বলিয়া অনেকেই বিদ্রূপাত্মক

ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কিন্তু কালে প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার দূরদৃষ্টি সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁহার দুই খণ্ড পুস্তক "হিন্দু জাতি ও শিক্ষা" শিক্ষার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বহুদিন পরে তিনি আবার এই "মহাভারতের রহস্য" প্রকাশিত করিলেন। ইহাতে যথারীতি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ 'কি? ব্যাসদেব ও মহাভারত, মহাভারতের নাম ও রচনা, মহাভারতের গল্প, দ্যুতক্রীড়া, নলোপাখ্যান, নারদ ও কৃষ্ণ'—এই কয়টি পরিচ্ছেদে আছে। মহাভারতের বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার মধ্যে কতটা সত্য ও কতটা কাল্পনিক। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র শেখর বসু ও অন্যান্য পুরাণবেত্তাদের মতের বিপরীত মত এই পুস্তকে হয়তো আছে এবং বহু পাঠকই হয়তো লেখকের মতের সহিত একমত হইতে পারিবেন না—তবু লেখকের বিচার, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ভঙ্গি প্রশংসনীয়।

—পৌরাণিক

রাশিয়া ভ্রমণ—শ্রীনিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

জীবন ও রাষ্ট্র লইয়া গত ষোল বৎসর ধরিয়া রাশিয়া যে বিরাট পরীক্ষা (Experiment) চালাইতেছে, সারা জগৎ সে দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা, বাণিজ্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা, নাগরিক জীবনের উন্নতি, ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—এই সকল ব্যাপারে রাশিয়া যে উন্নতি করিয়াছে তাহাতে নিন্দকরা যাহাই বলুক, সে পরীক্ষা যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু রাশিয়ার যে খবর আমরা সাধারণতঃ পাই, বহু হাত ঘুরিয়া তাহার স্বরূপ বদ্‌লাইয়া যায়। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্য বর্ণনা শুধুই উপভোগ্য নয়, বিশেষ আদরণীয়। যে অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী ইতিমধ্যে রাশিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন লেখক তাঁহাদের অন্যতম। অনাবিল দৃষ্টি লইয়া তিনি রাশিয়ায় যাহা দেখিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর নূতনত্বে ও অপূর্ব্বতায় পুস্তকখানি উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। রাশিয়া এই কয়েক বৎসরে কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে তাহা এই পুস্তকের কারাগার, জনশিক্ষা, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি পরিচ্ছেদ পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ ভ্রমণকাহিনীর অবান্তর অংশ বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিই কেবল লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—রচনার ভঙ্গী সরল ও সাবলীল। পুস্তকে ২১খানি চিত্র আছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

—শ্রীসুবললাল বসু

কাছারী-প্রাঙ্গণে—শ্রীকালিদাস বাগচী এম, এস, সি প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বাঙ্গলার মাসিক পত্রিকা পাঠকগণের নিকট শ্রীযুক্ত কালিদাস বাগচী সবিশেষ পরিচিত। এ যাবত আমরা তাঁহাকে স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা গেল মানবজীবন ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাঁর কম নহে। কাছারী-প্রাঙ্গনে নিত্য যাহারা ভিড় করিয়া দাঁড়ায় তাহাদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরকারী কর্ত্তব্যের লৌহবর্ম্মে তিনি তাঁহার ডেপুটীজীবন চালনা করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। বিচারকালে বিচারপ্রার্থীদের অন্তরে সুখদুঃখের কথা দরদ দিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকের বারটি গল্পেই সেই দরদপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পরদার অন্তরালে কাছারী-জীবনের দুএকটা চিত্রও চোখে পড়ে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আর্টের আটচালা

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

বাঁশীর আওয়াজ, না ঢাকের বাদ্য

অগ্রহায়ণের "মাসিক বসুমতী"তে শ্রীফাল্গুনি রায় "থামাও তোমার বাঁশের বাঁশী" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। লেখক কাহাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না, তবে কবিতাটি পাঠ করিয়া মনে হইল ইহা বোধ হয় স্বগতোক্তি। বাঁশের অর্থাৎ কঞ্চির কলমে তিনি লিখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না কিন্তু তাঁহার এই বাঁশীর কবিতা বোধ হয় অলিখিত থাকিলেই ছিল ভাল। প্রথমেই একটা নমুনা দেখুন—

পথের পাশে দাঁড়িয়ে "ছিনু"
বাঁশীর সুরে উতল "হ'নু"
তাইতে আমার গেলো যে গো
হিয়ার সকল বাঁধন "খসি"।
পথিক ওগো পথিক ওগো
থামাও তোমার বাঁশের "বাঁশী"।

প্রথমেই 'ছিনু' ও 'হ'নু' 'খসি' ও 'বাঁশীতে' মিলের বহর পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। তৎপরে "হিয়ার সকল বাঁধন খসি" কথার অর্থ কি? "হার্ট ফেল" নাকি?

"কার তরেতে বাজাও বাঁশী
আঁধারভরা ছাতিমতলে,"

"ছাতিমতলে" কেন? এ যুগে কি কদমতলা বাতিল হইল? জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেছিলেন ছাতিমপাতার রস সর্দ্দির প্রতিষেধক, সেই হিসাবে এই শীতকালে কদমতলা অপেক্ষা ছাতিমতলায় অভিসারার্থ অপেক্ষা করা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। লেখকের ভবিষ্যৎদৃষ্টি আছে বটে!

আর দুটি অদ্ভুত পদ আছে সাধারণ বুদ্ধিতে যাহার অর্থসঙ্গতি অসম্ভব :

(১) বুকখানি মোর উঠ্‌লো ভেঙ্গে
তাইতে ওগো এলেম চ'লে
(২) রাতের বাতাস যাচ্ছে কেঁদে
করুণ সুরের আগল লুটে

ইহার পর যদি আমরা বলি যে, কবি এই কবিতাটি নিজের পাঠকবর্গের এবং কাব্যের ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থ নিজেকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা হইলে কি বিশেষ অপরাধ হইবে?

একটি সঙ্গত প্রশ্ন

উক্ত সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে একটি প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রশ্নটি জনসাধারণের দিক হইতে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমরা এই দিকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। "বিশ্বকবির কারুণ্যোচ্ছাস" শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি লিখিতেছেন :—"কালীর সমুখে ছাগপশুর ছেদন কল্পনা করিয়া আজ আমাদের বিশ্বকবির শোক কবিতাকারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। 'পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা' শীর্ষক একটি কবিতায় তাই তিনি লিখিয়াছেন"—এই বলিয়া কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত কবিতাটি তিনি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন :—

"আমি রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতে পড়িয়াছি—তাঁহার ভোজনের জন্য প্রত্যহ একটি করিয়া অবল ছাগশিশুকে প্রাণ দিতে হইত। একদিন একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া শুনিলেন, মাছ-কোটা বঁটির সাহায্যে একটি ছাগশিশুর মস্তক কর্ত্তিত হইতেছিল এবং তিনি তাহার ক্রন্দনে বিচলিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত অবশ্য রবীন্দ্রনাথও পড়িয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, এই বৃত্তান্ত পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ শোকের উচ্ছ্বাসে কয়টি কবিতা রচনা করিয়াছেন?"

এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর কবিগুরুর নিকট হইতে পাওয়া না গেলেও, আশা করি তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস কি বলেন?

অভাগী ও ভাগ্যবান

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী পৌষের "ভারতবর্ষে" খেয়ালী শীর্ষক এক কবিতা লিখিয়াছেন। তাহার শেষ কয়েকটি লাইন :—

খেয়ালী আখি লোরে
গাঁথিছে প্রেম-ডোরে
বসিয়া প্রেমমালা।
অভাগী নাহি জানে
প্রেমে যে কত হানে
জানে সে শুধু "জ্বলা"।

শুধু অভাগী কেন, অনেক ভাগ্যবানও জানিতে পারিবেন না—"প্রেমে যে কত হানে" অথবা "জ্বলা"র সহিত প্রেমমালা গাঁথার সম্বন্ধ কি?

ভরসা থাকিলেই চলে

পৌষের "ভারতবর্ষে" শ্রীসৌরীন মজুমদারের 'অপত্যস্নেহ' প্রকাশিত হইয়াছে। এটি বড় গল্প কি উপন্যাস বোঝা গেল না, তবে শেষে একটা (ক্রমশঃ) থাকাতে এটা যে অসম্পূর্ণ একটা কিছু তাহা বুঝিতে পারা গেল। অসম্পূর্ণ বলিয়া বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ সম্বন্ধে আলোচনা সমীচীন নহে, তবে ভাষার যে বিরূপ বৈচিত্র্য ইহাতে আছে তাহা সবিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কানাই, পল্লীর চাষার ছেলে। হঠাৎ সহরের মোহ তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। ইহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন :—হঠাৎ হাওয়া গেল উল্টে, মন হলো চঞ্চল, প্রাণ উঠ্‌ল দুলে, জীবনের গতি গেলো এলে (?), চরম পথ হলো কুয়াসাচ্ছন্ন, নির্দ্দিষ্ট পথ হলো অনির্দ্দিষ্ট।"

"গতি এলে যাওয়া" এবং 'চরম পথ' বলিতে কি বুঝায়?

আরও দু একটা বর্ণনার নমুনা দেখুন :

(১) "কানাইয়ের সহরের কোন জ্ঞান নেই, কোন কল্পনাও নেই মনে, ভাবতে পারে, ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করতে পারে এমন সম্পদও সে কোনদিন পায়নি।"

(২) "চরণে ফুলের কাঁটা ফুটিয়ে ক্ষণিকের তরে ধ'রে রাখবার মত শক্তি পল্লী-সুন্দরীর নেই।"

(৩) "আর পল্লী-গাঁয়ের? সূর্য্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার, ভয়াবহ জমাট অন্ধকার পাতালপুরীর মত নির্জ্জন, নীরব নিথর, নিস্তব্ধ, পাগলা ঝড়ো ঝঙ্কার যমরাজ প্রলয়নাচে ধেয়ে আসে মৃত্যুবার্ত্তা নিয়ে, সুবিধে না হ'লে দিয়ে যান দুঃখ দুর্দ্দশা নির্ম্মমভাবে।"

আচ্ছা "ত্রিবর্ণে রঞ্জিত" কেন? স্বরাজ পতাকা নাকি?

ফুলের কাঁটা ফুটিয়ে ধ'রে রাখার পদ্ধতি কোন্ সুন্দরীদের মধ্যে প্রচলিত? যেখানেই হোক—সেখানকার সুন্দরদের অবস্থা যে সবিশেষ লোভনীয় নয় তাহা বলাই বাহুল্য। আচ্ছা, ফুলের কাঁটা না হোক, বাব্‌লার কাঁটা ফুটাইয়া তো বহুজনকে বিছানায় বহুদিন ধরিয়া আট্‌কাইয়া রাখিবার ক্ষমতা পল্লী-সুন্দরীর আছে।

আর "পল্লীগাঁ"? আমরা তো পাড়গাঁ, বা পল্লীগ্রামই জানি। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রাম হইল 'নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ" কিন্তু সেই নীরব, নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে "ঝড়ো ঝঙ্কারে যমরাজ প্রলয়নাচ" নাচেন কিরূপে? "সুবিধে না হ'লে..."—কার সুবিধা, কিসের সুবিধা?

জনৈক ছাত্র কিছুতেই ইংরাজী লেখা আয়ত্ব করিতে পারিতেছিল না। তাহা দেখিয়া তাহার শিক্ষক বলিয়াছিলেন—"বাবা, কেবল ভরসা। ভরসা ক'রে কলম চালিয়ে যাবে—কতকগুলো নীচে নামিয়ে, কতকগুলো উপরে তুলে, কতকগুলোর মাথা কেটে, কতকগুলোর মাথায় ফুট্‌কী দেবে। তাহ'লেই সেই হ'বে ইংরাজী।" এখন দেখিতেছি ভরসা থাকিলে সকল রকম লেখাই চলে।

পাণ্ডিত্যের পাষাণ ভার

ব্র্যাকেটে বিদ্যারত্ন শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় পৌষের "মাসিক বসুমতী"তে "স্ত্রী-শিক্ষা" শীর্ষক এক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লেখকের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দরদ অপেক্ষা নিজের সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ পাইয়াছে অনেক বেশি। শাস্ত্র হইতে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইনি স্ত্রীশিক্ষা একরূপ সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু পাছে স্ত্রীলোক শিক্ষা পাইলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করে সে ভয়ও পদে পদে আছে। তাই নিজের কোলে ঝোল টানিবার বিদ্যায় পারদর্শী এই বিদ্যারত্ন মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সুলভা, শবরী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। অতএব যে সকল মহিলারা গৃহধর্ম্ম পালন করিবেন, তাঁহাদের চলনসই শিক্ষা দেওয়াই প্রাচীন রীতি ছিল—ইহাই তাঁহার বক্তব্য। এই মহাপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করি যে, মণ্ডণ মিশ্রের স্ত্রী 'উভয়ভারতী' কি বিবাহিতা ছিলেন না? "বিদ্যারত্ন" বলিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করিয়া এইরূপ এক তরফা রায় দিতে লেখকের লজ্জা করে না, ইহাই আশ্চর্য্য!

একস্থানে পাদটীকায় লেখক লিখিয়াছেন : "য়ুরোপ যে পথ ধরিয়াছেন, তাহা যে ভ্রান্ত, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার বিশেষ কারণ আছে। একটা কথা সোজা বুঝা উচিত যে, যে পথ অভ্রান্ত, সেই পথে চলিলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না।" লেখকের এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার পরও যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, ইউরোপ ভ্রান্ত এবং ভারত অভ্রান্ত তাহা হইলে তিনি অতি বড় পাষণ্ড। তবে একটা কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভ্রান্তপথে চলিয়া ইউরোপের তো সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে, আর অভ্রান্ত পথে চলিয়াছে বলিয়াই বুঝি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতকে গৌরবের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলিয়া দিয়াছে?

এইরূপ পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের পাষাণভারেইতো দেশের তরী আজ ডুবুডুবু।

——:*:——

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

শত্রুর এরোপ্লেন থামবার নয়া ফন্দী

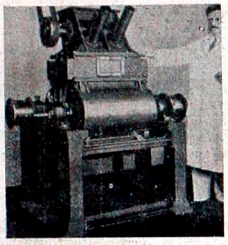

আধুনিক সভ্যতায় যুদ্ধ মানেই হচ্ছে মেশিন গান, ট্যাঙ্ক্ আর এরোপ্লেন্। নীচে ট্যাঙ্ক্ আর মেশিন গান, আর ওপরের এরোপ্লেন থেকে অগ্নিবর্ষণ ক'রে আবালবৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে ধ্বংস করাই আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। শত্রুর এরোপ্লেনের এই অনলবর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এক নয়া ফন্দী করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক মার্কনিও এই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গবেষণা কচ্ছেন। হয়তো শীঘ্রই এমন কিছু আবিষ্কৃত হবে যার দ্বারা এরোপ্লেন্ মহাশূন্যে, হঠাৎ অচল হ'য়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীর বুকের ওপর প'ড়ে চুরমার হ'য়ে যাবে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকের ফন্দীটি ভারি চমৎকার। ছবিতে যে যন্ত্রটি দেখা যাচ্ছে, মোটর্-চালিত এই যন্ত্রটির সাহায্যে পিচের অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো শূন্যে উঠে বায়ুতে মিশ্‌তে থাক্‌বে, আর চলন্ত এরোপ্লেনের কলের মধ্যে ঢুকে গ'লে গিয়ে কলটিকে এমন জাম ক'রে দেবে যে, এরোপ্লেন্ অচল হবেই, আর অচল হ'লে মাটিতে পড়বেই।

পেন্‌সিলের ডগে বিজলী বাতি

পেন্‌সিলের কাঁপা খোলের ওপরের দিকে ছোট্ট একটি ব্যাটারি, আর নীচের দিকে অতি ছোট্ট একটি বাল্‌ব্ দেওয়া আছে। সুইচ্ টিপ্‌লেই পেন্‌সিলের ডগের দিকটায় আলো জ্বলে ওঠে; এর দ্বারা সুবিধা হয়েছে

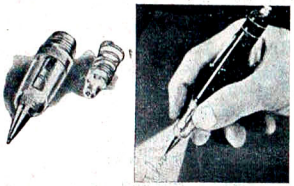

এই যে, অন্ধকারেও অনায়াসে লিখতে পারা যায়। প্রথম ছবিতে জিনিষ দুটি আলাদা ক'রে দেখানো হ'য়েছে এবং দ্বিতীয় ছবিটিতে কি ভাবে অন্ধকারে লেখা যায় তার নমুনা।

নয়া প্যারাসুট্

কত সহজে মানুষ-মারা যেতে পারে, এই চিন্তাটাই যেন বর্ত্তমান যুগের সব চেয়ে বড় চিন্তা। এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলেই মানুষ খুসী থাকতে পার্‌লে না, এখন চেষ্টা কচ্ছে সৈন্যদের মহাকাশ থেকে কি ক'রে

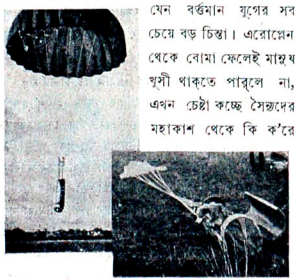

শত্রুর দেশে বেমালুম নামিয়ে দিতে পারে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা প্যারাসুটের সঙ্গে একটা খুব মোটা চোঙ ঝুলছে। এই চোঙের ভেতরে থাক্‌বে মানুষ। চলন্ত এরোপ্লেন্ থেকে প্যারাসুট্ ছেড়ে দেওয়া হবে, চোঙটাতো নীচের দিকেই থাক্‌বে। মাটিতে এসে ঠেক্‌লেই চোঙটি আপনা আপনি খুলে যাবে, আর মানুষটিও বেরিয়ে আস্‌বে। রাশিয়ায় এখন চোঙের ভেতর কুকুর ঢুকিয়ে এই প্যারাসুট পরীক্ষা করা হচ্ছে। নীচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, মাটিতে ঠেকে চোঙটা গেছে খুলে আর কুকুরটাও আসছে বেরিয়ে।

নয়া নৌকা

জার্ম্মানীতে এক অভিনব নৌকা তৈরি হয়েছে, এর সামনে এবং পেছনে বায়ুপূর্ণ "ট্যাঙ্ক" আছে; কাজেই নৌকো উল্টেই থাক্ আর জলেই ভর্ত্তি হোক্, কিছুতেই ডুব্‌বে না। নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে নৌকাটা উল্টে গেছে, কিন্তু আরোহী নৌকার উল্টো পিঠে চেপে ব'সে আছে। বায়ুপূর্ণ "ট্যাঙ্ক" যুক্ত নৌকা আমাদের দেশে তৈরি হ'লে ফি বছর নৌকা-ডুবিতে এত লোক আর মারা যাবে না।

"ষ্ট্র্যাটোস্‌ফিয়ার" ব্যোমযান

পৃথিবীর ওপর থেকে প্রায় আট মাইল পর্য্যন্ত যে বায়ুর স্তর আছে এরোপ্লেন বড়জোর সেই অবধি উঠতে পারে, তাও অতি কষ্টে। এই স্তরেরও বহু উর্দ্ধে আছে ওজোনের (Ozone) স্তর। পৃথিবী থেকে এই ওজোনের স্তর প্রায় পনেরো মাইল উর্দ্ধে। মোটামুটি আট মাইলের পর থেকে চৌদ্দ পনেরো মাইল অবধি যে স্তর তাকে বলে "ষ্ট্র্যাটোস্‌ফিয়ার"। এখানে মেঘ নেই, ঝড় নেই, কোন বাধা নেই, সুতরাং এই স্তরের মধ্য দিয়ে এরোপ্লেন প্রবল-বেগে ছুটতে পারবে।

এই স্তরটির পরীক্ষা সুরু হ'য়ে গেছে। পৃথিবী থেকে ওজোনের স্তর অবধি এরোপ্লেন যেতে পাচ্ছে না ব'লে পূর্ব্বেকার পরিত্যক্ত বেলুনেরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই বেলুনের পরিমাণ হচ্ছে আট লক্ষ ঘন ফুটেরও বেশী। এই অতি বিশালকায় বেলুনের সঙ্গে কলশূন্য এরোপ্লেন জুড়ে দেওয়া হয়, এইটির নাম হচ্ছে "গণ্ডোলা"। চারিদিক বন্ধ করা "গণ্ডোলা"র কক্ষে

ব'সে আছেন বৈজ্ঞানিক। এমন ক্যামেরা লাগানো আছে তাতে যে, আপনা-আপনিই সব ফটো ওঠে প্রত্যেক পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর। ছবিটিতে যে বেলুন দেখা যাচ্ছে, তা 'গণ্ডোলা' নিয়ে সাড়ে বারো মাইল অবধি অনায়াসে উঠতে পারবে। এর পরীক্ষা চলেছে রাশিয়ায়। প্রথমটি বেলুন, দ্বিতীয়টা গণ্ডোলার ছবি এবং সব নীচে দেখানো হ'য়েছে কেমন ক'রে বেলুনটী চালানো হবে।

ডিনামাইটের বদলে বায়ুর চাপ

খনিতে কয়লার স্তর ডিনামাইট দিয়ে ভাঙা হয়; কিন্তু এতে বিপদও যেমন বেশী, খরচও তেমনি কম নয়। এই জন্যই ডিনামাইটের বদলে এই নয়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একটা খুব লম্বা ইস্পাতের কার্ত্তুজ কয়লার স্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছবিতে দেখানো হচ্ছে যে সেই কার্ত্তুজের ওপর বায়ুর চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ যে সে চাপ নয়, একেবারে লৌহ-ভীম চূর্ণ করার চাপ, এক বর্গ ইঞ্চিতে পনেরো হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত হাজার মণ! ভেতরে এই চাপের ফলে কয়লার স্তর ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়, আর বড় বড় খণ্ড হ'য়ে পড়ে, গুঁড়িয়ে যায় না। ডিনামাইটে বেশীর ভাগ কয়লাই গুঁড়িয়ে যায়।

এরোপ্লেন্ থেকে রাত্তিরে ফটো তোলা

যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে, মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য বনে-জঙ্গলে গিয়ে গা ঢাকা দেয়; কিন্তু এখন থেকে আর গা ঢাকা দেওয়ারও উপায় থাকবে না দেখা যাচ্ছে। কালিফোর্ণিয়ায় সম্প্রতি পনেরো শ' ফুট ওপর থেকে রাত্তিরের গাঢ় অন্ধকারে ফটো তোলা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাস্তার

লোকজন, মটরবাস্ প্রভৃতি সবই স্পষ্ট উঠেছে। এরোপ্লেন্ থেকে এক রকমের গুঁড়োয় ভর্ত্তি বড় বড় বোমা ফেলে দেওয়া হয়, সেইগুলো ফেটে আলো হয়, আর সেই আলোতে তোলা হয় ফটো।

স্বর্গগত সভাপতিদের ভাষণ

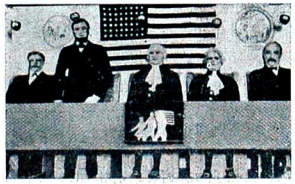

থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট্, আব্রাহাম্ লিঙ্কন্, জর্জ ওয়াশিংটন্, জেফার্সন্ এবং ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড্ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অতীত যুগের বিখ্যাত সভাপতি। সম্প্রতি নিউইয়র্কের এক শিল্পী এদের মূর্ত্তি তৈরি করেছেন। পর পর এক একজন সভাপতি দাঁড়ান এবং তাঁদের সব চেয়ে বেশী বিখ্যাত বক্তৃতার খানিকটা আবৃত্তি

করেন। পরদার আড়ালে গ্রামোফোনের রেকর্ড চালানো হয়, লাউড্ স্পিকারের সাহায্যে তা দূরের লোকের শ্রুতিগোচর হয়। বক্তৃতার সময় মনে হয় বুঝিবা পাঁচজন সভাপতিই একই সভায় সমবেত হ'য়ে বক্তৃতা কচ্ছেন। বিদ্যালয়ের ছেলেদের চাক্ষুষ শিক্ষা (Visual Education) হিসাবে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হ'বে।

বিমানপোতের লম্বভাবে আরোহণ

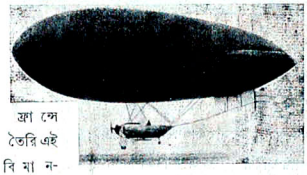

ফ্রান্সে তৈরি এই বিমান-পোতটির তলায় আছে একটি "গণ্ডোলা"। এই 'গণ্ডোলা'য় চার পাখাযুক্ত একটি পরিচালনার কল আছে। সেই কলের সাহায্যে এই বিমানপোতটি লম্বভাবে আকাশে উঠ্‌ছে।

জার্ম্মানীর নিমগ্ন যুদ্ধ জাহাজ

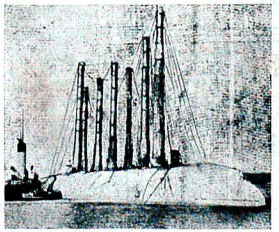

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কোনিগ্ আল্‌বার্ট নামে জার্ম্মানীদের এই যুদ্ধ জাহাজটি সমুদ্রের অতলগর্ভে নিমগ্ন হয়েছিল। এতদিন পর এটিকে তুলতে পারা গেছে। জাহাজটি যখন ওপরে ওঠ্‌ল তখন কি রকম দেখাচ্ছিল, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।

বিরাট বৃক্ষকে স্থানান্তরে রোপণ

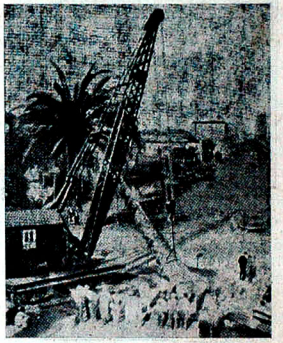

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে এই খেজুর গাছটিকে মরক্কো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এনে পুতে দেওয়া হয়েছিল। গাছটি এখন উঁচু হয়েছে ৭০ ফুট। সম্প্রতি এটিকে কি ক'রে আবার চার মাইল দূরে নিয়ে পুতে দেওয়া হয়েছে, ছবিতে তা-ই দেখানো হচ্ছে। গাছটি পোতবার জন্য ১৪ ফুট গভীর ও ৩০ ফুট পরিধিযুক্ত গর্ত্ত খুঁড়তে হয়েছিল। মটরের সাহায্যেই যে এই বিরাট বৃক্ষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

কৃত্রিম রেডিয়াম্

মাদাম কুরি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন রেডিয়াম্ আবিষ্কার ক'রে। এর মত মহার্ঘ্য বস্তু জগতে আর আছে কি? এক আউন্স রেডিয়ামের দাম বহু লক্ষ টাকা! সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ই, ও, লরেন্স সামান্য লবণ থেকে রেডিয়াম্ প্রস্তুত করেছেন। বিদ্যুতের দ্বারা লবণ থেকে প্রস্তুত এই কৃত্রিম রেডিয়াম্

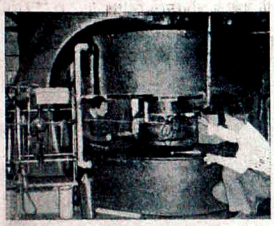

নাকি আসল রেডিয়ামের চেয়েও উৎকৃষ্ট হবে, আর নাম-মাত্র দামে প্রচুর পরিমাণ পাওয়াও যাবে। বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রেও কি আসলের চেয়ে নকলের বেশী আদর সুরু হ'ল? যে-কলে এই কৃত্রিম রেডিয়াম তৈরী হ'বে উপরে তারই ছবি দেওয়া হয়েছে।

উড়ন্ত কুমীর

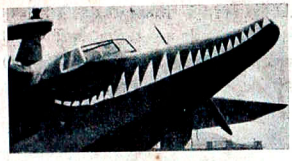

রাশিয়ায় একটি এরোপ্লেন্ তৈরি হয়েছে—দেখ্‌তে ঠিক কুমীরের মত। এই জন্য এর নামকরণ হ'য়েছে 'উড়ন্ত কুমীর'। দেখ্‌তে অদ্ভুত ব'লেই এই 'কুমীর' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছে খুব বেশী; ব্যবসাদারদের ভারি সুবিধা হয়েছে এতে বিজ্ঞাপন চালাতে।

———•———

গৈবীনাথ

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

কটিতটে দোলে গঙ্গা-মেখলা
পাষাণ গৈবীনাথ,
স্মরি' তারি 'পরে দেবতা-দেউল,
নমিনু ভক্তিসাথ!
প্রাতঃসূর্য্যের হৈমকিরণে
হেরিনু ভাসিয়া তরল হিরণে,
রক্তকমল সম সে অচল
মনটী করিছে মাত্!

স্বভাব-শোভার মাঝখানে রহি'
বাঁধিয়াছে আশা-নীড়,
তাই এসে' কত ক্রৌঞ্চ-মিথুন
রচিছে গীতের মীড়;
শত শত আসে উড়ি' গিরি-শিরে,
বাঁধিছে কুলায় মন্দির ঘিরে,
অস্ফুট ভাষায় বলিছে নিয়ত,—
"লহ দেব প্রণিপাত!"

———:॰:———

দশম পরিচ্ছেদ

গুরু-শিষ্য সংবাদ

মনোজ মাধবীকে লইয়া যাইবার জন্য পুরীতে উপস্থিত হইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ আসিলে সে হাসিয়া বলিল, "একের উদয়—অপরের অস্ত।'

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে সূর্য্য, আর কে চন্দ্র?"

"সে ত নামেই সপ্রকাশ। তুমি কেবল রবিও নও—রবীন্দ্র।"

মা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্দিরে যাবে কি?" তখন মালতী একটু অপ্রস্তুত হইল—কারণ, স্বামীর সঙ্গে সে-ও পথে চা পান করিয়াই আসিয়াছিল। রবীন্দ্র বলিল, "না, মা, খেয়ে দেয়ে যাব। এখন সমুদ্রে স্নান করে আসি।"

মা কিছু বলিলেন না।

মা চলিয়া যাইলে মনোজ রবীন্দ্রনাথকে বলিল, "পুরীতে এলে—একবার আগে মন্দিরে যাবে না?"

"কেন? ঠাকুর কি তাতে রাগ করবেন?"

"ঠাকুর রাগ করবেন কি না, আমরা কেমন করে জানব? কিন্তু মা সন্তুষ্ট হ'তেন"

"আমরা ত আর তীর্থ করতে আসি নি।"

"অবশ্যই নয়। তবে কথা—মা যেখানে থাকেন, সে-ও তীর্থ। তা ছাড়া পুরী হিন্দুর একটি বড় তীর্থ—পাঁচধামের একটি।"

"ও বিষয়ে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতই মানি—ভগবান থাকেন, থাকুন; তিনিই বা আমাকে বিব্রত করবেন কেন? আর আমিই বা তাঁকে বিরক্ত করব কেন?"

"কি জান, ভায়া, তোমরা যাদের পরম ভক্ত সেই বিদেশীদের একজন বড় পণ্ডিত—ভল্‌টেয়ারই ত বলেছেন, ভগবান যদি না থাকেন, তবে সংসারে শৃঙ্খলা রাখতে হ'লে স্বর্গ ও নরক সমেত ভগবানকে গড়ে নিতে হ'বে, অর্থাৎ কল্পনা ক'রে তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার করতে হবে।"

"নইলে কি সংসারে শৃঙ্খলা থাকে না?"

"তাই ত দেখতে পাই। অশুচিতা যদি একবার প্রবেশের পথ পায়, তবে তার দ্বারা কেবল অনিষ্টই হয়। মনে কর—আমরা পার্টিতে যাই; গিয়ে যা'দের সঙ্গে মিশি তা'রা কোন্ দলের লোক, তা ভেবে দেখি কি? হয়ত আমরা তর্ক করে বলি, মদ পান করলে দোষ কি? কিন্তু যাঁরা বিধান করেছিলেন, মদ অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য—তাঁরা জান্‌তেন 'সাবধানের বিনাশ নাই'—কারণ, মদ যদি জ্ঞান ক্ষুন্ন করে, তবে তা'র পক্ষে সংযম নষ্ট করতেই বা কতক্ষণ?"

"আপনি যেন সেই অনুক্রমের কথা পাড়লেন। গল্পে আছে, একজন তাঁর চাকরকে অনুক্রমের কথা বলেছিলেন—তাই চাকর তাঁর অসুখ হ'লে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে একেবারে খাট অবধি কিনে এনেছিল।"

"সেটা প্রভুর দোষ—তিনি অধিকারী বিবেচনা করে উপদেশ দেন নি।—"

উভয়ে যখন এইসব কথা হইতেছিল, তখন মাধবী লক্ষ্য করিল, মালতীর মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—

তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে পার্টি হইতে মস্ত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা প্রকাশ পায়। ভগিনীর মুখভাব লক্ষ্য করিয়াই মাধবী কথাটা চাপা দিবার জন্য স্বামীকে বলিল, "এরাত ক'দিন থাকবে, পরে মন্দিরে মা'র সঙ্গে যাবে। তুমি ত বলছিলে, সমুদ্রে স্নান করতে যা'বে—যাওনা, ওদের সঙ্গে।"

মনোজ তখন রবীন্দ্রনাথকে বলিল, "চল, ভায়া, যখন তোমার বড় শালীর আদেশ, তখন তা' তামিল করেই আসি।"

তখন সমুদ্রস্নানে যাইবার আয়োজন হইল। ভৃত্য যাইয়া যান ডাকিয়া আনিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় রবীন্দ্র মালতীকে ও মাধুরীকে বলিল, "জুতা পায় দেবে না?"

মালতী বলিল, "না।"

মাধুরী বলিল, "কিন্তু বৌদিদি সত্যই বলেছিলেন; আর কিছুদিন এখানে থাক্‌লে পা ফুটি-ফাটা হ'বে।"

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জুতা আন নি?"

"না।"

সমুদ্রস্নান হইতে ফিরিবার সময় রবীন্দ্রনাথ মোটর-চালককে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কোথায় জুতা পাওয়া যায়?"

সে বলিল, "একটু ঘুরে গেলেই পাওয়া যা'বে।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "জুতা কেন?"

রবীন্দ্রনাথ বলিল, "মাধুরীর জন্য কিনে নিয়ে যা'ব।"

মাধুরী বলিল, "না—না।"

"কেন? বিকেলেও কি খালি পায়ে বেড়াতে যা'বে?"

"মন্দিরে কি জুতা পায় দিয়ে যায়?"

"মন্দির ছাড়া কি আর কোথাও বেড়া'তে যেতে নেই?"

মনোজ কোন কথা বলিল না।

মালতী বলিল, "এখন যদি আবার মুচীর দোকানে যাও, বাড়ী গিয়ে আমাদের আবার নাইতে হ'বে।"

"কি সর্ব্বনাশ!"—বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যান-চালককে বলিল, "তবে বাড়ীই চল।"

রবীন্দ্রনাথ মনোজকে বলিল, "এ জাতের কি কোন আশা আছে?"

মনোজ বলিল, "জুতার সঙ্গে জাতের সম্বন্ধ কি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ?"

"আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না।"

"আমার অপরাধ?"

"মেয়েদের জুতা পায় দেওয়া কি দোষের?"

"কে বল্লে? যদি দরকার হয়, পরতে হ'বে; বিনা দরকারে না পরলেই বা কি দোষ হয়?"

মালতী বলিল, "জামাইবাবুর কথা, খরচ যত কম হয়।"

"সেটাও কি বিবেচনা করবার বিষয় নয়? সংসারটা যদি তোমরা গুছিয়ে না চালাও তবে পুরুষরা যত উপার্জ্জনই কেন করুক না, যশোদার দড়ীর দু'মুখ কখন মিলবে না।"

রবীন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিল। মনোজ তাহাকে বলিল, "শুধু শুধু আর তর্ক করব না। হয়ত আমার মত আর তোমাদের মত মিলবে না।"

ইহার পর আর তর্ক করা চলে না, সুতরাং রবীন্দ্র আর কোন কথা বলিল না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেণ। তাহার পূর্ব্বে মাধবী বিদায় লইল—মা'র সঙ্গে আবার কবে দেখা হইবে, জানা নাই; কাম্যেই যাইবার সময় তাহার মুখে বিষাদের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিল, "দিদি কি বিয়ের কণে শ্বশুরবাড়ী যা'বার সময় যেমন কাঁদে তেমনই কেঁদে ফেলবেন নাকি?"

মনোজ বলিল, "ভায়া ভুল করলে। এখন আর বিয়ের কণেরা শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদে না। সে দিন আর নাই।"

কিন্তু মাধবীর চক্ষু যেন সজল হইয়া আসিল।

মা-ই তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মাকি কা'রও চিরদিন থাকে, মাধবী? জগবন্ধুর কাছে প্রার্থনা কর,

তাঁ'র চরণে—তোদের সব রেখে—যেতে পারি। বেহানকে আমার নমস্কার জানাস। তিনি কবে আস্‌বেন। রথেই যে কেবল আস্‌তে হয়, তা'ত নয়—স্নানযাত্রা, দোল, এ সবেও ত আসতে পারেন।"

মাধবী বলিল, "তিনি ত কেবলই বলেন, তোমার মত আসতে পারলে বাঁচেন।"

মনোজ বলিল, "আমরা যে বাঁচাটা ভালবাসি না। দেখুন মা, আপনার ছেলে-মেয়েরাই আপনাকে বেঁধে রাখতে পারলে না।"

মা বলিলেন, "বাবা, মা'র কর্ম্ম যত দিন, ততদিন তা'কে তা' করতেই হবে।"

মা'কে প্রণাম করিয়া সকলে গাড়ীতে উঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলিল, "চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।" সেও গাড়ীতে উঠিল। আসল কথা, চুপটি করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। গাড়ী যখন অরুণস্তম্ভের নিকট আসিল তখন মাধবী পতিত-পাবনের মূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম করিল—মনোজও তাহাই করিল।

সিগারেট টানিতে টানিতে রবীন্দ্রনাথ বলিল, "এত-দিন ত রোজ অন্ততঃ দু' বার ঠাকুরকে দর্শন করেছেন—তা'তে তৃপ্তি হয় নি?"

মাধবী মৃদু হাসিল।

মনোজ বলিল, "ভায়া, ভুল করছ। যে বস্তু যা'র কাছে, প্রিয়, তা'র কি তা'তে সেবা যত্ন ভক্তি করে আকাঙ্খার শেষ হয়? মাতালরা মদ খেয়ে কখন তা'দের তৃষ্ণার শেষ করতে পারে না; আজকাল দেখি চা-খোররা যত চা খায়, ততই চায়। আর ঠাকুরকে প্রণাম করেই চট করে' আশা আর আকাঙ্খা মিটবে?"

রবীন্দ্রনাথ বলিল, "অর্থাৎ ঘি পেলে আগুণ যেমন বেড়েই উঠে, ওও তেমনই?"

"কোনটা বাড়া ভাল—কোনটা মন্দ—এই প্রভেদ।"

ট্রেণ ছাড়িয়া যাইলে রবীন্দ্রনাথ নিকটে রেলের হোটেলের দিকে যাইতে যাইতে ফিরিল। তাহার মনে পড়িল—সেই পার্টির পর মালতী এত কাঁদিয়াছিল যে, সে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিয়াছিল, সে আর মদ্যপান করিবে না। সে প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিল—মদ্যপানটা দোষের নহে, ইংরাজরা এটা দোষ বলিয়া মনেই করে না। কিন্তু মালতী কিছুতেই তাহা বুঝে নাই। বিশেষ পুরীতে আসিয়া—। সে ফিরিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিন সে চলিয়া গেল।

মাধুরী লক্ষ্য করিতে না পারিলেও মা সহজেই লক্ষ্য করিলেন, মালতীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার মনে কেমন যেন ভাবনা, মুখের হাসিতে তাহা ঢাকা যায় না। তাহার কারণও মা অনুমান করিলেন। যে চাঞ্চল্য তাহার কথায় ও ব্যবহারে সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিত, সে যে তাহা সংযত করিয়াছে, ইহাতে মা যত তৃপ্তিই কেন বোধ করুন না, তাহার দুর্ভাবনার কারণ তাঁহারও দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছিল। সে ছেলেকে লইয়া আইসে নাই—রবীন্দ্রই বলিয়াছিল, "ক' দিনই বা থাক্‌বে, যে আবার ছেলে নিয়ে যা'বে?" সে কথাটা তাহারও ভাল লাগে নাই; মা-ও তাহাতে সন্তোষানুভব করেন নাই। তবে মালতী মনে করিয়াছিল, সেই জন্যই সে শীঘ্র ফিরিতে পারিবে। এখন তাহার মনে কেমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল—সে রবীন্দ্র-নাথকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না।

মাধুরী প্রথমে লক্ষ্য না করিলেও ক্রমে মালতীর এই পরিবর্ত্তন বুঝিল। সে দেখিল, মালতী আর মা'র পূজা-চর্চ্চায় অত্যধিক সময় ব্যয় লইয়া বিদ্রূপ করে না—যদি অভ্যাসবশে কখন কোন ব্যঙ্গোক্তি করে, তবে যেন আপনার কাছে আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করে। এমন কি মাধুরী যখন একদিন বলিল, "মা ঠাকুর দেখা, আর ঠাকুর পূজা নিয়েই আছেন।" তখন মালতীই বলিল, "দেখেছিস, মা যখন ঠাকুর দর্শন করেন, তখন মনে হয়, তিনি সংসারের সব ভুলে গেছেন!"

মা প্রতিদিনই মন্দিরে দেবদর্শনে যাইতেন বটে, কিন্তু কখন একা যাইতেন না। সঙ্গে দাসী ও ভৃত্য লইয়া যাইতেন, এমন ভাবে চাদর বা অন্য গাত্রাচ্ছাদনে দেহ আবৃত করিয়া যাইতেন যে, যেন সেকালের নববধূ পল্লীতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছেন। প্রমথনাথ একদিন বলিয়াছিল "মা, তুমি যে ভাবে মুড়ি দিয়ে যাও, আমার ভয় হয়, কোন্ দিন পথে পড়ে না যাও।" মা'র সঙ্গে মন্দিরে যাতায়াতকালে মাধবীও তেমনিই ভাবে যাইত। লজ্জাবতী তাহা দেখিয়া একদিন মৃদু হাসিয়া মাধুরীকে বলিয়াছিল, "কি অতিরিক্ত লজ্জা!" মাধুরী তাহাই মনে করিয়াছিল। তাহার আশা ছিল, লজ্জাবতী ও দাদা চলিয়া যাইবার পর হইতে যে হৈ হৈ করিয়া বেড়ান বন্ধ হইয়াছিল মালতী আসিলে তাহা আবার আরম্ভ হইবে। শ্বশুরবাড়ীর সেকালের ব্যবহার তাহার পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল—বাপের বাড়ীতেও কি তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই!

কিন্তু মাধুরী দেখিয়া বিস্মিত হইল, মালতী একদিনও তাহাকে লইয়া একা বেড়াইবার কথা বলিল না। সে-ও মা'র সঙ্গে মুড়ি দিয়া মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রষ্টব্য যাহা কিছু সবই দেখিতে যাইবার সময় গাড়ীতে হুড তুলিয়া দিয়া মা'র সঙ্গে দেখিতে গেল—মাধুরীকে সঙ্গে লইয়া গেল।

মালতীর এই পরিবর্ত্তিত ব্যবহারে মাধুরী বিস্মিত হইল; এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে দেখছি, দিদির মতই হচ্ছ; কেন?"

মালতী বলিল, "কি জানিস, মাধুরী, মা'র কাছে ক'দিনের জন্য এসেছি, মা'র যা' ভাল লাগে না, তা' করব কেন?"

"মা ত কিছু বলেন না।"

"কিন্তু তিনি কি ভালবাসেন আর কি ভালবাসেন না—তা'ত আমরা বুঝি।"

"বৌদিদি যখন এসেছিলেন, তখন দাদার সঙ্গে—খুব বেড়ান, সমুদ্রে স্নান—হ'ত, তবুও বৌদিদি যেন হাঁফিয়ে উঠছিলেন।"

"বৌদিদি মা'র বৌ—মেয়ে নয়। তারপর, সে আমাদের বাড়ীর ব্যবহারে অভ্যস্তও নয়।"

"বৌদিদি ত তোমার বাড়ীর ব্যবহারেই অভ্যস্ত।"

"হাঁ। কিন্তু আমি সে বাড়ীর বৌ, জানিস ত কথায় বলে—

পড়েছি মোগলের হাতে
খানা খেতে হ'বে সাথে।"

এই যে তোর শ্বশুরবাড়ীর চালচলন সেকেলে, তা'তে সেই চালচলনই যতটা সম্ভব নিতে হবে।"

সে-ইত মাধুরীর বিরক্তির কারণ। মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ীর চালচলন কি তোমার ভাল লাগে না?"

মালতীর মনে হইল, বলে—"আর বলতে পারি না—লাগে।" কিন্তু সে তাহা বলিল না—মাধুরীর কথার সরল উত্তর না দিয়া বলিল, "একটা বড় সংসারে এক জনের ভাল লাগা না লাগার দাম খুব বেশী হয় না। যখন অনেককে নিয়ে সংসার, তখন অনেকের যা মত তাই চলবে।"

"তাতে যদি নিজের অসুবিধা হয়?"

"মানুষ মাত্রকেই কতকটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়—নইলে শান্তি পাওয়া যায় না।"

এমন কথা মাধুরী দিদির মুখেই শুনিয়াছে এবং দিদির মুখেই শোভা পায়, মনে করিয়া আসিয়াছে। এখন মালতীর মুখে এই কথা শুনিয়া সে মনে করিল, একি?

যে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আঘাত মালতীর মনে "প্রগতি" সম্বন্ধে সন্দেহের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার বিষয় মাধুরী অবগত ছিল না। কাযেই সে বুঝিতে পারে নাই। মালতী এখন ভাবিতেছিল, তাহার পিতৃগৃহে সে যে শুচিতায় অভ্যস্তা ছিল এবং দিদির সংসারেও যে শুচিতা সে দেখিয়াছে, তাহাই কি মানুষকে সংযম আনিয়া দেয়? কিন্তু সেই কথা মালতী যতই ভাবিতেছিল, ততই তাহার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছিল।

কাজেই মালতীর আগমনে মাধুরী যাহা পাইবে আশা করিয়াছিল, তাহা পাইল না।

এদিকে দশদিন যাইতে না যাইতে, মালতী ফিরিয়া যাইতে চাহিল। মাধুরী জিদ করিল, কিছুতেই তাহা হইবে না, কিন্তু মা বলিলেন, "না, বাছা, জিদ করিস নে—ছেলেকে রেখে এসেছে, কেমন করে থাকবে?"

তাহার পর রবীন্দ্রনাথই মালতীকে লইতে আসিল এবং ছেলেকে সঙ্গে লইয়া আসিল। মা তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মালতী যখন চলিয়া যায়, তখন মাধুরী বলিল, "এই বার আমার পালা।"

মালতী বলিল, "তা'তে কি আর সন্দেহ আছে?"

মা বলিলেন, "ওর বড় কষ্ট হয়—একা একা কি ভাল লাগে?"

রবীন্দ্রনাথ মাধুরীকে বলিল, "আমি গিয়ে দেবদত্তকে বলব—এটা তার বড় অন্যায়।"

মাধুরী লজ্জায় দৃষ্টি নত করিল।

মালতী বলিল, "দেবদত্ত এখন বাড়ী রদবদল করতে বড় ব্যস্ত। সে আসবে—তা'র মা'র সঙ্গে।"

মালতী ফিরিয়া গেল।

শিল্প ও বাণিজ্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী সমিতিতে বড়লাট

ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড উইলিংডন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী সমিতি সঙ্ঘের (Associated Chamber of Commerce) বার্ষিক সভা উদ্বোধনকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক অর্থসঙ্কট তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ বলিতে চাহেন যে, আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত কৃষি প্রধান দেশে জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোন সম্পর্ক দেখিতে পাইতেছি না। এই হতভাগ্য দেশের ভাগ্য-বিড়ম্বিত কৃষককুল অন্যান্য দেশে তাহাদের সমব্যবসায়ী-দিগের মত শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ নহে। য়ুরোপ-আমেরিকার কৃষক বাজারদর চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষেত্রজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য আদায় করিয়া লইতে জানে—এদেশের কৃষক তাহা জানে না। রপ্তানী ব্যবসায়ের সহিত কৃষকের কোন সম্বন্ধ নাই—কতকগুলি ধনী, য়ুরোপীয় বা অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী রপ্তানী ও আমদানী ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহারা দয়া করিয়া যে মূল্য দেয় তাহা লইয়াই নিরুপায় কৃষককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ যে সময় দ্বিগুণ ছিল—সে সময়ও ভারতীয় কৃষকের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না—তবে, তাহাদের অধিকাংশই সে সময় দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইত—আজ তাহারা তাহাও পায় না; কিন্তু, দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান থাকিলেই অবস্থা স্বচ্ছল হয় না।

স্বদেশীর ছদ্মবেশে

১৯০৬ সনে বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলন, ও ১৯২০ সনে সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পর হইতে স্বদেশজাত পণ্যের প্রতি ভারতবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী পণ্যের তুলনায় অনেক অপ-কৃষ্ট পণ্যও আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছি। দেশবাসীর আন্তরিক সহায়তা লাভ করিয়া অনেকগুলি ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ে আশা-তিরিক্তরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

অন্যদিকে, স্বদেশী পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত্ত ব্যক্তি ও প্রতারকগণ বিদেশী পণ্যের উপর "ভারতে প্রস্তুত" ছাপ মারিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে উহা বিক্রয় করিতেছে এবং ক্রেতাসাধারণকে ঠকাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। বহু কাপড়ের কল বাজার হইতে জাপানী সুতা কিনিয়া নিজ কলে কাপড় বুনিয়া, "ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় কলে, ভারতীয় উপাদানে ভারতে প্রস্তুত" ছাপ মারিয়া বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে যে, খাঁটি স্বদেশী ও জাল স্বদেশী পণ্য চিনিবার কোন উপায় নাই। সাধারণ ক্রেতা সরল বিশ্বাসে "জাল স্বদেশী" জিনিষ বিদেশী জিনিষ অপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া কিনিতেছে—তাহাতে বিদেশে অর্থ রপ্তানী বন্ধ হইতেছে না; কতগুলি প্রতারকের স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে মাত্র।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে জাপানের ওসাকা সহর হইতে "ওসাকা ম্যানুফ্যাক্চারার্স অ্যাসোসিয়েশন" নামক একটি প্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলকে—জাপানী গেঞ্জা ও মোজা "মোহিনী মিলে প্রস্তুত" ছাপ মারিয়া বিক্রয় করিতে—অনুরোধ করিয়াছিলেন। মোহিনী মিল ঐ চিঠি প্রকাশ

করিয়া দেওয়ায় তৎকালে ভারতে, জাপানে এবং ইংলণ্ডে ব্যবসায়ীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে আমরা "ওসাকা ম্যানুফ্যাক্চারার্স এসোসিয়েশনের" ভিতরের খবর জানিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, জাপানীদের সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্বন্ধ নাই—জনৈক দেশদ্রোহী বাঙ্গালী—জাপান হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া—ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী।

প্রকাশ, সেলুলয়েডের ব্যবসায় সম্পর্কে জাপানের সহিত ইহার ব্যবসায় সম্বন্ধ আছে। আরও কোন কোন জিনিষ এই লোকটি জাপান হইতে আমদানী করিয়া থাকে। কতদিন পর্য্যন্ত এই লোকটি জাপানী মালের উপর "স্বদেশী" ছাপ মারিয়া দেশবাসীকে ঠকাইতেছে—তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন শিল্পে অনুরূপ প্রতারকের অভাব নাই। সৌগন্ধি শিল্পে (scents) শতকরা ৯৯ জন তথাকথিত উৎপাদক এইরূপ প্রতারণা করিতেছে। ইহাদিগের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া এবং জনসাধারণ যাহাতে "স্বদেশী" বিশ্বাসে বিদেশী পণ্য ক্রয় করিয়া প্রতারিত না হয়—তদ্রূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ব্যবসায়ে প্রতারণা

ব্যবসায়ে প্রতারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার ফলে ভারতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যৌথ কোম্পানী—বিশেষভাবে বীমা-কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট কোম্পানী—গুলিয়া প্রতারকগণ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতেছে—একদিকে দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; অন্যদিকে, একবার প্রতারিত দেশবাসী ভবিষ্যতে সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কারবারেও মূলধন বিনিয়োগ করিতে অসম্মত হইতেছে।

দিল্লীর লাক্ষ ও এঞ্জেলস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, কলিকাতার কান্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোং, ক্যাশ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক, পায়োনিয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, বেন-ভেন্থটো কোম্পানী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে দেশবাসীর—বিশেষভাবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের—সতর্ক হওয়া উচিত। সিন্ধুদেশ হইতে লালা কিষেণ চাঁদ নামক একটা ভবঘুরে কলিকাতায় আসিয়া কে, ডি, লালা ছদ্মনামে নিজপরিচয় দিয়া কান্ট্রি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী রেজিষ্ট্রী ক'রে। কালী কুমার মিত্র নামক আর একজন প্রতারকও কান্ট্রি ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠায় চোর-চূড়ামণি কে, ডি, লালাকে সাহায্য করিয়াছিল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া ইহারা অবাধে প্রতারণার ব্যবসায় চালাইতে থাকে—কিঞ্চিদধিক একবৎসরকাল মধ্যে ভারতের নানা স্থান হইতে কে, ডি, লালা প্রতারণার সাহায্যে দুই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে।

তাহার পরে পুলিশের নজর পড়ে—কে, ডি, লালা গ্রেপ্তার হয়। জামিনে মুক্ত থাকার সময় সে পলায়ন করে—রেঙ্গুনে পুনরায় গ্রেপ্তার হয় এবং রেঙ্গুন, কলিকাতা ও অমৃতসরে তিনটি প্রতারণার অভিযোগে সুদীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়। অন্যতম সহযোগী কালীকুমার মিত্র ক্যাশ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক খুলিয়া সাধারণকে প্রতারণার অভিযোগে সেদিন দণ্ডিত হইয়াছে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কারবার ও ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়; কেবলমাত্র ভারতেই ইহার অন্যথা দেখা যায়। এ দেশে সমাজসেবক ও রাজনীতিকগণ পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই যৌথ কোম্পানীর পরিচালকসভায় নাম ধার দিয়া থাকেন—অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁহারা কোম্পানী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করিতে পারেন না; ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর অর্থ আত্মসাৎ করিলে তাহা ধরিবার মত যোগ্যতাও ইহাঁদের নাই।—নাম জানা এই সব অযোগ্য নেতার নাম দেখিয়া ভারতীয় কোম্পানীর অংশীদারগণ অনবরত প্রতারিত হইতেছে—কিন্তু, নিজেদের নাম ধার দিয়া সরলচিত্ত দেশবাসীকে এইভাবে প্রতারণা করার উপলক্ষ্য হওয়া যে অবিধেয়,

এ সম্বন্ধে কবে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে?

এঞ্জেলস্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। মূলচাঁদ হাস্সলুকম নামক একজন আন্তর্জ্জাতিক প্রতারক (International swindler) ঐ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করে। ফ্রান্সে অবস্থানকালে মূলচাঁদ জুয়াচোররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই লোকটি যাহাতে কাহাকেও প্রতারণা করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে প্যারীতে পুলিশের বড়কর্ত্তা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, ভারতের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ তাহাতে সতর্ক হন নাই। মূলচাঁদের ধাপ্পায় ভুলিয়া উত্তরভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা নেতা এঞ্জেলসের পরিচালকসভায় নাম ধার দেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহায়তায় মূলচাঁদ অবাধে তিনবৎসরে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করে। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দিল্লীর আদালতে মূলচাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু হইয়াছে, প্রতারক মূলচাঁদ পলায়ন করিয়াছে এবং তাহার নামে হুলিয়া জারী হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে একপ কত মূলচাঁদ যে অবাধে প্রতারণায় ব্যবসায় চালাইতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

পাটচাষী কৃষকের দুর্গতি

পাট বাঙ্গলা একচেটিয়া (monopoly) পণ্য। বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থান, বিহারের একাংশ এবং আসামের একাংশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে পাট উৎপন্ন হয় না। অন্যান্য দেশে পাট চাষ করার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু, ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। পাট চাষের জন্য প্রাকৃতিক যে বিশেষ (peculiar) জলবায়ু এবং মাটির (soil) প্রয়োজন হয়—একমাত্র বাঙ্গলা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ দুইটির কোন কোন অংশে তাহা বিদ্যমান।

পাট, বর্ত্তমান যুগে, ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক—অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পব্যয়ে সর্ব্বাপেক্ষা টেঁকসই যে সুতা, চট ও থলিয়া প্রস্তুত হয়—তাহা ব্যতিরেকে

পণ্য-দ্রব্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করা যায় না। তদ্ব্যতীত, পা-গোরু, দড়ি, পশমের মধ্যে ভেজাল, এবং অন্য নানা রূপে পাট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশবাসী এইরূপ অত্যাবশ্যক ও এক চেটিয়া সম্পদের অধিকার হইলে তাহারা নিজেদের আর্থিক সুবিধা করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু, অভিশপ্ত বাঙ্গালীজাতি পাটের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়াতো দূরের কথা—উত্তরোত্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পাটশিল্পে কিম্বা কাঁচা পাটের ব্যবসায়ে ও রপ্তানী বাণিজ্যে হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির কোনও স্থান নাই। অবাঙ্গালী দালাল ও মধ্যবর্ত্তিগণ মফঃস্বলে পাটের ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে; তাহারা যত কম মূল্যই দিক না কেন, ক্ষুৎপীড়িত, শোচনীয় রূপে অর্থাভাবগ্রস্ত, ঋণভার জর্জ্জরিত, ও বিপন্ন—বাঙ্গালী চাষী সেই কম মূল্যেই তাহাদের নিকট পাট বিক্রয়ে বাধ্য হয়। মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণ উহার উপর কিছু লাভ রাখিয়া দেশে ও বিদেশে পাটকলগুলির নিকট ঐ পাট বিক্রয় করে। পাটকলগুলি ঐ পাট হইতে চট ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে পাট যাহারা বপন করিয়া থাকে—একমাত্র তাহারা, অর্থাৎ বাঙ্গালী চাষী ব্যতীত অন্য সকলেই পাটের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

পাটশিল্পে বিদেশীর প্রভুত্ব

ভারতে ও ভারতের বাহিরে পাটকলগুলিই প্রতি বৎসরে উৎপন্ন পাটের শতকরা কিঞ্চিদধিক ৯৫ ভাগ ক্রয় করিয়া থাকে। পাটের নানারূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ইহারা যে প্রভূত অর্থও লাভ করিয়া থাকে—সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুঃখের বিষয়, পাটশিল্পে বাঙ্গালী,—শুধু বাঙ্গালী কেন—ভারতবাসীও বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা হইতে সর্ব্ব প্রথম বিদেশে পাট রপ্তানী হইয়াছিল; ঐ সময় প্রতি বৎসর কি পরিমাণ

পাটরপ্তানী হইত তাহা জানা যায় নাই; ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা হইতে প্রায় চারি শত মণ কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই পাট রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক্ষণে, প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক আড়াই কোটি মণ পাট বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। এই সমস্ত পাট হইতে সূতা চট ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য বিদেশে—ডাণ্ডি, ডামষ্টর্ডেট, মিলান, ভিনিস, ক্যালে, বোর্ডো, স্যানফ্রান্সিসকো, প্রভৃতি সহরে অনেকগুলি পাটকল খোলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বাঙ্গলায়—কলিকাতার উপকণ্ঠেও বহু পাটকল চলিতেছে।

বিদেশীয় পাটকলে আমাদের বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই। ভারতেও অধিকাংশ পাটকল বিদেশীয় পরিচালিত এবং বিদেশীয় অংশীদারবহুল—সুতরাং আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী। কলিকাতার উপকণ্ঠে সমস্ত পাটকলে যত তাঁত চলিতেছে—তাহার মধ্যে শতকরা ˙৮৩টি মাত্র বাঙ্গালী ব্যবসায়ী রাজা জানকীনাথ রায় ব্রাদার্সের এবং ৭˙৮টি মাত্র মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী (স্যার স্বরূপ চাঁদ হুকুম চাঁদ, বিড়লা ব্রাদার্স, সুরযমল নাগরমল ও মফতলাল গাগাভাই), ১˙০৬টি মাত্র ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ী (আদমজি হাজি দাউদ) এবং ১˙০৮টি ইহুদি ব্যবসায়ীর (বি, এন্, ইনিয়স) কলে অবস্থিত, অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে—ভারতে সমস্ত পাট কলের যত তাঁত চলিতেছে তাহার শতকরা ১০˙৭৭টি মাত্র ভারতীয় পরিচালিত তাঁতে অবস্থিত। এই সমস্ত কলও আবার নূতন; পাটশিল্পের প্রথম যুগে কলগুলি যখন শতকরা ২০০৲ হইতে ৩০০৲ হারে লাভ করিয়াছে, তখন পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বণিকগণ পাটকল খোলার চেষ্টা করেন নাই। যে সময় পাট ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে, লাভের হার কমিয়া গিয়াছে—সেই সময়ে তাঁহারা পাট-শিল্পে নামিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা পাটকল খুলিয়া আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই। বহুদিনের পুরাতন, সুপ্রতিষ্ঠিত য়ুরোপীয় কলগুলি এখনও শতকরা ১৫৲, ২০৲, ২৫৲, ৩০৲ হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছে—আর ভারতীয় পরিচালিত কলগুলি কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে মাত্র।

য়ুরোপীয় পাটকল সমূহের আবদার

সম্প্রতি, ধনী কয়েকজন মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ী নূতন পাটকল স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু, বর্ত্তমানে পাটকল সমূহে যত তাঁত ও টেকো আছে তাহাই পৃথিবীর চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। নূতন তাঁত ও টেকো বসিলে পাটশিল্পে বিষম প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হইবে, নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ কলই বিপন্ন হইবে। অন্যদিকে, একথাও চিন্তা করা দরকার যে, পাট-ব্যবসায়ে ও পাটশিল্পে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই—অথচ, তাহাদের স্থান থাকা উচিত। পাট-ব্যবসায়ে লাভের কড়ি চিরকালই অবাঙ্গালীদিগের পকেটস্থ হইবে—ইহাও অসহ্য।

নূতন তাঁত ও টেকো বসার ফলে য়ুরোপীয়বহুল জুটমিলস্ এসোসিয়েশন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছেন। এসোসিয়েশন-সংশ্লিষ্ট কলগুলিতে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে মাত্র ৪০ ঘণ্টা কাজ চলিতেছিল, তদ্ব্যতীত কিছু তাঁত ও টেকো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। এখন, এই সমস্ত কলে সপ্তাহে পুরা ৫৪ ঘণ্টা কাজ করার এবং অব্যবহৃত তাঁত ও টেকো লইয়া পুরা কাজ আরম্ভ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এসোসিয়েশন ও য়ুরোপীয় কলগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত কলসমূহকে প্রতি-যোগিতায় টুঁটি টিপিয়া মারার চেষ্টা করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাটশিল্পে ও পাটব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কোন লাভ হয় না—অথচ ভারতীয় কলগুলি ও অবাঙ্গালী দালালগুলি ইহাতে প্রচুর লাভ করিতেছে।

—:*:—

এক আর একে দুই

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, একে আর একে দুই,
মোরা যেন দু'টী যুক্তাক্ষর জীবনের অভিধানে,
তুমি আর আমি কায়ার পিছনে ছায়া।
অনাদি কালের পথে—
দেশ আর কাল ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য মোদের লীলা
সৃজনের মহাপদ্মবুকের তুমি গো গন্ধরেণু,
সৌরভে মোরে উন্মাদ আজি করিয়াছ সুন্দরী?
প্রেমের সাধনা-সমাধির ঘুম ভাঙ্গি'
তুমি এলে প্রিয়তমা।

চকিতে আসিয়া লুকালে আবার বহুর ব্যাপ্তি মাঝে
ক্লান্তিবিহীন চিত্ত তোমার ডাকিয়া পেলনা সাড়া
ছায়াতরুহীন উষর মরুতে পেলনা তোমায় খুঁজি,
বেদনারুদ্ধ বক্ষের মাঝে পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যথা
ঘনায়ে তুলিল নিবিড় আঁধার বিফল অন্বেষণে
কোথায় প্রেয়সী, কোথায় আজিকে সহসা লুকায়ে গেলে?
অয়ি মৃগ-তৃষ্ণিকা;
তৃষা মিটাবার সুশীতলবারি-ভৃঙ্গারখানি হাতে
হাতছানী দিয়ে কোন্ মহামরু পারে করি' লয়ে যাও?
লয়ে চল কোন্ দুর্জ্জেয় অভিসারে?
যুগ যুগ হ'তে তোমারি স্বপনে অপলক আঁখি দু'টী
জমাট অশ্রু-কারাগার তলে অধীরে প্রতীক্ষিয়া
কান্ত-বিধুর ক্রৌঞ্চীর মত কাঁদিছে করুণ সুরে—
এলেনা এলেনা তুমি,
দূর হ'তে শুধু যাদু কটাক্ষে ভুলালে ছলনাময়ী?

একদা সে কোন্ বিস্মৃত দিনে তোমাতে আমাতে প্রিয়া
অসীম উধাও নভোছায়াপথ করিয়া পরিক্রমা
নেমে এসেছিনু মর্ত্ত্যের অভিসারে।
দেখিনু সেথায় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, সন্দেহ শঙ্কায়—
থর থর কাঁপে বাসনা বহ্নিশিখা,
জ্বলে আর নেভে কামদেবতার যজ্ঞের হোমশিখা।
নহ নহ তুমি যজ্ঞসমিধ রসহীন ইন্ধন
কোটী নারীমেধ যজ্ঞের তুমি নহ সখি উপচার
কামী সাধকের লুব্ধ আঁখিতে নহ কামানল জ্বালা;
তুমি গো বেদিনী মৃত্যু-ফণীরে খেলাও কী কৌতুকে,
স্রষ্টার চিরতন্দ্রা বুকে সীমাহারা বিস্ময়,
নিষ্কলঙ্কা তুমি গো মহিমময়ী।

মর্ত্ত্যের বিষ-বাষ্প তোমার তাই কি অসহ লাগে
তাই কি আমার সর্ব্বহরিয়া লুকালে সর্ব্বনাশী
চির-লোভনীয় দুর্লভের দেশে??
তুমি গো প্রাণেশ্বরী,
নিত্যকালের মহাপারাবার চলেছ কি সন্তরি'—
সোনার হরিণে ভুলায়ে আমারে মরু-মৃত্তিকা বুকে?
তুমি জানো সখি, বাহুর বাঁধনে যদি দাও এসে ধরা
ব্যাকুল মরমে না-পাওয়ার ব্যথা নিমেষে ফুরায়ে যাবে
নিমেষে ভরিবে বিরহের শূন্যতা।
অয়ি চিরযৌবনা,
স্বর্গ-গণিকা উর্ব্বশী সম স্বপ্নআঁচলখানি
চিরকাল কিগো ভাবুকের বুকে পরশ বুলায়ে যাবে?
নিটোল গণ্ডে ললাটে পড়েনি ক্লান্তির বলি-রেখা
নামেনি মত্ত মদিরনয়নে প্রদোষের কালো ছায়া
মৃত্যুর নামে স্ফুরিত অধরে ফুটিছে ব্যঙ্গ হাসি।

ওগো রহস্যময়ী,
এসেছে জীবনে বহু নরনারী, বহুবার বহুদিন
পারেনি তাহারা করিতে আমায় উদাসীন উন্মাদ,
নাহি জানে তা'রা মন ভোলাবার কুহক মন্ত্রখানি
মায়াদূতী তা'রা বিলাসের সঙ্গিনী
মায়াঅঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।
কিন্তু তোমার যে বিশাল মায়া দিক্‌দিগন্ত ছেয়ে—
দুর্য্যোগময়ী রজনীর বুকে দিয়ে যায় সান্ত্বনা,
সহানুভূতির প্রজ্জ্বলন্ত আত্মার দীপশিখা
জ্বেলে দিয়ে যায় সজল অন্ধকারে,
সে মায়ায়, আমি মুগ্ধ হ'য়েছি দেবী
মুগ্ধ হয়েছি অসীম অতৃপ্তিতে।

—*—

মহিলা মজলিস

শ্রীমতী ইভা গুপ্তা

বর্ত্তমান পারস্য

পারস্যদেশের আধুনিকাদের মধ্যে অনেকেই বোরখা ও ঘোমটা ত্যাগ ক'রেছেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও নারীর এই আবরণ-মুক্তি ছিল কল্পনাতীত। এই চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে পারস্য নারীর ভবিষ্যৎ স্বাধীন ইচ্ছার পথ যিনি মুক্ত ক'রেছেন তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীমতী হায়দারী। পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার আদর্শে নিজেকে গ'ড়ে তুলবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হ'ন। পাশ্চাত্যের সমস্ত প্রধানদেশই তিনি পরিভ্রমণ ক'রেছেন—বিশেষতঃ রাশিয়া। রুষ-বিপ্লবের পূর্ব্বে এবং পরে তিনি রাশিয়ায় গিয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। বিশেষ ক'রে শিক্ষা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য পারস্য সরকার তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন।

শ্রীমতী হায়দারী

বহু পরিভ্রমণের পর তাঁর ধারণা হ'য়েছে যে,ভাষা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপারে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে খুব বেশি প্রভেদ থাকলেও, জীবনের গভীর স্তরে এদের একটা ঐক্য আছে। তবে তিনি বলেন যে, পারস্যেও দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। তেহরাণ থেকে ইস্পাহানের পথে এখনও আরোহীসহ উটের দল চ'লেছে দেখতে পাওয়া যায় বটে, গাধায় চ'ড়ে লোক চ'লেছে সে দৃশ্যও বিরল নয়, তবে তার পাশ দিয়ে বহু মোটর গাড়ী ছুটে চ'লেছে —এ দৃশ্যও দেখা যায়। উড়োজাহাজের শব্দে ঘর-বাড়ী ছেড়ে লোক আর রাস্তায় বেরিয়ে আসে না। এই সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথমে পারস্যে বাহিরের যে কয়েকজন লোক উড়োজাহাজ-যাত্রী হ'য়েছিলেন—তার মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা —অর্থাৎ তিনি।

বর্ত্তমানে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বেশ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী দোব্‌লাত আবাদাই-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বৎসর বয়সে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পারস্য ত্যাগ ক'রে প্যারিস যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে শিশুশ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, এমন কি শিক্ষকদেরও বিদ্রূপ পরিহাস অগ্রাহ্য ক'রে তিনি নিদারুণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিজের কাজ ক'রে যান। ফলে, পরে তিনি পূর্ণ শিক্ষিত হ'য়ে আমেরিকার "সম অধিকার সঙ্ঘের" একজন সদস্যা হন ও প্যারিসে তাদের মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করেন। দেশে ফিরে তিনি পারস্য নারীর শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রম ও উল্লেখযোগ্য কার্য্য ক'রেছেন।

নারী ও বিশ্বশান্তি

অনেক মনীষীও মনে করেন যে, পৃথিবীতে যদি কখনও শান্তি স্থাপিত হয়, অর্থাৎ মানুষে মানুষে যদি কখনও হিংসাদ্বেষ হানাহানির অবসান অথবা জাতিতে জাতিতে যদি কখনও যুদ্ধ বন্ধ হয় তো সে একমাত্র নারীর চেষ্টাতেই সম্ভব হ'বে।

জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হ'য়েছে সে আজ পনেরো বৎসর হ'ল কিন্তু মানুষের মন থেকে হিংসা, দ্বেষ, আত্মঘাতী

কলহের ইচ্ছা তিলমাত্র কমাতে যে এই সঙ্ঘ সমর্থ হ'য়েছে তা'তো মনে হয় না;—চীন-জাপান ও ইতালী-আবিসিনিয়াই তার প্রমাণ। এই পনের বৎসরের মধ্যে কতই নৌ-সম্মেলন, কতই অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন হ'ল, কিন্তু তার ফলে অস্ত্র-শস্ত্র ও নৌবহর কমার বদলে বেড়েই গেল। তাই মনে হয় পুরুষের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র জীবদাত্রী ও জীবধাত্রী জননীদের দ্বারাই এই ভয়াবহ জীবহিংসা নিবারিত হ'তে পারে। ইস্তাম্বুলে নারী-মহাসভার উদ্বোধনের সময় আন্তর্জ্জাতিক নারী-সঙ্ঘের স্থাপয়িত্রী ও সভানেত্রী মিসেস্ কেরী চ্যাপম্যান ক্যাটও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

১৯৩১ সালে জাতিসঙ্ঘ একবার নারীদের সঙ্ঘশক্তির প্রভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন। কয়েকটি মহিলাসমিতি লীগ কাউন্সিলের কাছে এক দাবী পেশ করেন যে, আইনজ্ঞ নারীদের নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত করা হোক্। আন্তর্জাতিক বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারী কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত হ'বেন এ সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট এই কমিশন পেশ ক'রবেন, যাতে সেই রিপোর্টটি জাতিসঙ্ঘের খোলা অধিবেশনে আলোচিত হ'তে পারে। তখনকার বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ হেণ্ডারসনের বিশেষ সমর্থন থাকলেও এই দাবী অগ্রাহ্য হয়। এই ব্যাপারটি হয় ১৯শে জানুয়ারী। তখন সেই পরাজিত মহিলাসমিতির প্রতিনিধিরা প্রত্যেক দেশে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে তার করলেন এবং অনুরোধ ক'রলেন যে জাতিসঙ্ঘে সেই সেই দেশের প্রতিনিধিদের কাছে যেন অবিলম্বে তার ক'রে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা এই দাবী সমর্থন করেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সকল দেশ থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের কাছে উক্ত মর্ম্মে তার এসে হাজির। ফলে জানুয়ারির ২৪শে তারিখে ওয়াটারমেলার প্রতিনিধির প্রস্তাবে জাতিসঙ্ঘ মত দিতে বাধ্য হ'ন এবং উক্ত প্রস্তাবানুসারে একটি কমিশনও নিযুক্ত হয়। কয়েকটি মহিলা সমিতির সদস্য এক হ'য়ে যদি এই অসাধ্যসাধন ক'রতে সমর্থ হ'ন তাহ'লে যদি সমস্ত দেশের নারীরা যুদ্ধবিরোধী হ'য়ে শান্তিপ্রার্থী হ'ন তাহ'লে সে শক্তির প্রবল "জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

সাড়ীর সৌন্দর্য্য ও আধুনিক ফ্যাসান

বিশ্ববিখ্যাত নর্ত্তকী এ্যানা প্যাভলোভা যখন কলিকাতায় এসেছিলেন তখন নারীদের বেশভূষা সম্বন্ধে

সাড়ী পরিবার পার্শী ভঙ্গি

একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ ক'রে এবং নারীদের বিচিত্র বেশভূষা দেখে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তা থেকে তিনি বলতে পারেন যে, নারীর সৌন্দর্য্য ও সুষমা ভারতীয় নারীর—বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী নারীর—পরিধেয় সাড়ীদ্বারা যেমন প্রকাশিত হয় এমন আর কিছুতে হয় না। ভদ্র শালিনতা,

বাঙ্গলার বাহিরে বিহার ও উড়িষ্যা এবং সংযুক্ত প্রদেশের নারীদের সাড়ীর বৈশিষ্ট্য বর্ণে। বাস্তবিক, সাধারণ অশিক্ষিতা নারীরাও সেখানে স্বাভাবিক বর্ণের সুষমা কতটা হৃদয়ঙ্গম ক'রেছে তা তাদের বিচিত্র বর্ণযুক্ত সাড়ী থেকেই বোঝা যায়। বর্ষাগমে পশ্চিমের কাজরী উৎসব যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তো একথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম ক'রবেনই—এমন কি পথে ঘাটে হাটে বাজারে এই

ঘুরাইয়া সাড়ী পরিবার অতি-আধুনিক রীতি। ইহাতে পাশ্চাত্য নারীদের স্কার্টের ভঙ্গি সুপরিস্ফুট।

সাড়ীর আঁচল ঘুরাইয়া পিছন দিকে আগুল্ফ লম্বিত করার অতি আধুনিক ফ্যাশান।

অতি আধুনিকা বিহারী মহিলার শাড়ী পরিবার ভঙ্গি। সংরক্ষণশীল বিহারেও প্রগতি আপনার পথ করিয়া লইয়াছে।

নারীদেহের সুষমামণ্ডিত ও সংযত মাধুর্য্য শাড়ীর সাহায্যে সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়।

ভারতের নানা প্রদেশের নারীরা নানাভাবের সাড়ীর ব্যবহার ক'রেন। সাধারণ বাঙ্গালী নারীর সাড়ীর প্রধান বৈশিষ্ট্য পাড়ে। পাড়ের এতরকম বৈচিত্র্য আর কোন প্রদেশে নেই। এক সময়ে পাছা পাড় সাড়ীর প্রচলন বাঙ্গলায় খুবই ছিল—এখন তা' উঠে গেছে।

সাড়ী ও ব্লাউজের অপরূপ সামঞ্জস্য উদ্ঘাটিত করিয়া আধুনিকাদের সাড়ী পরিবার ভঙ্গি

সময়ে যে সমস্ত গ্রাম্য নারীরা মোট মাথায় ক'রে গান গাইতে গাইতে আসা যাওয়া করে তাদের বিচিত্র বর্ণের সাড়ী দেখলেও বর্ণবিলাসের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। মালাবার, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও রঙীন সাড়ীর প্রচলন বেশী, তবে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের মত তার বৈচিত্র্য এত অধিক নয়। অভিজাত ও ধনীগণের নারীরা অবশ্য পালপার্ব্বনে বা উৎসবাদিতে যে দামী রেশমী সাড়ী ব্যবহার করেন, বর্ণবিলাসে ও পাড় এবং আঁচলের কারুকার্য্যে তা' অনিন্দ্যনীয় ও চিত্তচমৎকারী। এখানে আধুনিক সাড়ী ও তার পরবার কায়দার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হ'ল। সাড়ীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে জামা বা ব্লাউসের ব্যবহারও আধুনিক ফ্যাশানের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এইজন্য জামার গলা ও হাতে সূচী-শিল্পের কত নিত্য নূতন পরিকল্পনা বেরুচ্ছে এবং এই দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ফ্যাশানের সঙ্গে তাল রাখা নাকি মর্ম্মান্তিক রকম কঠিন—এ রকম অভিযোগও প্রায়ই এই ধরণের আধুনিকাদের স্বামীদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। যাক্—সেটা ঘরোয়া ব্যাপার; সেইজন্য সে সম্বন্ধে আমি কোনো মন্তব্য ক'রতে চাই না।

(২)

বেলা ১১টার সময় "বেনারস" পৌছে গেলাম। আমাদের বাড়ী "দশাশ্বমেধ" ঘাটের নিকটে একটা গলিতে, কিন্তু গাড়ী নিয়ে যাওয়া যায় না, তাই গাড়ী একটা গারাজে রাখবার বন্দোবস্ত করে বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

আরামে গঙ্গায় স্নান হ'ল, তারপর নিত্য নৈমিত্তিক খাওয়া দাওয়া। সমস্ত রাত জেগে গাড়ী চালান হয়েছে, সুতরাং সকলেই ক্লান্ত। অগত্যা কোথাও বেরুন হ'ল না। বেশ আরামে লম্বা ঘুম দেওয়া গেল·····তারপর বেলা ৫টার সময় উঠে, চা খেয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে দলবদ্ধ হয়ে বেড়াতে গেলাম। বিকেলের দিকে কাশীর গঙ্গার ঘাট অতি চমৎকার। তার বিচিত্র ও রমণীয় দৃশ্য অনেকবার অনেক লেখকই অঙ্কিত করেছেন; অতএব সে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কোথাও কথকতা হচ্ছে, কোথাও রামায়ণ গান, কোথাও মহাভারতের ব্যাখ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্ম্মের মহীয়ান্ ভাব ক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণে শান্তিধারা ঢালছে। কত রকম লোকের ভিড়—বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী, নেপালী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশে হিন্দুর এই পুণ্য ক্ষেত্রকে মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে—সেখানে আছে শুধু প্রেম, নিষ্ঠা, ত্যাগ। হিন্দুর এই পরম তীর্থক্ষেত্রের একটা আলাদা রূপ আছে। কেউ যায় তাই দেখতে, কেউ যায় পুণ্যকথা শুনতে আবার কেউ যায় সেই অবসরে পকেট লুটতে। পাপপুণ্যের এই একত্র বাস, স্বর্গ-নরকের নির্বিবাদ সমাবেশ, কাশীর এ এক অপূর্ব্ব মহিমা। প্রকাণ্ড বাড়ী, গঙ্গা থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে, দূরে একপ্রান্তে বেণীমাধবের ধ্বজা, অন্য প্রান্তে হরিশচন্দ্র ঘাটে সর্ব্বদাই চিতা জ্বলছে।

কত লোক শোক করছে, আবার কত লোক আনন্দে মেতে গেছে, হাসিঅশ্রুর অশ্রান্ত কল্লোল বয়ে চলেছে এই গঙ্গার বুকে·····কিছুক্ষণ এই সব দেখে ৭॥০টার সময় ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে "আরতি দেখে বাসায় ফেরা গেল রাত ৯টায়। পরদিন সকালের দিকে রামনগর ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে আসা গেল। পথে দুর্গাবাড়ী ক্যান্টনমেণ্ট ইত্যাদিও দেখা হ'ল। বেলা

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়

১২টার সময় বাসায় ফিরে এসে বেশ আরামে গঙ্গায় স্নান সেরে খাওয়া দাওয়া করা গেল। একটু বিশ্রাম করে বেলা ৩টায় আমরা "সারনাথে" গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে "মিউজিয়ামে" পুরাতন অনেক মূর্ত্তি, জিনিষ পত্তর দেখা গেল, তারপর এক গাইডের সাহায্যে স্তূপ সমূহ এবং মূলগন্ধকুটীবিহার পরিদর্শন করলাম। তারপর চীনা ও জাপানী কারিগরের তৈরী নতুন বৌদ্ধ মন্দির দেখ্‌লাম। মন্দিরটি অতি চমৎকার। একধারে একটি বুদ্ধের মূর্ত্তি আর দেয়ালে বুদ্ধের জীবনী ছবি এঁকে দেখান হয়েছে—লোকশিক্ষার এ এক অভিনব পদ্ধতি।

কি চমৎকার সে ছবি!

৭টার সময়—"সারনাথ" থেকে ফিরলাম। তারপর গঙ্গার ঘাটে একটু বেড়িয়ে রাত ৯টায় বাসায় ফেরা গেল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিদ্রার আয়োজন করা গেল, কারণ সকালে আমাদের কাশীবাসের মেয়াদ ফুরবে। ২৪শে মার্চ্চ—সকালে উঠে আমরা জিনিষ পত্তর গোছাতে সুরু করলাম আর নিরু ষ্টোভ্ জেলে চায়ের ব্যবস্থা করতে লাগল—দেরি করে পড়ে থাকলে ত চলবে না, আমরা যে কাশীরযাত্রী।

৮টার সময় গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে এলাহাবাদের পথে বেরিয়ে পড়লাম। ৮০ মাইল রাস্তা—সেখানে গিয়ে একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে নতুবা বড়ই অসুবিধা। মটরের গতি একটু বাড়িয়ে রওনা হওয়া গেল। দেখতে দেখতে গ্রাম, গমের ক্ষেত, বড় আম, ও পেয়ারা বাগান, ছোট ছোট "চটি" পেরিয়ে বেলা ১০॥টায় আমরা ত্রিবেণীঘাটে পৌছে গেলাম। যদিও আমরা বিদেশী পোষাকে ছিলাম, তবুও পাণ্ডাদের উৎপাত সুরু হ'ল। আমরা যতই তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে "আমরা তীর্থ-নমত্তে আসিনি, তাহারা ততই আমাদের চেপে ধরে। অগত্যা ত্রিবেণী-সঙ্গমে হিন্দুমতেই স্নান ও তারপর দানধ্যানজনিত পুণ্যার্জ্জন করা গেল। স্নান সেরে সঙ্গের Tiffin box খুলে পুরী তরকারির সদ্ব্যবহার করে সহরের দিকে অগ্রসর হ'লাম। প্রথমে ৺পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়ি,—অধুনা স্বরাজভবন—দুর্গ, Science College, Victoria Park ইত্যাদি দেখে "চক" বাজারে এসে "মডার্ণ হোটেল" নামে একটি বাঙ্গালী হোটেলে উঠা গেল।

এলাহাবাদ সহরটি মোটের উপর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিশেষভাবে সৈন্যাবাসের দিকে আরও সুন্দর। যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য সহরের চেয়ে এলাহাবাদ আমাদের বেশী ভাল লেগেছিল। কারণ কাশীর পরেই বাঙ্গালীর এত অধিক সমাবেশ আর কোথাও নাই।

পরদিন ভোর পাঁচটার দিকে উঠে জিনিষ পত্তর গুছিয়ে ৫॥০ টার মধ্যেই আমরা এলাহাবাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে, পথের দুধারের গাছগুলিতে নানারকম পাখীর গান আরম্ভ হয়েছে, পথে দু একটা গরুরগাড়ী একঘেঁয়ে

আওয়াজ করতে করতে চলেছে। পথের ধারের আমগাছ থেকে নূতন "বোলের" চমৎকার মিঠে গন্ধ বেরুচ্ছে; আর আমরা গাড়ীতে ছুটেছি বাংলা মায়ের শান্ত শ্যামল স্নিগ্ধ কোল থেকে অজানা দেশের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের পথে। বেশ আনন্দে চলেছি, ক্রমে "খাগা" "রাজাতলাও" ইত্যাদি ছোট ছোট জনপদ পেরিয়ে 'ফতেপুর' এসে গাড়ী দাঁড় করান হ'ল। তখনও আমাদের চা খাওয়া হয় নি তাই চায়ের চেষ্টায় গাড়ী দাঁড়িয়েছে। আমাদের

পথিমধ্যে (লেখক ও তাঁহার সহযাত্রিগণ)

অদৃষ্ট ভাল; সামনেই "টি প্রোপাগেণ্ডা কোম্পানী"র একদল লোক গ্রামোফোন বাজিয়ে ও নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে চায়ের উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিল। আমরা তাদের ভাষা ঠিক বুঝতে পারলেম না; "লেক্‌চারের" উপসংহারে একজন বল্লে "চা পিয়ো তো বহুত দিন জিয়ো।" তারপর মাটির ভাঁড়ে করে উপস্থিত লোকগুলিকে বিনা পয়সায় চা খাওয়ালে। আমরাও তার ভাগ পেলাম। সাহেবী পোষাকধারী বলে একবারের জায়গায় ছবার! চা খেয়ে আবার চলা সুরু হ'ল। মাইল কুড়ি এগিয়ে গিয়ে পথের ধারেই দৌলৎপুরের ডাক্‌বাংলা। বেলাও হয়েছে তখন প্রায় ১০টা; দুপুর বেলার আহারের ব্যবস্থা এখানেই হ'ল। একটা ছোট্ট ঘুমও দেওয়া গেল, যদিও সেটা মোটেই আরামের হয় নি,—যে বিশ্রী গরম! এদিকে গরম বাতাস আরম্ভ হয়ে গেছে, যদিও এখনও ঠিক "লু" চলা আরম্ভ হয় নি, তবুও রীতিমত গরম পড়ে গেছে। একটু বিশ্রাম করার পর বেলা তিনটায় আবার যাত্রা সুরু। তারপর ঘণ্টা দুই গরম বাতাসের মধ্যে বেশ "আরামেই" কাণপুর পৌছে গেলাম। কাণপুরে থাকার ইচ্ছা সকলেরই ছিল। এখানেই সেই সিপাহীবিদ্রোহের উৎপত্তির প্রধান নেতা নানা সাহেবের বহু স্মৃতিচিহ্ন পড়ে রয়েছে। এখানে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক অনেক কিছু দেখবার ও জানবার আছে। কিন্তু 'মেনিন্‌জাইটীস্' মহামারী-রূপে দেখা দেওয়ায় প্রাচীন কীর্ত্তি দেখবার ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ্ণৌর দিকে ছুটলাম। ৫০ মাইল পথ; সন্ধ্যাও হয়ে আসছে, একটু জোরেই বেরিয়ে গেলাম। রাত ৮টায় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে পৌছে গেলাম। নূতন জায়গা, তাতে রাতের বেলা, কোথায় যাওয়া যায় ভাব্‌ছি, এমন সময় ১জন বাঙ্গালী ভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে অধ্যাপক ধূর্জ্জটি প্রসাদের বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করা গেল কিন্তু তিনিও নূতন আগন্তুক। তাই তিনি কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর "বাঙ্গালী টোলার" খোজ পাওয়া গেল। এখানে 'কালাবাবু' নামে একটী ভদ্র লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। তিনি Great Indian Hotel নামে একটী বাঙ্গালী হোটেলে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থাটা সেখানেই করে নিলাম। নিকটেই একটী ধর্ম্মশালা ছিল, তাও বাঙ্গালীর এবং কেবল বাঙ্গালীদের জন্যই। আমাদের সহজেই আশ্রয় মিলে গেল; গাড়ী দুটো পাশের ভদ্রলোকের বাড়ীতে রেখে আমরা শুয়ে পড়লাম।

তার পর দিন সকালে উঠে দেখা গেল পাড়াটা

বাঙ্গালীতে ভর্ত্তি; নাম আমিনাবাদ, হিওয়েট রোডের উপরে। মেন রোড থেকে যে সব গলি বেরিয়েছে, সবই বাঙ্গালীর নামে যথা:—সান্যাল ষ্ট্রীট, বসু লেন ইত্যাদি। দোকান-পত্তর সব বাঙ্গালীদের। পাড়াটী দেখিলে মনে হয় না যে এটা যুক্তপ্রদেশের একটী সহর। অনেক দিন পর আজ আমরা বিদেশে মাতৃ-ভাষায় কথা বলে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলুম। কাঁহাতক আর "যাতাহায়" "যাতাহায়" কর' যায়! এই জন্যই বুঝি মেকলে সাহেব বলেছেন যে "বিদেশে দেশবাসীকে দেখলে বা মাতৃভাষা শুন্‌লে খুব আনন্দ হয়।" ধর্ম্মশালায় আমাদের পাশের কোঠায় খিয়েটারের জন্য জোর রিহারসেল চল্‌ছিল বাঙ্গলায়। ধর্ম্মশালার সামনেই একটী বাঙ্গালী চায়ের দোকান,—সকলে সেখানে চা খেতে গেলাম এবং বিভূতিদা নামে এক আমুদে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। কিছুক্ষণ বাদে ধর্ম্মশালার মালিক স্বয়ং শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র সান্যাল মহাশয় এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। আমাদের ডজ গাড়ীটা একটু খারাপ হ'য়েছিল সেটা তিনি তাঁর নিজের কারখানায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে সে বেলার মত বাড়ী গেলেন।

বিকেলে আবার তিনি আমাদের সঙ্গে বেরুলেন। প্রথমে মিউজিয়াম্ লাট-ভবন, 'জু', কলেজ ইত্যাদি দেখে চা খেয়ে নিয়ে গুম্‌তির অপর পারে লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দিকে গেলাম। রাত্রের ভোজনটা বরেনদার অনুরোধে রেস্তোঁরায় সেরে নেওয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। একে একে লক্ষ্ণৌএর ভূতপূর্ব্ব নবাবের গৃহ, বড় ইমাম্ বাড়ী, নূতন মিউজিয়াম, মচ্‌ছি ভবন, ছোট ইমাম্‌বাড়ী দেখা গেল। বড় ইমাম্ বাড়ীতে একটী মজার জিনিষ আছে। তাকে বলা হয় "ভুল ভুলইয়াঁ"—মানে

লক্ষ্ণৌ ইমামবাড়া

গোলোকধাঁধা। আশ্চর্য্য রকমে তৈরী। অজানা লোক একবার ঢুক্‌লে আর বেরুতে পারবে না। নবাবরা নাকি বেগমদের নিয়ে এখানে লুকোচুরি খেল্‌তেন, মন্দ খেলা নয়! ফেরার পথে ফোর্ট দেখা হ'লো, এখন অবশ্য ইটের পাঁজা বিশেষ। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই দুর্গ নষ্ট হয়, কামানের গোলার দাগ এখনও দেখা যায়। কত গোরা সৈন্য মারা গেছে, কে এসে সিপাহীদের হারিয়ে অবরুদ্ধ গোরা সৈন্যদলকে বাঁচিয়েছে ইত্যাদি অনেক গল্প চলিত আছে। ওখানকার লোকে বলে এখনও নাকি রাত্রে গেলে অবরুদ্ধ ঘর থেকে অনাহারে মৃত গোরাদের প্রেতাত্মাকে, "বিস্কুট দাও বিস্কুট দাও" বলে আর্ত্তনাদ করতে শোনা যায়। কতদূর সত্য তা আমরা অবশ্য পরখ করে দেখিনি।.....দুপুর বেলা হোটেলেই খাওয়া হ'লো। বিকেলে আবার বরেনবাবুর সঙ্গে বেরুনো গেল, গুম্‌তির ধারে। বেড়িয়ে এসে পাশের বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে স্নান করা হ'লো। তার পর খাওয়া দাওয়ার পর হিন্দুস্থানী "নটঙ্কি" (যাত্রা গোছের) একটু দেখা গেল। সকালে উঠে ডজ গাড়ীর খোঁজ নেওয়া হ'ল, তখনও ঠিক হয় নাই তবে শীঘ্রই ঠিক হবে। গরম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের যেতেও হবে অনেক দূর এক

কিছুদূর এগিয়েও যেতাম, মানখান থেকে ডজ্ গাড়ীই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। যাহোক বেলা ৩টার মধ্যেই গাড়ী ঠিক করে নেওয়া গেল। ৪॥০টায় চা খেয়ে আমরা আবার রওনা হলাম। আমরা কানপুর এসে Petrol নিলাম, তখন ৬॥০টা; তারপর কিছু বিস্কট ইত্যাদি নিয়ে ৭টার সময় কাশপুর থেকে G. T. Road ধরে বেরিয়ে পড়লাম আগ্রার পথে। তখন বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, রাস্তা এ জায়গায় একটু খারাপ তাই আস্তে আস্তে চল্লাম। কল্যাণপুর রেল ষ্টেশনে ডাক্ বাংলার খোজ করে জানতে পারা গেল আরো ১৫ মাইল দূরে শিউরাজপুরে ডাকবাংলা পাওয়া যাবে।

আমরা আবার চল্লাম। রাত ১০টায় গিয়ে শিউরাজপুর ডাক্‌বাঙলায় উঠলাম এবং রান্না করে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ২৯শে মার্চ্চ ভোর পাঁচটায় উঠে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে চা খাওয়া সেরে ৬টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

রন্ধনায়োজন

সকালের যাত্রাটা বেশ চমৎকার, বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যায়। পথের দুধারে এখন আর দেখবার বিশেষ কিছুই নেই কেবল বাবলা বন আর ধূসর ক্ষেত ছাড়া।

গম কেটে নিয়েছে। সেই সব ক্ষেতে ময়ূর ময়ূরী ঘুরে বেড়াচ্ছে; কোথাও বা সারসের দল গলা উঁচু ক'রে ডাকছে। মাঝে মাঝে দুই একটা খরগোস্ এক ঝোপ থেকে দৌড়ে আর এক ঝোপে গিয়ে ঢুকছে, পথে দু' চারজন ঘাঘরা পরা গয়লানী কলসী মাথায় বাজারের দিকে চলেছে……আর আমরা চলেছি আগ্রার পথে।

একে একে "বিলাউর" "তিরবা" "সরাই মিরান", "বেওয়ার", "মৈনপুরী" পেরিয়ে আমরা চল্লাম। সেদিন বোধ হয় কোন মেলা ছিল। পথে বেশ লোক সমাগম। উটের গাড়ীতে, কেউ গরুর গাড়ীতে, কেউ বা টাঙ্গায়, কেউ বা বাসে নানা রঙ্গের ঘাঘরা পরে, গায়জামা প'রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চলেছে। এই সব দেখতে দেখতে আমরা একটা খালের ধারে এসে পৌঁছে গেলাম। বেলাও তখন প্রায় ১১টা, .ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। Canal I. B. তে গিয়ে উঠা গেল। কজন রান্নায় লেগে গেল আর আমরা কজন গাড়ী দুটো ধুতে লেগে গেলাম।

জোন্ ক্রাওফোর্ড্

প্রতি ছবিতে যেন এর নব-জীবন। ভালো অভিনেত্রী যে সবাই স্বীকার করে।

জুনিটা কুইগ্‌লি মেট্রোর নতুন ছোট্ট মেয়ে। কোথায় বসে' আছে বলুন তো? একটা মার্ক লাইটের ভেতর। লাইন বসিয়ে করবার সময়—এ কথা বলে মিকি মার্টিনের সঙ্গে।

মিরিয়াম হপ্‌কিন্‌স অভিনয় জগতে দিন দিন অসম্ভব রকমের নাম করে' চলেছে। ইউনাইটেড্‌ আর্টিষ্ট্‌-এর "বারবারি কোষ্ট্‌" এ মিরিয়াম নেমেছে—এতেও তার অভিনয় অনিন্দ্য সুন্দর।

ক্লদেৎ কলবার্ট্

তার মুখশ্রীর তিনটি রূপ।

রূপ ছায়া

শ্রীমিলন মিত্র

শুধু যদি বলি—ইভান্‌জেলিন অ্যাডাম্‌স্ বলে' এক ভদ্রমহিলা হলিউডে সেদিন মারা গেছেন—তা হ'লে, আমি ঠিক জানি, আপনারা বল্‌বেন—এঁর নাম এই আমরা শুনলুম প্রথম। আশ্চর্য্য কিছু নয়—মিস্ অ্যাডাম্‌স্‌এর নাম পৃথিবীতে অনেকেই শোনেন নি। কিন্তু, তবুও তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত।

সে অনেকদিনের কথা। ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ আর মেরী পিক্‌ফোর্ড্‌এর মাঝে মনোমালিন্যের তখনও ছায়া পড়ে নি। তারা তখন ছিলো একটি খাঁচায় ক্রৌঞ্চ-মিথুন। সুনামের নীল নদীতে পূর্ণিমার টানে তখন বান ডেকেছে। পিক্-ফেয়ারে তখন দিন নেই, রাত নেই, বইছে—সুখ-প্রপাতের পাঁচমুখী পাগ্‌লাঝোরা। সত্যি···সে অনেক দিনের কথা···

ঠিক তেমনি এক সময়ে মিস অ্যাডম্‌স্ এক বিকেলে তাঁর বাড়িতে ছিলেন বসে, এলো বেতারে এক টেলিগ্রাম।

তাতে লেখা—

"প্রিয় ইভান্‌জেলিন, বেতারে এখুনি আমায় জানাবে—আস্‌চে শনিবার ডগ্‌লাস্ উড়োজাহাজে হলিউড্ থেকে নিউ ইয়র্কে যাবে কিনা।

তলায় নাম লেখা ছিলো—

"মেরী পিক্‌ফোর্ড।"

এডি ক্যান্টর ভারী অবাক্! কথা নেই বার্ত্তা নেই, তিনটি মেয়ে তার সঙ্গে এসে দেখা কর্‌তে চাইলে। এ মেয়েরা ক্যান্টরের সঙ্গে নাব্‌ছে 'স্ট্রাইক মি পিঙ্ক'? — 'হট্ দি স্ক্রিন'

ভারি মিষ্টি এই মেয়েটি দেখ্‌তে। মিষ্টি তার কথা, মিষ্টি তার স্বভাব, মিষ্টি তার সব। মেয়েটির নাম মেরিয়ান মার্স্। কলম্বিয়ায় অভিনয় করে।

ইভান্‌জেলিন অ্যাডাম্‌স্ যে কী, কাদের কাছে বিখ্যাত এবং কেন যে বিখ্যাত আপনারা এতক্ষণে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আর, এও নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, জ্যোতিষ-বিদ্যায় এ ভদ্রমহিলার জ্ঞান ছিলো। জ্ঞান—সে অল্পসল্প নয়, যথেষ্ট, অত্যাশ্চর্য্য।

বিশেষ রকম প্রমাণ না পেলে খানিকটা বিশেষণ প্রয়োগ আমি করি নে।

প্রমাণ অনেক আছে। এই যে উইল রোজার্স্ সেদিন আকাশ-পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে হঠাৎ মারা গেলো—এ কথা উইল রোজার্স্ নিজেই জান্‌তো।

মৃত্যু যেখানে লোকে জানে অনিবার্য্য—সেখানে কখনও কেউ যায়? আপনারা বল্‌বেন পাগল।

কিন্তু মানুষের মরণ যখন ঘনিয়ে আসে তার আর জ্ঞান থাকে না। ১৯৩২এ উইল রোজার্স্ মিস্ অ্যাডাম্‌সের কাছ থেকে শুনেছিলো—যে, তার জীবনের সব চেয়ে খারাপ সময় হচ্ছে ১৯৩৫। বিশেষ করে' গ্রীষ্মকালে দারুণ এক মোটর, কিংবা রেল, কিংবা এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় উইল রোজার্স্‌এর মৃত্যু হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ১৯৩৫এর গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত আকাশে, উইলের মৃত্যুর যে রক্তময় সূর্য্য—তার সুপ্রখর রশ্মি তিন বছর আগে মিস্ অ্যাডাম্‌স্‌এর চোখে পৌঁছেছিলো। সময় থাকতে সতর্ক-বাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—কিন্তু, উইল তা শোনে নি।

এ না শোনার শাস্তি তাকে জীবন দিয়ে যে দিতে হ'য়েছিলো—এ কথা আমি জানি, আপনি জানেন, সে জানে।

আরেকটি বিখ্যাতি সতর্ক-বাণী জোন ক্রাওফোর্ড সেদিন লক্ষন ক'রেছে।

হাসিমুখ শিশুবালার। আনন্দের এ হাসি, কারণ এ অভিনয় করছে ভালো।

মিস্ অ্যাডাম্‌স্ বলেছিলেন—জোন্ বিয়ে যদি করেও, তবে এ বছর তার কিছুতেই করা উচিত নয়।

জোন এ কথা মানে নি। তার বিবাহিত-জীবনের দুর্ঘটনা আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আরেকটি দৃষ্টান্ত যা দাউ দাউ করে জল্‌ছে—সে হচ্ছে প্ল্যাটিনাম-পরী জিন হার্লো—রূপো-রেশমী চুল যার।

জিন হার্‌লোর নাম তখনও কেউ শোনে নি।

'হেল্‌স্ এন্‌জেল্‌স্'-এ সে সবেমাত্র তখন নেবেছে। এমন সময় তার একটি ফটো মিস্ ইভান্‌স্‌এর হাতে পড়ে। দেখেই তিনি বল্‌লেন—এ মেয়েটির বিয়ে করা কখনও উচিত নয়।

কথাটি আজ অত্যন্ত সত্যে দাঁড়িয়েছে। পর পর দুটো বিয়ে করে'ও সেই বিশেষ সুখের সোনা তার মেলেনি। অসংখ্য বার বিয়ে করলেও সেটি তার মিল্‌বে না।

গম্ভীর মুখ বীণার। 'তরঙ্গালা'য় কী রকম সে অভিনয় ক'রেছে—তাই হয়তো ভাব্‌ছে।

বয়েস এই মেয়েটির মোটে উনিশ। এর ভেতরই সে চিত্ররাজ্যে বিখ্যাত হতে চলেছে। বেটি ফারনেস্ হচ্ছে এ মেয়েটির নাম, মেট্রোয় তার চাকরী।

এ খবর আর আপনাদের কতবার দেবো? —যে, হলিউডের আরেকটি বিখ্যাত বিয়ে হঠাৎ সেদিন ভেঙ্গেছে। ক্লার্ক গেব্‌ল্‌কে লোকে বল্‌তো—হলিউড হয়তো একদিন ভাঙ্গবে, কিন্তু তার বিয়ে আর ভাঙ্গবে না! এ কথাটি সেদিন একেবারে অসত্যে পরিণত হয়েছে। ক্লার্ক আর স্ত্রী রিয়া লুকাস্ গেব্‌ল্ কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একদিন পরস্পরের মুখ দেখা বন্ধ করলে। শুধু তাই নয়, এক বাড়িতে থাকাও তারা বন্ধ ক'রেছে। রিয়া গেছে তার বাপের বাড়ী, ক্লার্ক চলে এসেছে বেভারলি-উইল্‌সায়ার হোটেলে।

সবার মনে হয় বছর দুয়েকের ভেতর ঐ বিখ্যাত অভিনেতাটি আর বিয়ে করবে না।

মিস্ ভাজিরী সুদূর পার্শিয়া থেকে ভারতে এসেছেন অভিনয় করতে। ইনি অত্যন্ত বিদুষী, ফরাসী ভাষায় অদ্ভুত এঁর জ্ঞান। এঁর প্রথম ছবি বিখ্যাত 'লয়লা মজনু'।

তবে তারপর নিশ্চয়ই করবে।

কিন্তু, কাকে?

গুজব—ক্লার্ক এর মাথায় ঘুরছে তিনটি মেয়ের ছবি।

তারা কারা?

একনম্বর—মেরি টেলর; নিউ ইয়র্ক্ সমাজের সে সুন্দরী এক নারী।

দু'—এলিজাবেথ অ্যালান। দেশ তার বিলেতে, সবুজ তার বয়েস, ছায়া-রাজ্যে অল্প নামের অধিকারিণী সে নয়।

তিন—লরেটা ইয়ং। ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। রূপ তার যেন আয়নার উপর চাঁদের আলো। ঝল্সানো ঝলমলে, চঞ্চল টলমলে নয়।

আরেকজন হচ্ছে এলেনর বোর্ডম্যান্। বিখ্যাত পরিচালক—কিং ভিদোরের সে গৃহিনী। সম্প্রতি সে নিয়েছে আদালতের আশ্রয়।

বিচারপতির হুকুমে ভিদোরকে আজীবন তার স্ত্রীকে দিতে হবে একশো নব্বুই পাউণ্ড। তাদের একটি মেয়ে আছে। ঠিক হয়েছে—সে তার মায়ের কাছেই থাকবে।

নরমা শিয়ারার 'জুলিয়েট' এখনও খুঁজে পায় নি। মেট্রো গোল্ড্‌উইন মেয়ারে সমস্ত ঠিকঠাক,—কে কি কথা বলবে, কে কি পোষাক পরবে, কোথায় কখন কি হবে—সমস্ত, শুধু রোমিয়ো এলে এলেই হয়।

রোমিয়োর অংশের জন্য ব্র্যায়ান্ আরন্ ও সিজার রোমিয়োর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ঠিক এখনও কিছু হয় নি।

সেক্সপীয়ারের অন্যান্য চিত্র সংস্করণের সম্বন্ধে খবর হচ্ছে এই—মেরিয়ান্ ডেভিস্এর যে 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট্'এ নাব্‌বার কথা ছিলো—তা বোধ হয় হবে না।

বিলেতে এলিজাবেথ বার্গনার কিন্তু 'অ্যাস্ ইউ লাইক্ ইট্'এ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

মেট্রো-গোল্ড্‌উইন-মেয়ার ষ্টুডিয়োয় যে সমস্ত চিঠি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে আসে তার প্রত্যেকটাতেই নম্বর দেওয়া হয়। অবিশ্যি, এ নিয়মটির প্রচলন মোটে দু'বছর থেকে হয়েছে।

ঠিক দু'মাস আগে একদিন একখানা চিঠি আসে তার নম্বর হচ্ছে ৫,০০০,০০০। সংখ্যাটী মোটেই অসম্ভব নয়, কারণ, দৈনিক এখানে চিঠি আসে প্রায় ২,১১৮ খানা।

পাঁচ লক্ষ নম্বরের চিঠিখানা বেশ মজার। লেখা হয়েছে ক্লার্ক্ গেব্‌ল্‌কে। লেখক হচ্ছে একটি মেয়ে। মিসিসিপিতে তার বাস। বেশীর ভাগ মেয়েরা ক্লার্ককে চিঠি লেখে তাদের বিয়ে করবার জন্যে। কিন্তু, এ মেয়েটির প্রার্থনা একটু অন্য রকমের। সে চায় গেব্‌ল্ তাকে মিসিসিপি থেকে নিয়ে আসুক তার রান্নার জন্যে। কারণ, সে নাকি ভারী সুন্দর বিস্কুট তৈরী করতে পারে!

এ চিঠির উত্তরে ক্লার্ক্ গেব্‌ল্ কী লিখেছে জানা যায় নি।

দর্শকদের এই অসংখ্য চিঠি লেখার কথায় গত মাসের অসংখ্য ছবি জমানো ও অসংখ্য ছবি দেখার কথা মনে পড়লো। আমি লিখেছিলুম ওদেশে আর এ দেশে প্রভেদ হচ্ছে আকাশের সঙ্গে পাতালের। সৃষ্টিকর্ত্তা মাঝখানে তো বিশাল এক সমুদ্রেরই সৃষ্টি ক'রেছেন। আমাদের দেশে একজনও ও রকম ছবি দেখেন কিনা সন্দেহ। জমানো তো দূরের কথা।

ক্লদেত্ কলবার্ট শুধু রূপ দেখিয়ে আমাদের মন মুগ্ধ করে না। এর গুণও আছে অগণন। 'শি ম্যারেড্ হার বস' এর আধুনিক ছবি, অভিনয় নাকি অতি অপূর্ব্ব।

এর উত্তরে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ক'রে এক চিঠি লিখেছেন। তাঁর জমানো ছবির সংখ্যা, ও দেখা ছবির সংখ্যা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমরা তাঁকে একটি পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর বাসস্থানের ঠিকানাই দেন নি। খুব সম্ভব তিনি ভুলেই গিছ্‌লেন!

একটা ঘটনা মনে করলেই ভিক্‌টোর জোরির চুল এখনও আতঙ্কে খাড়া হয়ে ওঠে। ঘটনাটির সংঘটন হয়েছিলো কোলাম্বিয়ার "টু টাফ্ টু কিল্"এর বহির্দৃশ্য তোলবার সময়। খানিকটা দৃশ্য তোলা হয়েছে, এমন সময় জোরি একটু বিশ্রাম নেবার জন্য অদূরে এক কাঠের বাক্সের ওপর গিয়ে বস্‌লো। বসে' ধরালো একটা পাইপ।

বেশ খানিকটা ধূমপানের পর সে ছাইগুলো পাইপ থেকে ফেলে দিলে।

এখন, ও জায়গাটার ঘাস এতখানি শুক্‌নো যে, ছাই ফেল্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে আগুন ধরে' গেছে। আগুন যে ধরেছে জোরি তা প্রথমে বুঝ্‌তে পারে নি। হঠাৎ, পায়ে অত্যন্ত গরম লাগাতেই সে লাফিয়ে ওঠে।

চেহারায় কতখানি যে মধুরতা আছে—রোজমারী এম্‌ন্‌এর এ ছবিখানি দেখে আমরা বুঝতে পারছি।

লাফিয়ে উঠে দেখে—যে—আগুন বাক্সের তলায়ও ঢুকছে। তাড়াতাড়ি সে বাক্সটাকে খানিক উল্টে দিলে।

বাক্সের এক ধারে বড় একটা লেবেল্ মারা ছিলো। তার ওপর চোখ পড়্‌তেই জোরির হৃদ্-যন্ত্র প্রায় বন্ধ হয়ে আসে আর কি। কাগজটির ওপর লেখা ছিলো —"ডিনামাইট"।

ঐ নিরীহ জিনিষটি আনা হয়েছিলো একখানি ভাঙ্গ্‌বার দৃশ্যের জন্যে।—জোরি তা জান্‌তো না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ইংরিজি আরেকটি বছর কেটে গেলো। সময়ের এই তীর-গতির চলন ভারি মজার!

এই তো সেদিন—এই একবছর আগে—আমাদের দেশের ছবি

আমাদের দেশ

মাইক্রোফোনের ভেতর দিয়ে ভালো করে' কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে পার্‌তো না। আর—এই আজ—বাংলা ছবি কতখানি যে উন্নতি লাভ করেছে তা আর বল্‌বার কথা নয়। এ বছর এতো উচ্চ-শ্রেণীর ছবি আমরা যে দেখ্‌তে পাবো এ কথা ভাব্‌তে সত্যিই ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে। বাংলা-দেশের ছবিতে সুন্দর শিল্পীর যে তুলির ছোঁয়া আমরা পাই—তা ভারতের আর কোন প্রদেশে আছে কি না সন্দেহ। বাংলার বাইরের চিত্রে কীরকম যেন একটা শক্ত হাতের ছোঁয়া। আমরা আজ খুবই আশা কর্‌ছি—এই আস্‌চে বছর আমাদের বেশীর ভাগ ছবিই শিল্পে, অভিনয়ে—সব দিক দিয়েই আরো উন্নতি লাভ কর্‌বে। ভারতে এ ব্যবসায়ে বাংলা যাবে আগে, তার পদচিহ্ন চিনে যাবে অন্য দেশ।

গত বছর বাংলায় বিখ্যাত ও অখ্যাত ছবির তালিকা এখন দেওয়া হয়তো অবান্তর হবে না।

আমাদের মতে গত বছরে শ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে—

১। দেবদাস
২। ভাগ্যচক্র
৩। প্রফুল্ল
৪। মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল

শরৎবাবুর উপন্যাসের: আসল আব্‌হাওয়া চিত্রে

ধরে' রাখা কতখানি যে কঠিন কাজ এ আমরা অতি সহজেই অনুভব কর্‌তে পারি। শুধু মাত্র এ জন্যেই প্রমথেশ বাবুর "দেবদাস"এ শ্রেষ্ঠ সম্মানের দাবী করতে পারে। এবং, এর জন্যে দায়ী প্রমথেশ বাবুর পরিচালনা। পরিচালনায়, অভিনয়ে, ক্যামেরার কাজে আর শব্দযন্ত্রে "দেবদাস" সত্যিই অতুলনীয়। এতে শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর চন্দ্রমুখীর অভিনয় ভারতের শ্রেষ্ঠ সব অভিনয়ের ভেতর স্থান পেতে পারে।

প্রমথেশবাবু এখন "গৃহ-দাহ" তুল্‌তে ব্যস্ত। এই নতুন বছরে আমরা কামনা করি—তিনি ক্যামেরার সাম্‌নে আর নাব্‌বার লোভটা সংবরণ করুন। এতে তাঁর পরিচালনা আরো ভালো হবে—আমাদের বিশ্বাস। আর, আরেকটি জিনিষের ওপর তাঁকে আমরা নজর রাখ্‌তে বলি—সেটি বাঙ্গালীর আদব-কায়দা। বাঙ্গালীর নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে, আমাদের মনে হয়, প্রমথেশ বাবুর ধারণা একটু কম। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁর "দেবদাস"এ পার্ব্বতী যখন বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ি এলো, তখন তাকে বরণ করে তুলে নিলো থান্-পরা এক মহিলা। বাঙালীর নিয়ম-কানুন অনুযায়ী কনে'কে ঘরে তোলায় কোন বিধবার হাত দেবার নিয়ম নেই।

১৯৩৫এর আরেকটি আশ্চর্য্য ছবি হচ্ছে "ভাগ্যচক্র"। চিত্রটি এক কথায় আধুনিক। ক্যামেরার পেছনে থেকে নীতীনবাবু পরিচালনায় যে বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রমথেশবাবুর থেকে কোন অংশে কম নয়। এই চিত্রে যে একটি গতির আস্বাদ পাওয়া যায় তা সত্যিই অত্যন্ত লোভনীয়। "ভাগ্যচক্র" চিত্রটিতে যে

গান গেয়ে গ্রেস মুর নাম যা করেছে জগতে তা অতুলনীয়। মেট্রোর হয়ে একখানা ছবিতে সে নাব্‌বে।

চিত্রত্ব আছে তা আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন চিত্রে আছে কি না সন্দেহ!

নীতীনবাবু এখন "চোখের বালি" তুল্‌বেন ঠিক করেছেন। এখানা সব দিক দিয়ে আরো অনেক যে উন্নত হবে এ আশা আমরা করি। তবে, নীতীন-বাবুকে আমরা Sentiment নিয়ে যাঁটাঘাটিটা আরেকটু কম করতে বলি।

"প্রফুল্ল" চিত্রটিকে যদি বলি—এ শুধু অভিনয়ের জন্য স্মরণীয়—তা হলে বোধ হয় অন্যায় কর্‌বো না। এর আরেকটি প্রশংসনীয় কাজ হচ্ছে তিনকড়ি বাবুর স্বর্গীয় গিরীশ ঘোষের বিশাল কাহিনীটিকে চিত্র

শারলী টেম্পল্ সুদূর আমেরিকা থেকে আপনাদের নববর্ষের শুভ-কামনা করছে।

অনুরূপ ছোট করা। "প্রফুল্লের" মত এতো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় বাংলাদেশের খুব কম চিত্রেই দেখা গেছে। এরকম উচ্চাঙ্গের আরো চিত্র যে কালী ফিল্মস্ তুলবেন—এ আমরা অনায়াসেই আশা করতে পারি।

কালী ফিল্মস্ এখন "কাল-পরিণয়ে"র সবাক সংস্করণে ব্যস্ত।

"মা"নময়ী গার্ল্স্ স্কুলের" সাফল্যের জন্য দায়ী পরিচালক জ্যোতিষবাবুর চেয়ে স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রই বেশী। জ্যোতিষবাবু রাধাফিল্ম্ ছেড়ে "দেবদত্ত ফিল্ম্স্"এ যোগদান করেছেন।

শ্রেষ্ঠ ছবির উল্টো—অত্যন্ত নিকৃষ্ট চিত্রের নাম আমরা এখন দিচ্ছি। সে হচ্ছে—

১। "ফ্যান্টম্ অফ্ ক্যাল্কাটা"

২। হরিশ্চন্দ্র।

—

[illegible] ম্যান্ সাদার্ন। খুব বড় অভিনেত্রী না হ'লেও খুব বড় রূপসী বলে এ সবার কাছে পেয়ে আসছে অত্যন্ত সম্মান। অ্যান্ কলম্বিয়ার মেয়ে।

জন বোলস ভালো গান গায় বলে বিখ্যাত। আর ডিকসী লী আগে ছবিতে ছোট অংশে অভিনয় করতো। কিন্তু, বিং ক্রসবির সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় ক্যামেরার সামনে এতোদিন ও নাবতে পারে নি।

ডিক্সীর ছেলে আছে তিনটি।

আমেরিকার কোলম্বিয়া কোম্পানী নিত্য নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর সন্ধান করতে ব্যস্ত। ওদের মার ছবি দেখ্‌ছেন সিনেমা রাজ্যে সে একেবারে নতুন। নাম—জোন পেরী। চিত্রোপযোগী চেহারা এর আছে, তবে গুণের প্রমাণ আমরা পাই নি।

ফুলের মত নরম [illegible] ফ্লোরেন্স রাইস-এর। [illegible] বয়সে ডেকেছে [illegible] চোখে যাদু [illegible]
[illegible] কাজল, এর অভিনয় অভিজ্ঞ—তাই এর আদর।

সম্পাদকীয়

ভারতের সর্ব্বত্র মহাসমারোহে কংগ্রেস [illegible] জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বোম্বাইয়ে গোকুল [illegible] তেজপালা পাঠশালায়—যেখানে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন। কলিকাতায় ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের পৌরহিত্যে সকালে ও অপরাহ্নে মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়।

কংগ্রেস কনক-জয়ন্তী

পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়

৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর স্থান ছিল কংগ্রেস তথা দেশের পুরোভাগে। আজ তাহার স্থান কোথায়? এই কথা ভাবিয়া শুধু ব্যথা পাইলেই হইবে না—যে দোষ ও দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের এই দুরবস্থা, তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। এই জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

আমাদের শুধু বর্জ্জন করিতে হইবে পরশ্রীকাতরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও আলস্য এবং অনুশীলন করিতে হইবে—ভালবাসা, শৃঙ্খলা ও একাগ্রতা। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তাহা হইলে সকল গুণের সমাবেশের ফলে আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আস্ত নিখুঁৎ মানুষ হইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী সভার সভাপতি হিসাবে হাওড়া কংগ্রেসের দলাদলির অবসানের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ দান করেন। অতঃপর তিনি বলেন—

কংগ্রেসের শক্তিকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মকলহ বিস্মৃত হইতে হইবে। চরিত্রগঠন করিতে না পারিলে জাতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং আমাদের স্বরাজ-সাধনা ফলপ্রসূ হইবে না। আমি বিশেষ করিয়া যুবকদের বলিতে চাই, যে, যদি তাঁহারা দেশসেবার অধিকার পাইতে চান তাহাহইলে তাঁহাদের চরিত্রকে নির্ম্মল ও দৃঢ় করিতে হইবে।

কংগ্রেস কনকজয়ন্তী ঠিক আনন্দোৎসব নহে—কারণ কংগ্রেসের লক্ষ্য এখনও অনধিগত। অতীতের স্মারক ও ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশক হিসাবেই ইহার উপযোগিতা। অতএব অতীতের দোষত্রুটীর প্রতিকার করিয়া শক্তিমান ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি আমরা দাঁড়াইতে চাই, তাহা হইলে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের কথাগুলি যেন আমরা জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পালন করিতে যত্নবান হই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বাঙ্গলাকে যে বাণী দান করিয়াছেন তাঁহাও সকলকে স্মরণ করিতে বলি। তিনি বলিয়াছেন—

যখন আমি গত পঞ্চাশ বৎসরের অপরিসীম নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সাধনার অতুলনীয় আত্মদানের কথা ভাবি, তখন কৃতজ্ঞতায় ও বিস্ময়ে আমার মন ভরিয়া উঠে।

ভারতরাষ্ট্র মহাসভার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাঙ্গলা পুনরায় এক মহান ব্রতসাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প লউক এবং অপরিমিত ত্যাগ ও নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি ও অনুপ্রেরণার ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত বাঙ্গলা ভারতবাসীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করুক।"

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

নাগপুরে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ও সুযোগ্য ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সুচিন্তিত অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাসংস্কার অর্থে শিক্ষাসঙ্কোচ নহে—একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এই কথাটি বিশেষ জোরের সহিত এবং অত্যন্ত সুন্দর করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বেকার বৃদ্ধি ও কার্য্যকরী শিক্ষার অভাব ইত্যাদির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে অভিযোগ করা হয়, উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচন দ্বারা তাহার প্রতিকার হইবে না। সকল রকম কার্য্যকরী শিক্ষাও

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যা[illegible]ই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত কিন্তু এই সকল শিক্ষ[illegible]প্রহ ও কাজে লাগাইবার জন্য চাই গভর্ণমেণ্টের [illegible]হায্য। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সবিশেষ দায়িত্ব আছে। অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচের তিনি ঘোর বিরোধী। একদিক ছাঁটিয়া আর একদিক বাড়াইয়া কো লাভ নাই—ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রগতি-বিরোধী। এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত। পরিশেষে তি শিক্ষার উন্নতি ও শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে যে বার্ষিক এককোটি টাকা দাবী করিয়াছেন তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তিনি বলেন :—

ভারত গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কেবল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিই দায়ী নহেন, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই অভিমত সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। কারণ ভারতের শিক্ষাসমস্যা একটি বড় রকমের জাতীয়সমস্যা। অতএব আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই দাবী উত্থাপন করি যে, এখন হইতে অন্ততঃ কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক কোটি টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করা আবশ্যক। আমি মনে করি, সময় সময় ভিন্ন প্রকার, পরিকল্পনা ও রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তারের যেটুকু সহায়তা করিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ আমার প্রস্তাবিত উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে।"

এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর কি উত্তর ভারত সরকার দিবেন তাহা বলিতে পারি না, তবে দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাব্রতী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে এই দাবী যদি সমর্থিত ও নিয়ত উত্থাপিত হয় তাহা হইলে তাহা কিঞ্চিৎ কার্য্যকরী হইতে পারে। সরকারের প্রধান অজুহাত অর্থাভাব। এ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেন—

ইচ্ছা থাকিলে অর্থের অভাব হইতে পারে না। ১৫০ বৎসর কাল ভারত শাসন করার পরও এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৯ জনের বেশি নহে। ইংরাজ শাসনের এই যে দুরপনেয় কলঙ্ক, ইহা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন।

ঔষধ প্রয়োগে রোগের সাময়িক প্রতিবিধানের ন্যায় আইন প্রয়োগে সামাজিক ব্যাধির

সাময়িক প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হয়। এই হিসাবে বাঙ্গলার [illegible]ভারে জর্জ্জরিত কৃষককুলকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য যে কৃষক-ঋণমুক্তি আইন হইয়াছে তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে—রোগের প্রতিরোধ অপেক্ষা প্রতিষেধই শ্রেয়ঃ। তদনুসারে ঋণগ্রস্ত কৃষককে ঋণমু[ক্ত] করিবার চেয়ে কৃষককে যাহাতে ঋণগ্রস্ত হইতে না হয় সেই ব্যবস্থাই শ্রেয়স্কর। ইহা সম্ভব করিতে হইবে সরকারী তহবিল হইতে কৃষককে সাহায্য করা, [illegible] সুদে ঋণদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। এই তাহা সম্ভব না হইলেও, এই দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ও চেষ্টা থাকা উচিত।

কৃষক-ঋণ-মুক্তি-আইন

খাতক ও মহাজন খাদ্য-খাদক স[ম্বন্ধ] নহে। অবশ্য এতদিন অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তাই ছিল! ইহা সত্যই ক্ষতিকর ও অন্যায়। কিন্তু [এ] আইনের ফলে যদি অবস্থাটা উল্টাইয়া যায় তা হইলেও তাহা সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে শুভ হইবে না। সমাজ-ব্যবস্থায় ঋণদাতার স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়। এইরূপ লোক যাহাতে সীমার মধ্যে থাকিয়া কৃষক সাহায্য করিতে পারে, এই আইন প্রণয়নকালে সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বড়দিনের ছুটীতে নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হই[য়া] গেল। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সারগর্ভ অভিভাষণটী সংক্ষিপ্ততার জন্য বিশেষভাবে মনোহর।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত বৎসর কবিগুরু কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

"সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনও প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হ'য়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। * * * * এই একটা জিনিষ ঈর্ষাপরায়ণ বাঙ্গালী সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে ক'র্ত্তে হয় নি।"

কবিগুরুর এই ভাষণের উত্তরে আমরা প্রথম সংখ্যা চিত্রালীতে বলিয়াছিলাম যে, দশে মিলিয়া সাহিত্য হয় না ইহা সত্য—কিন্তু সেই একের সৃষ্ট সাহিত্যকে সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য এবং সাহিত্য-সমালোচনার জন্য দশের প্রয়োজন অর্থাৎ এইরূপ সম্মেলনের সার্থকতা আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও অন্যভাবে আমাদের এই উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"সাহিত্য মেলার মধ্যে হয় না, কিন্তু মেলা নিয়েই সাহিত্য।...... আমার মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান সম্মিলনীর মধ্যে।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের অভাব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :—

কয়েকটী জিনিষ বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রয়োজন হয়েছে। * * * আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করতে হ'লে তার মাল মসলার জন্য অভিজ্ঞতার প্রসারের প্রয়োজন। আর দরকার—আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-বিচার। আত্ম-সমালোচনা আমাদের যত বৃদ্ধি হবে, সাহিত্য ততই পরিপুষ্ট হবে। সাহিত্যে সরলতার অভাব আমাদের যথেষ্ট আছে। সাহিত্যে পৌরুষের প্রকাশ এখন বড়ই প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে। আমরা দুঃখে দৈন্যে মেরুদণ্ডহীন হোয়ে পড়েছি। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সমালোচনা-সাহিত্য। আজ অবধি একটা বড় ধরণের রবীন্দ্র-সমালোচনা বাঙ্গলা দেশে হোল না—এটি বড়ই পরিতাপের বিষয়।

পাশ্চাত্যে কোথাও কোনও নূতন মারাত্মক রোগের আবির্ভাব হইলেই, সেই জাতির উর্ব্বর মস্তিষ্কগুলি তাহার প্রতিষেধ আবিষ্কার এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহার মূলোচ্ছেদে লাগিয়া যায়। অব্যাহত ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে। জার্ম্মানীতে বসন্তের উদ্ভব হইলেও এখন সে দেশ উক্ত ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। পীতজ্বর এক সময়ে প্রথম সুয়েজখাল-খনন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। কিন্তু আত্মোৎসর্গকারী বীর চিকিৎসকদের অভিযান সেই বাধা সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া পানামা-যোজককে সুয়েজ-খালে পরিণত করিয়াছে। এমন কি জাপানেও বেরিবেরির প্রথম আবির্ভাব হইলেও, এখন সে দেশে এ রোগ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

রোগ ও তাহার প্রতিকার

সাধারণতঃ রাষ্ট্র ও প্রজার শক্তি মিলিত হইয়া এ

অসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়া থাকে। অসংখ্য ব্যাধি-প্রপীড়িত ভারতবর্ষ যথোচিত রাষ্ট্রীয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত তো আছেই। তদুপরি তাহার চিকিৎসকদের মধ্যেও রোগের সাময়িক চিকিৎসা করিয়া ব্যক্তিগত বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জনের স্পৃহা যেমন প্রবল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা দেশের কল্যাণের স্পৃহা তত প্রবল নহে। সেইজন্য এই দুর্ভাগা দেশে বসন্ত, প্লেগ, বেরিবেরি প্রভৃতি মহামারী যাহা একবার আসে, তাহা আর যায় না। ইন্দোরে এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

"মানব সমাজের ক্লেশ দূর করা, আয়ুষ্কাল বৰ্দ্ধিত করা ও মানব জাতিকে শক্তিমন্ত করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

ডাঃ ব্রহ্মচারীর এই মূল্যবান কথাটি যদি এ দেশের চিকিৎসকগণ মনে রাখেন তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইবে।

তাঁহার অভিভাষণে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান উক্তি আছে। তিনি বলেন :—

"পৃথিবীর সমস্ত দেশে—বিশেষভাবে রোগব্যাধি প্রপীড়িত ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে পুষ্টিকর আহার্য্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

কথাটা তিনি ভাবরাচ্যে বলিয়াছেন। ইহার পরে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—"পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করিবে কে?" জমিদাররা চক্ষু বুজিয়া আছেন, সরকার দেখিয়াও দেখেন না। পীড়াপীড়ি করিলে শূন্য ধনভাণ্ডারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। যে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক পুষ্টিকর আহার্য্য তো দূরের কথা পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পায় না, ভেষজে তাহাদের কি উপকার করিবে? সেই জন্যই মনে হয় এদেশের পক্ষে বোধ হয় খাদ্যই প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঔষধ। কিন্তু সেই ঔষধ দিতে পারে, এমন চিকিৎসকতো দেখি না!

আসলে দারিদ্র্যই আমাদের প্রধান ব্যাধি। ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের সভাপতি পাঞ্জাব সরকারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত মনোহরলাল তাঁহার অভিভাষণে এই সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

অর্থনৈতিক প্রতিকার

আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারাই আমাদের প্রধান সমস্যা। সরকার নানা প্রকার ঘোষণায়—ইহার আবশ্যকতা নানাভাবে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এ জন্য আন্তরিক বা যথোপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। ফলে দেশ জুড়িয়া দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে এবং এ দারিদ্র্যই জাতীয় অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায়।

এই সম্বন্ধে আলাচনা করিতে গিয়া তিনি ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই এইরূপ সর্ব্বনাশা দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান প্রতীকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং গত আদম সুমারী রিপোর্টের কমিশানার ডাঃ হণ্টন, অধ্যাপক বাউলি ও রবর্টসন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়া নিজের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। একদল লোক আছেন যাঁহারা জন-নিয়ন্ত্রণের কথায় শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু ক্ষুধায়, ব্যাধিতে, ও অকর্ম্মণ্য অক্ষমতায় মরিবার জন্যই সন্তানোৎপাদনের মধ্যে কোন শক্তি বা মনুষ্যত্বের পরিচয় নাই—একথা তাঁহারা কবে বুঝিবেন? যে সকল পিতামাতা সন্তানের বাঁচিবার পথ প্রশস্ত না করিয়া মরিবার পথই প্রশস্ত করিয়া দেন তাঁহাদের কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-নীতিরও তিনি যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :—

"আমাদের দেশের বাণিজ্য-নীতিরও মাত্র কয়েকটি কথায় ব্যাখ্যা করা চলে। যথা, ভেদমূলক কতকগুলি রক্ষা-ব্যবস্থা, আর্থিক অধিকার-চুক্তি এবং অটোয়া চুক্তির সর্ত্ত। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কোনো ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত সাহসের সহিত সরকার অবলম্বন করেন নাই।"

এই সরকারী নীতির সমালোচনা কোনো চরমপন্থী অসহযোগীর মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই; জনৈক ভূতপূর্ব্ব সরকারী মন্ত্রীই একথা বলিয়াছেন। ইহাতেই যে সরকারী বাণিজ্যনীতির ধারা বদলাইয়া যাইবে, সে আশা অবশ্য দুরাশা। তথাপি ইহা জনসাধারণকে, বিশেষতঃ সহযোগকর্ম্মী বিশিষ্ট ভারতীয়গণকে বাণিজ্য-নীতির স্বরূপ বুঝাইতে অনেকটা সাহায্য করিবে বলিয়াই মনে হয়।

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদ পট—শীত। রেখাচিত্রটির মধ্য দিয়া শিল্পী শ্রীযুক্ত মুখী শীতের জড়তার অপূর্ব্ব একটা রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ "খেয়ালী প্রেসে" শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ন্যাশন্যাল নিউজ পেপার্স লিমিটেডের পক্ষে ৯, রামময় রোড হইতে প্রকাশিত।

AGREEMENT

BETWEEN

THE TATA IRON AND STEEL COMPANY, LIMITED

AND

THE TATA EMPLOYEES UNION, CALCUTTA